CUL-H01975-6-P36133

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩০২; কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্. এ., বি. এল্., শ্রীনেপালচন্দ্র রায়, শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ., শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্., শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ., শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়ক	পৃষ্ঠা
১। কালিদাসের জয় (কবিতা) ...	৪৪১
২। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা (চিত্র) ...	৪৪৪
৩। নারায়ণ রাওএর বধর ...	৪৫২
৪। ঐতিহাসিক কথা	৪৬৩
৫। ইন্দু (গল্প)	৪৭৩
৬। সীতারাম	৪৮৫
৭। "কৃষ্ণচরিত্র" রহস্য	৪৯৩
৮। সহযোগী সাহিত্য	৪৯৭—৫০৪
১। সমাজনীতি	৪৯৭
২। সাহিত্য	৪৯৯
৩। সমালোচনা	৫০২
৯। দুটি সনেট	৫০৪
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৫০৫

কলিকাতা;
১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারিআনা।

শর্ম্মা কোম্পানীর জ্বরাদির অব্যর্থ মহৌষধ

মূল্য প্রতিকৌটা ॥৹ আনা, ডাকমাশুল ।৹ আনা।

(একত্রে ১০ কৌটা পর্য্যন্ত ।৹ মাশুলে যায়।)

১৩৮৭২০ এক লক্ষ বড়ি বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই আজ "চৌদ্দবড়ির" অত্যাশ্চর্য্য গুণে চমৎকৃত। দেশময় "চৌদ্দবড়ির" সুযশ। পুরাতন জ্বরের যে এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাতে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে, রোগোদ্ভূত দিনের পুরাতন, হউক না ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ২।৪ দিনেই প্রকাশ পায়। প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতির পীড়ায় যেখানে কোন ঔষধে সুফল দেয় নাই, সেখানেও ইহার রোগনাশক ক্ষমতা খুব অল্প সময়ে প্রকাশ পাইবে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া ও জীর্ণজ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, নানারূপ চিকিৎসায় যাঁহারা সুফল পান নাই, তাঁহারা এই ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন,—ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

প্রশংসাপত্রে।—প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমি আপনার প্রকাশিত চৌদ্দবড়ি লইয়া গিয়া আমার এক প্রতিবেশীকে দিয়াছিলাম। তিনি ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় ৫ দিন জ্বর হইত, এই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ ৫ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "জীবন-রক্ষক" পুস্তক বিতরিত হইতেছে। ১০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকি।

শর্ম্মা কোম্পানী।

6 P 36,133

কালিদাসের জয়।

কবিত্রের চরিত্র ভাল ছিল না", এই কথা কেবল বাঙ্গলা মুল্লুকেই প্রচলিত দেখতে পাই। কবির জন্মভূমি উজ্জয়িনী তৎসমীপবর্ত্তী অঞ্চলে ইহার বিপরীত শ্রুতি বিদ্যমান কালেও প্রবল। প্রবাদ রূপ যে, একদা স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য-বর চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য এক দুষী রাজনির্ব্বাচকে প্রেরণ করেন। বলা হলা, কালিদাস জয়লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষণীর হাবভাবময় আহ্বানবাক্য ও উত্তরে কবির সুপরাহর্ণ নিম্নে নিবৃত্ত হইল।

আহ্বান।

(তোরা) আয় আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
উড়ে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
গ্রীবা বাঁকাইয়া, পক্ষ ঝাপটিয়া,
হৃদয়-পিঞ্জরে তোরা আয়;
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়।
(মোর) রঙ্গিণ নয়নে বিলোল চাহনি,
সীমন্তে সুনিন্দু, অধরে লাজনি,
অশান্ত লালসাময়,
(মোর) উরস-কদম্বে কাঞ্চন-কাঁচলি,
কটিতে চরণে রজত কাকলি,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ পড়িছে উছলি,
(হের) রূপোল গোলাপে কত বুলবুলি
নাচিয়া বেড়ায় তায়!
(তোরা) আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
(আমি) যৌবন-সাগরে মাণিক্য-তরণী
সাজায়ে রেখেছি, মদন আপনি
নাবিকের বেশে, মৃদু হেসে হেসে,
ক্ষেপণি ধরেছে তায়!
(হের) ওই সুখ দ্বীপ। বাজিছে বাঁশরি—
তরণীতে আয়, কি হবে সাঁতারি?
পড়ে থাকা সিছে, দুঃখ পাওয়া মিছে;
বহে অনুকূল বায়;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ যাত্রী পুরুষেরা আয়;

জনমে জনমে, জীবনে, মরণে,
এত তীব্র সুখ পাবিনে পাবিনে,
বিমোহিত চিত—মিলনের গীত
শুক সারী ওই গায়;
জীবনে মরণে, অলীক ভাবনা,
দুঃস্বপন সম, অলীক কল্পনা,
অলীক জল্পনা, অপূর্ণ বাসনা,
সুখ-দ্বীপে নাহি হায়;
(ওই) বাজিছে বাঁশরি, মধুর, মধুর—
তালে তালে তায় কনক কেয়ুর
বাজিছে এ ভুজে, মেখলা কিঙ্কিণী
আনন্দে শিহরি, বাজে কিনি কিনি;
(আমি) আনন্দে বিভলা, আনন্দে বিবশা;
সুখের তিয়াষা, রূপের পিপাসা,
তোদেরো ঘুচিবে; তোদেরো রজনী
বিদ্যুৎ প্রবাহে নাচিবে এমনি,
সূর্য্যকান্ত মণি প্রায়।
(হবে) নয়নেতে নেশা, প্রাণে ঘুম ঘোর;
সারা নিশি জাগি হইবি অথোর;
পড়িবি ঘুমায়ে এ উরস মোর
ভূপতি শিথান প্রায়;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী পুরুষেরা আয়!

(তোরা) সুখ-দ্বীপ পানে মেলিয়া নয়ান
দেখ দেখ চাহি—বিস্ময়-নিশান
লাল নীল পীত বাসন্তী রঙের
উড়িছে বাতাসে; বীর অনঙ্গের

সুন্দর পতাকা তার ;
সীমন্তিনীহৃদি-হার দুঃখ-ভয় ক্লেশ,
প্রাণান্তক মৃত অশিব অশেষ ;
নিরাশার ওই শূর্পণখা-বেশ,
লেহ বহে নাসিকায়।
(এবে) বসন্ত বাহার স্নেহাগ রাগিণী ;
(সুখ) পূর্ণিমা চাঁদনি, মাধবী যামিনী ;
(সুখ) কুসুমের মালা, সঙ্গীতের রেশ ;
(সুখ) সুখমল-শয্যা, কিংখাপের বেশ ;
(সুখ) গোলাপি আতর, সুবাসিত জল,
রজতের থালে কনকের ফল ;
তাম্বুলের রাগ, আবীর কুঙ্কুম,
কামুশে, কালয়ে, আলোকের ধুম,
হাসি, করতালি, রাগিণী ঝঙ্কার,
রঙ্গের আলাপ, রসের বিহার,
ছন্দোময় নৃত্য, সোভার ফোয়ারা,
আহা মরি কিবা আনন্দের কারা,
নিজে প্রাণ ধরা দেয় ;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী পুরুষেরা আয়।

কালিদাসের উত্তর।

চিনেছি, চিনেছি তোরে।
হায় রে নাগিনি, মানবীর বেশে,
দেবভাষা মুখে, এসি হেসে হেসে,
জড়ান রয়েছে কুন্তলের কেশে
সর্পশিশু বিষময়।
আমি কবি ; মোর উজ্জ্বল নয়ান
অন্তর্ভেদী সদা ; ছলনা ও ভাণ
বুঝেছি বুঝেছি, সকলি দেখেছি ;
রাখ্ রাখ্ নারি অমিয়ার ভাণ—
(তোর) কণ্ঠেতে গরল ধর।
(ছি ছি) এ কি তোর সজ্জা ? নারী-চক্ষু-লজ্জা,
চিরতরে ছাড়ি, লজ্জা পেয়ে লজ্জা,
ধূলায় লুটায় কার।
(একি) আবরণহারা অঙ্গ-যষ্টি তোর !
ওই দেখা যায়, পড়ে আছে ঘোর
কুণ্ডলী-পাকায়ে, বিষম সাপিনী
কালকূট-ভরা, প্রাণসংহারিণী,
হৃদি-পিণ্ডলেহ চুষিছে নাগিনী,—
থেকে থেকে ওই ফণা আস্ফালিয়া
(তোর) কণ্ঠনলী মাঝে দিতেছে ঢালিয়া
হলাহল সুচিজ্বালা ;
(ছি ছি) ঢেকেছিস্ তনু চাকাই বসনে,
কত হাব ভাব প্রকাশি বদনে,
চাহিস্ লুকাতে, হাসি-পারা-মুখ,
অন্তরের জ্বালা, বুকের অসুখ,
(তোর) প্রাণ যাহে ঝালা-পালা।
(তোর) ওই সর্প-চক্ষু করে মিটি মিটি,
রাখ্ রাখ্ তুলে ঢাকাই শাড়িটি,
সাপের খোলোস্ তোর।
কবি-নেত্রে আমি বুঝেছি, বুঝেছি,
ছদ্মবেশী নারী, জানিতে পেরেছি,
(তোর) নাগিনী-ব্যভার ঘোর।
(ছি ছি) সাপের খোলোস্
ঢাকাই শাড়িটি তোর।
গিয়াছে সঙ্কোচ, লজ্জা ঘৃণা ভয়,
উলঙ্গ-রমণী, সাজাইয়া ডঙ্গা,
মোহপূর্ণ গীতি গাস্।
নগন নয়ন, নগন বদন,
নগন নিতম্ব, নগন জঘন,
দোকানীর সম খুলিয়া দোকান,
ছি ছি মরি লাজে, নগন পসারি,
পুরুষে দেখাতে চাস্।
'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি,
গলায় পরিতে ফাঁস।
(তোর) নেত্রনীলিমায় চপলা হানিছে,
চিকুরকলাপে তরঙ্গ নাচিছে,
স্ফীত পয়োধরে উথলি পড়িছে
নাগিনীর অহঙ্কার।
ঘৃণা ও গরব, ঘৃণা ও বিলাস,
যৌবন-মাঝারে কান্তির বিকাশ,
বৃথায় রমণি ও তোর প্রয়াস
এ হৃদয় ধরিবার।
(তোর) নাগিনী-ব্যভার ঘোর।
দীন চক্ষে আহা উঁকি মারে ওই
অতি দুঃখী প্রাণ তোর।

হায় অভাগিনী, সে সৌভাগ্য কোথা—
পারিবি জুড়াতে হৃদয়ের ব্যথা,
হয়ে কবি-প্রণয়িনী?
এ তোর জনমে, এ তোর জীবনে,
এ মহান্ সুখ পাবিনে পাবিনে,
কোন কূপে হায়, এ মর্ত্ত্য-ভবনে,
শোভা পায় মন্দাকিনী?

* * *

ছাড় ছাড় বৃত্তি, হও তপস্বিনী,
ধর কমণ্ডলু, কলুষনাশিনী
গঙ্গাতটে গিয়া, থাক বার মাস—
উদার প্রবাহ, প্রশান্ত আকাশ,
সুস্মিত ভঙ্গ, লতিকার হাসি,
বনরাজি গায়ে জ্যোৎস্নার রাশি,
সৌরভ-প্রবাহ প্রথম ফাল্গুনে,
আর মুকুলের, সেবি কায়মনে
জুড়াও জীবন,—তিল তিল করি
ফুলটা-কলঙ্ক যাওরে নাশিরি।
মধুর সঙ্কোচ, দয়াময়ী-বেশ,
অবরোধ-বধূ-স্নেহের অশেষ
সৌন্দর্য্য ফিরে গো আসুক আবার—
বসন্তলক্ষ্মীর লাবণ্য-সম্ভার
যেন মধুমাসে; মুগ্ধা মোহিনী
শারদ নিশীথে যেন বনরাণী;—
শেফালি-সৌরভে মদিরা-বিভোর,
বনস্থলী ঘরে আনন্দে বিভোর।

* * *

বৃথায় বৃথাধ, এ জনমে আর
দক্ষিণা বাতাসে, ঘর পাপিয়ার
পশিবে না তোর মরুভূ-হিয়ায়।
এ কলুষ ঘোর ধোয়া কভু যায়
মানব-জীবন-কর্ম্মনাশা-জলে?
লো কুলটা, তুই ঝাঁপিয়া অঞ্চলে
ম্লান মুখ তোর, আকুল আহ্বানে,
ছাড়ি ছলা কলা, ডাকরে মরণে।
চির দয়াবান, চির প্রেমবান,
বিশ্বে নাহি বঁধু মরণ সমান;—
পরশে তাহার নিবিড় আনন্দ;
অধরে তাহার সুধা মকরন্দ,
ত্বকে নাহি তার শুষ্ক অসাড়তা;
কণ্ঠে নাই তার ব্যাকুল জড়তা;
অপূর্ণ বিশ্বের অপূর্ণ সংস্কার,
পাপ-পুণ্য-ভেদ, নাহিরে তাহার;
মন্দাকিনীজল তাহারো শুকেশে,
(হর-শিরে যথা) উছলে হরষে।
কলঙ্কিনী, তোর দেহের কলঙ্ক
হইবে বিধৌত; মরণের অঙ্ক
কি সুন্দর।—তুই পড়িস্ ঢুলিয়া
ক্লান্ত-ভুরু আঁখি সুখীরে মুদিয়া;—
সুখক্লান্ত কোন সুন্দরীর প্রায়,
ছাদে পড়ি বালা যবে সে ঘুমায়;
(আর) কুহরে কোকিলা; দক্ষিণা বাতাসে
বিকম্পিত তনু, জ্যোৎস্নারাশি হাসে।

* * *

যুগ কল্প যুগ এইকপে যাবে—
(তোর) অশান্ত হৃদয় মহাশান্তি পাবে
মৃত্যুর আলয়ে; পাষাণ হইয়া
(অহল্যার মত) রহিবি পড়িয়া।
এমনি যুগান্ত বিগত হইবে
মহর্ষি-আশ্রমে; ঋষিরা পড়িবে
পাষাণের বেদু,—পুষ্পের মঞ্জরী
হবি শেষে তুই মালঞ্চ-সুন্দরী
ঋষি-তপোবনে। শকুন্তলা আসি,
(তোরে) পরিবে কুন্তলে, গালভরা হাসি।
হবি শেষে তুই চারু প্রজাপতি—
পুষ্প হ'তে পুষ্পে, মহাহর্ষে মাতি;
ছুটিয়া-বেড়াবি কবি-কুঞ্জবনে।
তার পর তুই, বিচিত্র বরণে,
বিহগের সাজে, কল্পতরু পরে,
অলকার কোন নন্দন ভিতরে,
কুহু কুহু রবে, নব-ঊষা-মুখে,
যক্ষ-দম্পতিরে জাগাবি কৌতুকে।
গন্ধীজনমাঝে, সাজিয়া হরিণী,
নৃপতিকন্যার মহা সোহাগিনী
থাকিস্ হইয়া; কিছু দিন পরে;
শুভ ইন্দ্রধনু অদৃষ্ট-অম্বরে
দেখা দিবে তোর; মহাবহ্নি-দীপ্ত
(পৃথিবী-কন্যার দ্বিতীয়বার মত)
(তোর) আত্মার কলঙ্ক সব নিবে হরি,
করিয়া তুহারে ত্রিলোকসুন্দরী!

পুণ্য পুঞ্জফলে, মানবের ঘরে,
আবার আসিবি নারীজন্ম ধরে।

* * *

ধর্ম্মের সহায়, সিদ্ধির সাধনা,
জয় জয় নারী, অপূর্ব্ব ললনা।
সন্ধ্যা সম তার চারু চিকুর,
লক্ষ্যা সম তার লোচন মধুর;
অধরে তাহার প্রেমালির বাস,
কপোলে তাহার গোলাপী আভাস;
কুচযুগে তাহার সারল্য সন্ধান;
ব্রীড়াময় হাস্যে মাধুরী মাখান;
প্রেমাশ্রুচুম্বনে অমিয়া ছানিয়া,
নয়নে অধরে রেখেছে মাখিয়া;
নখরপর্ণেতে জ্যোৎস্না বিম্বিত,
ললাটে মহিমা, চরণে গৌরব;
সতত সরস আশা-ফুল ঢালা,
শ্রীকরে তাহার কনকের থালা;
দুই করে দুটি কদমের ফুল;
নাহি সাজ-লজ্জা, ভূষণ অতুল।
নাহি পক্ষপাত, নাহিক বিরাট,
গৃহ-রাজত্বের অপূর্ব্ব সম্রাট।
পতি-মুখ তার সুধাংশু-জিনি,
তার-পানে চাহি কি দিবা রজনী
আছে গো রোহিণী; সুখবাদ্যে তার
অনন্ত বসন্ত করে গো বিহার;
বিপন্ন জনেরে হেরিলে পরে
মুক্তারাশি তার নয়নে ঝরে;
(তার) মুখ পানে চাহি বুঝিতে নারি
মানবী কি দেবী, অপূর্ব্ব নারী।
হেন বেশে নারি! আসিবি যখন
কবি-প্রণয়িণী হইবি তখন।
তখন হাসিস্ কটাক্ষে তোর
যত আছে রাগ, বিষদিগ্ধ ঘোর
নাগপাশে তোর, বাঁধিয়ে মারিনি,
রাখিস্ আমারে দিবসযামিনী।*

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

সহর অঞ্চলে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার আয়োজন কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা সহরের লোকের অজ্ঞাত নহে, কিন্তু পল্লীগ্রামের এই উৎসবের মধ্যে যে আনন্দ, যে নিষ্ঠা, যে প্রীতিপূর্ণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুধু অনুভবনীয়, বর্ণনা দ্বারা ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তবে রসজ্ঞ পাঠকগণ যদি তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ রস উপভোগ করিতে পারেন, এই ভরসায় তাহার একটা বর্ণনা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিজয়ার আলিঙ্গন এবং আনন্দোচ্ছ্বাস থামিতে না থামিতেই, লক্ষ্মীপূজা আসিয়া উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই লক্ষ্মীপূজা একটি অতি সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয় উৎসব। দুই প্রকার পদ্ধতিতে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে; এক—যাঁহারা ধনবান, তাঁহারা কেহ কেহ প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন, প্রতিমার পদতলে ধানের আড়ি, কড়ি ইত্যাদি ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধানের আড়িতে পরিপূর্ণরূপে ধান ঢালিয়া লক্ষ্মীরূপে তাহারই পূজা

* এই কবিতার দুই এক স্থলে plagiarism ও anachronism আছে। আশা করি পাঠক মহাশয়েরা মাফ্ করিবেন।—লেখক।

হয়; অল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই দ্বিতীয় প্রকারের পূজাই প্রচলিত আছে।

শনিধান ও খয়েনধান এই পূজার একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। দ্বাদশীর দিন হইতেই বাড়ীর মেয়েরা ধানগুলি ঝাড়িয়া বাছিতে আরম্ভ করে; তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে, যাহাতে ইহার মধ্যে একটিও কাল ধান না থাকে।

তাহার পর লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল-বেলা পূজার সরঞ্জাম বাহির হয়। লক্ষ্মীর আড়ি, কড়ি, শঙ্খ প্রভৃতি আসবাব ঘরের সরদাল, কলুঙ্গা কি এই রকম কোন উঁচু যায়গায় তোলা থাকে; যাহাতে বাড়ীর দুষ্ট ছেলেরা হাত বাড়াইয়া সেগুলি গোপনে হস্তগত করিতে না পারে। লক্ষ্মীপূজার দিন সকালে গৃহকর্ত্রী স্নান করিয়া আসিয়া সেগুলি সেখান হইতে নামাইয়া জলে ভাল করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেন। আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা কাপড় ছাড়িয়া লক্ষ্মীদেবীর পরম-আদরণীয় বেতহাতা লইয়া সেই আড়িটি আলিপনায় রঞ্জিত করে। কেহ জলচৌকী, কেহ বা পিঁড়ির উপর লক্ষ্মী আঁকিয়া করে। লক্ষ্মীপাতার পিঁড়ি বা জলচৌকী সাধারণ গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তাহা সাবধানে পৃথক্ করিয়া রাখে। পূজার দিন সেখানি ধুইয়া আলিপনা দিয়া তাহা চিত্রিত করে; এবং ঘরের যে দেওয়ালের কাছে লক্ষ্মীস্থাপন করা হইবে, সেই দেওয়ালের অনেক দূর পর্য্যন্ত দুর্গাঠাকুরাণীর চালচিত্রের মত আলিপনায় চিত্রিত করে। গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের চিত্রনৈপুণ্য অধিক নহে, কিন্তু যেটুকু নিপুণতা তাহাদিগের অভ্যস্ত, তাহা তাহারা সেই মাটীর দেওয়ালে প্রয়োগ করিতে ছাড়ে না। সেই চিত্রের উপর প্রতাকা উড়িতে থাকে; মধ্যে নানা রকম লতাপাতা কাটে, এবং সর্ব্বোচ্চে থাকে সিংহাসন সমেত লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি আঁকে, ঠাকুর-ঠাকুরাণীর চারি দিকে বালিশ আঁকিয়া দেয়, এমন কি, চিত্রের দুই পাশে লক্ষ্মীর বাহন প্রকাণ্ড দুটি পেচকের চিত্র অঙ্কিত করিতেও ছাড়ে না; এই পেচকের চেহারা সর্ব্বত্র ঠিক পেচকের মত হয় না; কারণ, এঁকে চিত্রকারিণীর এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর যে উপকরণ দিয়া যাহার উপর চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা চিত্রাঙ্কনের কিছুমাত্র অনুকূল নহে। তাই অসম্ভবপুচ্ছবিশিষ্ট লম্বা শরীরের নীচে এক জোড়া বাঁকান পা, এবং চক্রাকার মুণ্ডুর মধ্যে গোল গোল দুটো চোখ, মাথার উপর সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দুটি বৃহৎ কান। কিন্তু পেচকের

এই চিত্র যতই বিকৃত হউক না কেন, আশা করা যায়, তাহা বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মী-দিগের অপ্রীতিকর হয় না, এবং দেওয়ালে আলিপনার এই চিত্র কিছু বেশী দিন না মুছিয়া পল্লীগৃহিণীদিগের নিকট হইতে প্রশংসাকর্ষণের জন্য অবি-কৃত রাখা হয়।

যাহা হউক, সমস্ত চিত্রটি শেষ হইলে, ঝাঁপি টেপারীর ফল আলিপনার বাটিতে ডুবাইয়া তর্জ্জনী চিত্রের চতুর্দ্দিকে ছাপ দিয়া তাহাকে ভারি জাঁকাল করিয়া তোলে। যাহাদের গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত এবং দেওয়াল চুনকাম করা, তাহারা দেওয়ালের আলিপনার পরিবর্ত্তে বাটিতে খয়ের গুলিয়া ছোট একটি তুলি দ্বারা দেওয়াল চিত্রিত করে; কিন্তু পল্লীগ্রামে ভট্টাসিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

দেওয়ালে ও মেঝেতে আলিপনা দেওয়া হইলে লক্ষ্মীপাতা হয়। 'এলমি' অঙ্কিত জলচৌকী বা পিঁড়িখানা দেওয়াল ঘেঁসিয়া বসাইয়া তাহার উপর 'আড়ি' রাখে, এবং তাহাতে সেই বাছা ধানগুলি চূড়া করিয়া ঢালিয়া তাহার উপর লক্ষ্মীর মুখস বসাইয়া দেয়। লক্ষ্মীর মুখস সোলার পাতে প্রস্তুত, মুখসের উপর লাল রঙ্গ দিয়া চোক মুখ আঁকা, ধানের মধ্যে বসাইয়া দিবার জন্য তাহাতে একটা দাণ্ডী লাগান থাকে। লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল বেলা মালী বৌ বা মালীদের মেয়ে এক একটা মুখোস ও কলাপাতে জড়ান শিউলী ও করবীর গোটাকত ফুল প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে দিয়া যায়; ইহার পরিবর্ত্তে কিছু পয়সা পায় না; চাউল, মুড়ি, জলপান, লাড়ু প্রভৃতির বরাদ্দ আছে, লক্ষ্মীপূজার পরদিন সকালে তাহাই তাহারা আদায় করিয়া বেড়ায়।

মুখোস বসাইয়া সমস্ত আড়িটি লাল কাপড়ে ঢাকিয়া তাহার চারি দিকে নানা রকম আকারের লাল কৌটা, ছোট বড় মাঝারি রকমের সামুদ্রিক কড়ি, ছোট ছোট সাঁদা কাঁকুই, এবং আধ পয়সা দামের টিনমোড়া ক্ষুদ্র আরসি— সমস্ত সাজাইয়া দেয়। তাহার পর লক্ষ্মীর সম্মুখে একটি পিতলের জলপূর্ণ সিন্দূররেখাঙ্কিত ঘট সংস্থাপিত করিয়া, তাহার মুখে আম্রশাখা ন্যস্ত করে।

লক্ষ্মী পাতা হইলে, গৃহিণী সেখানে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া নৈবেদ্য সাজাইতে ব্যস্ত হন। এ দিকে বাড়ীর মেয়েরা সকল ঘরে আলিপনা দিয়া দালান, চৌকাট, গৃহপ্রাঙ্গণ, সমস্ত হাড়ী,—কমল-বন, পদ্মফুল, পাখী, লতা পাতা প্রভৃতিতে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করে, এবং লক্ষ্মীর জোড়া জোড়া পা আঁকিয়া সমস্ত উঠান ছাইয়া ফেলে।

সূর্য্য অস্ত গেল; ধূসর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ায় গ্রামখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মেঠো পথ দিয়া রাখালবালকেরা গরু চরাইয়া আজ সকালে সকালেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পক্ষিকুল হর্ষধ্বনি করিতে করিতে কুলায় অভিমুখে ফিরিতেছে; সান্ধ্য অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে, এবং গৃহে গৃহে, বাজারের দোকানে, নদীতীরসংলগ্ন নৌকায়, আম্রকাননবেষ্টিত, বাঁশ বনের প্রান্তবর্ত্তী কৃষককুটীরে মৃৎপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে শরতের পূর্ণ শশধর রজতচক্রের ন্যায় পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল, ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সহসা যেন সমস্ত প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ, শুধু দুই একটি নক্ষত্রবধূর লজ্জাকাতর দৃষ্টি চন্দ্রের শুভ্র কিরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল; বালক বালিকাগণ উঠানে, বারান্দায়, ছাদের উপরে চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া শ্বেতবর্ণের বৃহৎ শঙ্খ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সজোরে ফুঁ দিতে লাগিল; শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন কোন বাড়ী হইতে কাঁশর ঘণ্টার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহ উৎসবময়, সমস্ত গ্রাম হাস্যকলরবমুখর।

লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পাশে দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপের সুগন্ধে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে; পিতলের রেকাবিতে আতপ চাউলের চূড়াকার নৈবেদ্য, তাহার উপর সন্দেশ, মোণ্ডা, বাতাসা। পূজার জন্য সাজিতে স্থলপদ্ম, রজনীগন্ধা, বক, শেফালিকা প্রভৃতি ফুল। কাঠের বারকসে মুগের ডাল, ছোলা, পাটনাই মটর, বরবটীভিজে, হাঁড়িতে দই, কড়ায় দুধ, বাটিতে ক্ষীর, ধামা-বোঝাই খই, মুড়ি, মুড়কি। লক্ষ্মীপূজা হইয়া গেলেই, গরীব দুঃখী, রাখাল কৃষাণ, নৌকার মাঝি, মালাকর, বারুই, নাপিত প্রভৃতিরা লক্ষ্মীপূজার 'ভুজো' ও 'নাড়ু' লইতে আসিবে,—তাহাদের বিতরণের জন্যই মুড়ি, মুড়কি, খৈ, বেশী পরিমাণে যোগাড় করা হইয়াছে।

পূজার সকল যোগাড় হইয়াছে, কেবল এখনও নাড়ু তৈয়ারী হয় নাই; নারিকেলের ছাঁই লক্ষ্মীপূজার একটা প্রধান উপকরণ। নারিকেল ভাঙ্গা হইলে, তাহার জল একটা পাথরের বাটিতে লইয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কাছে রাখিয়া আসিয়া বড় বৌ, মেজ বৌ, দুই যা, দুই খানা কুরণি লইয়া, নারিকেল কুরিতে লাগিল। গিন্নির কাছে ছাঁই তৈয়ারীটা আগে ভাল; তিনি, উনানে কড়া চাপাইয়া ছাঁই করিতে লাগিলেন। ছাঁই তৈয়ারী হইলে, গিন্নি মেয়েদের কাপড় ছাড়িয়া হাত ধুইয়া নাড়ু বানাইতে বলিলেন; তাহারা হৃষ্টচিত্তে

তাঁহার আদেশে মনঃসংযোগ করিল। হঠাৎ গিন্নির মনে পড়িল, আলনাস্থরী ও মধুপর্কের বাটি আনান হয় নাই, পুরুতঠাকুর আসিয়া সে গুলি না পাইলে, এখনি হাঙ্গামা বাধাইবে; হয় ত রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং পরে হয় ত সকল বাড়ী পূজা সারিয়া অসময়ে পূজা করিতে আসিবে! লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পূজা অসময়ে—বাস্‌রে! গৃহস্থ না ছাবেখারে যাইবে; গিন্নি ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তখনি পুরুতবাড়ী লোক পাঠাইলেন। একটি পয়সা পাইয়া পুরুতঠাকুরাণী হৃষ্টচিত্তে জিনিষ গুলি ছাড়িয়া দিলেন; তিনি জানেন, সে গুলি তাঁহার ঘরেই আসিবে, পয়সাটি উপরি-লাভ মাত্র।

এ দিকে পুরুত ঠাকুর নামাবলী গায়ে টিকিতে ফুল গুঁজিয়া যজমানবাড়ী আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁহার কিছুমাত্র অবসর নাই; তিনি ধূলি-প্রসরিত পা দুখানি চট হইতে বাহির করিয়া এক বটী জলে তাড়াতাড়ি তাহা ধুইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পূজায় বসিলেন। ছেলেরা জোরে জোরে শঙ্খ বাজাইতে লাগিল, মেয়েরা পুরুতঠাকুরের একটু তফাতে চৌকাট ঘেঁসিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যের সহিত পূজা দেখিতেছে, কেহ বা পুরোহিতের অত্যন্ত সন্নিকটবর্ত্তী ধুনুচির আগুনে ধুনো নিক্ষেপের অধিকার পাইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছে।

পূজা শেষ হইলে পুরোহিত অন্য বাড়ীতে চলিলেন। গিন্নিরা সকলকে ঘরের বাহির করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সময় লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া ভোগ গ্রহণ করেন।

দণ্ড খানেক পরে গিন্নি ছেলেদের মধ্যে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলেন। কলাপাতে একটু সন্দেশ, চাটি ভিজে, দুখানা পেঁপা, খানদুই নারিকেল, একটু ছানা, ক্ষীর পাইবামাত্র ছেলে মেয়েরা জ্যোৎস্নালোকিত রোয়াকে বসিয়া পরম পুলকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। সেই ফুল জ্যোৎস্নালোকে আলিপনাঙ্কিত রোয়াকের উপর বসিয়া প্রসাদ খাইতে খাইতে বালক বালিকা-গণ হাস্য কলরব ও উল্লাসে নিমগ্ন হইল।

ছেলেদের জলখাবার দিয়া গৃহিণীগণ পুরোহিত-বাড়ীতে সিধা ও জল-খাবার পাঠাইতে লাগিলেন। আত্মীয় কুটুম্বদের বাড়ীতেও জলপান প্রেরিত হইতে লাগিল। কোন কোন ভদ্রলোকের ছেলে মুখোস পরিয়া কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ লাগাইয়া ভিখারী সাজিয়া আত্মীয় প্রতিবাসীর বাড়ীতে জলপান ভিক্ষা করিতেছে; কোন কোন স্থানে তাহাদের ছদ্মবেশ ধরা না পড়িলেও কোথাও

কোথাও তাহারা ধরা পড়িতেছে, আর গৃহিণী-কর্ত্তৃক পরম সমাদরে আহূত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে,—গৃহিণী কাছে বসিয়া, 'এটা খাও, ওটা খাও,' বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ভিখারিণী সাজিয়া নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, "মা চাট্টি ভিক্ষে পাই, লক্ষ্মীপূজোর দিন চাট্টি ভুজো না দিয়ে অমনি ফিরিও না।" কেহ বলিতেছে, "কেরে মাগি রাত্রে ভিক্ষে নিতে এসেছিস্, কাল সকালে আসিস্।" কিন্তু গৃহিণীর কন্যা বা পুত্রবধূ সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া দুই কোমল বাহু দিয়া সেই ছদ্মবেশিনী ভিখারিণীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিতেছে,—"মাগী কত ছলই জানে, ও গলার আওয়াজ কি আমরা চিনতে পারিনে?" অমনি চারি দিক হইতে মধুর হাস্য-কলরব উত্থিত হইতেছে। এই শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত আনন্দাহ্লোলিত রাত্রে যুবতীগণের সেই সরল স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য চারি-দিকের মাধুর্য্যকে আরো ফুটাইয়া তুলিতেছে; আকাশের কোন দূর-দূরান্তর হইতে পূর্ণচন্দ্র সেই কোমল হাসি দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছে, এবং তাহা গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে না। যেন আজি প্রকৃতি-দেবীর কল-হাস্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ বিমল বাসবরাত্রি! আকাশে চন্দ্রের হাসি, উপবনে প্রত্যেক পল্লবের অন্তরালে সুবাসপূর্ণ কুসুমের হাসি, গৃহ-প্রাঙ্গণে যুবক-যুবতীগণের প্রসন্ন হাসি, নিখিলের সমস্ত হাস্য মিলিয়া এক কোমল হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী আলিপনায় অঙ্কিত শুভ্র পুষ্প, লতা, পক্ষী এবং লক্ষ্মীর চরণযুগল পর্য্যন্ত যেন সজীব হইয়া সেই হাস্যে যোগদান করিতেছে।

আজ রাত্রে লক্ষ্মী, অর্থাৎ ভাত খাইতে নাই, সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীতে কেহ লুচি, কেহ রুটি খাইতেছে, কেহ বা সমারোহ পূর্ব্বক চিঁড়াদইয়ের ফলার করিতেছে; তাহার পর ছেলে পিলে হইতে যুবক বৃদ্ধ অনেকেই বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটাইবার জন্য তাস, পাশা, দাবা লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। এই হাস্যময়ী, শান্তিপূর্ণ রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইতে কাহারো ইচ্ছা নাই, আজি ঘুমাইতে নাই।

রাত্রি দশটার পর বাজারের বারোয়ারী তলায় পাঁচালীর গান আরম্ভ হইল। অনেকেই পাঁচালী শুনিতে বারোয়ারী তলায় মাদিয়ালীর নীচে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু এবার পাড়ায় পাড়ায় বেহুলার গানের ভারি ধুম লাগিয়া গিয়াছে। বহুকাল আগে গ্রামে বেহুলার পালা গীত হইত, কিন্তু অনেক দিন

হইতে চাষাদের মধ্য হইতে এই গান একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল; এমন কি চাষার ছেলেরা চাঁদ সদাগর, পদ্মাবতী, বেহুলার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু অল্প দিন হইতে রাখাল কৃষাণরা আবার বেহুলার পালা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ রাত্রে প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে তাঁহাদের অনুগত রাখাল কৃষাণ এবং মজুরেরা এক এক নীলের চাদর অথবা পাল টাঙ্গাইয়া দুই তিনটা কম্বলের উপর বসিয়া বেহুলার পালা গাহিতে সুরু করিয়াছে। দুই তিনটি কেরোসিনের টিমি অথবা ল্যাম্প মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, চাষারা সেই ম্লান দীপালোকে দাঁড়াইয়া কেহ পদ্মাবতী, কেহ মনসা, কেহ নখিন্দরের বক্তৃতা করিতেছে; যাহারা মেয়ে সাজিয়াছে, তাহাদের পায়ে নূপুর, মাথায় কতকগুলা রঙ্গ পরচুলা, পরনে ময়লা শাড়ী ফের দিয়া পরা, প্রকোষ্ঠে পিতলের বিবর্ণ বলয়, কঙ্কণ, উপর হাতে তাবিজ, অনন্ত। বৃদ্ধ চাঁদ সদাগর মাথায় এক জীর্ণ কালো টুপী পরিয়া এক গাছি স্থূল লাঠি হস্তে আসিয়া দাঁড়াইলে, চিকের অন্তরাল হইতে মেয়েরা একবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সদাগরের মুখশ্রী, এবং পরিচ্ছদপারিপাট্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাহার পর চাঁদ সদাগর যখন বৈবাহিকের দর্শনকামনায় অশ্বারোহণে দ্বিতীয়বার আসরে প্রবেশ করিল, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। এক জন লোক উবু হইয়া বসিয়া সদাগরের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া চলিয়াছে, এবং সদাগর একটা ঘোটকমুণ্ড সম্মুখে প্রায় বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রগামী হইয়াছে, ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনীতে ঘা পড়িতেছে, আর অশ্বরূপী মনুষ্য তালে তালে পা ফেলিতেছে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া পায়ের নূপুর বাজিতেছে। অশ্বারোহণেই চাঁদসদাগর তাঁহার বৈবাহিক সবিহান সদাগরের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল; আলাপ শেষ হইলে গায়কেরা অতি তীব্র চীৎকারে গান ধরিল; একঘেয়ে সুর, মিষ্টত্বের নামগন্ধ নাই, কিন্তু ঢোলক ও খঞ্জনীর শব্দ এই অমিশ্রিত সুরের প্রত্যেক কম্পনের সহিত মিলিয়া বহুদূরে এমন একটি পুতরাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে, যাহা এই কোজাগরপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাচ্ছন্নিত রাত্রে মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত শ্রোতার চক্ষুপথে মোহময় স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসে, অস্তাচলবর্ত্তী চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হইয়া পড়ে, শীতল বাতাস বহিতে থাকে, এবং পূর্ব্বগগন লোহিতাভ হইয়া উঠে। কিন্তু তখনো এই চীৎকারধ্বনির বিরাম নাই, সেই ক্রমাগত দ্রুততালে

ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনীর ঝঙ্কার উঠিতেছে, কেরোসিনের টিমি লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সমস্ত লণ্ঠনটা কালীতে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, এবং চিমনিগুলির পাদদেশে সবুজপক্ষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র পতঙ্গের মৃত দেহ পড়িয়া আছে; ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত চিকের আড়ালে বসিয়া মায়ের কোলের কাছে ঢুলিতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে সং আসিয়া গানের একঘেয়েত্ব ভাঙ্গিয়া চারি দিকে একটা সজীবতা ফুটাইয়া তুলিতেছে, এবং মেয়েদের মধ্যে ভারি হাস্যকল্লোল উঠিতেছে; তখনই হঠাৎ তাহাদের নিদ্রা ছুটিয়া যাইতেছে।

রাত্রি প্রভাত হইল, তথাপি গান ভাঙ্গিল না। নখিন্দর সর্পাঘাতে পড়িয়া আছে, তখন কি গান ভাঙ্গা যায়? তাহা হইলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে? সুতরাং বেলা দশটা পর্য্যন্ত গান চলিল, মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাজারে যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া লইতেছে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর স্নান করিবার জন্য ঘাটে যাইতে যাইতে বকুলতলায় দাঁড়াইয়া একটু গান শুনিলেন, তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বেহুলার গান হইলে বৃষ্টি হয় না—একেবারে বৃষ্টি নাই, বেটারা দেশে আগুণ লাগাইবে দেখিতেছি।" আজ সকালে ছেলেপিলের খাওয়া বন্ধ, গোয়ালে গরু বাঁধা আছে, রাখালেরা পাঁচনের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া গান গিলিতেছে। অবশেষে অনেক গান এবং বক্তৃতা বাদ দিয়া নখিন্দরকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল, রমণীরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গান ভাঙ্গিয়া গেল।

গান শেষ হইলে গৃহিণী স্নান করিয়া আসিয়া লক্ষ্মী তুলিলেন। ফকির, বৈষ্ণব, রাখাল, কৃষাণ, পারঘাটের মাঝি, ধোপা, নাপিত, বারুই, মালী সকলে আসিয়া লক্ষ্মীপূজার ভুজো ও নারিকেলের নাড়ুর জন্য তাঁহাকে ধরিতে লাগিল; তিনি অক্লান্তভাবে অন্নপূর্ণার ন্যায় দুই হস্তে তাহাদের মধ্যে জলপান বিলাইতে লাগিলেন। যাহার আয়োজন নিতান্ত অল্প, তিনিও আজ কাহাকেও নিরাশ করিলেন না। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাড়ীর ছোট ৫ টি ছেলে মেয়ে ও বৌ ঝিদের আজ আর চোক মেলিবার যো নাই; কেহ ঘরের বারান্দায় আঁচল মেলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কেহ যেখানে সুবিধা পাইয়াছে, সেখানেই শুইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুধায় ছেলে কাঁদিতেছে, বাটিতে দুধ পড়িয়া আছে, উঠিয়া জ্বাল দিবার শক্তি নাই; কাহারো ছেলে মায়ের ভিজে আলুলায়িত চুলের গোছা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে,—"মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে ওঠ"—মা ক্রমাগতই বলিতেছেন,—"উঠ্‌চি"—কিন্তু গাত্রোত্থান করা কঠিন।

গৃহিণী ক্রন্দনাগত মুখনাড়া দিয়া বলিতেছেন,—এমন ক'রে,—রাত জেগে গান না শুনলেই কি নয়?—এমন ঘুম ত কখন দেখিনি।"—কিন্তু তাঁহার সেই স্নেহের তৎসনায় কাহারো সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। কাজেই গৃহিণী নিজেই দুধ জ্বাল দিয়া ছেলেগুলিকে খাওয়াইতেছেন, ভাত রাঁধিয়া পাথরে টালিয়া বৌ ঝিয়ের ডাকাডাকি করিতেছেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা পবিত্রহৃদয়া পল্লীবিধবাদিগের ন্যায়ব্রত, নির্লিপ্ত হৃদয়ের স্নেহ, মমতা এবং পরোপকারিবৃত্তির সম্যক্‌স্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে, জননী লক্ষ্মীর পূজাচ্ছলে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর কার্য্য সম্পাদন করেন।

নারায়ণ রাওয়ের বখর।

৩

নারায়ণ রাওয়ের বখরের উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে বখরের বর্ণনার সহিত মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ের প্রদত্ত বিবরণের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বলেন,—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অগষ্ট দিবসে, বেলা ২টার সময় নারায়ণ রাও নিহত ও পাবদীগণ কর্ত্তৃক রাজপ্রাসাদ বেষ্টিত হইলে, নগরমধ্যে মহা হলস্থুল পড়িয়া গেল। সাপ্রাসস্ কোতওয়াল কাছারীতে (office of police magistrate) গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এমন সময় প্রাসাদ হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"দাদাসাহেব নিরাপদে আছেন; প্রাসাদে কোনও গোলমাল নাই। তিনি আপনাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে প্রাসাদমধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, এবং নাগরিকগণকে অভয় প্রদান করিতে আপনাকে বলিয়াছেন।" এই সংবাদ পাইয়া সখারাম বাপু হরিপন্তকে বলিলেন যে, আপনি স্বীয় নামে দাদাসাহেবকে পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করুন।" এই পত্র লিখিত হইলে রঘুনাথ রাও উত্তরে জানাইলেন যে,—"গারদীগণ বিদ্রোহী হইয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়াছে।"

হরিপন্ত ফড়্‌কের মনে পূর্ব্ব হইতেই রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি সন্দেহ ছিল। রঘুনাথ রাওয়ের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তিনি সহসা প্রকাশ্য ভাবে সকলের সমক্ষে স্বীয় সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই স্পষ্টবাদিতার পরিণাম চিন্তা করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পুণা পরিত্যাগপূর্ব্বক "বাবামভী" নামক নগরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। সখারাম বাপু নগরবাসিগণকে অভয় প্রদান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। তার পর ত্রিম্বক মামা হতভাগ্য পেশওয়ের উত্তরক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ইংরাজ দূত মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য রাজদূতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাঘোবাকে অভিনন্দন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গারদীগণ সেতল আদায়ের জন্য রাঘোবাকে তাঁহারই

ইঙ্গিতক্রমে কপর্দ্দকশূন্য করিয়া রাখিয়াছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই রঘুনাথ রাও গারদী-গণের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্তিলাভ ও সাতারা হইতে স্বীয় নামে "অভিষেক-বসন" আনয়ন করিলেন।

রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি সকলের সন্দেহ থাকিলেও, বর্ত্তমান হত্যাকাণ্ডে তিনি স্বয়ং কত-দূর লিপ্ত ছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় নাই বলিয়া কেহই তাঁহার সিংহাসনা-রোহণে বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই। গুণাধীশ রাম শাস্ত্রীও তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া, গোপনে এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফলে, প্রায় দেড় মাস পরে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইল। রাম শাস্ত্রী নির্ভীকহৃদয়ে প্রকাশ্যভাবে দাদাসাহেবকে দোষী প্রমাণিত করিয়া বলিলেন, "দেহান্ত প্রায়-শ্চিত্ত ভিন্ন আপনার এই পাপের আর কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনি ভবিষ্যতে কখনই কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। আপনার রাজ্যের উন্নতি হইবারও আর কোনও আশা নাই। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি এই পাপ-রাজ্যে পদার্পণ করিব না।" এই বলিয়া তিনি ওয়াঈর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন।—Grant Duff's History, Vol. I. 700—702,)

বখরের উত্তরার্দ্ধ।

ইহার পর দাদাসাহেব দুই মাস রাজকার্য্য করিলেন। গঙ্গাবাঈ সাহেব অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই কারণে, আনন্দীবাঈ সাহেব তাঁহাকে ও পার্ব্বতীবাঈকে একটি প্রকোষ্ঠে বন্দোবস্ত (বন্দীপ্রায়) করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন নানা ফড়ণবীস সেই প্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া গণেশদরওজার (প্রাসাদের পূর্ব্ব দ্বারের) দিকে যাইতেছিলেন। সে সময়ে গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈ স্বীয় প্রকোষ্ঠের বাতায়নসমীপে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা ফড়ণবীসকে (নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া) সঙ্কেতপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। ফড়ণবীস নিকটে আসিলে পার্ব্বতী-বাঈ তাঁহাকে বলিলেন যে,—"গঙ্গাবাঈ অন্তঃসত্ত্বা আছেন, দুই মাস শেষ হইয়া তৃতীয় মাস আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার গর্ভে অবতার হইবে। আপনারা পাঁচ জন সচিব আছেন, এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।" তখন নানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিব? বলুন।" পার্ব্বতী-বাঈ বলিলেন, "দাদাসাহেবকে ধৃত করিবার পরামর্শ কর।" ইহা শুনিয়া নানা বলিলেন, "আমরা সেই চেষ্টাতেই আছি। আপনাদেরও যখন সেইরূপই আদেশ হইতেছে, তখন এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য অবশ্যই করা যাইবে।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। সে সময়ে বক্সিগণ কেহই নিকটে ছিল না।

সেই দিবসই রাত্রে ১১ জন মৎসুদ্দী বা রাজকর্ম্মচারী "নানা'র গৃহে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের নামের তালিকা এই,—

১। নানা ফড়ণবীস।	৫। ত্রিম্বক রাও মামা।	৯। হরিপন্ত তাত্যা পড়বর্দ্ধন।
২। নারো আপাজী।	৬। আপাগ্রী বলবন্ত।	১০। আনন্দ রাও প্রাণে।
৩। বাবু রাও কেশব।	৭। কৃষ্ণাজী বহিরব মণ্ডে।	১১। খাসগীওয়ালে। †
৪। বিসাজীকৃষ্ণ বিনীওয়ালে *	৮। আপাজী পুরন্দরে।	

* বিসাজীকৃষ্ণ বা বিশ্বনাথজীকৃষ্ণ বিনীওয়ালে পেশওয়েগণের "অগ্রগামী সৈন্যের অধিনায়ক" ছিলেন। বিনীওয়ালে শব্দের অর্থ,=quatermaster general.

† খাসগীওয়ালে=private cash-keeper-of-the Peshwas. এখানে আনন্দরাও জীবাজী নামক পেশওয়ের ধনরক্ষককে খাসগীওয়ালে বলা হইয়াছে।

এইরূপ ১১ জন কর্ম্মচারী (১) একত্র হইয়া দাদাসাহেবকে বৃত করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। তার পর এ বিষয়ে একটি লেখ্য প্রস্তুত করিয়া সকলের তাহাতে স্বাক্ষর করিবার প্রস্তাব হইল। (২) তখন ত্রিম্বক রাও মামা বলিলেন, "এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সখারাম বাপুর সম্মতি চাই। তাঁহার সম্মতি ভিন্ন এ বিষয়ে কাহারও সম্মতি প্রদান করা উচিত নহে।" সে দিন ইহার বেশী আর কিছু হইল না। মামা ও অন্যান্য সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন আবার সকলে নানা ফড়ণবীসের গৃহে একত্র হইলেন। তখন নানা সাহেব ফড়ণবীস সকলকে বলিলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ এ সব কথা কোনওরূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দাদাসাহেব সকলের সর্ব্বনাশ করিবেন। এ কারণে, গীতা, গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া সকলে পরস্পরের নিকট শপথ করুন। এ বিষয়ে যদি কোটী-বধি (অর্থাৎ বহুকোটী) টাকা ব্যয় হয়, তথাপি সকলে মিলিয়া তাহা করিতে হইবে, এ বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করুন।" সকলেই এ কথায় সম্মত হইলেন। সে-দিন ইহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, "আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইবে।" তার পর নানা বলিলেন, "এই কার্য্যে যদি সখারাম বাপুর সাহায্য থাকে, তবেই ইহা সিদ্ধ হইবে।" কিন্তু তিনি দাদাসাহেবের পক্ষপাতী, ইহা শুনিয়া মামা উত্তর করিলেন, "আপনারা ১১ জন যখন এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তখন বাপুর ভার আমি লইতেছি।" নানা বলিলেন, "তিনি (সখারাম বাপু) একজন বুদ্ধিমান্; এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তালাভবিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইলে, আমার সম্বন্ধে তাঁহাকে নিঃসংশয় হইতে বলিবেন।" পুনরায় সকল কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন সখারাম বাপু রাজপ্রাসাদে কাজ করিতে আসিলেন। কাজকর্ম্ম সমস্ত শেষ হইল। বাপুর সহিত মামার মনান্তর ছিল। কেবল সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহারা পরস্পরের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে। উভয়ের মধ্যে অতিশয় শত্রুতা ছিল। (৩) কাছারী বরখাস্ত হইলে, মামা ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া, নানা সখারাম বাপুর গৃহে গমন করিলেন। বাপু নীচ বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। দ্বারপাল সেখানে গিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, "মামা আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।" শুনিয়া বাপু বলিলেন, "ইহা কিরূপে হইতে পারে? পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিম দিকে কিরূপে উদিত হইবে? মামা আমাদের গৃহে কখনই আসিবেন না।" দ্বারপাল কহিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু মামা নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।" ইহা শুনিয়া বাপু বৈঠকখানা

---

(১) গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব কেবল সাত জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত তালিকায় ধৃত হয় নাই, এরূপ দুইটি নাম (প্রথম—বন্ধা বা পুরন্দরে ও দ্বিতীয় মোরোবাদাদ ফড়ণবীস) দৃষ্ট হয়।

(২) এই সকল কার্য্যে নানা ফড়ণবীস সকলের নেতা ছিলেন। তাঁহারই আহ্বানে ও চেষ্টায়, এই ১১ জন মুৎসদ্দী একত্র হইয়া দাদাসাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(৩) পূর্ব্বে মাধব রাও পেশওয়ে সখারাম বাপুকে পদচ্যুত করিয়া, ত্রিম্বক রাওকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই, বোধ হয়, মামার সহিত বাপুর মনান্তর হয়।

হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে নীচে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মামা নমস্কার করিলেন। বাপু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ পূর্ব্বে সূর্য্য পশ্চিম দিকে কিরূপে উদিত হইলেন।" মামা উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরকৃপায় খেলা কেহ বুঝিতে পারে না। ক্রমক্রমে পশ্চিম দিকেও সূর্য্যোদয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই ঈশ্বরী মায়া কাহারও বোধগম্য নহে। আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি। আপনার সহিত কতক কথা আছে। যেখানে মক্ষিকারও প্রবেশ নাই, এরূপ নিভৃত স্থানে চলুন।"

বাপু তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তখন মামা বলিলেন,—"আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি। যাহা চাহিব, তাহা বক্সীস্ দিতে হইবে।"

বাপু। বক্সীস্ যদি দিবার যোগ্য হয়, তা দিতে প্রস্তুত আছি।

মামা। তাহা হইলে সত্য করুন। বড়লোকেরা কথা দিয়া কখন অন্যথা করেন না।

বাপু সত্যে বদ্ধ হইলেন।

মামা। আমি অপর এক বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছি। গ্রহণ করিতে হয়, করিবেন; না হয়, আমি কিছুই বলি নাই, এবং আপনিও কিছু শুনেন নাই। এ বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুতি চাই।

বাপু। উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, গ্রহণ করিব। নচেৎ আমি কিছুই শুনি নাই। (এরূপ ভাবে থাকিব।)

সখারাম বাপুর নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া মামা বলিলেন,—"এই লেখ্য আনিয়াছি, পাঠ করিয়া দেখুন।" বাপু কাগজটি লইয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

মামা। আপনি ইহাতে সম্মতিদান ও স্বাক্ষর করুন।

বাপু। আমি এ বিষয়ে কিরূপে সম্মতি প্রদান করিব? আমি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক। আপনি আমাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিলেন। এ সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই বলিয়া বাপু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া মামা বলিলেন, "ইচ্ছা হয় সম্মতি প্রদান করুন। আমি এ বিষয়ে আপনাকে বেশী অনুরোধ করিতে চাহি না। (যদি বলেন) এখনি এই লেখ্য ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদেরই বা এত কি গরজ পড়িয়াছে। আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, এবং আপনিও কিছু শুনেন নাই। কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ব্যবহারের রাজা বাপুর সত্য লঙ্ঘন করা হইল। বড়লোকের কথাই প্রমাণ। আপনি কথা দিলেন যে, 'যাহা চাহিবেন, তাহা দিব', অতএব এখন এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন।"

বাপু। আমি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক; আমি কিরূপে ইহাতে স্বাক্ষর করিব?

মামা। আপনি দাদাসাহেবের পক্ষের লোক বলিয়াই ত আপনার স্বাক্ষর ও সম্মতি চাহিতেছি। নহিলে আমরা ১১ জন কি চক্রান্ত করিতে জানি না?

বাপু। 'বাপু সত্যভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার কথার ঠিক নাই', এই কথা আপনি রাষ্ট্র করিবেন বলিয়া আমি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিতেছি। কিন্তু দাদাসাহেবকে আপনারা কিরূপে বৃত করিবেন?

মামা। আগে স্বাক্ষর করুন, পরে বলিতেছি।

বাপু ভৃত্যকে কলমদান আনিতে বলিলেন। কলমদান আসিলে তিনি সেই কাগজে স্বাক্ষর করিলেন। মামা গীতা, গঙ্গাজল, পুষ্প, তুলসী ও বেলভাণ্ডার (বিল্বপত্র ও হরিদ্রাচূর্ণ)

আনাইয়া বাপুর হস্তে প্রদান করিলেন। বাপু তাহা লইয়া শপথ করিলেন। পরে বলিলেন, "গঙ্গাজল পর্য্যন্ত হস্তে লইয়া শপথ হইল, এখন রঘুর দাদাসাহেবকে কিরূপে ধরিবেন?"

মামা। সে কথা আমাই জিজ্ঞাসা করিবেন না। যেখানে গোপনে আমাদের এই সকল বিষয়ের পরামর্শ হইবে, কল্য সেখানে আপনাকে লইয়া যাইতে আমাদের একজন লোক আসিবে। আপনি সেখানে গেলে এ কথার উত্তর পাইবেন। এই বলিয়া মামা বাপুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। দাদাসাহেব এ সব বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

পরদিন রাত্রে নানার গৃহে ১১ জন মুৎসুদ্দী সমবেত হইলেন, এবং বাপুকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। বাপু আসিল, সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, "দাদাসাহেবকে কিরূপে বধ করা যাইবে? তিনি প্রাসাদে থাকিতে তাঁহাকে হস্তগত করা সহজসাধ্য নহে।" বাপু বলিলেন, "দাদাসাহেবকে কোনও উপায়ে পুণার বাহির করিতে হইবে। হায়দরাবাদের নিজাম আলীর সহিত পেশওয়েগণের বন্ধুত্ব আছে। তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিত হউক যে, দাদাসাহেব নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি নানাসাহেবের (বালাজী বাজী রাওয়ের) পুত্রকে হত্যা করেন নাই, পরন্তু আপনার পুত্রকেই হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আপনি মনে করিবেন; এবং ইহার প্রতিবিধানার্থ আপনি লক্ষ সৈন্য লইয়া পুণা আক্রমণের চেষ্টা করিবেন।' এই পরামর্শ সকলের সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। পরে গঙ্গাভাগীরথী পার্ব্বতী বাঈ সাহেবের নামে একখানি পত্র হায়দরাবাদের মোগলকে (নিজাম আলীকে) ও একখানি পত্র পেশওয়ের ভ্রাতৃস্থ উকিল (দূত) রাজশ্রী কৃষ্ণরাও কালে'কে লিখিত হইল। কৃষ্ণ রাওয়ের পত্রে লিখিত ছিল যে, "নরাবকে প্রত্যেক কুচের জন্য লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া লক্ষ সৈন্য সহ তাঁহাকে রাঘোবাটের নিকট লইয়া আসিবে।" এইরূপ দুইটি পত্র লিখিত হইল। সেই রাত্রেই দূতহস্তে পত্র প্রেরিত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ প্রাসাদে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। (১)

মাস খানেকের মধ্যে দূত পত্র লইয়া (হায়দরাবাদে) পঁহুছিল। উকিল (কৃষ্ণরাও) নিজাম আলীর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পড়িয়া নবাব বলিলেন,—"নানা সাহেব পেশওয়ের পুত্র নিহত হন নাই, আমার পুত্রই নিহত হইয়াছে। এ কারণে আমার পুণা আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া নবাব লক্ষ সৈন্য লইয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। (২) এ দিকে কৃষ্ণরাও দাদাসাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, "নিজাম আলী পুনা আক্রমণের উদ্দেশে রণসজ্জা করিতেছেন।" তদ্ভিন্ন নানা ও বাপু প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণকেও গোপনে এক পত্র লিখিত হইল।

---

(১) নাদশ রাজকর্ম্মচারিকৃত এই চক্রান্ত, মহারাষ্ট্র ইতিহাসে "বারভাইচে কারস্থান" বা বার ভাইয়ের চক্রান্ত নামে প্রসিদ্ধ।

(২) পেশওয়েগণের বংশেও লিখিত আছে যে, সখারাম বাপু নিজামকে দাদাসাহেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ট ডফ বলেন, নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুতে পুণা দরবারে গোলযোগ বাধিয়াছে, দেখিয়া, মারাঠাগণের চিরশত্রু হাইদরি আলী ও নিজাম আলী মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের দমনের জন্য দাদাসাহেব রণসজ্জা করিয়া বহির্গত হইলেন। নিজাম আলীর সহিত দাদাসাহেবের সেদরের নিকটে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে নিজাম পরাজিত হন। নিজামকে পরাজিত করিয়া দাদাসাহেব হাইদরের দণ্ডবিধানের জন্য কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এক মাস পরে উকিলের পত্র লইয়া দূত পুণায় আসিল, ও দাদাসাহেবকে পত্র প্রদান করিল। তিনি পত্র পাঠ করিয়া সখারাম বাপু, ত্রিম্বক রাও মামা, নানা ফড়ণবীস ও হরিপন্ত ফড়্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উকিল লিখিয়াছেন যে, নিজাম পুনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বাহির হইয়াছেন। এ সংবাদ কি সত্য?" বাপু বলিলেন, "উকিল মিথ্যা কথা লিখিবেন না। নিজামের এ দিকে আসিবার সংবাদ নিশ্চয়ই রটিয়াছে। তিনি বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছেন, তাই লিখিয়াছেন। আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। (মাধব রাও) পেশওয়ের সময় মোগলেরা আসিয়াছিল, কিন্তু কি করিতে পারিয়াছিল? আপনি স্বয়ং সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া সম্মুখীন হউন। বিপর্য্যাস (অর্থাৎ নিজামের অসদভিপ্রায়) দেখিলে, দণ্ড দেওয়া যাইবে। সে জন্য চিন্তা কি?" বাপু এই কথা বলিলেন।

পঞ্চাশি সহস্র সৈন্য সহ দাদাসাহেব সমস্ত মুৎসুদ্দীগণ (১) এবং আনন্দীবাঈ ও দত্তক পুত্র চিরঞ্জীব অমৃত রাওকে সঙ্গে লইয়া গারদীরে (২) গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিন্দে হোলকর ও অন্যান্য সর্দারগণকে পত্র লেখা হইল যে, "নিজাম আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে, আপনারা সকলে সৈন্যসামন্ত সহ আসিবেন।"

এ দিকে নবাব দুই কুচ পর কুচ করিয়া বালেঘাটের নিকট আসিলেন। দাদাসাহেব কুচ করিয়া "কোরেগাঁও" মোকামে উপনীত হইয়া বলিলেন, "পুণায় পার্ব্বতীবাঈ ও গঙ্গাবাঈ দুই জন মাত্র আছেন। তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাহাকেও সেখানে রাখা উচিত। কারণ, গঙ্গাবাঈ তিন মাসের গর্ভবতী।" এই বলিয়া ধোণ্ডো (ধুণ্ডিরাজ) খণ্ডাজী নামক তাঁহার জনৈক পট্টশিষ্যকে (৩) মুতালিকের পরিচ্ছদ, মুদ্রা (মোহর) ও তরবারি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—"তুমি পুণায় গিয়া প্রাসাদের ও সহরের বন্দোবস্ত রাখিবে (৪)।

ভিমধ্যে নাগপুরের সারাজী ভোঁসলে বিদ্রোহী হইয়া ওরঙ্গাবাদ অভিমুখে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া দাদাসাহেব ত্রিম্বক রাও মামাকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং কর্ণাটকে গমন করিলেন। নানা ফড়ণবীস প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ দাদাসাহেবকে বন্দী করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু দাদাসাহেব যত দিন পুণায় ছিলেন ও সৈন্যসামন্ত তাঁহার হস্তে ছিল, ততদিন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। রঘুনাথ রাও পুণা পরিত্যাগ করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবামাত্র বাবুভাইগণ তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা পাইলেন। মাধোরি কর্ণাটকের অভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র নানা ও বাপু প্রভৃতি সকলে একে একে পীড়ার ভাণ করিয়া পুণার প্রত্যাগমন করিলেন। দাদাসাহেব ইহার প্রকৃত কারণ তখন বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দূরবর্ত্তী দেখিয়া, মুৎসুদ্দীগণ গঙ্গাবাঈকে মুক্ত করিয়া পুরন্দর দুর্গে প্রেরণ করিলেন; এবং সারাজী ভোঁসলের ও নিজাম আলীর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন।

(১) পেশওয়ের বখরের বর্ণনামতে, খাসগীওয়ালে প্রভৃতি কয়েক জন প্রাচীন কর্ম্মচারীকে পুণায় রাখিয়া দাদাসাহেব যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

(২) "গারদীর" পুণার অনতিদূরে। এখানে পেশওয়েগণের সেনানিবাস ছিল।

(৩) পট্টশিষ্য—প্রিয়তম ও বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ভৃত্য। পেশওয়েগণের সেবায় জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ ভৃত্য নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে "ভৃত্য" না বলিয়া শিষ্য নামে অভিহিত করা হইত।

(৪) পেশওয়েগণের বখরে লিখিত আছে, রাঘোবা পুণা পরিত্যাগের সময় বাজো আপ্পাজীকে প্রাসাদ ও নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন।

(তাঁহার আদেশক্রমে) ধোণ্ডো বল্লাজী পুণায় প্রতিগমন করিয়া প্রাসাদের ও সহরের বন্দোবস্ত করিলেন।

এদিকে মুৎসুদ্দীগণ দাদা সাহেবকে নিজামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন, এবং নিজামকে গোপনে পত্র লিখিলেন, "আপনি বালেঘাটে আসিবেন; তার পর আমরা যেরূপ লিখিব, সেইরূপ করিবেন।" অনন্তর একদিন রাত্রে সমস্ত মুৎসুদ্দীগণ একত্র হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখন পার্ব্বতী বাঈ ও গঙ্গা বাঈয়ের মুক্তির জন্য কোন্ উপায় অবলম্বনীয়?" (তখন সকলের বিবেচনায় স্থির হইল যে,) পুরন্দর দুর্গ-নারো আপাজীর (ইনি চক্রান্তকারিগণের অন্যতম) তত্ত্বাবধানে আছে। অতএব তাঁহাদিগকে সেই দুর্গে লইয়া গিয়া রাখা হউক।" সখারাম বাপু নারো আপাজীকে বলিলেন, "আমি দাদাসাহেবের নিকট হইতে আপনার পুরন্দরে প্রতিগমনের আদেশ আনিয়া দিতেছি। বাঈগণ (পার্ব্বতী বাঈ ও গঙ্গা বাঈ) যাহাতে পলায়নপূর্ব্বক পুরন্দরে গমন করিতে পারেন, আপনি তাহা করিবেন।" এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া মুৎসুদ্দীগণ দাদা সাহেবকে বলিলেন যে, "পুরন্দরের নিকট রামোশী নামক পার্ব্বত্য জাতি বিদ্রোহী হইয়া অতিশয় দাঙ্গা করিতেছে। এ কারণে মামা আপাজীকে পুরন্দরে ফিরিয়া যাইবার আদেশ প্রদত্ত হউক; তাহা হইলে তিনি গিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করিবেন।" তাঁহাদের সকলের অনুরোধে দাদা সাহেব মামা আপাজীকে বিদায় দিলে, তিনি পুরন্দরে আসিলেন।

পরদিন ১১ জন মুৎসুদ্দী এক স্থানে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আমাদের মধ্যে দুই জনের পুণায় প্রতিগমন করা আবশ্যক। এই জন্য এখানে থাকিতে হইবে, তিনি এদিকের উপায় করিবেন। অতএব কে এখানে থাকিতে প্রস্তুত আছেন, বলুন। যিনি এখানে থাকিবেন, তাঁহাকে 'আজই মরিয়াছি' মনে করিতে হইবে।" তখন বাপু বলিলেন, "আমি এখানে রহিতেছি। এদিকের সমস্ত বন্দোবস্ত আমি করিব।" ইহা শুনিয়া মামা বলিলেন, "আপনারা যাহাতে পুণায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইতে পারেন, আমি তাহা করিতেছি। এবং আমি এখানে থাকিতেছি। (১) 'আমি আজই মরিয়াছি' বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ভার আপনাদের উপর রহিল।" (২)

পরদিন বাপু কপালে কাপড় বাঁধিলেন, এবং দাদা সাহেবকে বলিলেন, "আমার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। শরীর ভাল নাই। আমাকে পুণা যাইবার অনুমতি দিন। আরোগ্য হইলে পুনরায় আসিব।" মামাও দাদা সাহেবকে বলিলেন, "বাপুর শরীর ভাল নাই; তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হউক। আরোগ্য হইলেই তিনি আসিবেন।" কাজেই দাদা সাহেব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বাপু পুণায় আসিলেন।

ইহার পর নানা ফর্ণবীসের স্বাস্থ্য বিকৃত হইল, এবং হরিপন্ত তাঁকে কড়কে খুল রোগে খুব ভুগাইতে লাগিলেন (২)। তাঁহারা পুনায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, দাদা বলিলেন, "সকলেই পাঁড়ার ভান করিয়া বিদায় চাহিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন রকম জুয়াচুরি আছে বলিয়া আমার বোধ হয়।" তখন মামা বলিলেন, "যুদ্ধে অনিচ্ছু সৈনিককে বলপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলে সে আর কত ভলওয়ার চালাইবে? অতএব ইহাদিগকে বিদায় দেওয়া হউক। পুণায় গিয়া দু-১০ দিনে আরোগ্য হইলে, ইহারা পুনরায়

(১) দাদা সাহেবের পক্ষপাতী বলিয়া বাপুর প্রতি মামার সন্দেহ ছিল; এই কারণে তিনি বাপুকে একাকী দাদা সাহেবের কাছে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না।

(২) পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ সমস্তই ভানমাত্র।

আসিবেন। আমি আপনার সঙ্গেই রহিলাম। আপনি কোনও চিন্তা ক[illegible]না।" এই রূপে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া মামা মুৎসুদ্দীগণকে পুণায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। (১)। তাঁহারা পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। দাদাসাহেব সেখান হইতে কুচ করিয়া এক মঞ্জিল অগ্রসর হইলেন। সেখানে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হইল।

পুণায় আসিয়া মুৎসুদ্দীগণ গঙ্গাবাঈয়ের জননী "তাঈবাঈ" সাহেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আপনি গঙ্গাবাঈকে দুখৌটা (২) করিবার জন্য বলিয়া (একবার) স্বগৃহে আনয়ন করুন।" তাঁহাদিগের উপদেশক্রমে তাঈবাঈ প্রাসাদে গিয়া রাজশ্রীধোণ্ডো খণ্ডাজীর নিকট গঙ্গাবাঈকে দুখৌটার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধোণ্ডো খণ্ডাজী গঙ্গাবাঈকে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীবাঈ ও গঙ্গাবাঈকে ঘোম্টা দিয়া তাঈবাঈ সাহেব গৃহে আনা হইল। দুজনেই গেলেন, এ কথা ধণ্ডো খণ্ডাজী জানিতে পারিলেন না।

নারো আপাজী পাঁচ শত নাগী সহ পর্ব্বতীশৈলে (লুকাইয়া) বসিয়াছিলেন। রাত্রি প্রহরৈক কালে তিনি (গোপনে তাঈবাঈর গৃহে আসিয়া পুরন্দর পর্য্যন্ত পাল্কীর ডাক বসাইয়া গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈকে পাল্কীতে করিয়া দুই প্রহর রাত্রে পুরন্দরে লইয়া গেলেন। (৩) পরদিন প্রাতে সখারাম বাপু, হরিপন্ত ফড়্‌কে নানা ফড়ণবীস প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ (পুণা হইতে পুরন্দরে) পলায়ন করিলেন। এই সংবাদ ধোণ্ডা খণ্ডাজীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাঘোবাকে জানাইলেন, যে, "বাঈদ্বয়কে (গঙ্গাবাঈ ও পার্ব্বতীবাঈ) লইয়া মুৎসুদ্দীগণ পুরন্দরে পলায়ন করিয়াছেন।" (৪)

ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

(১) পেশওয়ে-বখরের লিখিত অনুসারে, দাদাসাহেব পেশওয়ে হইয়া "চিন্তো বিঠ্‌ল" নামক তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সখারাম বাপু চিন্তো বিঠ্‌লকে বলিলেন,—আপনার মন্ত্রিত্বপ্রাপ্তিতে নানা ও হরিপন্ত প্রভৃতি মুৎসুদ্দীগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট ও আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। ইঁহারা সঙ্গে থাকিলে, আপনার কখন কি বিপদ্ ঘটাইবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এ কারণে ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য দাদাসাহেবকে আপনিও অনুরোধ করুন। আমার সঙ্গে ১০।১২ শত সওয়ার আছে; সরকার হইতে আরও কতক সৈন্য আমার সাহায্যের জন্য দেওয়া হউক; আমি ইঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইব, এবং পুণায় ইঁহাদিগের গৃহে চৌকী পাহারা রাখিব, যেন ইঁহারা কোনওরূপে বিদ্রোহাচরণ করিতে না পারেন।" বাপুর এই উপদেশ চিন্তো বিঠ্‌লের নিকট সুসঙ্গত বোধ হওয়ায়, তিনি রাঘোবাকে বলিয়া বাপুর সঙ্গে ১ হাজার সওয়ার ও ১ হাজার গারদী সৈন্য প্রদানপূর্ব্বক, নানা ও হরিপন্ত প্রভৃতির সহিত তাঁহাকে পুণায় পাঠাইলেন।

(২) দুখৌটা—মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার বিশেষ প্রথাকে দুখৌটা" বলে। এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণ ক্রিয়াকর্ত্তাকে বা মৃত ব্যক্তির অতিনিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে, অন্ত্যেষ্টি শেষ হইলে, ভোজনের জন্য একদিন স্বগৃহে আহ্বান করিয়া বস্ত্রাদি প্রদান করেন।

(৩) খৃষ্টীয় ১৭৭৪ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী এই ঘটনা ঘটে Grant Duff;—পুরন্দর দুর্গ পুণার প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

(৪) পেশওয়ের বখরে লিখিত আছে, নারো আপাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বাপু, নানা ও হরিপন্ত সহসা একদিন বিদ্রোহিতার ভান করিয়া প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক, গঙ্গাবাঈ, পার্ব্বতীবাঈ, সাগুনাবাঈ (জনার্দ্দন বাবার স্ত্রী) ও দুর্গাবাঈ (সখারাম বক্সী) প্রভৃতিকে লইয়া পুরন্দরে পলায়ন করেন; এবং দাদাসাহেবের পক্ষীয় বক্সী ও কর্ম্মচারিগণ এই কার্য্যে বাধাপ্রদানের চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে বন্দী করেন।

ঐতিহাসিক কথা।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বিধাতা আপন মস্তক হইতে ব্রাহ্মণের, বক্ষোদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে এই চারি ভিন্ন আর জাতি নাই; এবং এই পুরাতন চারি জাতি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সহস্র-জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক কথা, এই চারি মনুষ্যের মধ্যে, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ ও মাথার বলে শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ ও বাহুবলে শ্রেষ্ঠ; বৈশ্য পীতবর্ণ ও কৃষি, বাণিজ্যাদি-কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের দাসত্বই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জাতিভেদের মূল কথা এই বর্ণভেদ; এবং ভারতবর্ষে অদ্যাপি জাতিশব্দের অপর পর্য্যায় বর্ণ।

কৌতুক এই যে, প্রকৃত অবস্থার দৃষ্টিপাত করিলে এই পৌরাণিক আখ্যানের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সমগ্র মনুষ্য জাতিকে মোটামুটি চারি জাতিতে বিভাগ করিবার প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ককেসীয় জাতি, আর্য্যজাতি বহির প্রধান শাখা, সেই জাতি আপনার শ্বেতচর্ম্ম ও প্রকাণ্ড মাথা লইয়া অদ্যাপি সমগ্র পৃথিবী আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। আদিম আমেরিক তাম্র বা রক্তবর্ণের জন্ম ভূগোলবিবরণে বিখ্যাত, এবং তাহাদের বাহুবলের জন্য সম্যক্ খ্যাতি আছে কি না, জানি না; তবে মহাভাগ খ্রীষ্টান দিগের শুভ-পদার্পণের পূর্ব্বে, আমেরিকার লোকে মিশর, কাল্‌দিয়া ও গ্রীস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াও বড় বড় সাম্রাজ্যস্থাপনে ও উন্নত সভ্যতাসৃজনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাই। মোগলজাতীয় চীনাম্যানের প্রধান পরিচয় পীতবর্ণ, এবং শুনা যায়—এই চীনাম্যানই প্রথমে দিগ্‌দর্শন শলাকায় তথ্য অবগত হইয়া সমুদ্রযাত্রা সুগম করে। আর মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি নিগ্রহের ও উৎপীড়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যতই ব্যথিত হউক না, কৃষ্ণকায় কাফ্রি দেশভেদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত কেন না করিবে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হইত ও হইয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে এইরূপে একটা সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ের কারণ

দেখি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, চারি-বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতবর্ণ মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা কত দূরে আসিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্যকাল হইতে আমরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ, গ্রীক ও জর্ম্মান, পার্শী ও হিন্দু, একই মানবব্রহ্মবংশে উৎপন্ন ও পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বন্ধবান্। এই প্রাচীন মানববংশ একটি বিশেষ সুগঠিত সুন্দর ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, একই দেবতার আরাধনা করিত, এবং কাস্পীয় সাগরের ধারে অথবা পামির অধিত্যকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অধিবাস করিত। কালক্রমে বংশবিস্তারসহকারে বা খাদ্যাভাবে বা পার্শ্বস্থ জাতির আক্রমণে আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কেহ পশ্চিমে কেহ বা পূর্ব্বে যাত্রা করে, এবং কালক্রমে পশ্চিমে আৎলান্তিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলে। সেই সেই প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এই বৈদেশিক অতিথির পদার্পণানুগ্রহে সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনাদের গরু ভেড়া ও বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত অভিধিনৎকারে নিয়োজিত করিয়াও নিষ্কৃতি পায় নাই। এমন কি, অধিকাংশ স্থলে আপনাদের অস্তিত্ববার্ত্তা পর্য্যন্ত এত দূর নিষ্কামভাবে লুপ্ত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্তর আক্ষেপ ও গবেষণাতেও তাহার উদ্ধার হইতেছে না। যাহাই হউক, শ্বেতকায়গণের এই আতিথ্যগ্রহণস্পৃহাটা অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে; এবং এই ক্ষুদ্র ধরাখানার মধ্যেও অত বড় সাহারা দেশটাকে মরুভূমি ও মেরু প্রদেশটাকে বরফভূমি করিয়া বিধাতা তাঁহাদের বাসস্থানকে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বিধাতার এই নিষ্করুণ কার্পণ্যের সুচারু কৈফিয়ৎও পাওয়া যাইতেছে না।

P 36,133

আমাদের পঞ্চনদবাসী পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন, এবং সার উইলিয়ম্ জোন্সের পর হইতে ইউরোপীয়েরাও আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞাতি সাব্যস্ত করিয়া সেই নামে পরিচিত করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদের জ্ঞাতিত্বস্বীকারে কুণ্ঠিত, এবং অপরের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরাজেরা যে নিশ্চয়ই বানরের বংশধর, ডারুইনের মতের এইটুকু গ্রহণ করিতে আনন্দসহকারে প্রস্তুত। তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের আর্য্যত্ব স্বীকৃত ও আর্য্যশব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

এই স্থলে ইউরোপীয়দের আর্য্যত্বে অধিকার-বিষয়ক যুক্তির একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রধানতম ও প্রবলতম যুক্তি ভাষাগত ঐক্য। যখন ইংরাজ ও জর্ম্মন্ ও পঞ্জাবী ও মারাঠী একই ভাষার কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ভাষাগত ঐক্যের মূলে শোণিতগত বা জাতিগত ঐক্য না থাকিলে, এত বড় হেয়ালিটারও কোন অর্থ হয় না। অপিচ, ইংরাজের ভাষার ও বাঙ্গালীর ভাষার সাদৃশ্য ও বিভেদ পর্য্যালোচনা করিয়া, যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একত্র পাশাপাশি অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়েও কতকটা স্থূলসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এমন কি, তাঁহাদের আদিম বাসস্থান পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে। তবে যেমন সিদ্ধান্ত-মাত্রেই সকল পণ্ডিতকে কখন এক মত গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই, এখানেও সেইরূপ দুই মত রহিয়াছে। আর্য্যভাষাসমুদয়ের ব্যবচ্ছেদ ও তুলনা-আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আর্য্যজাতির প্রধান বাসস্থল ছিল, কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে; আর কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, সুইডেনের উত্তরে। পুরাতত্ত্বে এইরূপ দৈবৎ মতদ্বৈধ দেখিয়া বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কাজ।

এই ভাষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান আর্য্যজাতীয় মনুষ্যগণকে ছয় প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ছয়ের মধ্যে চারি শাখা ইউরোপে, ও দুই শাখা এশিয়া মহাদেশে বসতি করিতেছে। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন্, গ্রীক্-রোমান, ও স্ল্যাব্; এবং এশিয়া মহাদেশে পারসী ও হিন্দু। এই ছয় শাখা লইয়া আর্য্যজাতিরূপ মহাবৃক্ষ। ইহার মূল কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে বা সুইডেনের উত্তরে কোন স্থানে সংস্থিত ছিল। ইহার শাখা প্রশাখা সমগ্র ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমগ্র ধরাভাগ ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। সমগ্র ধরাভাগ ইহার ছায়ার আশ্রয়ে "সুশীতল" হইতেছে; ইহার শোভা, ইহার ঐশ্বর্য্য, ইহার সমৃদ্ধি পৃথিবীতে তুলনা-বিরহিত; তবে ইহার আওতা ক্ষুদ্র আগাছার পক্ষে বড় উগ্রতর।

এই সিদ্ধান্তটা স্থূলতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত; ইহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইবার সম্যক্ কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীনকালে কোন দেশবিশেষে একটা বিশেষলক্ষণাক্রান্ত মানব-বংশ বসতি করিত; সেই বংশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে শোণিতগত ও জন্মগত সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ তাহারা পীতবর্ণ মোগল, ও কৃষ্ণকায় কাফ্রি, ও তাম্রবর্ণ আমেরিক হইতে স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত জীব ছিল;—সেই জাতির নাম হউক "আর্য্যজাতি"। তাহারা একটা বিশেষ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত; সেই ভাষা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় সম্পত্তি, তাহাদের নিজস্ব ছিল;—তাহার নাম হউক "আর্য্য ভাষা"। তদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূল ঐক্য ছিল; অতএব সেই প্রাচীন ধর্ম্মের নাম দাও "আর্য্যধর্ম্ম"। সেই আর্য্য-ভাষা-ভাষী আর্য্যধর্ম্মাশ্রয়ী আর্য্যজাতি কালে সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং অধুনাতন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মনুষ্য-গণের অনেকে অদ্যাপি সেই প্রাচীন আর্য্যগণেরই বংশে জন্মিয়াছে; কাল-সহকৃত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং হয় ত সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকেই রূপান্তরিত করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এ পর্য্যন্ত কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে এইরূপ কয়েকটা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উত্তরের দরকার হয়। সম্প্রতি যাঁহারা আর্য্যভাষায় কথা কহে; ও আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, সকলেই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য নামের অধিকারী বটে কি না? প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবী ছাইবার পূর্ব্বে কোন-না-কোন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত;—সে কোন্ স্থান? প্রাচীন আর্য্যজাতি কোন-না-কোন সময়ে প্রাচীন বাস-ভূমি ত্যাগ করিয়া দিগন্তে বাহির হয়;—সে কোন্ সময়?

এ কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু সন্দেহের কারণ রহে।

ভাষাগত ঐক্য ধরিয়া জাতিগত ঐক্য স্থাপন করিতে গেলে, অনেক সময়ে ভুল হয়। ভাষাপরিবর্ত্তন পৃথিবীর ইতিহাসে নিত্য ঘটনা। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে পুনঃপুনঃ দেখা যায়, সময়ে সময়ে এক একটা সমগ্র সম্প্রদায় অথবা সমগ্র জাতি আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতৃ-জাতির ভাষা গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করে। আধুনিক ফরাসী ও স্পানিস্ ভাষা লাতিন্ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফরাসী ও স্পানিস্ জাতি রোমক জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তত্তৎ প্রদেশের অধিবাসিগণ রোম-

সাম্রাজ্যের অধীনতার সময়ে রোমকদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে খাঁটি জর্ম্মাণ নর্ম্মাণেরা ফরাসী দেশে বাস করিয়া ফরাসী ভাষা গ্রহণ করে। ওয়েলশ্ ও আইরিস্‌গণ ক্রমে আপন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ভাষা গ্রহণ করিতেছে।

কাফ্রিদাসেরা অনেক স্থলে শাদা প্রভুদের নিকট হইতে খৃষ্টানির সহিত ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা দেশে লাল, শাদা ও কালো, এই ত্রিবিধ বর্ণসমন্বয়ে যে সকল অপূর্ব্ব সুচারু সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা ইউরোপীয় ভাষায় কথা কহে। অথবা অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি, যখন আমাদের মধ্যেই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা অনুভব করেন!

বস্তুতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে চাহিলেই এই বর্ণরহস্যের সহিত ভাষা-রহস্যের সম্বন্ধ অনেকটা বুঝা যায়। মহারাষ্ট্রভূমি বাদ দিলে প্রায় সমুদয় দাক্ষিণাত্যেরা আপন আদিম ভাষা ছাড়িয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ কর্ত্তব্য বোধ করে নাই, অথচ তাহারা ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে আর্য্যপন্থার অনুগামী হইয়াছে। তামিলভাষী ও তেলুগুভাষী লোকে সর্ব্বতোভাবে হিন্দু; কিন্তু তাহারা আর্য্যজাতীয় বা আর্য্যভাষাবলম্বী নহে। আবার মহারাষ্ট্র দেশে ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যভাষা প্রচলিত। অবশ্য গারো ভীল সাঁওতালের কথা বলিতেছি না, আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুসমাজভুক্ত লোকের কথা বলিতেছি। ইহারা সকলেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কিন্তু শোণিতসম্বন্ধ ধরিতে গেলে বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ কয় জন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? এই বাঙ্গালা দেশেই বাগ্‌দি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি জাতির পূর্ণ অনার্য্যত্বে কেহ সন্দেহ করেন না। যাহারা সচরাচর শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে গণিত হয়, তাহাদের শোণিতেও অনার্য্য মাত্রা অধিক, কি আর্য্য মাত্রা অধিক, তাহা বলা দুষ্কর। *

* এইখানে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা নিগূঢ় কথা আসিয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শক ও হূন নামে প্রসিদ্ধ লোক দলে দলে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে। তাহারা সকলেই বৌদ্ধ অথবা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, ও হিন্দুগণের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়। শক অথবা হূন নামে পরিচিত সকলেই যে অনার্য্য ছিল, তাহা বলা যায় না; তথাপি তাহাদের সহিত মিশ্রণে আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যদের বিশুদ্ধত্বের যথেষ্ট হানি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অনেকের বিবেচনায়, পৌরাণিক অর্থাৎ আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেকটা এই সকল বর্ব্বর জাতির নিকট গৃহীত। কাহারও মতে রাজপুতেরা শকদিগেরই বংশধর। শক ও হূন জাতীয়ের মধ্যে অনেকেই এ দেশে বাস করিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। যাহাই

এই সকল দেখিয়া কেবল ভাষার সাহায্যে জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে, অতএব সে আর্য্যসন্তান; অমুক ব্যক্তি ইংরাজি কহে, অতএব সে আর্য্য টিউটন,—এরূপ বিচার অন্যায় ও অসঙ্গত।

সুতরাং জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অন্য পন্থার অবলম্বন আবশ্যক। মানুষে কি ভাষায় কথা কহে, কেবল ইহা দেখিলে চলে না। গায়ের রঙটা কেমন, মুখখানা গোল না দীঘল, চুলগুলা কোমল না কর্কশ, চোখ কালো না কটা, নাক উঁচু না বসা; এই সকল দেখা দরকার হইয়া পড়ে। এবং এই সকল দেখিয়া মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমগ্র মানবজাতিকে তিনটি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপের সকল লোকেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কেবল পিরিনীস্ পর্ব্বতের নিকট বাস্ক নামে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, ও উত্তর রুশিয়ার লাপ জাতির ও ফিন্ জাতির কেহ কেহ যে ভাষায় কথা কহে, তাহা আর্য্যভাষা নহে। স্থূলতঃ ইউরোপের সকলেই আর্য্যভাষা-ভাষী, ও এই কারণে সকলেই

হউক, আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসমাজের উচ্চতম স্তরেও যে বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান নাই, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

আর একটা কথা, এখানে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও, উল্লেখ করা যাইতে পারে। সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য ছিল। বহু আর্য্য ও বহুতর অনার্য্য কোন-না-কোন আকারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল ভারতবর্ষবাসী বৌদ্ধের বংশধরেরা গেল কোথায়? ইতিহাসে লেখে, স্পেনের খ্রীষ্টানেরা এক সময়ে তদ্দেশবাসী ইহুদীদিগকে কঠোরভাবে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। হিন্দুরা যে কখন বৌদ্ধগণকে হিমালয় পার করিয়া বা সিন্ধুনদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। আর সমগ্র জাতির একটা প্রধান ভাগকে একেবারে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়াও সম্ভাবিত নহে। কালক্রমে সেই সকল বৌদ্ধগণ হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী আচার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। অথবা আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, যাহা দ্বিজেতর শ্রেণী সকলের নিকট সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেরই বিকার ও রূপান্তরিত অবস্থামাত্র। বোধ হয়, সেই সকল বৌদ্ধেরাই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধহিন্দু, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী জাতি সকলের সৃষ্টি করিয়াছে। সচরাচর যাহাদিগকে সঙ্করবর্ণমধ্যে ধরা যায়, তাহাদের উৎপত্তি কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। ব্যবসায়ভেদে যে জাতিভেদ, এবং ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্তি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই দুই ঘটনাও কতক এই হিসাবে বুঝা যায়।

আর্য্যজাতীয় বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু আকার অবয়বের তুলনা করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন গঠনের লোক দেখা যায় যে, সকলকেই এক বংশে উৎপন্ন বলিতে জীববিদ্যা রাজী নহেন। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ভূমধ্য-সাগরের তটবর্ত্তী দেশের লোকের আকৃতি কিছু খর্ব্ব; চুল কালো, চোখ কালো, বর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন, মুখের অবয়ব কাহারও গোলাকার, কাহারও বা ঈষৎ দীর্ঘ। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের গঠন অনেকাংশে পৃথক্; তাহাদের আকৃতিতে শালপ্রাংশুত্ব ও সহাভুজত্ব বর্ত্তমান; বর্ণ ধপধপে সাদা; বদনমণ্ডলকে গোল বলিলে ভুল হয়; চুল রক্তবর্ণ অথবা ইংরাজি কাব্যের অনুরোধে সুবর্ণ বর্ণ, আমাদের বিচারে কটা; চক্ষু নীল। আবার অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের গঠনে উভয় জাতির লক্ষণই কিছু না কিছু বিদ্যমান; ইহারা উভয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই। এবং ইহাদের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যভাগেই অধিক।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয়, ইউরোপের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তিনটা অথবা অন্ততঃ দুইটা বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপন্ন। অনুমান হয়, উত্তর অঞ্চলের লোকেই স্থূলতঃ আর্য্য, এবং দক্ষিণ অঞ্চলের লোক স্থূলতঃ অনার্য্য। তবে সর্ব্বত্রই আর্য্যে অনার্য্যে অল্পবিস্তর মিশ্রিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্র আর্য্যের বা খাঁটি অবিমিশ্র অনার্য্যের সংখ্যা অধিক মিলে কি না, সন্দেহের স্থল।

ইংরাজেরা আপনাদিগকে আর্য্য টিউটন বলিয়া পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক সময়ে ভেন ও নরমান্ আসিয়া ইংলণ্ডে বাস করে;—তাহারাও আর্য্য টিউটন ছিল। সুতরাং তাহাতে ইংরাজ জাতির বিশুদ্ধির হানি হয় নাই। ওয়েল্‌শ্, কর্ণবাল, স্কটলণ্ডের উত্তরভাগ ও আয়রলণ্ডের পশ্চিমভাগের লোকে কেল্টিক ভাষায় কথা কয়, ও আপনাদিগকে কেল্টিক্ আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

কেল্টিক্ ও টিউটনিক, উভয়ই আর্য্যভাষা; তবে উভয় ভাষায় কালক্রমে যতটা তফাৎ দাঁড়াইয়াছিল, কেল্টিক ও টিউটনের শারীরিক গঠনে অবশ্যই ততখানি পার্থক্য জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভাষা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, জীবশরীরের গঠন তত শীঘ্র বদলায় না। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড, তিন প্রদেশের অধিবাসীদের একই রকম গঠন হওয়া উচিত; নতুবা উহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ জন্মে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, তিন প্রদেশেরই অধিবাসীদের গঠনে আর্য্য অনার্য্য উভয় লক্ষণই বিদ্যমান আছে। কোথাও কম,

কোথাও বেশী। অনেক খাঁটি ইংরাজ,—যাহারা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা কহেন; তাঁহাদের শরীর খাটো, মুখ গোল, চুল ও চোখ কালো,—দেখিলেই তাঁহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই কয়টা কথা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে,—কত পূর্ব্বে তাহা সম্প্রতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে না—ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের যোগ ছিল; মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। তখন ইউরোপে সুতরাং ইংলণ্ডে, খর্ব্বাকৃতি জাতিবিশেষ বাস করিত। ইহারা পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিত, লড়াই করিত। কালে সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল বিস্তৃত হিমানীস্তরে আবৃত হয়। এই আকস্মিক শীতোৎপত্তির কারণ কি, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইউরোপের তদানীন্তন মনুষ্য এই হিমের দৌরাত্ম্যে অনেকাংশে লুপ্ত বা স্থানত্যাগী হইয়া দক্ষিণ মুখে তাড়িত হয়। কালে হিমের আচ্ছাদন গলিতে থাকে; কালে সেই মহাদেশব্যাপী বরফের আস্তরণের পরিধি সংকীর্ণ হইতে থাকে। এখনও সেই হিমরাশি সর্ব্বত্র গলে নাই। এখনও আল্প্স পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে সেই হিমরাশি পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান। এখনও ইউরোপের উত্তরে মেরুপ্রদেশ সারা বৎসর সেই হিমস্তরে আবৃত থাকে। এখনও সমগ্র গ্রীনলণ্ড দেশ হিমে আচ্ছাদিত। ক্রমশঃ শীতের অপগমে ইউরোপ সেই হিমাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করে; আবার জীবজন্তুর অধিবাসের উপযোগী হয়। প্রাচীন খর্ব্বকায় মনুষ্য হিমস্তরের পরাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উত্তর মুখে অগ্রসর হয়। ম্যামথের অস্থির সহিত তাহাদের অস্থিপঞ্জর ভূস্তর মধ্যে নিহিত রাখিয়া যায়। এই সময়ে আর একটি জাতি আসিয়া দক্ষিণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলে, এবং পূর্ব্বতন খর্ব্বাকৃতি অধিবাসিগণকে আরও উত্তরে দূরীভূত করে। সেই অবধি ইউরোপে ইহাদের আর বড় চিহ্ন রহিল না। হয় ত বর্ত্তমান হুস্বকায় এস্কিমো জাতি অদ্যাপি তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে। নবাগত মনুষ্যেরা কালো চোখ কালো চুল ও লম্বা মুখ লইয়া দক্ষিণ ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহারাও ধাতুর ব্যবহার প্রথমতঃ জানিত না, প্রথম কাটিয়া বিবিধ সুন্দর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। আর্য্য গ্রীক অথবা হেলীনেরা বোধ হয়, ইহাদিগকেই জয় করিয়া ও দাসত্বে আনয়ন করিয়া গ্রীসের ইতিহাস আরম্ভ করেন।

ইহাদের পর আর একটি অনার্য্য জাতি ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। সমগ্র মধ্য ইউরোপে ইহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। ইহাদেরও

কালো চুল ও কালো চোখ; অধিকন্তু ইহাদের বদনমণ্ডল প্রকৃতই মণ্ডলাকৃতি। ক্রমশঃ অধিকার প্রসারিত করিয়া ইহারা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয়, এবং দক্ষিণাঞ্চলের পূর্ব্বতন দীর্ঘানন অধিবাসীদিগকে আপনাদের সহিত মিশাইয়া ফেলে।

ইহাদের পর আর্য্য জাতি আইসে। আর্য্য জাতির দৈহিক লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ছিল। ইহারা যেখনে উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে পূর্ব্বতন অধিকারীকে পরাজিত করিয়া আপন ধর্ম্ম, আপন ভাষা, আপন আচার অবলম্বন করাইয়াছে। আর্য্যেতর ভাষা, আর্য্যেতর ধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বত্র মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; তবে অনার্য্যের দৈহিক গঠন লুকাইবার নহে। এই আর্য্য জাতিরাই হয় ত বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই আর্য্য। পূর্ব্ব হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিমগামী, উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণগামী হইয়াছে। উহাদের ধর্ম্ম ও ভাষা বিজিত ভূখণ্ডে প্রবল হয়। প্রাচীন মানবগণের ভাষা ও ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায়। সম্প্রতি সেই অনার্য্য ভাষা হয় ত দুই এক জায়গায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিরিনীস-পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ বাস্ক ভাষা সেই প্রাচীন কালের অনার্য্য জাতির ভাষা। বাস্ক-ভাষী অনার্য্যগণ, যাহারা আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগকে আইবিরীয় নাম দেওয়া হয়। ভাষা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু শারীরিক গঠন ধরিয়া বিচার করিলে দক্ষিণ ইউরোপের লোক আর্য্যধর্ম্মী হইলেও স্থূলতঃ অনার্য্য-বংশজ। মধ্য ইউরোপের লোকে বংশে সঙ্কর। উত্তরাঞ্চলের লোকে স্থূলতঃ খাঁটি আর্য্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ধরিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। ব্রিটিশ দ্বীপে পূর্ব্বে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্য কেল্টেরা আসিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়। অনার্য্য আর্য্যের সহিত মিশে নাই। আর্য্যই অনার্য্যের সহিত মিশিয়াছিল। ভাষা ছিল পূর্ব্বে অনার্য্য বাস্ক-জাতীয়,—ভাষা হইল আর্য্য কেল্টিক্। পরে রোমানেরা এই আর্য্য-ভাষা-ভাষী অনার্য্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া খৃষ্টীয় ও রোমান্ সভ্যতা প্রদান করে। তবে ভাষার বা শোণিতের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সময় পায় নাই। পরে জর্ম্মণী হইতে প্রায় খাঁটী আর্য্য জর্ম্মাণ আসিয়া ব্রিটীশ দ্বীপ ক্রমে অধিকার করে ও পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সহিত মিশে। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কেল্টিক ভাষা

সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অদ্যাপি লোপ পায় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীতে আর্য্যত্বের মাত্রা অধিক, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীতে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। স্পেন দেশে ও ফরাসী দেশে বাস্ক-ভাষী অনার্য্য আইবিরীয়গণ বাস করিত। ফরাসী দেশের কতক অংশে আর্য্য অধিকার বিস্তারের সহিত কেল্টিক ভাষা ও রীতি নীতি চলিত হয়। রোমানেরা উত্তর দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া আর্য্য রোমক ভাষা প্রচলিত করে। শোণিত মূলতঃ অনার্য্যই রহিয়া যায়। পরে রোম সাম্রাজ্যের পতন ও জর্ম্মণ বিপ্লবের সময়, ফরাসীর পূর্ব্বোত্তরভাগে আর্য্যগণের প্রবল মাত্রায় আমদানি হয়। এক্ষণে স্পেনবাসী স্থূলতঃ অনার্য্যবংশীয় আর্য্যভাষী। দক্ষিণ ফরাসীর পক্ষেও তাহাই বক্তব্য। উত্তরপূর্ব্ব ফরাসীতে স্থূলতঃ আর্য্য কেল্ট ও আর্য্য টিউটনের অধিবাস, ভাষা আর্য্য রোমক।

প্রাচীন রোমানদের জাতিনির্ণয় দুরূহ। প্রাচীন রোমকেরা উত্তর হইতে আগত গল জাতি দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইত। তাৎকালিক গলদিগের যেরূপ বিবরণ আছে, ও পরবর্ত্তী ইতিহাসে জর্ম্মনদিগের যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, বোধ হয় না। উভয়েরই প্রকাণ্ড কলেবর ও সুনীল চক্ষু রোমক ঐতিহাসিকের নিকট প্রশংসা অধিকার করিয়াছিল। এই গলেরা আবার পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গল ও জর্ম্মন উভয়েই প্রায় খাঁটি আর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। রোমকেরা স্বয়ং বোধ করি সঙ্করজাতিভুক্ত ছিল। তাহারা আর্য্য ভাষার কথা কহিত ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রাচীন অনার্য্য আইবিরীয় জাতি, বোধ হয়, আর্য্যগণের সহিত কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন ইটালীয় সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

গ্রীস দেশে আইবিরীয় জাতির বোধ করি বিস্তার হয় নাই। সেখানে দীর্ঘাননশালী অনার্য্যেরই বসতি ছিল। আর্য্য হেলীনেরা আসিয়া ইহাদিগকেই জয় করে ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজের উচ্চতর স্তরে আর্য্যত্ব ও নিম্নতর স্তরে অনার্য্যত্ব প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টানির বিস্তারে উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে।

জর্ম্মনির দক্ষিণভাগে সঙ্কর জাতিরই অধিক প্রাদুর্ভাব। উত্তর জর্ম্মনিতে ও স্কাণ্ডিনেবিয়াতে বিশুদ্ধ আর্য্যের সংখ্যা বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র অপেক্ষা অধিক।

রুশিয়ার ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকে শ্লাবনিক ভাষায় কথা কহে। শ্লাবনিক ভাষা আর্য্য ভাষার শাখামাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে কেহ শ্লাবনিক ভাষা কহে, সেই আর্য্যবংশীয়, এমন নহে। এমন কি, রুশিয়াতে যতটা বর্ণসাঙ্কর্য্য ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ততটা অন্যত্র হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও ঠিক্ এই ইতিহাস। দক্ষিণাপথে অধিকাংশ লোকই আর্য্য-ধর্ম্মী, কিন্তু অনার্য্যভাবী ও অনার্য্য বংশী। আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসমাজে উচ্চস্তরে আর্য্যত্বের ও নিম্নস্তরে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। ভারতবিজেতা আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সহজে মিশিতে চাহিতেন না। তথাপি মিশ্রণ-নিবারণও অসাধ্য ছিল। দ্বিজাতিরসংখ্যা পূর্ব্বেও অল্প ছিল, এখনও অল্প আছে। সেকালে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যা-বিবাহ বৈধ বিবাহের অন্তর্গত ছিল। ফলে আমরা যতই আর্য্যত্বের স্পর্দ্ধা করি না, কটা চামড়া, কটা চুল ও নীলচক্ষুর বড় প্রাদুর্ভাব ব্রাহ্মণের মধ্যেও দেখা যায় না। প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ আয়তন ও উন্নত নাসা দেখিয়াই আজকাল আমাদের মধ্যে আর্য্যত্বের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যাতপ বর্ণবিকারের জন্য কতকটা দায়ী হইতে পারে; কিন্তু কতকটা মাত্র। বেদধর্ম্মানুযায়ী হিন্দুশাস্ত্র কঠিন নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা বর্ণবিশুদ্ধিরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লব ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকের সমবেত প্রয়াসে সেই বিশুদ্ধির যথেষ্ট অপচয় হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নীচকে উচ্চে তুলিয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চকেও নীচে নামাইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুরাতন প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, নিরূপণ দুষ্কর। অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম ভাগ বিশাল গভীর মহাসাগর-তলে নিমগ্ন ছিল। ভূ-বিদ্যায় এই কথা প্রমাণ করে। পশ্চিমে ইউরোপ-খণ্ড ও পূর্ব্বে এশিয়াখণ্ড, এই মহাসাগর কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন ছিল। মধ্য ইউ-রোপ ধৌত করিয়া সমুদয় জলরাশি বিশাল নদ নদীর আকারে এই মহা-সাগরে পতিত হইত; ইরাণ ও হিন্দুকুশের অধিত্যকা ধৌত করিয়া বড় বড় নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া এই মহাসাগরে পড়িত। এই মহা-সাগর প্রকৃতই তাৎকালিক ভূমধ্যসাগর ছিল। বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও উত্তর ইউরোপের উত্তরাংশ তখন উত্তরমহাসাগরের তলবর্ত্তী ছিল। উত্তরমহা-

সাগরের সহিত হয় ত সেই পুরাকালীন ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ছিল। বোধ হয়, এই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রাচীন পীতকায় তাতার বা তুরাণ জাতি বসতি করিয়া পূর্ব্ব আশিয়াখণ্ডে আধিপত্য করিত। সেই ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম উপকূলে শ্বেতকায় আর্য্যগণ ধীরে ধীরে আপন গার্হস্থ্যসমাজ স্থাপন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পশ্চিমগামী হইয়া ইউরোপের পুরাতন অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, বা স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মিশ্র সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন।

কালক্রমে সেই ভূমধ্যসাগরের তলদেশ ভূগর্ভাগত শক্তির বলে উত্তোলিত হইতে থাকে। মহাসাগরের পরিধিসীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। উহার জলরাশি উত্তরমুখে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়া উত্তরমহাসাগরে মিশিতে থাকে। অদ্যাপি ওবি নদী সেই পথে সাইবিরিয়ার সাগরগর্ভোত্থ প্রান্তর ভেদ করিয়া উত্তর মুখে বহিতেছে। সাগরগর্ভ ক্রমশঃ উত্তোলিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। মহাসাগর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় অত্র এখনও শুকায় নাই। বৈকাল ও বালকাশ, বিস্তীর্ণ আরাল, কাস্পীয় ও কৃষ্ণসাগর অদ্যাপি স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন বিশাল মহাসাগরের পুরাতন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বল্গা ও দানিউব, আমুদরিয়া ও শির-দরিয়া, অদ্যাপি পূর্ব্বের মত পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া ধুইয়া লইয়া সেই মহাসাগরের গর্ভদেশ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসাগরের গর্ভ উত্তোলিত হইয়া স্থলে পরিণত হইলে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ সাধিত হয়। তখন বোধ করি, পশ্চিমবাসী আর্য্যগণের কেহ কেহ সেই স্থলপথে আসিয়া ইরাণের উত্তরে পামিরের নিম্নে, আরাল ও কাস্পীয় সাগরের তটবর্ত্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই স্থানে ইহাদের প্রাচ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে বা কিছু কাল পরে এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে মানবজাতির ইতিহাসের আরম্ভ। এশিয়া দেশে তখন পুরাতন মানব সম্প্রদায় উন্নতিপথায় আরোহণের চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে তাতারজাতি চীন সাম্রাজ্য ও চীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেতিসের তটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে কালদীয় জাতি আপন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। দূরে নীলতটে সূর্য্যোপাসনার প্রচারের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল আবিষ্কারের আরম্ভ হইতেছে।

মধ্য এশিয়ার জল যত শুকাইতে লাগিল, সমুদ্রগর্ভ উত্তোলিত হইয়া কোথাও অনুর্ব্বর প্রান্তর কোথাও বা মরুভূমি বা মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, অন্নার্থী উগ্রস্বভাব পীতকায় মোগলজাতি ততই স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সরিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহাদের পীড়নে আর্য্যগণ দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া হিন্দুকুশের ও ইরাণের অধিত্যকা আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। প্রতাপান্বিত ব্যাবিলন ও নিনেবের রাজগণ বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিম মুখে চলিতে দেয় নাই। পূর্ব্ব মুখে খাইবার ও বোলানের গিরিসঙ্কট পার হইয়া কেহ কেহ সপ্তসিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারত-ভূমে তখন ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতি বাস করিত। ইহারা ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়া আর্য্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড হিন্দুজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে আর্য্য মিদীক ও পারসীক কিছু দিন পরে ব্যাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া বিক্রান্ত পারসীক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই ঘটনার পর হইতে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

ইতিহাসে লেখে, পারসীকদিগের সহিত উত্তরাঞ্চলবাসী সীদিয় বা শক জাতির সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সীদিয় জাতির যেরূপ বিবরণ দেন, তাহাতে অন্ততঃ আকার অবয়বে তাহারা আর্য্যজাতিরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হইতে পারে—তাহারা আর্য্য ও মোগল, উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মোগল বা তাতার জাতি। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসার উপায় নাই। আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের পর শকজাতি পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রাচীন অযোধ্যাবাসী শাক্যজাতি ও শাক্যজাতির কুলপ্রদীপ কুমার সিদ্ধার্থের সহিত এই শক-জাতির কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, বলা যায় না। উত্তরকালে শকজাতি বাহ্লীকের গ্রীকগণের স্থাপিত যবনরাজ্যের ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আপতিত হয়। মহারাজ কনিষ্কের সময় শকজাতির আধিপত্য মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুর্জ্জরে শকবংশ কিছু দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শকজাতি আর্য্যবংশীয় ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতবর্ষের সমাজে, তাহাদের বাসচিহ্ন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

কোনরূপে 'জাপান' দিয়া, 'মাতামাতি' যুবতীভাবাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা পড়িয়া গেল। চারুকে তাঁরা কখনও বকিতেন, কখনও ভয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন, কিন্তু কেমন 'এঁড়ে গরু' মেয়ে চারু, সে সব কথা সে কানেই তুলিত না। অগত্য চারুকে এক আধ দিন মার কাছে একটু বেশী রকম আদিভূত হইতে হয়; কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি, হারি মানিলেন। ইতিমধ্যে চারুর দিদি ইন্দু, শ্বশুরবাটী হইতে আসিল। ইন্দু আসিলে তার মা ও খুড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; ইন্দুকে বলিলেন, "আমরা ত চারুকে 'এঁটে' উঠতে পাল্লেম না, এখন, বাছা, তুই যা পারিস কর্। চারু ত তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে মন্মথর ঘরে নিয়ে যানে?" ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কর্ত্তৃক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত জগৎসিংহ যেমন, উল্লাসে, গর্ব্বে, বীর রণপাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইন্দুও তেমনই এই ব্যাপারে কুতিত্ব দেখাইতে, আপনার সমস্ত কৌশল, সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করিল।

ইন্দু এখন প্রতিবারে চারুকে মন্মথের ঘরে দিয়া আসে, নানারূপ কথাবার্ত্তায় চারুর মুখ ফুটাইতে ও লজ্জা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। মন্মথ এক দিন তাস খেলিবার কথা তুলিল; ইন্দু দেখিল, পরামর্শটা মন্দ নয়, এই উপায়ে, মন্মথর সহিত চারুর ভাবটা সহজে হইতে পারিবে; কেন না, সে জানিত, চারু খেলা তেমন জানুক না জানুক, খেলিতে কিন্তু তার ভারি উৎসাহ। তা হলে কি হয়, চারু ত সহজে মন্মথের সঙ্গে খেলিতে 'রাজি' হয় না। "বরের সঙ্গে আবার খেলা, ছি! দিদির বেমন কাচ!" কিন্তু দিদি যে কিছুতেই ছাড়ে না, এক দিদির বকুনি, তাতে মায়ের অপমানের ভয়, চারু কি মুস্কিলেই পড়েছে গা! চারু মনে মনে মা দুর্গা, কালী, কত দেবতাকেই মানে, "কবে ও তাদের বাড়ী থেকে যাবে", কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না। শেষ আর কি করে, দুই এক দিন দেখিয়া, চারু অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু বোনটা কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারুর আর খেলা হইত না, কাজেই ইন্দুকে বসিয়া থাকিতে হইত। বাজী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব দিন চারুর ধৈর্য্য থাকিত না। সে খেলিতে খেলিতে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্মথের অনুরোধে, ইন্দু সে বাজীটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিত না। রাত্রির এই বন্দোবস্তে কিন্তু ইন্দুর উদ্দেশ্য সফল হইল না, চারুর মুখ ফুটিল

না। দিদি চলিয়া গেলেই আবার যে চারু সেই চারু। বিশেষতঃ চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্মথের ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু অনেক কান্না-কাটি, আপত্তি করিল, কিন্তু কে তার কথা শুনে বল! শেষ 'দুপুর বেলাতেও' চারুকে দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত! কিন্তু সে দিদির আঁচল ছাড়িত না! দিদিকে মাঝে রাখিয়াই কোন কোন দিন 'দেখা বিস্তি', কোন দিন বা 'গোলাম-চোর' খেলা হইত! বিস্তিখেলায়, মন্মথ ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙ্গিত; চারুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্মথকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দিদিকে তখনই কানে কানে বলিত, "ও কি? অমন কেন?" আবার, গোলাম-চোরে, মন্মথ প্রায়ই সাধ করিয়া "গোলাম-চোর" হইত! চারুর তাতে ভারি আনন্দ, ভারি উৎসাহ! সে সময়, চারুর অজ্ঞাতে, তার ঘোমটা একটু সরিয়া যাইত, কোন দিন হয় ত সেই মুহূর্ত্তে, মন্মথর সহিত, তার "চোকোচোকী" হইয়া যাইত, মন্মথের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সে হাসি যেন "হেসে গিয়ে হেসে চাওয়া।" চারু কিন্তু তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইত। লজ্জায় মুখ নামাইত! অঙ্গুলিস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন "গুটিসুটি" হইয়া যায়, চারু তেমনই জড়সড় হইয়া পড়িত, কোন দিন বা পলাইয়া যাইত। বেশী পীড়াপীড়ি ভাল নয় বলিয়া, ইন্দুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না! চারু চলিয়া আসিলেও, ইন্দু, মন্মথের-সহিত গল্প করিত। তবে প্রায়ই ইন্দুর দুই একজন "সমবয়সী" বা দুই একজন ঠাকরুণ দিদি সে সময়ে আসিয়া জুটিতেন; নানা রকমের কথাবার্ত্তা, হাসি তামাসা চলিত। মন্মথ বেশ মিষ্টি মিষ্টি মজার মজার গল্প করিতে পারিত; সে গল্প শুনিতে ইন্দুর বড় ভাল লাগিত! ক্রমে মন্মথের সহিত তাসখেলা ও গল্প করা, ইন্দুর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল! মন্মথ যদি আহারান্তে দৈবাৎ বাহিরে যাইত, ইন্দু অমনি মন্মথকে ডাকাইতে পাঠাইত! আসিতে বিলম্ব হইলে, অভিমান করিত। মন্মথ শীঘ্রই ইহা বুঝিল; বুঝিয়া কি জানি কেন ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বিলম্ব করিত। শেষ আবার সাধিয়া ঠাকুরঝির অভিমান ভাঙ্গাইত! কে জানে এ খেলা খেলিয়া কি লাভ! সরলা ইন্দু অত শত বুঝিত না, সে অকপটে মন্মথকে বিশ্বাস করিত; মন্মথ যেন তার "সমবয়সী"! এইরূপে, আমোদে আহ্লাদে, হাসি গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপে মন্মথের প্রতি ইন্দুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। ইন্দু চারুকে ধরিয়া দিবার ভস্ত জাল

চিঠিখানি যে ইন্দুর স্বামীর, তা আর আমাদের পাঠক পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

ইন্দু পত্রখানি পড়িয়া কি ভাবিতে ভাবিতে উপরের ঘরে যাইতেছিল। চিঠিখানি তখনও হাতে। সেই সময় মন্মথও নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির ঘরে উভয়ের দেখা হইল। মন্মথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি ঠাকুরঝি?" "কই কার নয়" বলিয়া, একটু হাসিয়া, ইন্দু চিঠিখানি হাতের মুঠায় লুকাইল। মন্মথের প্রথমে যে সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "চিঠি দেখাবে বলেছিলে যে, দেখাও।" ইন্দু, "না না সে চিঠি নয়," বলিয়া পাশ কাটাইতেছিল, মন্মথ পথ আটকাইল, বলিল, "চিঠি দেখাও নইলে কিন্তু ছাড়ব না।" ইন্দু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া হাত দূরে রাখিয়া বলিল, "এই দেখ!" মন্মথ ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিখানি লইতে গেল, ইন্দু সেই অবকাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, মন্মথ তার হাত ধরিল। সহসা ইন্দুর হাসি তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ইন্দু বলিয়া ফেলিল, "ও কি মন্মথ, হাত ছাড়!" মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্মথ ইন্দুকে হাস্যময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত, বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত হইল!

৩

মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট ছোট বালক বালিকার দল বড় মজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটের পাতায় কতকগুলি ধূলা, দুখানা খোলামকুচি, হলো বা গোটাকত তেঁতুচি আনিয়া বলিত, "মন্মথ বাবু খাও।" কেহ বলিত, "তুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ। ওহো! বৌএর নাম করেছে, সব্বাইকে বলে দেব।" কেহ বা মন্মথর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিত, "টোমায় চারু ডিডি ডাকচে।" মন্মথ ইহাদিগকে এক আধবার যে তাড়া তুড়ি না দিত, তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না। বরং মাঝে মাঝে সেই ছেলেখেলায় যোগ দিত। নবীন রসের সম্বন্ধ না হইলে বুঝি এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বয় না।

এই সব বালক বালিকার পশ্চাতে, আর এক দল বালিকা থাকিত।

তাহারা বাহিরে আসিবার পথে, সদর দরজা ভেজাইয়া, তাহার কাঁকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া সব দেখিত। আর মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া, সেই ছোট দলকে ডাকিয়া, নূতন নূতন তামাসা শিখাইয়া দিত। মন্মথের সহিত চোখোচোখি হইলেই "ওলো দেখেছে লো" বলিয়া ঝম্ ঝম্ রবে সেই বালিকার দল অন্দরের দিকে ছুটিয়া যাইত। আবার টিপি টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চারুর অনেকটা সমবয়সী। মন্মথ অন্য দিন এ সব বেশ উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকক্ষণ ছুটাছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু মন্মথ সে দিকে বড় মনোযোগ দিল না। তখন সেই "গৃহ হারা আনন্দের দল" যেন একটু মুখ হইয়া চলিয়া গেল। মন্মথ অন্যমনস্কভাবে একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘুম আসিল না। মনটা বড় চঞ্চল। মুদ্রিতচক্ষু মন্মথ, কি একটা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিল,—

"ঘুমুলে ঘুমুলে পান খেয়ে না,
পান খেয়েছি এলাচ খাব।"

* * *

মন্মথ হাসিয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল, সম্মুখে একটি কৃত্রিম পান হাতে দাঁড়াইয়া তাহার এক অষ্টমবর্ষীয়া শ্যালিকা। মন্মথ তাহাকে সেই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি পানটি মন্মথের গায়ে ছুড়িয়া হাসিতে হাসিতে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল, "জামাই বাবু! 'দিদিমণি' আপনাকে ডাকচে।" সে ডাক মধুর বীণাধ্বনির মত মন্মথের কানে বাজিল। মন্মথ তখন কাঁচপোকায় আকৃষ্ট আরসুলার মত কির অনুসরণ করিল।

৪

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ বাহিরে চলিয়া গেলে, ইন্দুও মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল? সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভাল হয় নাই। ভয়ীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে। তখন আর কোন কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সে দিন বৈকালে অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল মন্মথের জলখাবারের ডাক পড়িল। অন্যদিন মন্মথের পাওড়ী ডাকে জলখাবার দেন, আজ ইন্দু

জলখাবার দিতেছে। ইন্দু জলখাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, "মন্মথ জল খাও।" মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে স্থান পাইল না। সে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও ইন্দু অবনতমুখী। মন্মথ মুগ্ধনেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু মুখ তুলিল, চারি চক্ষে মিলিবামাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্মথ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "কই—চিঠি!" চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া ইন্দু মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানা আগা গোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু একটা তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না,—তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িল—"যাও ছি! অমন কল্লে কিন্তু আর আসব না", বলিয়া গমনোদ্যতা ইন্দু যেন ঈষৎ কোপ-কুটিল-কটাক্ষে মন্মথের দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু হাসিও খেলিয়াছিল।"—তখন "যাই" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

৫

মন্মথ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার মুমটা একটু বেশী। "অনেক রাত হয়েছে এখন যাই" বলিয়া ইন্দু একবার উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল; বলিল, "রাত আর কই হয়েছে, আর আজকের রাত বই ত নয়।" ইন্দু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গুরু গুরু দুরু দুরু গভীর গর্জ্জনে মেঘ গর্জ্জিতেছে। সেই "ঘোনা ঘোরা বাদল" নিশীথে, ইন্দু আর মন্মথ খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে মনে মন্মথের রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুষুপ্ত, কেবল জাগ্রত আর ইন্দু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর। সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা গৃহমধ্যে প্রচণ্ডবেগে একটি 'দমকা' বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল। গৃহের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবনও অন্ধকার হইয়া গেল।

ধীরে, অতি ধীরে, ইন্দু সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল, "ঠাকুরঝি!" ইন্দু ফিরিল না। বুঝি সে কথা তার কানে গেল না।

৬

মন্মথ পরদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী চলিয়া গেল। চারু আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদী যেমন জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্ত বাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে, সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ইন্দু কিন্তু বড় বিমর্ষ। এই বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া লেখাপড়া-জানা এক নবীনা ঠাকুরুণ দিদি, ইন্দুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিলেন,—

"সোনার নাতিনী, এমন যে কোন
হইলি বাউরি পারা,
সদাই রোদন, বিরস-বদন,
না বুঝি কেমন ধারা।"

ইহার সমবয়স্কারাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, "নে ভাই ইন্দু, তোর আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিনে। ভগ্নীপতি তো সবারই আছে লো।" কেহ বা সুর আর একটু চড়াইয়া, "কি লো, মন্মথ গিয়ে ভুই যে একেবারে মজে গেলি। লোকের বর বিদেশে গেলেও ত এমন হয় না।"

ইন্দুর মাও ক্রমে ইন্দুর এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "ইন্দু, তোর হলো কি? দিন রাত অমন করে কি ভাবিস বলতো, দিনকের দিন যে শুকিয়ে উঠ্‌লি।"

ইন্দু কোন উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কাঁদ-কাঁদ হইয়া থাকিত। কোন দিন বা অন্যের অলক্ষ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

আজ অনেক দিনের পর ভূপেন্দ্র ইন্দুর হস্তাক্ষর পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

"প্রিয়তম!

"সত্যই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল, নহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন! আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তোমাকে অনেক কথা লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম কিন্তু তা আর পারিলাম না। আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, সকল কথা পরে লিখিব। কেমন আছ? ইতি

"পাপিষ্ঠা
"ইন্দুবালা"

"একি এ? একি আমার ইন্দুর পত্র? হাঁ, ইন্দুর হস্তাক্ষরই ত বটে।"

ভূপেন্দ্র এক বার দুই বার তিন বার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ভূপেন্দ্রের মনে কত রকমের অনুমান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া ভূপেন্দ্র ভাবিলেন, ছি আমি কি পাগল! কিন্তু—কিন্তু ইন্দু এমন করিয়া পত্র লিখিল কেন? আবার ঐ কথা? শেষ ভূপেন্দ্র সিদ্ধান্ত করিলেন, আমোদে মত্ত হইয়া আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া ইন্দু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিয়াছে। এ সামান্য কথাটাও এত ক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমি কি নির্ব্বোধ! ভূপেন্দ্র ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

"আমার ইন্দু!

"পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা কি? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর মত পত্র দিয়াছ কেন? এ ত অতি তুচ্ছ কথা; যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া, এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আমায় জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। যা হোক্, এর জন্য এত অপ্রতিভ হবার কারণ নাই। তুমি যে এমনি ভুলিতে পার না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন করে পত্র দিতে আর দেরী করো না, লক্ষ্মী আমার।

"অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন?

"চারুদের কেমন ভাব হলো জানিতে উৎসুক আছি। মন্মথ এখন কোথায়?

"কেমন আছ। আমি ছুটীর চেষ্টায় আছি। ছুটী পেলেই তোমায় আনিতে যাব। আর যদি এর মধ্যে অন্য সুযোগ পাই, তবে তত্দিনও অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সুখবরের জন্য কি খেতে দেবে, দাও। ইতি।"

ইন্দু যথাসময়ে এ পত্রের উত্তর দিল—

"তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে। একদিন বিস্তারিত জানাইব। আজ থাক।"

পত্র পড়িয়া ভূপেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। মিছে কথা এ, ইন্দু পাপিষ্ঠা, ইন্দু অবিশ্বাসিনী, অসম্ভব এ!—ঘন ঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব করিয়াছে, ইন্দুর কি ছেলেমানুষি! কিন্তু তবু ভূপেন্দ্রের মনের মেঘ কাটিল না। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল।

ভূপেন্দ্র ছুটী লইয়া ইন্দুর কাছে যাওয়াই স্থির করিতেছিলেন, কিন্তু পর দিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেন, মন্মথ শ্বশুরবাটী হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে ইন্দুকে আনা সহজ হইবে মনে করিয়া, ভূপেন্দ্র তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন, উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরীকৃত দিনে যথাসময়ে ভূপেন্দ্র ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মন্মথও গাড়ী হইতে নামিল। ইন্দু কই? ভূপেন্দ্র অতিমাত্র আগ্রহে, মন্মথকে শুধাইলেন, "তোমার ঠাকুরঝি?" মন্মথ সংক্ষেপে বলিল, "তাঁর আসা হইল না।" "কেন?" "ঠিক বলিতে পারি না।" "সব ভাল ত।" "হাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ভূপেন্দ্রের উদ্বেগ বাড়িল মাত্র। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, ইন্দুর একখানি চিঠি। ইন্দু শুধু লিখিয়াছে, "প্রিয়তম। একবার এস।" ভূপেন্দ্রের আসন টলিল, সাহেবকে বলিয়া কহিয়া কোন রূপে পাঁচ দিনের ছুটী লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে, "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে", ভূপেন্দ্র ইন্দুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটার পর ভূপেন্দ্র প্রভাপপুরে পৌঁছিলেন। যাহাকে দেখিবার জন্য ভূপেন্দ্র এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌধ, ওই সৌধে ভূপেন্দ্রের সেই প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভূপেন্দ্রের মন সহসা এত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূর হইতে চারু কিরূপে ভূপেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমনি "ভূপেন বাবু এসেছে গো।" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। ইন্দুর সহিত চোখাচোখি হইয়া চারু এক মুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শাসাইল "দিদি আজ।" বোধ হয় চারুর তখন মনে হইতেছিল, "দিদি আমায় এবার বড় জ্বালানই জ্বালিয়েছে, এখন আমিও তেমনি দাদ তুলবো," তাই সংক্ষেপে এই শাসনবাক্য প্রয়োগ করিল। চারুর এই বালিকা-সুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, ভূপেন্দ্রের আগমন-সংবাদে ইন্দুর মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু "দিদি আজ।" এই কথায় কি জানি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখকমল নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

আজ বহু দিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। ইন্দুর সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দু, এমন দেখচি কেন?" ইন্দু কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে সৌদামিনী যেমন হাসে, অনেক দিনের পর ইন্দু আজ তেমনই হাসিল। কিন্তু তখনই আবার জলভরা মেঘের মত

গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভূপেন্দ্র আগ্রহভরে ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া গেল; বলিল, "আমায় ছুঁও না," ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, ইন্দুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন ইন্দুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। ভূপেন্দ্র আবার স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ইন্দু এমন দেখ্‌চি কেন? অমন করে, অপরাধীর মত চিঠি পত্রই বা লিখ্‌তে কেন? আর মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কল্লে কেন?" ভূপেন্দ্র দারুণ আগ্রহে, একবারেই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ইন্দু আত্মহারা হইয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল। পদস্খলিত ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদে, পথ-হারা শিশু যেমন জননীর কোল পাইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদে, ইন্দু তেমনি করিয়া কাঁদিল।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ইন্দু সরিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তবে শোন।"

ইন্দুর সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপেন্দ্র মহাভীত হইয়াছিলেন; সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন ঘটিয়াছে। "আর বলতে হবে না—ইন্দু আমি বুঝেছি," বলিয়া, ভূপেন্দ্র তাড়াতাড়ি আবার ইন্দুকে বুকে ধরিলেন।

"না বুঝ নাই। বুঝিলে এ কালসাপিনীকে এমন আদর করিয়া বুকে লইতে না," বলিয়া ইন্দু আবার কাঁদিয়া ফেলিল; "যা বুঝি নাই, তা আর বুঝে কাজ নাই ইন্দু! তুমি যে অপরাধই করে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" ইন্দু ভূপেন্দ্রের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—"না; শোন!" "না, ইন্দু না, শুনে আর কাজ নাই। এস, অন্য কথা কই" বলিয়া ভূপেন্দ্র ইন্দুর সেই রোদন-লোহিত, অশ্রুসিক্ত, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ধরিয়া বার বার চুম্বন করিলেন; তার পর, অতি যত্নে চোখের জল মুছাইয়া, ইন্দুকে আপনার পাশে বসাইলেন। অতি সাবধানে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, ক্রমে ইন্দুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল! ভূপেন্দ্র বুঝিলেন, তবে বুঝি বা এখনকার মেঘ কাটিয়া গেল! এমন সময় কে ডাকিল—"ইন্দুকুল বাঁধবে এস!" "তবে যাই" বলিয়া ইন্দু উঠিল, ভূপেন্দ্রও উঠিয়া বিদায়-চুম্বন দিলেন; এবং ইন্দুও প্রতিচুম্বন করিল—সে চুম্বন বড় তপ্ত, বড় গাঢ়! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া, চাঁহিয়া, ইন্দু চলিয়া গেল।

ভূপেন্দ্র বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, "ইন্দু, আয় লো, তোর মাথা বেঁধে দি;" ইহার পরের চরণ ভূপেন্দ্রের জানা ছিল, ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল—এই যে হীরক, ইহা খাঁটি না নকল? ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয় না? নকল হয় হোক, ভাঙ্গিয়া কি লাভ? আমি ত জানি ইহা খাঁটি। তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া কাজ কি? ভূপেন্দ্র এই ভাবিয়া আবার আপনার মন দৃঢ় করিলেন।

আর, ইন্দু? ইন্দু চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড় অন্যমনস্ক হইতেছে। সেই নবীনা ঠাকুরুণদিদি চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন কিন্তু ইন্দু আজি সে হাসি তামাসার যোগ দিতে পারিতেছে না! ইন্দু যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্না। চুল বাঁধা শেষ হইলে, ঠাকুরুণদিদি,—

"সাদা মনে কালো কিছুই রেখে দিলাম চুল,
বাকীর প্রাণে মনটি মেরো, হয় না যেন ভুল।"

বলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি "টিপ" পরাইয়া, ইন্দুর মুখে চুমো খাইলেন! ইন্দু বিবাদের হাসি হাসিল। ঠাকুরুণ দিদি বুঝিয়া গেলেন,—

"মুখের হাসি চাপলে কি হয়
প্রাণের হাসি চোখে খেলে।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর চারু তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তোমরা শীগ্‌গির এসো গো, দিদি কেমন কচ্চে।" চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন, ছিন্নকণ্ঠ পক্ষিণীর মত ইন্দু ভূমিশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। ইন্দু কখন যে তার ঠাকুরমার কৌটা হইতে আফিং চুরি করিয়া খাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। "ওমা আমার কি হলো গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। ইন্দু একবার কাতর দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তার পর চারুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একবার ডাক চারু, একবার ডাক!"

* * * * *

ধীরে ধীরে ভূপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলিলেন, "ইন্দু, ইন্দু এ কি?" "বলি" বলিয়া ইন্দু একখানি

চিঠি ভূপেন্দ্রের হাতে দিল, তার পর ভূপেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া, কাতর-কণ্ঠে বলিল, "আমার বুকে দিন রাত নরকের আগুন জ্বলছে, এ পাপের বোঝা আমি আর বহিতে পারি নে;—তুমি আমায় ক্ষমা করে চরণে স্থান দিলে, কিন্তু আমার জ্বালা নিভিল কই? আর বলিতে পারি না, চিঠিতে সব রইলো, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

মনের আবেগে, বহু কষ্টে, ইন্দু এই কয়টি কথা বলিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বলি বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। ইন্দু তখন নির্ব্বাক হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃন্তভ্রষ্ট কুল্ল কুসুম যেমন কর্দ্দমস্পৃষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া শুকাইয়া যায়, ধরণীলুণ্ঠিতা ইন্দুও তেমনই কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুলকণ্ঠে ভূপেন্দ্র ডাকিল, "ইন্দু!" বাণবিদ্ধ হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও বংশী-রবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে ইন্দু তেমনই শিহরিল। তার পর ধীরে ধীরে সেই বিবেকবিক্ষত, অনুতপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল।

সীতারাম।

প্রথম অধ্যায়।

আমরা বড়ই উপন্যাসপ্রিয়। আমাদের রুচি বুঝিয়া বঙ্কিমবাবু সীতারামকে লইয়া একখানি বিচিত্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সে উপন্যাসে বঙ্কিম-বাবুর সরল সুন্দর তুলিকার বিন্যাসে সীতারামের চিত্র যেরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের অধিকারী মহাশয় বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াছেন। একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান; সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তথাপি উপন্যাসের সীতা-রাম ইতিহাসের সীতারাম পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার অবসর প্রায় নাই।

কৃত্রিম ফুল বড়ই সুন্দর;—বর্ণসামঞ্জস্যে, গঠনগৌরবে আসল বলিয়া অনেকেরই ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাহা কৃত্রিম; ঘ্রাণে মধুগন্ধ নাই, স্পর্শে দেবদুর্ল্লভ কোমলতার অভাব। উপন্যাসের নায়ক হইয়া সীতা-রামের সেই অবস্থা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তাহা নিজেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন,

এবং বেকসুর খালাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়া গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। উদ্দেশ্য, বোধ হয়, আমাদের উপন্যাস-স্পৃহার সাময়িক পরিতৃপ্তি, এবং লেখকের অর্থাগমের সোপাননির্ম্মাণ; (১) আরও একটু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। উপন্যাসের নায়ক সাজাইয়া বঙ্কিমবাবু সীতারামকে যেমন নাস্তানাবুদ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যদি কখনও কেহ সীতারামের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয় নাই। আদর্শ উপন্যাসলেখক গ্রন্থ শেষে দুই জন নাগরিকের মুখ দিয়া আমাদিগকে যাহা শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহা এই :—

"রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

রামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুটপাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হলো কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি ভাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দু'টো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকে কত রকমই বলে। আবার কেউ কেউ বলে রাজা রাণী নাকি ধরা পড়েন নাই,—সেই দেবতা এসে তাঁদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর বেটারা আল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

(১) 'সীতারামের' উদ্দেশ্য আর যাহাই হউক, 'অর্থাগমের সোপান নির্ম্মাণ' যে বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিম-বাবুর উদ্দেশ্য ছিল, ইহা বোধ হয় না। নিঃস্বার্থ সাহিত্য-সেবী বঙ্কিমবঙ্গের এই সামান্য সাহিত্য-মন্দিরের কেবল 'সোপান' নহে, চূড়াও নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসের অনুরোধে ঐতিহাসিক সীতারামের ঐতিহাসিকতার ব্যতিক্রম করিয়া তিনি ইতিহাসের ক্ষতি করিয়া থাকিবেন,—কিন্তু তাহার মূলে অর্থাগমের কামনা ছিল, এরূপ অনুমানের ভিত্তি নাই। —সাহিত্য-সম্পাদক।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস তার ঠিক কি? এটা না হয় মুসলমানের রচা। তা থাক্ গিয়ে,—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।"

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ একবার তামাক সাজিয়া খাইতে খাইতে আমরা দশ জনে মিলিয়া এতদিন ধরিয়া বহুবার তামাক সাজিলাম, খাইলাম,—ঢালিয়া সাজিলাম, তাহাও খাইলাম, এবং এখনও ঢালিতেছি, সাজিতেছি, খাইতেছি, এবং নিঃশেষপীতধূমপটলে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি,—কিন্তু কোন্‌টা কাহার রচা কথা, আর কোন্‌টাই বা সীতারামের আসল ইতিহাস, তাহার আর কোন অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছি না।

সীতারাম বাঙ্গালী,—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান। আমরাও বাঙ্গালী। সীতারামের ইতিহাস যে আমাদেরই গৌরবের ইতিহাস, সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; বাঙ্গালী বলিয়াই সীতারামের ইতিহাসের সমাদর হয় নাই। বিদেশের ইতিহাসলেখকেরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আমাদের ললাটে এক দুরপনেয় কলঙ্করেখা টানিয়া দিয়াছেন; আমাদের জীবন, আমাদের দৃষ্টান্ত, আমাদের ইতিহাস, সে কলঙ্করেখা অপসারিত করিতে পারিতেছে না। যে দুই এক জন বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি তাহা কথঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারিত, সীতারাম তাঁহাদের মধ্যে একজন; কিন্তু সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস কৈ?

বহুদিনের পরপীড়নযাতনায় আমাদের অস্থিমজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জীবন আছে, কিন্তু সকলেই জীবন্মৃত, তাহার উপর আবার সকলেরই মেরুদণ্ড পুরুষকলত্রভারে অত্যধিক অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু অবশিষ্ট, তাহা অর্থচিন্তাতেই সঁপিয়া দিয়াছি। কে কোথায় কি বলিল, কে কোথায় কি লিখিল,—কে তাহার সন্ধান লয়, কেই বা তাহার প্রতিবাদ করে?

আলোচনার অভাবে অনেক "ঐতিহাসিক ব্যক্তিই" বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, সীতারামও যে সেই পথে গমন করিবেন, তাহাতে আর দুঃখ কি? এখনও দুই শত বৎসর যায় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই সীতারামের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে;—যাহা কিছু এখনও শুনিতে পাওয়া যায়, সে

কেবল উপন্যাস, জনশ্রুতি, অথবা পিতামহীর উপকথা; তাহার কতক হিন্দুর রচা কথা, কতক মুসলমানের রচা কথা, এবং পাছে রচা কথার অভাব থাকিয়া যায়, সে খেদটুকু পূরণ করিয়া যাহা বাকী ছিল, তাহাও বঙ্কিমবাবুর রচা কথায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল যেন একটু একটু করিয়া বাতাস ফিরিতেছে;—বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিবার জন্য কিছু কিছু আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই শুভ দিনে কেহ কি সীতারামের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন না? উপন্যাস লেখা সহজ কথা,—একটু ভিত্তি পাইলেই হইল, তার পর ঘরে বসিয়া তামাকের ধূমরেখা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অংশ গড়িয়া তুলিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখা সেরূপ সহজসাধ্য নহে। সময়, অর্থ, শ্রম, উৎসাহ, অনুরাগ, অধ্যবসায়, সকলগুলিই হয় ত নষ্ট হইতে পারে! নষ্ট হয় হউক, কিন্তু তথাপি স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করি, তোমরা কেহ স্বদেশের বিলুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখ। ইহাতে অর্থাগম হইবে না, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাবৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু কেহ যদি যত্ন চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালীর ললাট-কলঙ্ক দূর করিতে পার, আমরা দশ জনে মিলিয়া তাহার ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিব!

সীতারামের ইতিহাস আমাদিগের গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু তাহা সংকলন করিবার উপাদানের বড়ই অভাব; হিন্দু সে ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন দিনই চেষ্টা করেন নাই; মুসলমান তাহা লিখিয়াছেন, কিন্তু সত্যোদ্ঘাটনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ইংরাজ কেবল সীতারামকে একজন "দস্যু-দলপতি বিদ্রোহী" বলিয়াই গল্প সমাপন করিয়াছেন। সুতরাং সে কালের লেখকদিগের হাতে পড়িয়া সীতারামের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে।

সীতারামের বীরত্বকাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বীরকীর্ত্তির শেষচিহ্ন এখনও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। মহম্মদপুরের দুর্গপরিখা প্রায়ই জলশূন্য শুষ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে তাহার গভীরচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতারাম নাই, কিন্তু তাঁহার রামসাগরের স্বচ্ছ সলিলে এখনও গৌরবদীপ্তি প্রতিফলিত হইতেছে। সিংহদ্বার জরাজীর্ণ হইয়াছে, রাজপুরী বন্য শ্বাপদের লীলাভূমি হইয়াছে, দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে;—কিন্তু বাঙ্গালী কেমন করিয়া নিপুণহস্তে দুর্গপ্রাচীর

নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর সারি সারি তোপ সাজাইয়া বীরবিক্রমে বাদশাহের বলদর্পিত কৌজদিগকে পদদলিত করিয়া মোগল-সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার শেষনিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই! তাহা দেখিবার জন্য আমাদের বাঙ্গালীহৃদয়ে তত দূর কৌতূহল হয় না, আমরা অবসর পাইলে ইংরাজ নবাবদিগের পদানুসরণ করিয়া, কত লাথি গুঁতা খাইয়া, রেল, ষ্টীমারে হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া, দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা পাহাড়ে ইংরাজকীর্ত্তি দেখিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হই। কিন্তু দেশের কোন্ নিভৃত কোণে বাঙ্গালীর স্বহস্তরচিত কোন্ পুণ্যকীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান লই না। বাঙ্গালী মহম্মদপুরের সীতারামের দুর্গপ্রাচীরে পদচালন করিবার অবসর পায় নাই, কিন্তু অনুসন্ধাননিপুণ ইংরাজ পরিব্রাজকেরা তাহার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে অনেকবার সীতারামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কৌতূহলনিবারণের জন্য এক জন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ * সীতারামের কীর্ত্তিকলাপের যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহাই সীতারামের একমাত্র লিখিত ইতিহাস;—কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহারও অধিকাংশই উপন্যাস!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্র; সে চরিত্র লইয়া উপন্যাস লিখিতে গিয়া তাহার ঐতিহাসিকতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সীতারামের কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে আবার নূতন করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে, মুসলমানেরা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলা দেশ বাহুবলে পদানত করিয়া নিরুদ্বেগে রাজশাসন করিতেন;—কালক্রমে জন কতক বণিক বাণিজ্য করিতে আসিয়া রোরুদ্যমান [illegible] বালিকার গ্রাস-মিষ্টলড্ডুকের ন্যায় মোগলের হস্তচ্যুত সোনার রাজ্য কুড়াইয়া পাইয়া—এই বর্ণনা ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

মুসলমানেরা যে অনেকবার বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা। কিন্তু কোনদিনই মুসলমান-বাঙ্গালা দেশে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শাসন-করা দূরে থাকুক, সকল স্থানে রীতিমত দীর্ঘ-

* J. Westland Esqr. C. S.

কাল রাজস্ব-সংগ্রহ করিবারও সুবিধা হয় নাই। কখন কোন অংশ পদানত হইত, কখন আবার কোন অংশ স্বাধীন হইয়া উঠিত। সুতরাং মুসলমান-শাসনসময়ে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করা, বাহুবলে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবার কল্পনা করা, সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া, কেহই অন্যায়, অবৈধ কার্য্য বা বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন না।

পাঠান সেনা বাঙ্গলা দেশ প্রদানত করিবার জন্য অসিহস্তে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিল। কিন্তু সেকালের বাঙ্গালীও দুর্ব্বলহস্তে অসি চালনা করিত না। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্বদেশরক্ষার জন্য, স্বাধীনতারক্ষার জন্য বাঙ্গালী অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছিল;—শেষে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে না পারিয়া, যাহা পদানত হইল, তাহা লইয়াই পাঠান ভূপতিগণ মুসলমান রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে হিন্দু মুসলমানের বৈরিভাব চলিয়া গিয়াছিল; মুসলমানের অধীনে হিন্দু, এবং হিন্দুর অধীনে মুসলমান, এক গ্রামে এক দেশে শান্তি ও প্রীতিতে বসতি করিতে শিখিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটেরা যখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার জন্য বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন বাঙ্গল দেশে তিন শ্রেণীর তিনটি প্রবল শক্তি বর্ত্তমান। এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কোন দিনই মুসলমানকে করপ্রদান করেন নাই। এক দল মুসলমান ছিলেন,—তাঁহারা মোগলকে প্রভুপদে বরণ করিতে অসম্মত। আর এক দল হিন্দু ছিলেন,—তাঁহারা কখন কখন মুসলমানকে করপ্রদান করিলেও, সুযোগ পাইবামাত্র স্বাধীন হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। মোগলের সঙ্গে এই তিন দলেরই শত্রুতা বাধিয়াছিল, সে যুদ্ধে বাঙ্গলা দেশ কতবার হারিল, কিছুই যায় আসে না। কখন মোগলকে সম্রাট বলিয়া সেলাম করিল, কখন সময় পাইয়া অসুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিল না। পাঠান অনেকবার সুবর্ণরেখাপারে তাড়িত হইলেন, বাঙ্গলা দেশে মোগলের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল;—কিন্তু তবুও বাঙ্গলা দেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের অধীন হইল না;—ইহাই সেকালের ইতিহাস। *

* "The province of Bengal paid a nominal Submission to the throne Delhi, but during several reigns had been virtually independent."—Mill's History of British India, Vol. II. p. 303.

আজ যাহারা অশ্বপদতাড়নাভয়ে "শতহস্তেন বাহিনঃ" বলিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, সেকালে তাহারা অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়াছিল। আজ যাহারা বালকদিগকে একখানি ছুরি হাতে করিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি আঙ্গুল কাটিবার ভয়ে ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হাতে তুলিয়া দেয়, সেকালে তাহাদেরই বালকবৃন্দ লাঠি তরবারি লইয়া খেলা করিত,—আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণও কোষাকুষি ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

সম্রাট আকবর, এই সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বাঙ্গলা দেশে মোগলের একাধিপত্য স্থাপন করিবার আশায়, যথাক্রমে টোডরমল্ল এবং মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকবরের বাহুবলে ভারতবর্ষে মোগলের প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল;—এলাহাবাদ, আগরা, অযোধ্যা, আজমীর, গুজরাট, বিহার, বাঙ্গালা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান, মাল্বা, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগরে সুবা সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজা টোডরমল্ল সুবে বাঙ্গলার সমুদায় সকর ভূমি ১৯টি সরকারে এবং ৬৮৯ পরগণায় বিভাগ করিয়া দিয়া, বার্ষিক ১০৬৯৩১৫২ টাকা রাজকর নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন;—কিন্তু এই রাজকর কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারেন নাই। †

মহারাজা মানসিংহ আসিয়া বাহুবলে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিয়া নিরূপিত রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। পাঠান সুবর্ণবেথাপারে তাড়িত হইল, প্রতাপাদিত্যের "যশোর নগরধাম" ধূলিপরিণত হইল, অনেকেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজকর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন;—কিন্তু তথাপি আশানুরূপ রাজকর সংগৃহীত হইল না।

মানসিংহের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর মানসম্ভ্রম চলিয়া গেল; বাঙ্গালী আবার স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। সম্রাট আরঙ্গজীব আসিয়া যখন বাহুবলে পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, বাঙ্গলা দেশ তখন একপ্রকার স্বাধীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরঙ্গজীব সেই দেশ করায়ত্ত করিবার আশায়, আপন পৌত্র আজিমশ্বান্ এবং আপন অনুচর মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

---

* আইন আকবরি।

† Grat's Analysis of Finances of Bengal.

ইহারা উভয়েই ঢাকার রাজধানীতে থাকিয়া রাজ্যশাসনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন দৃঢ়মুষ্টিতে রাজিকরসংগ্রহে ব্যস্ত, বাদশাহ আরঙ্গজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আরঙ্গজীবের নাম আজিও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সে সময়ের লোক তাঁহার নামে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, মুসলমান মস্‌জিদে হিন্দুস্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তীর্থদর্শনেও হিন্দুদিগের বিড়ম্বনার একশেষ হইতেছিল;—সুতরাং হিন্দুমাত্রেই মুসলমান শাসনের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ যদি কঠোরহস্তে রাজকর সংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী হয় ত আরঙ্গজীবের অত্যাচার একেবারেই অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইল না;—মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলা দেশে ১৩ চাকলা এবং ১৬৬০ পরগণা সংস্থাপন করিয়া বার্ষিক ১৪২৮৮১৬৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিলেন।* এই রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য চাকলায় চাকলায় এক এক জন "ফৌজদার" নিযুক্ত হইলেন, এবং কেহ সহজে রাজকর না দিলে, তাহের জমিদারী অন্যের হাতে সমর্পণ করিবার নিয়ম হইল। এত দিনের পর হিন্দুর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। যে জমিদার অধীনতা স্বীকার করিতে বা রাজকর প্রদান করিতে অসম্মত, নবাব-সরকারে তাহারই জমিদারী অন্য লোকের নামে লিখিত হইতে লাগিল, এবং সেই অন্য লোক লোকলস্কর যোটাইয়া সুবাদারী ফৌজ এবং জমিদারী লাঠিয়াল লইয়া, বিদ্রোহীদিগের জমিদারী কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। এতদিনের পর বাঙ্গালীর গৌরব যায়-যায় হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর এই সংকট সময়ে সীতারামের আবির্ভাব। সুতরাং সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। সীতারাম কে? কেমন করিয়া তিনি ইতিহাসে পরিচিত হইলেন, কেমন করিয়া তাঁহার অধোগতি হইল—তাহা বুঝিতে হইলে মুর্শিদ কুলী খাঁর নবাবী আমলের আমূল বিবরণ পাঠ করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

* Grat's Analysis of Finances of Bagal.

"কৃষ্ণচরিত্র"-রহস্য।

গত ভাদ্র ও আশ্বিনের "নব্যভারতে", "প্রতিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে, "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়ের উপর একটি গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ঐ প্রবন্ধের সহিত আমার নাম কিয়ৎপরিমাণে জড়িত;—"সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয় আমার মাননীয় বন্ধু, এ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা প্রকাশ না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। আমার ইচ্ছা, এই প্রবন্ধটি "সাহিত্যে"ই প্রকাশিত হয়,—কেন তাহার কতক ভাবুক পাঠক নীচে জানিতে পারিবেন। "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয় যদি ইহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে—অনুগ্রহ করিয়া "নব্যভারত"-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেও করিতে পারেন।

১৩০০ সালের ফাল্গুনের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, "কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত" প্রবন্ধে মীমাংসা করেন যে কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কৃষ্ণচরিত্রের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা বঙ্কিম বাবু অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবু ও নবীন বাবুর পরস্পর লিখিত কতকগুলি পত্র (অবশ্য গোপনীয়,—যাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নবীন বাবু হীরেন্দ্র বাবুকে না দিলে, চিরদিনই গোপনীয় থাকিত।) উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে, কুরুক্ষেত্রোক্ত কৃষ্ণচরিত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দের শেষে কল্পিত হইয়াছে এবং বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থ প্রথম ভাগ প্রথম সংস্করণ ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে নবীন বাবু এ কল্পনা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী।

উদ্ধৃত চিঠি পত্র হইতে বিষয়টি ঠিক প্রমাণ হয় নাই; সেই জন্য ঐ সংখ্যার "সাহিত্যে" হীরেন্দ্র বাবুর মীমাংসার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখি,—যে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র,—"কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে শরীর প্রাপ্ত হইলেও, কল্পিত ও সূচিত হইয়াছে বহু পূর্ব্বে,—"বঙ্গদর্শনে" ও "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাসে। কিন্তু সেই সময়ে আমি এমন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই, যে নবীন বাবু স্পষ্টই, বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র হইতে নিজের কৃষ্ণচরিত্র লইয়াছেন; তবে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা যে সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র আন্দোলনের প্রথম সূচনা, এবং বঙ্কিম বাবু যে এ কল্পনা সম্বন্ধে সকল বাঙ্গালী লেখকের পূর্ব্বগামী, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলাম।

নবীন বাবুর মত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখক যেখানে নিজের কল্পনার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে দাবী করিতেছেন,—এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন,—সেখানে তাঁহাকে সরল কথা স্পষ্ট বলিয়া, অপদস্থ করা, ভদ্রতা কি অভদ্রতার কাজ হইয়াছিল, নিজে তাহা বলিতে পারি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, হীরেন্দ্র বাবু আমার উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার কৃত পূর্ব্ব মীমাংসার প্রতিবাদ দেখিতে পান নাই, এই জন্য সেই চৈত্রের "সাহিত্যে"ই আমার প্রবন্ধের নীচে "বক্তব্য" শীর্ষক noteএ লিখিলেন যে "কামাখ্যা বাবুর প্রবন্ধ পড়িলাম উহাতেও আমার প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ দেখিলাম না ইত্যাদি" এই খানে পাঠক মহাশয়কে আমি, ১৩০০ সালের "সাহিত্য" হইতে হীরেন্দ্র বাবুর ও আমার প্রবন্ধ দুইটি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

হীরেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কল্পনায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণচরিত্রের নাম গন্ধও ছিল না, আমি দেখাইয়াছি যে তাহা প্রকৃত নহে, তাহার পূর্ব্বেও ছিল এবং স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই সেই পূর্ব্বকার কৃষ্ণচরিত্রের প্রচারকর্ত্তা। আমার অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ঐ চৈত্রেই বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু হয়। বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর ১৩০১ সালের ৫ই বৈশাখ আমি "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে পত্র লিখি :—

"গত চৈত্রের 'সাহিত্যে' আমার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র' ও 'বক্তব্য' দেখিলাম। বক্তব্য কাহার? হীরেন্দ্র বাবুর? না আপনাদের উভয়েরই? আমার লেখায় কি হীরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব প্রবন্ধের কতক অংশের প্রতিবাদ হয় নাই? হীরেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী, আমি স্পষ্টত দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণচরিত্রের মূল কল্পনা বঙ্কিম বাবুর। তার পর 'কিন্তু এমন বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে (কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) যে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যে সকল নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার মূল বঙ্কিম বাবু। তা সে সকল নূতন তত্ত্ব নবীন বাবুই আবিষ্কার করুন বা আর কেহই করুন।' এ সকল কথা কি হীরেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের মত শুনায় না।

যাহা হউক কথা বিষয়টির আলোচনা এখন প্রীতিপ্রদ হইবে না, নচেৎ দেখাইতে পারা যাইত, যে হীরেন্দ্র বাবুর পত্র দ্বারা আলোচিত বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই।"

৫ই বৈশাখ ১৩০১।

পত্রের সম্বন্ধে একটি কথা, "বক্তব্য কাহার? হীরেন্দ্র বাবুর? না আপনাদের উভয়েরই?" এ কথা বলিবার কারণ এই যে আমার প্রবন্ধ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হীরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এরূপ সাধারণতঃ মাসিক পত্রের নিয়ম নহে; সম্পাদক বা সহকারীরা উহার লেখকেরা প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে দেখিতে পান না। হীরেন্দ্র বাবুকে যখন প্রবন্ধ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছিল, তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল, যে, বক্তব্য হয় ত হীরেন্দ্র বাবুরও অংশ ধরিবে,—আর এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিকও নহে। (১)

আমার পত্রের উত্তরে সুরেশবাবু আমাকে লিখিলেন :—

"এ সময় শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে ওরূপ বিষয়ের আলোচনা প্রীতিপ্রদ নহে তাহা আপনিই লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে আমিও আপনার সহিত একমত।"

১৩ই বৈশাখ ১৩০১ সাল।

* * * * * * *

পত্রের শেষ অংশ প্রালোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নহে।

---

(১) 'মাসিকপত্রের নিয়ম' সম্বন্ধে কামাখ্যা বাবুর সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক। 'বক্তব্যের' নীচে লেখকের স্বাক্ষর ছিল,—লেখকগণের প্রবন্ধে বা অন্যের স্বাক্ষরিত কোনও বিষয়ের মতামতে সম্পাদকের 'অংশ' থাকিতে পারে না; কামাখ্যা বাবু এ সহজ কথাটি কেন বুঝিতে পারেন নাই, বলিতে পারি না। হীরেন্দ্র বাবুর মত বা কামাখ্যা বাবুর কৃত তাহার প্রতিবাদ, এ উভয়ের কোনওটির সহিতই সম্পাদকের মত না মিলিতে পারে,—লেখকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মতামতের জন্য দায়ী;—তাঁহাদের মতের সহিত সম্পাদকের মতের ঐক্য করিতেই হইবে, এমন কিছু মতঃসিদ্ধ নাই। আমার মত যাহাই হউক না কেন, তাহার সহিত লেখক বা প্রতিবাদকারীর সম্পর্ক কি, বুঝিতে পারা যায় না।—সাহিত্য সম্পাদক।

এই পত্রের পর এ সম্বন্ধে কোন কথা আমি সুরেশ বাবুকে লিখি নাই। আমার মনে ছিল যে চৈত্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের মহা গুরু নিপাতের বৎসর।

১৩০১ সালের প্রায় মাঝামাঝি আমি প্রবাসে যাই। প্রায় বৎসরেক আমি প্রবাসে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে (ঠিক কোন সময়ে আমার স্মরণ হইতেছে না)। কাশীধামে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের কথা উত্থাপিত হয়, আমি সেখানে নিজের মতামত ও এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব আলোচনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে অর্থাৎ গত ভাদ্রে আমি দেশে ফিরিয়া আসি। তাহার পর ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুরেশ বাবুর এক খানি পত্র পাই,—পত্রখানি এই :—

"ভাদ্র ও আশ্বিনের 'নব্য-ভারতে' 'প্রতিবাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি আপনি দেখিয়াছেন।

"উক্ত প্রবন্ধের এক স্থলে লেখক শ্রীবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, 'চতুর্থ বৎসরের 'সাহিত্যে' কামাখ্যা বাবুর এই প্রবন্ধ বাড়িয়া হীরেন্দ্র বাবু একটু ভাসা রকম জবাব দেন; শুনিয়াছি কামাখ্যা বাবু তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; (২) কিন্তু সেই সময়ে সাহিত্য-পতি বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হওয়াতে, কামাখ্যা বাবুর প্রস্তাবানুসারে সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় ও কামাখ্যা বাবু একমত হইয়া সে প্রতিবাদ প্রকাশ করেন নাই।'

"উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। বোধানন্দ সরস্বতী কি আপনার কাছে এ কথা শুনিয়াছেন? এরূপ জনরবের মূল কি? আপনি যাহা জানেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় জানাইবেন। ইতি ২১শে ভাদ্র ১৩০২।

"বিনয়াবনত

"শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

"পুনশ্চ। এই পত্রের উত্তর একটু শীঘ্র লিখিলে বাধিত হইব।

শ্রীসুরেশ শর্ম্মা।"

পত্রখানি সময়ে আমি পাই নাই,—পাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

সুরেশ বাবু যাহা বোধ করিয়াছিলেন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই,—"নব্য-ভারতের" প্রবন্ধ আমি তখনও দেখি নাই। এবং সুরেশবাবু যাহাকে জনরব বলিয়াছেন, তাহা জনরব নহে,—(৩) প্রকৃত ঘটনা বটে; পূর্ব্বকার উদ্ধৃত তিনখানি পত্র তাহার সাক্ষ্য।

যদি সে সময়ে বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু না হইত, এবং আমি ও সুরেশ বাবু একমত না হইতাম, তাহা হইলে এ বিষয় লইয়া নিশ্চয়ই আলোচনা হইত। (৪) আমার এই বৈশাখের

---

(২) কামাখ্যা বাবু কোনও প্রতিবাদ করেন নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৩) যাহার মূলে সত্য নাই, তাহা জনরব ভিন্ন আর কি বলিব?—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৪) দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে 'একমত' হইয়াই আমি অপরাধী হইয়াছি, দেখিতেছি। বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর অনেক মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাঁহার সপিণ্ডীকরণও শেষ হইয়াছে বহুদিন। লেখক এতদিনে এ বিষয়ে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। তিনি নিজে যদি 'আলোচনা' না করেন, এবং প্রবাসে থাকেন, সে অপরাধ কাহার?—সাহিত্য-সম্পাদক।

পত্রখানিকে আমি প্রতিবাদ বলিতেছি। (৫) এখন সুরেশ বাবু আমার নিকট যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা আমি তাঁহাকে ও পাঠকগণকে জানাইলাম।

সুরেশ বাবুর শেষপত্র পাইয়া আমি ২৩শে সেপ্টেম্বরই তাঁহার সহিত দেখা করি, এবং সেইখানে তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত গতীশ বাবু আমাকে ভাদ্র ও আশ্বিনের "নব্য-ভারত" দেখান। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পূর্ব্ব চিঠি লেখালিখি সম্বন্ধে সুরেশ বাবু কিছু প্রতিলিপি রাখেন নাই, এমন কি তাঁহার নিজের ১লা বৈশাখ ১৩০১ সালের পত্রখানির বিষয়ও তাঁহার স্মরণ ছিল না।

অতঃপর "নব্য-ভারতের" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আর কিছুই নাই। (৬)

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৫) কামাখ্যা বাবু তাঁহার ১৩০১ সালের ৫ই বৈশাখের পত্রখানিকেই 'প্রতিবাদ' বলিতেছেন। আমি এ বিষয়ে আপত্তি করিতেছি। সেখানি আমাকে লিখিত প্রত্যুত্তর, তাহা প্রতিবাদ নহে। আমি তাহা পত্র বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম, কেন না, তাহাই প্রতিবাদরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, সে পত্রে এমন কোনও লক্ষণই ছিল না। কামাখ্যা বাবুর সেই পত্রে আছে,—"কল কথা বিষয়টির আলোচনা এখন প্রীতিপ্রদ হইবে না, নচেৎ দেখাইতে পারা যাইত, যে হীরেন্দ্র বাবুর পত্র দ্বারা আলোচিত বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই।" এই অংশ পড়িয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ের আলোচনা প্রীতিপ্রদ হইবে না বলিয়া কামাখ্যা বাবু আপাততঃ নিরস্ত হইলেন, এ ঘটনা না ঘটিলে তিনি নিজ মতের যাথার্থ্য দেখাইতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার পত্রের আর কি অর্থ হইতে পারে? যে পত্রে তিনি "দেখাইতে পারা যাইত" বলিয়াছেন,—এবং বস্তুতঃ কিছুই দেখান নাই, সে পত্রকে প্রতিবাদ মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

২ ও ৩ নোটে আমি যাহা লিখিয়াছি, উপরি-লিখিত পত্রাংশের আলোচনাই তাহার প্রমাণ। কামাখ্যা বাবু যখন আদৌ 'প্রতিবাদ' করেন নাই,—তখন কেহ যদি বলেন, কামাখ্যা বাবু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন',—তাহা হইলে এরূপ নির্দ্দেশকে অনায়াসে বাস্তবের অপলাপ বা অযথার্থ বলা যায়। কামাখ্যা বাবুর দ্বিতীয় বার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—এ কথা কেবল জনরব নহে,—মূলহীন অলীক জনরবও বটে।—সাহিত্য-সম্পাদক।

(৬) যদি কামাখ্যা বাবুর মূল আলোচ্য সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি এক্ষণেও তাহা লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

সমাজতত্ত্বে হারবার্ট স্পেন্সর।

অগষ্ট-সংখ্যা কোর্টেম্পোরারি পত্রে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসর সমাজতত্ত্বের অংশ-বিশেষের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় সমাজের ব্যবসায়িক প্রণালী—(Professional Institutions)। সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, মনস্বী স্পেনসর সাহেব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের মুখ্য-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। বিবর্ত্তনবাদের মূলতত্ত্ব (অবিশেষ অব্যাকৃত হইতে বিশেষ ব্যাকৃতের আবর্ত্ত) অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ও গ্রীস প্রদেশে প্রচলিত থাকিলেও, ঐ তত্ত্বের সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গীন স্বতন্ত্র আলোচনা অধুনাতন বৈজ্ঞানিক যুগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডারবিন কি স্পেনসর ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। যদি ডারবিনই প্রথম প্রবর্ত্তক হয়েন, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ডারবিন প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদ সাকার স্থূল জগতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্পেনসরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিবর্ত্তনের বিশ্বব্যাপী প্রসার—স্থূল সূক্ষ্ম, সাকার নিরাকার, সাঙ্গ নিরঙ্গ, বিশ্বের সর্ব্বত্র আবিষ্কার করিল। তিনি প্রচার করিলেন যে, বিবর্ত্তনের ক্রীড়াস্থলই যে জড় জগতে আর চেতন জগতের স্থূল দেহাংশে সীমায়িত, তাহা নহে। জীববিজ্ঞানে (Biology) মনোবিজ্ঞানে (Prychology) ও সমাজবিজ্ঞানেও (Sociology) বিবর্ত্তনের লীলা প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই লীলার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিবর্ত্তনের মুখ্য নিয়মের আবিষ্কারে স্পেনসার অনেক গ্রন্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্পেনসর ধারাবাহিকক্রমে বিবর্ত্তন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত করেন। তদনুসারে প্রথম ভাগ মূল তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয় (First Principles)। দ্বিতীয় ভাগ (১ম ও ২য় খণ্ড) জীবনতত্ত্বের বিশ্লেষণে, তৃতীয় ভাগ (১ম ও ২য় খণ্ড) মনস্তত্ত্বের আবিষ্করণে, চতুর্থ ভাগ সমাজতত্ত্বের সমালোচনে, এবং পঞ্চম ভাগ ধর্ম্মতত্ত্বের নিরাকরণে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। গত ৩০ বৎসর অমিত অধ্যবসায় ও অপরিমেয় যত্নে স্পেনসর সেই গ্রন্থাবলীর রচনায় প্রবৃত্ত আছেন। মনোবিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজবিজ্ঞান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে (মূল কথা, রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, ও রাজনিক প্রণালীবিষয়ক ৪ খণ্ডে সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।) ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে (Data of Ethics)। সম্প্রতি স্পেনসর সমাজবিজ্ঞানের ব্যবসায়িক অংশের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমানে আলোচ্য প্রবন্ধ সেই আলোচনার একাংশ। ইহাতে বক্তা, কবি, নট ও নাট্যকারের উদ্ভব, বিবর্ত্তনের

সমাজতত্ত্ব।

বিবর্ত্তনবাদ।

স্পেনসরের বিশেষত্ব।

জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান।

বিবর্ত্তন গ্রন্থাবলী।

Sociology

Ethics.

হইতে আলোচিত হইয়াছে। বিবর্ত্তনের মূল সূত্র অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ। যাহা কারণে বীজভাবে লুক্কায়িত ছিল, তাহাই বিবর্ত্তনের বিধিবশে কার্য্যে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতএব এই নিয়মেই অসভ্য আদিম অবস্থা হইতে মানবের সকল প্রথা প্রণালী সভ্য আধুনিক অবস্থায় ব্যাকৃত হইয়াছে।

অব্যক্ত ও ব্যক্ত।

অসভ্য অবস্থায় জাতির সহিত জাতির বা সমাজের সহিত সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য ঘটনার মধ্যে ছিল। নেতা বা দলপতি দলবল লইয়া ভিন্ন সমাজের নেতা বা দলপতির সহিত বিরোধ উপলক্ষে প্রায়ই সসম্ভ্রমসমরে অগ্রসর হইতেন, এবং বিপক্ষ দলন করিয়া জয়োল্লাসে সানুচর সসজ্জ হইয়া বিজয়ী বীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাকে সমাদরে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তাঁহার স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায় মহোৎসব করিত। এই মহোৎসবের বীজ হইতেই বক্তা, কবি, নট ও নাট্যকাব্যের উৎপত্তি।

বক্তা প্রভৃতির আদি কি?

আদিতে প্রত্যাগত বিজয়ী বীরের জয়ঘোষণা করিয়া কোন বচনরাগীশ তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া তাঁহার অবদানপরম্পরার বর্ণনা করিত। ইহা হইতে ক্রমবিকাশে বক্তৃতার উদ্ভব হইয়াছে। এই বক্তব্যের প্রমাণার্থ স্পেনসর আপন প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। অধুনা এবাতত্তে যে সকল বিদ্যমান অসভ্য জাতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের সামাজিক প্রণালী পদ্ধতিই দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। সে দৃষ্টান্ত কি? ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে প্রতি শাখা জাতির সামাজিক উৎসবে বক্তার বক্তৃতা শ্রুত হইয়া থাকে। দেহোমা, কালিডোনিয়া, তিহিতি প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও উক্ত প্রথা লক্ষিত হয়।

বক্তা।

ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতাই কবিতা; সঙ্গীতরসিক অসভ্য জাতিরা, তাললয়সংযুক্ত করিয়া বিজয়ী দলপতির জয় ঘোষণা করে। (নিগ্রো শাখাজাতিরা ইহার প্রমাণস্থল)। কোথাও বা এই জয়ঘোষণা সঙ্গীতযন্ত্রের সহকারে উচ্চারিত হয়। (সমতিব জাতি ইহার দৃষ্টান্তস্থান)। এইরূপে ক্রমশঃ বক্তার বচনস্রোত তালের মানদণ্ডে নিয়মিত হয়। তাহা হইতেই ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা কবিতার উৎপত্তি।

কবি।

অনেক স্থলেই জীবিত বিজেতার সহিত তাহার পূর্ব্বপুরুষের অবদান কীর্ত্তিত হয়। কারণ অসভ্যের বুদ্ধিতে ইহলোক ও পরলোকে কোন অনতিক্রম্য ব্যবধান নাই। সে ভাবে, মৃত ব্যক্তি (যাহাকে সে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করে) আত্মগোপন করিয়া ইহলোকেই বিদ্যমান আছে। মৃতের সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস হইতেই (স্পেনসরের মতে) ভূত দেবতা শেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস উদ্গীত হয়। অথবা ভূতাদি ঐ বিশ্বাসেরই সৃষ্টি। এ মত কত দূর প্রমাণসঙ্গত বা সমীচীন তাহার বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। জড়বাদী স্পেনসরের এই অভ্রান্ত ঈশ্বরতত্ত্ব দর্শন। বর্ত্তমানে বক্তব্য এই যে, আদিম কালের কবিতা যে ধর্ম্মপ্রধান বা ধর্ম্মময়, তাহার কারণ স্পেনসর এই প্রণালীতে মীমাংসা করিয়াছেন।

বিজয়ী বীরের অবদানবর্ণন হইতে অবদান-অনুকরণ বড় অধিক দূর নহে। কথা বলা অপেক্ষা কার্য্যে দেখান অধিকতর হৃদ্য হয়। বক্তৃতা বা গীতি অপেক্ষা অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী। এইরূপে নটের উৎপত্তি হয়। অসভ্য জাতির সমাজপ্রণালীর অনুশীলন করিলে এই কথাই সপ্রমাণ হয়। এস্কিমো নেভোজি প্রভৃতি জাতি ইহার দৃষ্টান্ত। সংস্কৃতে নট হইতে নাটকের উৎপত্তি। অর্থাৎ সঙ্গীত নৃত্য (হাবভাবের পরিচায়ক ভঙ্গি বর্জ্জিত হইয়া) অভিনয়ে পরিণত হয়। এক চরিত্রের অভিনয়ে ক্রমশঃ তাহার সহকারী ও অবিসংবাদের কার্য্যাবলীর অভিনয় মিশ্রিত হয়। তখন

নট।

নট অন্যান্য পাত্র পাত্রীর সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। এইরূপ নট সূত্রধরে (Stage manager) উন্নীত হয়। সূত্রধর সহযোগী নট নটীর হাবভাব ভাষা ভঙ্গির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইহাই ত নাট্যকারের কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ অভিনেতা ও নাট্যকার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সেক্ষপীয়র ও মলেয়ার অভিনেতা ও নাট্যকার উভয়েরই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ইদানীং কয় জন নাট্যকার অভিনয়কার্য্যে ব্রতী হন? এইরূপে অব্যক্ত অব্যাকৃত অবিশেষ হইতে ব্যক্ত ব্যাকৃত বিশেষের বিকাশ হয়। ইহাই বিবর্ত্তনবিধি।

নাট্যকার।

সাহিত্য।

বিলাতে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস।

ইংরাজ এদেশবাসিগণকে চিরদিন কতকটা ঘৃণা আর কতকটা কৃপার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। 'নেটিবের' ভিতর যে কোনও প্রকার মহত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যজ্ঞান থাকিতে পারে, এরূপ চিন্তা কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নিতান্ত উপহাসের বিষয় ছিল। ভারতবাসীকে আমরা বাহুবলে পরাজিত করিয়াছি, পরাজিতের আবার মহত্ত্ব কি? বিজিতের কাছে জেতার আবার শিক্ষণীয় কি? বহুকাল ব্যাপিয়া ইংরাজের মনোভাব সাধারণতঃ এইরূপই ছিল। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। রোমরাজ্য-বিধ্বংসী, পাশব-বলের অবতার, প্রাচীন গথ ও ভান্দাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর বিজেতৃগণ এ পর্য্যন্ত ঐরূপই ভাবিয়া আসিতেছেন। তবে গথ ও ভান্দালের সহিত তুলনায় ইংরাজকে অবশ্য অনেকটা উচ্চ স্থান দিতে হইবে। সাহিত্য, জগতের সাধারণ সামগ্রী। বিশ্বজনীন সহানুভূতিই উহার প্রাণ। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের মত উহা আপন প্রভাব আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধিমধ্যেই সংযত করিয়া রাখিতে চাহে না। সাহিত্য স্বভাবতঃ এই সমাগরা বসুধাকে বেষ্টন করিয়া প্রেম ও প্রীতির মেখলা পরাইয়া দিতে চাহে। সার উইলিয়ম জোন্স হইতে আমাদের আজিকার আলোচ্য শ্রীমতী মেরিয়ম নাইট পর্য্যন্ত ইহার সাক্ষী।

সাহিত্য-জগতের সাধারণ সম্পত্তি।

ইংরাজ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এত দিন কেবল ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের উপরই নিবদ্ধ ছিল। সেই সংস্কৃতের ছায়ায়, আধুনিক সভ্যতার সলিলসেকে এই পরাজিত অথচ বঙ্গদেশে যে এক অতুল মহিমাময় অভিনব সাহিত্যের ভিত্তি, অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইংরাজ এতদিন তাহার বড় একটা খবর রাখিতেন না। তিনি আপনার মিল্টন, কিটস্ টেনিসন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, মাইকেল, হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার প্রবৃত্তি কখনও দেখান নাই। ওয়াল্টার স্কট, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট প্রভৃতি তাঁহাকে এত মুগ্ধ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সুদূর ভারতবর্ষের এক কোণে কোথায় কোন্ বঙ্গযাজ্ঞবল্ক্য কোন্ বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইবার আদৌ তাঁহার অবসর ছিল না। এখন সে দিন গিয়াছে। ইংরাজের নিত্য নূতন বুভুক্ষা নিবারণের জন্য আর সে স্কট নাই, থ্যাকারে নাই, জর্জ্জ ইলিয়ট নাই। সকলেই আপনাপন জীবনগত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর সেই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহারা সেই মহাত্মাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁহাদের লইয়া ইংরাজের বোধ হয় তাদৃশ তৃপ্তি হইতেছে না। তাই বাঙ্গালার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। "বিষবৃক্ষ" এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" অনূদিত হইয়া ইংলণ্ডে পঠিত হইতেছে।

ইংরাজের চক্ষে বঙ্গ-সাহিত্য।

শ্রীমতী মেরিয়ম নাইট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "বিষবৃক্ষের" ইংরাজী অনুবাদের কথা "সাহিত্যের" পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন। সম্প্রতি ইনি আবার বঙ্কিম-কৃত "কৃষ্ণকান্তের উইলের" এক অনুবাদ প্রচারিত করিয়াছেন। অনুবাদ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমতী মেরিয়ম স্বয়ং যে কথা লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজিন" হইতে আমরা তাহার আদ্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

বিলাতে বঙ্কিম বাবু।

"কৃষ্ণকান্তের উইল এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস বিষবৃক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানের শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ। ইহাদের প্রণেতা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহারই স্বদেশীয় কোন লেখক 'বঙ্গের ওয়াল্টার স্কট্' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কারণ বোধ হয় এই যে, বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস ঐতিহাসিক-শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের অপেক্ষাও উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাস আধুনিক প্রণালীর অধিকতর অনুগত; শুধু তাই বলিয়া নহে, উদ্ভাবন ও বর্ণনশক্তি হিসাবেও তিনি বড়। যে সকল গভীরতম প্রদেশে স্কট্ কখনও প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, বঙ্কিমের সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সেখানেও বিচরণ করিত। পরিহাসরসিকতায় হয় ত উভয়েই সমান। কিন্তু ট্রাজেডির অঙ্কনে বঙ্কিম নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

বঙ্গের স্কট্।

"১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ইহা বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরাজী সংস্করণের নিমিত্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মের জে. এফ. ব্লুমহার্ট এম্. এ. মহোদয় একটি ভূমিকা, নির্ঘণ্টপত্র ও টীকাগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

"ইংরাজ পাঠক যদি বঙ্গীয় নারী চরিত্রের উচ্চতা ও গভীরতা অনুভব করিতে চান, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায় আর কোথাও পাইবেন না।

"আমরা যাহাকে উপন্যাস বলি, তাহা বাঙ্গালার অথবা সাধারণতঃ প্রাচ্য প্রদেশসমূহের, নিজস্ব নহে। নাটক বা দৃশ্যকাব্যই প্রাচ্য লেখকদিগের প্রধান অবলম্বন। গত পঞ্চাশৎবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য আদর্শে উপন্যাসরচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আরও কয়েক জন ভাল ঔপন্যাসিক আছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের সমকক্ষ নহেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আসন গ্রহণ করিতে পারেন, এমন কোন লেখকের কথাও শুনিতে পাই না। কিন্তু আমরা আশাহীন নহি। ভারতবাসীর হৃদয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও পরিহাসরসিকতা হিন্দুজাতির বিশেষত্ব। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, সর্ব্ববিধ মনুষ্যত্বের চিত্রণে কথাগ্রন্থ কত দূর উপযোগী, শুকুমার শিল্পের হিসাবে ইহার প্রসার কত বিস্তৃত, এ সকল কথা লেখকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইলে, এ বিষয়ে শিল্পীর অভাব হইবে না। পুরুষ লেখকদিগের ন্যায় তখন লেখিকারও আবির্ভাব হইবে। উপন্যাসক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি স্ত্রী কবির অভ্যুদয় হইয়াছে।

বঙ্গের উপন্যাস।

"অনুবাদে ভাষার অন্তরায় সহজে যাইবার নহে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অযোগ্য অনুবাদকের হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল অনুবাদ দেখিয়াছি, তাহারা হয় অসম্পূর্ণ, নয় ত একেবারেই হাস্যাস্পদ। কতকটা অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য বটে। একে ত ভাষান্তরের কার্য্যটাই স্বভাবতঃ সুকঠিন, তা'র উপর যে জীবনের আদর্শ এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের কোনও উপায় নাই। হিন্দুর পারিবারিক জীবন বিদেশীয় দৃষ্টির অগোচর। অথচ মূলানুগত অনুবাদে উহার জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। সম্প্রতি

অনুবাদে অন্তরায়।

হিন্দু-জীবনের কয়েকটি চিত্র ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজী পাঠক-সম্প্রদায় উহাদের সৌন্দর্য্য মূলগ্রন্থ হইতে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক হয় ত উপন্যাসে উপকার।

আপন গ্রন্থনিচয়ের দেশীয় ও ইংরাজী সংস্করণ যুগপৎ প্রকাশিত করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা করিতে পারিতেন,—ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁহার যে আবার বিদেশী পাঠক জুটিবে, সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের এরূপ আশাও ছিল না; তিনি উহার কামনাও করিতেন না। হয় ত তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা অনাকাঙ্ক্ষিতই ছিল। কেবল অযোগ্য অনুবাদকের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার মানসেই তিনি যোগ্যতর হস্তে উহার ভারার্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১)

ভবিষ্যৎ।

"এমন দিন আসিবে, যখন বঙ্গীয় লেখকদিগের পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণতা আর থাকিবে না;—উহা এখনই কমিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতের সেই ঔপন্যাসিকগণ সভ্য জগতের সর্ব্বত্র আপনাদের প্রতিভার পুরস্কার খুঁজিয়া বেড়াইবেন; এবং সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক চিত্রশালায় স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর চরিত্র-চিত্র যোগাইবার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন লইয়া অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়াছে। প্রাচ্য-দেশবাসী মনে করেন, এ বিষয়ে প্রতীচ্যেরই অগ্রণী হওয়া উচিত। কেবল অগ্রণী হইলে চলিবে না; কার্য্যক্ষেত্রে যাহা কিছু করিবার, তাঁহাকেই করিতে হইবে। প্রাচ্যেরা কেবল প্রতীচ্যের প্রত্যুদ্গমন করিবেন; অথবা উত্তরসাধক হইয়া থাকিবেন। প্রাচ্যের এই ভাব অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে। কিন্তু উপন্যাসে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পাশ্চাত্য কথাগ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য নরনারীর পরিচয় পাইতেছেন। তিনি স্বদেশের নরনারীর যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাশ্চাত্যের সমক্ষে উপস্থাপিত করুন। তাহা হইলে জাতিবিশেষ ঘুচাইয়া পরস্পরের প্রীতিসংস্থাপনে অনেকাংশে সফল হইবেন।

বঙ্কিমের কথা।

"বঙ্কিমচন্দ্র বহুবর্ষব্যাপী রাজসেবা ও অসাধারণ প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সুতরাং শাখা প্রশাখাসমেত তাঁহার পূর্ণ নাম,—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সব শাখা প্রশাখায় পরিচয়ের বড় ব্যাঘাত ঘটে। এখানে তিনি, বিষবৃক্ষের প্রভৃতির বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামেই খ্যাত। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ কিন্তু তাঁহাকে স্নেহবশতঃ বরাবর বঙ্কিম বাবু বলিয়াই ডাকিয়া আসিতেছেন; এবং চিরদিন ঐ বলিয়াই ডাকিবেন। বঙ্কিম বাবু অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রস্তাবে উল্লিখিত দুইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুইখানিই জীবনের প্রকৃত নিখুঁত চিত্র; পাশ্চাত্য-পাঠকের পক্ষে যেমন মনোরম, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সানুভূতির জন্য স্ত্রীজাতি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিবে।"

---

(১) স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু শেষে এ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন,—এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক "দেবীচৌধুরাণীর" নিজ-কৃত ইংরাজী অনুবাদের খাতাখানি বাহির করিয়া আমায় দেখাইয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অনুবাদ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, ফেয়ার' করিয়া রাখিয়াছি;—নিজের সব বই নিজেই অনুবাদ করিব মনে করিয়াছিলাম;—কিন্তু তারপর আর ইচ্ছা হইল না।"

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু এই অনিচ্ছার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক।—সাহিত্য-সম্পাদক।

আমাদের বিবেচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিষয় ও, উদ্দেশ্যনির্বিশেষে একই নিকষে পরীক্ষিত করা সুসমালোচনার কার্য্য নহে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান-পারিপার্শ্ব জীবনের অঙ্কনে "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল গার্হস্থ্য জীবনই উপন্যাসের বিষয়ীভূত নহে। উদার, মহান্ ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির হিসাবে উচ্চতর স্থান "চন্দ্রশেখরের" প্রাপ্য। আবার, ঐতিহাসিক হিসাবে "রাজসিংহ" ইহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। শ্রীমতী মেরিয়ন্সের মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের আর একটুকু বক্তব্য আছে। বঙ্কিমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তিনি স্কটের গৌরবের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যে উদার, সর্ব্বতোমুখ সানুভূতির পরিচয় পাইয়া সমালোচকগণ স্বয়ং সেক্সপিয়রের নিম্নেই স্কটের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহা ত দেখিতে পাই না। স্কটের সেই বিশাল বৈচিত্র্য-রশ্মিমে কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র বহুনির্ব্বাচিত চিত্রগুলি সাজাইয়া কেবল এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালা সংগঠিত করিয়াছেন। কিন্তু, স্কটের কাব্যোদ্যান মাতা বসুমতীর বক্ষের ন্যায় বিশাল, উহাতে স্থান পায় নাই, জগতের অবশ্যে এমন কুসুম অতি অল্পই আছে।

আমরা শ্রীমতী মেরিয়নকে অনুরোধ করি, তিনি "বিষবৃক্ষ" "কৃষ্ণকান্তের উইল" ন্যায় "চন্দ্রশেখর" "রাজসিংহ" প্রভৃতিরও অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য পাঠকসমাজে প্রচারিত করুন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিমকে সম্পূর্ণরূপে পাইলে ইংরাজ পাঠক আনন্দিত হইবেন। গদ্য-কাব্যের ন্যায় বাঙ্গালার অন্যান্য প্রধান পদ্যগ্রন্থগুলিরও অনুবাদ হওয়া উচিত। মাইকেলের "মেঘনাদবধ", হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যা", বা রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" ইংরাজীতে অনুবাদিত হইলে, ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সমালোচনা।

কিংস্‌লি।

ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখক মিষ্টার ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন "ফোর্টনাম্" পত্রে, ইংরাজ লেখকদিগের সমালোচনা করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়াছি।* তিনি চার্লস্ কিংস্‌লির যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন যে, কিংস্‌লি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক না হইলেও, তাঁহার সময়ের লোকের উপর তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রভাব তাঁহার কোন বিশেষ গুণ হইতে উদ্ভূত নহে; পরন্তু তাহা তাঁহার পরিবর্ত্তনক্ষমতা, সাহিত্যে উৎসাহ, ক্ষমতার প্রাচুর্য্য, নবপথাবলম্বনক্ষমতা, সহানুভূতিসাহিত্য ও সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে তিনি পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে নানা চিন্তা ও নানা সম্প্রদায় বিস্তার করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া অনেকে চিন্তাও করিয়াছে, অনেকে আনন্দিত হইয়াছে। তিনি নানা উপায়ে নানা বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি গীতিকবিতা, গীত, নাটক, রোমান্স, উপদেশ, প্লেটোনিক-অনুরাগকথন, সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ, শিশুদিগের জন্য আবাঢ়ে-গল্প, বৈজ্ঞানিক পুস্তক, দার্শনিক-প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক, সকলই রচনা করিয়াছেন। এ সকলের প্রায়

* ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সহযোগী সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

কোনটাই প্রথম শ্রেণীর রচনা নহে; এবং কতকগুলিকে 'ভাল নয়'ও বলা যাইতে পারে। তবে তাঁহার রচনা সাধারণের রুচি ও ধারণার মর্ম্মস্থলস্পর্শী; কাজেই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া পাঠককে চিন্তা করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রচুর ক্ষমতা, তীক্ষ্ণতা এবং সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। কাজেই, তিনি ভবিষ্যৎবক্তা বা সাহিত্যগুরুদিগের দলস্থ না হইলেও, তাঁহার সময়ের পাঠকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভাবিত নহে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কিংস্‌লির প্রায় সকল কল্পনাসঞ্জাত পুস্তকই তর্কবহুল; সে সকলে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং জাতি সম্বন্ধে তর্ক দেদীপ্যমান, সেই জন্যই সে সকল পুস্তক তত ভাল হয় নাই। সে সকল গ্রন্থ কৌতূহলোদ্দীপক, সে সকলে তেজ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অভাব নাই। তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা কেবল তর্কবহুল পুস্তিকামাত্র, তাহারই মধ্যে তিনি এত সৌন্দর্য্য, এত কল্পনা সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে "Hypatia"ই বিশেষ প্রশংসিত। "Westward Ho!"ও সুন্দর ঐতিহাসিক রোমান্স। প্রথমোক্ত গ্রন্থের অনেক ভ্রম ইহাতে নাই; ইহাতে পরিপক্কতা পরিস্ফুট, এবং ইহা অধিকতর যত্নের সহিত লিখিত। কিংস্‌লি যে খুব উচ্চদরের ঔপন্যাসিক, এ কথা না বলিলেও ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে এমন অনেক দৃশ্য—বিশেষতঃ বর্ণনাপ্রধান দৃশ্য আছে, যে সকলে সাহিত্যাঙ্কনক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের কোন রোমান্সেই সে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত হয় নাই। "Two Years Ago"তেও কয়টি সুন্দর দৃশ্য আছে; তবে এই গ্রন্থে যে সকল গুণ বা দোষ কিংস্‌লির বিশেষত্ব, সে সকলের কিছুই নাই। কিংস্‌লির অন্যান্য কল্পনাসঞ্জাত গ্রন্থের মধ্যে, প্রকাশের চল্লিশ বৎসর পরে, এখনও "The Heroes" শিশুদিগের গ্রীকপুরাণের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়, এবং গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

রাজনৈতিক উপন্যাস।

কিংস্‌লির সকল উপন্যাসই অল্পাধিকপরিমাণে রাজনীতিজড়িত। লেখক তন্মধ্যে "Yeast"এরই অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের কতকগুলি সুন্দর কবিতা, কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যচিত্র, প্রভূত উজ্জ্বল চিন্তা, স্থিরীকৃত ধারণা, যৌবনাবেগ ও উৎসাহের প্রথম অরুণরাগ সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিরঞ্জন বলিয়াই ইহা সাহিত্যশিল্পের হিসাবে "Alton Locke" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে সংবাদপত্র বা প্রবন্ধের গন্ধ নাই, ইহাতে তেমন আকস্মিক ভাড়না নাই, ইহা কবিতাপূর্ণ। গ্রন্থকার নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের বিষয় ভাল জানিতেন। "Yeast" পল্লীগ্রামের কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে যে সকল সামাজিক দোষ সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী সেই সকলই আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে কোন কল্পনাসৃষ্ট শ্রমজীবী বা ধনিসন্তান, ধর্ম্মযাজক বা শিকার-চোরের চিত্র চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থকার যাহা জানেন, তাহাই লিখিয়াছেন, আর যাহা অনুভূত হইয়াছে, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি চিত্রই অত্যন্ত সুন্দর। পুস্তকের রচনাপ্রণালী চমৎকার নূতন, প্লেটোনিক আখ্যায়িকা ও কার্লাইলের ধরণের পুস্তিকা একত্র মিশাইয়া, সেই মিশ্রণোৎপন্ন জিনিসটা আবার জর্জ্জ-ইলিয়টের সাইলাস্ মার্ণারের মত গ্রাম্য রোমান্সের ছাঁচে ঢালিয়া ইহা রচিত; মধ্যে মধ্যে আবার উপদেশ, সুন্দর গাথা ও রাজনৈতিক আলোচনারও অভাব নাই। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে এখনও পুস্তকখানি বারবার পাঠ করিলেও বিরক্তি জন্মে না। "Alton Locke" অবশ্যই জনসাধারণের অধিক প্রিয়। কিন্তু লেখক সাহিত্যশিল্পহিসাবে "Yeast"কেই উচ্চতর স্থান দান করিয়াছেন।

লেখক বলেন যে, কবি হিসাবে কিংসলির স্থান অনেকটা উচ্চে। তাঁহার কবিতাগুলি মধুর ও প্রাঞ্জল। তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে দুই-চারিটি এতই চমৎকার যে, টেনিসনের গীতগুলিও সে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়। "The Sounds of Dee" ও "The Three Fishers"এর কথাই ধরা যাউক। যদি এই দুইটি গীত কবিতাহিসাবে অত্যুৎকৃষ্টও না হয়, তবুও যখন এই দুইটি গীত মধুর কণ্ঠে করুণ মধুর সুরে গীত হয়, তখন তাহার তুলনা কোথায়? শেষোক্ত গীতটি কি সুন্দর! সমুদ্রের জলে তরী ভাসাইয়া সেই তিন জন ধীবর চলিয়া গেল, তিন জনেই পত্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। ব্যয় অল্প নহে, উপার্জ্জন অধিক নহে,— তাহারা চলিয়া গেল; শিশুরা দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহারা চলিয়া গেল। তিন জনের পত্নী ব্যাকুলহৃদয়ে বসিয়া রহিল। সাগরের উন্মত্ত বারিরাশির গর্জ্জন আর বৃষ্টিপাত শব্দ তাহাদের শ্রবণে আসিতে লাগিল। হায়! "মানব কবিবে কর্ম্ম, রমণী কাঁদিবে শুধু!" তাহার পর যখন স্রোত সরিয়া গেল, তখন সেই রজতধবল সৈকতশয়নে শয়ান তিনটি মৃতদেহের উপর অরুণাভা নিপতিত হইল। আর যাহারা আর নগরে ফিরিবে না, তাহাদের জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহাদের পত্নীরা কাঁদিতে লাগিল।

জীবনের শেষ পনের বৎসরে তিনি রাশি রাশি বক্তৃতা, উপদেশ, গল্প, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কবিতা, কথোপকথন, শিশুদিগের জন্য কল্পিত গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, খাদ্যোপযোগিতাসম্বন্ধীয়, সমাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাগ্মিকৃত রচনায় সেই পূর্ব্বরচিত উপন্যাস গাথা ও কবিতার অপূর্ব্ব প্রতিভাছটা নাই। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে সেই প্রতিভার দীপ্তশিখা নির্ব্বাপিত হইল।

কবিতা।

দুটি সনেট।

নারী।

দাও দুই চক্ষু মুদি' কোন্ প্রাতে উঠি'
হরিতে স্মরণে ল'য়ে পুণ্যময়ী সতী
গৃহকর্ম্মপানে যাও,—স্নেহ আঁখি দুটি
করুণা কাতর ফিরে সরকার প্রতি।—
স্নেহধন ঘেরে আসে, দাও মুঠি মুঠি
স্নেহভক্ষ্য,—বক্ষাঞ্চল ভূমে পড়ে লুটি',
স্নেহ যেন ঝরে' পড়ে বসন আঁধারে।—
বেলা বেড়ে যায়, তুমি মাথা রাখি বুকে
অতিথির তরে বসে', অন্ন নাহি মুখে।—
স্নেহ কর, সেবা কর, সরস শ্যামল
কর সংসার অন্তর,—সুন্দর সফল
সতী জীবন তোমার; মরণ তোমারে
ব্যথা নাহি দেয়, সে ত শয়ন সুন্দর
নিশ্চল ধীরনের রণ অবসর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিশু।

অশরীরী আনন্দের ক্ষুদ্র এক কণা,
তৃপ্তির অধরচ্যুত এক বিন্দু হাসি,
আপনে আপনি মগ্ন এত অনিমনা
ভুলে কি ধরার গেহে লুটিয়াছ আসি?
বিহগের নভঃপ্লাবী স্বর মধুময়,
বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে জোছনা অঞ্চল,
আকুল সৌরভ-ভরা কুসুম হৃদয়,
প্রেমের আলোকে দীপ্ত নয়ন চঞ্চল,
শোকমুক্ত হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস,
শুভ্র রাতে দূরাগত বাঁশরীর গান,
সন্ধ্যার ললাটে স্নিগ্ধ তারকাপ্রকাশ,
কি আছে জগতে বল তোমার সমান?
ব্যথিত কাতর হৃদি জুড়াবার তরে
ভুলে কি ফুটেছ আসি এ আঁধার ঘরে?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, "সাধনা" অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্যসংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া "সাধনাকে" সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর "সাধনা" ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনার" বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয়, বাঙ্গালীপাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে "সাধনা" বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে "সাধনার" মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

এবারকার "সাধনার" প্রথমেই সম্পাদকের রচিত "বিদ্যাসাগর-চরিত",—এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যপ্রকাশ সম্ভাবিত নহে। আমরা কেবল এ জন্য লেখকের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যে দিন এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর-স্মরণার্থ-সভায় প্রথম পঠিত হয়, সেই দিন সভাপতি শ্রীযুত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য রবীন্দ্র বাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জীবনচরিতের আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদার সহানুভূতি, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, উন্নত বর্ণনাকৌশল ও পরিপূত লিপিকুশলতার আবশ্যক,—রবীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে। তিনি বিস্তৃত জীবনচরিতের রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন, মনে করি। "তুকারামের অভঙ্গ" একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। ইহাতে তুকারামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার কতিপয় 'অভঙ্গের' অনুবাদ আছে। অনুবাদে একটু নূতনত্ব এই যে, তুকারামের মূল অভঙ্গগুলি অমিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত বলিয়া অনুবাদও অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, অমিত্রাক্ষরের স্রোত ক্ষুদ্র কবিতার শেষে আসিয়া সহসা বিরত হয়,—তখন আর তাহার মাধুর্য্য পাওয়া যায় না;—যাহা হউক, ইহা এখনও পরীক্ষাধীন। "বৈদিক উপাখ্যান" একটি সংগৃহীত প্রবন্ধ। "অ্যাংলোবাৎসল্য" নামক প্রবন্ধটি বিলক্ষণ সময়োপযোগী, এবং যাঁহাদের জন্য রচিত, তাঁহাদের অত্যন্ত উপকারী হইবে। বর্ত্তমান লেখক যাঁহাদের 'অ্যাংলোবৎসল' সংজ্ঞা দিতেছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে এক জন লেখক তাঁহাদিগকেই 'ইঙ্গ-বঙ্গ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। "সম্পদব্রত" চলিত কথায় রচিত একটি ব্রতের ইতিহাস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি, আমরা ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই সংখ্যায় "লক্ষ্মীবাই" সমাপ্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। "সিরাজদ্দৌলা" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে; লেখক পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে জানেন, এবং তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, মনোরম ও বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সিরাজের বাল্যজীবন বিবৃত হইয়াছে। "নিবেদন" একটি মিষ্ট কবিতা। "অতিথি" একটি গল্প। লেখক ইহাতে একটি ধারাবাহিক পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্রশালার মধ্যে একটি সরলবন্ধনহীন সংসারবন্ধনভীরু স্বাধীনতাপ্রিয় নির্ব্বিবাদী সদাসপ্রতিভ বালক ও আর একটি পল্লীবালিকার মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। "অপূর্ব্ব কলাবিদ্যায়" লেখক বলিতেছেন,—বিচিত্র ভাবের

স্বরবেশে যেমন নূতন গানের সৃষ্টি হয়, তেমনই বিবিধ বর্ণবিন্যাসে 'দৃশ্য-সঙ্গীত' উৎপন্ন হইতে পারে, ইয়ুরোপে সম্প্রতি এই এক নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইতেছে। "পাঞ্চভৌতিক সভায়" বৈজ্ঞানিক কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে। "নন্দোৎসব" একটি সুন্দর স্বভাবানুগত চিত্র। লেখক পর্ব্ব ও উৎসবগুলির এইরূপ ছবি আঁকিয়া ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালীর উৎসবানন্দের একটা স্থায়ী ইতিহাস রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কালস্রোতে সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—ভবিষ্যতের জন্য অতীতের চিত্র সর্ব্বত্রই আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। "উপাসনার প্রকারভেদ" প্রবন্ধের নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। "ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক" প্রবন্ধে লেখক উক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। "আমরা ও তোমরা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার 'প্যারডি',—হাস্যজনক বটে। "ধারাম্নান" একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনী; মন্দ হয় নাই। "বহুপত্যাত্মক বিবাহ" প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট।—সচরাচর এরূপ সুলিখিত ও সুসজ্জিত প্রবন্ধ দেখা যায় না। 'বহুপত্যাত্মক বিবাহ' সম্বন্ধে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল এই প্রবন্ধে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। "মগধ-সংগীত" একটি কবিতা। এই কবিতাটি 'মিলের' জন্য প্রসিদ্ধ হইবে,—কবিতার প্রতি 'ভাগের' তিনটি চরণের শেষ অক্ষর যুক্তবর্ণ, এবং যুক্তবর্ণ দিয়াই তাহা মেলান হইয়াছে;—যেন যুক্ত-বর্ণ পালোয়ানেরা 'মিলের' জন্য 'কুস্তি' করিতেছে।—এরূপ স্থলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে;—শব্দের লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত কোমল ভাব-শিশু এমনই বন্দী হইয়া আছে যে, ইহজীবনে আর তাহার স্ফূর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, উভয়ে প্রত্নতত্ত্বের হুগলির বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দুইটিই পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "গীতার প্রামাণ্য"—তৃতীয় প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ ওষের "ঋগ্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব"—দ্বিতীয় প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি"—চতুর্থ প্রস্তাব, এবার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বোধানন্দ স্বামী সরস্বতী "প্রতিবাদ" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"চতুর্থ বৎসরের 'সাহিত্যে' কামাখ্যা বাবুর এই প্রতিবাদ পড়িয়া হীরেন্দ্র বাবু একটু ভাসা রকম জবাব দেন; শুনিয়াছি, কামাখ্যা বাবু তাহারও প্রতিবাদ করেন; কিন্তু সেই সময়ে সাহিত্যপতি বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হওয়াতে,—কামাখ্যা বাবুর অন্তর্বাসুনারে, 'সাহিত্য-সম্পাদক' মহাশয় ও কামাখ্যা বাবু একমত হইয়া, সে প্রতিবাদ পত্রস্থ করেন নাই। এখন এত দিন পরে, হীরেন্দ্র বাবু সেই কথা পুনরুত্থাপন করিয়া, একেবারে 'মোসাহেবি' ধরণের মীমাংসা সমেত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন, অথচ 'সাহিত্য-সম্পাদক' মহাশয় জানিয়া শুনিয়া কামাখ্যা বাবুর প্রতিবাদের নামটি পর্য্যন্ত লন নাই," যিনি অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার কথার উত্তর লিখিলে, অস্ত্রত্রাব প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে কামাখ্যা বাবু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তর দিয়াছি। এই মাসের "সাহিত্যের" স্থানান্তরে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র রহস্য" নামক প্রস্তাব পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সরস্বতীর কৃত অভিযোগের কোনও মূল নাই। স্বামী সরস্বতী তাঁহার প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কোনও ভদ্র লেখকের উপযুক্ত নহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রে সুশোভিত

ইন্দুমতী।

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত।

এই সর্ব্বজন-প্রশংসিত উপন্যাস খানি সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র সমূহে যে সমস্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাই ইন্দুমতীর গৌরবের বিষয়।

সমালোচনা।

সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার (নবজীবন সম্পাদক) লিখিয়াছেন :—

"আমি ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশ-ভূষা ও লালিত্বময়ী ভঙ্গির জন্য। * *

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সাহিত্য-সমাজে প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (বঙ্কিম চন্দ্র, নূতন লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রণেতা) লিখিয়াছেন:—

আপনার পুস্তকখানি পড়িয়াছি। পুস্তকখানিতে বর্ণনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই অতি সুন্দর ও নূতন রকমের হইয়াছে। বিশেষ বিখ্যাত উপন্যাস লেখক দুই এক জন ভিন্ন এরূপ বর্ণনা—কই—অন্য কাহার উপন্যাসেই ত দেখিতে পাই না। আপনার দুই-একটী বর্ণনা পড়িলে বোধ হয় যে সেরূপ বর্ণনা বাঙ্গলার কোন প্রকার উপন্যাসেই নাই। এই জন্য আপনার উপন্যাস খানিকে বিশেষ প্রশংসা করি। * * ইত্যাদি।

৫ই মাঘ, শুক্রবার। (স্বাক্ষর) শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। ইন্দুমতী পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই প্রথম উদ্যমেই যশোদা বাবু চরিত্র চিত্রণে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যশোদা বাবু কালে একটী ভাল উপন্যাস লেখক হইবেন। গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নায়ক নরেন্দ্র নাথ ও দুষ্টা গৌরমণির চিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা নমল সুললিত। ছাপা ও বাঁধাই-পরিপাটী।

অনুসন্ধান, ৫ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং গ্রাম্যদোষ বর্জ্জিত, গল্পাংশেও মনোহারিত্ব আছে, মুদ্রাঙ্কণ ও বাঁধাই অতি পরিপাটী।

সময়, ৩০ শে ভাদ্র, ১৩০১।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। বহি খানার ছাপা, বাঁধাই, কাগজ অতি পরিপাটী। সরকার মহাশয়ের যে কথা আমাদেরও সেই কথা। ইন্দুমতীর লেখক সাধারণের উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

জন্মভূমি—আশ্বিন ১৩০১ সাল।

ইন্দুমতী—পুস্তক খানির বাঁধাই এবং ছাপা অতি সুন্দর। এবং কাগজ অতি পরিষ্কার। ২৪০ শ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকলের তুলনায় মূল্যও অধিক হয় নাই। এক টাকা মাত্র। পুস্তকের ভাষাও বেশ পরিপাট্য আছে। গল্পাংশও পরিস্ফুট হইয়াছে। মোটের উপর গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম প্রশংসনীয় বটে।

হিন্দুরঞ্জিকা, ১১ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

ইন্দুমতী—পুস্তক খানি যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। কাগজ বেশ, ছাপা পরিষ্কার ও উত্তম, বাঁধাই বিলাতী পুস্তকের মত।

ইন্দুমতী পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বর্ণনা ললিত, মূলভাব ও ভাবগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বেশ প্রাঞ্জল, পড়িতে পড়িতে ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইতে হয়। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ওরূপ নূতন ভাবে বর্ণনা আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্য কোথাও দেখি নাই। এরূপ বর্ণনা এ পুস্তকে বিরল নহে।

ইন্দুমতীর উপন্যাস অংশটী বেশ মধুর। সাধুরীর কথা পড়িতে পড়িতে আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। ইন্দুমতী ও শৈলের সঙ্গে সাধুরীর প্রথম সাক্ষাতের কথোপকথন কি প্রাণস্পর্শী! "আজ আমরা কদিন যাবৎ ভিক্ষার্থী হইয়াছি" ইন্দু এই কথাকয়টী কি করুণ ভাবেই!!! এই সাধুরীর যে স্থানেই পতা-বাউক না, সেই স্থানেই মিষ্ট বোধ হয়। আর একটী স্থান আমরা পাঠকবর্গকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি, নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ হইয়াছে, সন্দিগ্ধ কেন দৃঢ়নিশ্চয় জন্মিয়াছে; প্রতিবাদে অনল উদ্গীরণ করিতে করিতে, নরেন্দ্র আসিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ইন্দুমতী—অপাপবিদ্ধা ইন্দুমতী স্বামীর মুখ পানে দাঁড়াইয়া, ইন্দু যেই বজ্র বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ খণ্ডের মত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল! উঃ এই স্থানের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!! এই স্থানটী পড়িতে পড়িতে আমরা এক নূতন ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলাম। এরূপ দৃশ্য এপুস্তকে অনেক আছে। নরেন্দ্রের উন্মাদ দৃশ্যটী তত উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। গৌরমণির পাপের শাস্তি বেশ হইয়াছে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ১২ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

বিগত ১৩০১ সনের ৫ই আশ্বিনের বিক্রমপুর পত্রিকায় ইন্দুমতীর বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ :—

ইন্দুমতী— * * এরূপ সুন্দর বিলাতী ধরণে বাঁধা ও উৎকৃষ্ট কাগজে পরিষ্কার ছাপা বাঙ্গলা পুস্তকের ভাগ্যে অল্পই দেখা যায়। * * লেখক নায়ক নরেন্দ্রনাথের প্রেমভাব, * * সৌরমণির ষড়যন্ত্র, * * বড় লোকের বাড়ীর ভৃত্যের দ্বারা সময় সময় যে অনিষ্টসংঘটন হয়, তাহাও "দোষে-ঠাকুরের" চরিত্রে বেশ দেখাইয়াছেন। * * নায়িকা ইন্দুমতী ও তাহার সখী শৈলবালার পরস্পর অকৃত্রিম স্নেহোদ্ভূত সখ্যভাব অতি মনোহর। * * মাধুরীর চরিত্রে লেখক যে আতিথ্য প্রবণতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। * * সৌরমণির পাপের পরিমাণ ফলও বেশ বর্ণিত হইয়াছে। * * প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনেও গ্রন্থকার নিজের বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। * * * ফলতঃ পাঠক স্বয়ং এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাঁহার অর্থ ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না।

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত। গ্রন্থের ভাব মন্দ নহে, ভাব সুরুচি সঙ্গত।

সঞ্জীবনী, ৭ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার বিস্তৃত সমালোচনার কিয়দংশ;—

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। মুদ্রিত হইয়াছে "শিরালদহ" প্রেসে। ছাপা বড় ভাল হইয়াছে, বাঁধা আরও ভাল হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা। ইন্দুমতী পড়িয়া পাঠক পাঠিকারা তুষ্ট হইবেন। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় না হইলে, কাব্য নাটক নবন্যাস কিছুই হয় না। অগ্রে চাই প্রণয় তাহার পরিণয় না হইলেও ক্ষতি নাই, প্রণয় কিন্তু চাই। যশোদালাল দুইটী যুবকের সঙ্গে তাহাদিগেরই পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় ঘটাইয়াছেন। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় ঘটাইতে হইলে, স্থান কাল পাত্র যেরূপ আবশ্যক, যশোদালাল সেই-রূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেইরূপ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। * * যশোদালালের শ্রম জন্মিয়াছে বেশ। পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় হইয়াছে; পরিণয়ের পর প্রণয় গাঢ় হইতে না হইতে বিচ্ছেদ হইয়াছে। যেখানে প্রণয় সেখানেই খটকা। খটকাও লাগিয়াছে প্রণয়িনীর উপর প্রণয়ীর—বিবাহের পর—সন্দেহ জন্মিয়াছে। প্রণয়িনী গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন। প্রেমিকও অনুতাপে পাগল হইয়া দেশছাড়া হইয়াছেন। মণিহারা ফণীর মত ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন। শেষে আবার মিলন হইয়াছে। ওদিকে পাপের দণ্ড হইয়াছে। যাহারা সাধে বাদ সাধিয়াছিল, তাহাদিগের পাপোচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এদিকে দুঃখের পর আবার সুখ। পুণ্যের পরিণাম ফল। কিন্তু সয়্যালী পাতির সম্যাসে বাধা পড়িবে বলিয়াই, কি যশোদালাল মাধুরীকে সাপ দিয়া কামড়াইয়াছেন? আমাদের মনে হয়, মাধুরীকে বাঁচাইয়া রাখিলেও ক্ষতি হইত না। বোধ হয়, বিবিলিপির মাহাত্ম্য ঘোষণা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, ইন্দুমতী হইয়াছে ভাল। রচনা প্রাঞ্জল হইয়াছে। লেখকের বর্ণনা শক্তি বেশ আছে বলিয়া মনে হয়। নবীন পাঠকসমাজে ইন্দুমতীর নিশ্চিতই আদর হইবে।

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, ১৭ আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

REVIEW.—The author possesses literary abilities of no mean order and the got-up of the work is admirable.

HINDOO PATRIOT.

The 15th September, 1894.

INDUMOTI.—Well-printed and got-up, by Babu Jasoda Lal Talukder. As the name indicates it is a novel in Bengalee. The writer has considerable powers of delineating characters. The book will, we believe, prove interesting reading to those who like fiction.

AMRITABAZAR PATRIKA
The 20th September 1894.

সুলভ দৈনিকের বিস্তৃত সমালোচনার কিয়দংশ—

ইন্দুমতী—পুস্তক খানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। দেখিলেই না পড়িয়া থাকা যায় না। ছুঁইয়া হাতে করিয়া বসিতে ইচ্ছা করে। লেখকের লিখিবার শক্তি বেশ আছে, পুস্তকে "কবির বিয়ে" বেশ পড়িলাম। ইহার বর্ণনার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সামাজিক উপন্যাসে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা ইহাতে বেশ আছে। ইন্দুমতীর পতিভক্তি শিক্ষার জিনিস সন্দেহ নাই। পুস্তকে পড়িবার ও শিখিবার অনেক আছে।

সুলভ দৈনিক ২৪শে ভাদ্র, ১৩০১ সাল।

ইন্দুমতী—গ্রন্থকর্ত্তার ইহা নূতন উদ্যম। নূতন উদ্যমে তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, বলিয়া বোধ হইল। পুস্তক খানির ভাষা প্রাঞ্জল হইয়াছে। সময়ে যশোমান্ বাবু যজ্ঞ সাহিত্য-ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সোমপ্রকাশ। ২রা আশ্বিন ১৩০১ সাল।

INDUMATI—This is a tale of a domestic character, and dealing mostly with village life. Among such, might be picked out the figures dealing with the marriage of the poet (Chap V.) and the breaking of Dawn (Chap XXV.) One of the best features of the story is the style in which it is written.

THE INDIAN MIRROR, *2nd December 1894.*

ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থের ভাষার সরলতা ও মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে, স্থানে স্থানে কবিত্বের প্রতিফলন সমাবেশ হইয়াছে।

দ্বাদশখণ্ড, নব্যভারত, ১৩০১ সাল চৈত্র।

ইহা ভিন্ন HOPE, হিতবাদী, বঙ্গবাসিনজীবনী, সহচর, পূর্ণিমা, বাঁকুড়া দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকাতেও উৎকৃষ্টরূপে প্রশংসিত।

মূল্য—উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা কাগজের মলাট ৸৹ আনা, ভিঃ পিঃ ৵৹ ডাঃ মাঃ ৵০ আনা। কাগজের মলাটের বহি কেবল শ্রীহারাণ চন্দ্র কুণ্ডুর নিকট প্রাপ্তব্য।

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—শ্রীহারাণ চন্দ্র কুণ্ড, ১০ বিশ্বম্ভর মল্লিকের লেন, কুমারটুলী; ক্যানিং লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়) ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; মনোমোহন লাইব্রেরী কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জ্বর-প্লীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজার অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজস্ত্রীর বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু! বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-রমণী বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীর-ধর্ম্মানুরাগে সুতরাং, যাঁহার জ্বরভাবের উপক্রম হইয়াছে যাঁহার জ্বর ইহাতে বহু অনুসন্ধানে ... অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের পাঠে যথাযথ রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল ইহারই উপকরণ-সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার সুদূর মহারাষ্ট্র দেশ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু সন্তান মাত্রই যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সমুচ্চ আদর্শ ও ব্রত প্রাপ্ত হন, তাহাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। মূল্যাদির বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ. প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাশুল ⁄০ এক আনা।

"উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন সুরের লেন, গোয়াবাগান, সিমলা পোঃ, কলিকাতা;—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

চিকিৎসা-জগতে নূতন আবিষ্কার!

কুষ্ঠ ব্যাধি ও বাতরক্ত পীড়ার পরীক্ষিত মহৌষধ!

কুষ্ঠঘ্ন তৈল, বটিকা, মলম ও পুরিয়া।

যত দিনের এবং যে প্রকারের কুষ্ঠ কিম্বা বাতরক্তের পীড়া হউক, উপরি উক্ত কয়েক প্রকার ঔষধ নিয়মমত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আমার ঔষধে পারদ কিম্বা কোন প্রকার অপকারী পদার্থ নাই।

উক্ত বটিকা ও পুরিয়া সেবন করিলে, পারদ জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগও সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মলমে পারার ঘা, নালী ঘা ইত্যাদি সকল রকম ঘা আরোগ্য হয়।

বিশেষ সুবিধা।—৭৷৷০ টাকা অগ্রিম লইয়া দেড় মাসের ব্যবহারোপযোগী বটিকাদি পাঠাইব। প্যাকিং ও ডাকমাসুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ৪১ দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদি উপকার বোধ করেন, তবেই আমার প্রদত্ত ঔষধের মূল্য (অবশ্য অগ্রিম প্রদত্ত ৭৷৷০ টাকা বাদ দিয়া) পাঠাইবেন। রোগীর বয়স ও রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাকে জানাইতে হইবে। ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে অন্যান্য আবশ্যক বিষয় জানিতে পারিবেন।

এই ঔষধ সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরার" "অমৃতবাজার পত্রিকা", "হোপ", "হিন্দু পেটরিয়ট", "প্রকৃতি", "সঞ্জীবনী", "সুধাকর", "টি, বউন" প্রভৃতি দেশের গণ্য মান্য সংবাদপত্র সকল কি বলিয়াছেন, যদ্যপি জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে ক্যাটালগ্ দেখুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ্ পাঠাইতে পারি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রামাণিক, রাণাঘাট,

কিম্বা ১৭৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি।

ষষ্ঠ বর্ষের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ অবিলম্বে ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

যে সকল গ্রাহক এখনও পঞ্চম বর্ষের মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা শীঘ্র পঞ্চম বর্ষের বাকী ও ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া আমাদের উপকৃত করিবেন।

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন,
সিমলা পোঃ আফিস, কলিকাতা।

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কবিরাজ অভয়চরণ গুপ্ত কবিরত্নের

সুধাবটী।

২০ বটীকার এক কৌটা—১৲ এক টাকা। প্রতি ১২ কৌটা—১০৲ দশ টাকা।

ইহা পাচক, বিরেচক, রক্তপরিষ্কারক এবং বলকারক; সুতরাং শরীরের ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লাবণ্য ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহা আহার পরিপাক করিয়া মল নির্গত করে, অথচ জলবৎ ভেদ হয় না এবং শরীর বিকৃত করে না। আফিম ব্যবহারকারিদিগেরও বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোন পীড়ার উপক্রমে ২।১ দিন সেবন করিলে আর পীড়া হয় না। যে প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহা অল্পদিন সেবনেই সম্পূর্ণ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতে কুইনাইন কিম্বা অন্য কোন দূষিত দ্রব্য নাই। অন্যান্য ঔষধের ন্যায় অল্প দিন পরেই পুনরায় জ্বর হয় না। অম্লপিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব একেবারেই দূর হইয়া যায় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ডাক্তার, কবিরাজ ও বহুতর রোগীর প্রশংসাপত্র ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন।

অনেক সময় লেখার দোষে ঔষধ প্রেরণ করা হয় না। অতএব লেখা যেন জড়ান না হইয়া স্পষ্ট হয়। বিদেশস্থ মহোদয়গণ ব্যবস্থা ও ঔষধের অগ্র পত্র ও মনি অর্ডার আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত—কবিরাজ,
আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১নং নীলমাধব সেনের গলি, সানকীভাঙ্গা, কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন।

আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি, "কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।" আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে অবিলম্বে আপনার স্ত্রীর জন্য এক বোতল ক্রয় করুন। তিনি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আপনি যদি বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত না হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের আফিসে আসিয়া কুন্তলীনের নমুনা দেখিয়া যাইবেন। মনোনীত না হইলে ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। ইহাই "আমাদের নিবেদন।"

এইচ, বসু।

ম্যানুফ্যাক্চারীং পারফিউমার,
২৬ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩০২, অগ্রহায়ণ। ৮ম সংখ্যা।

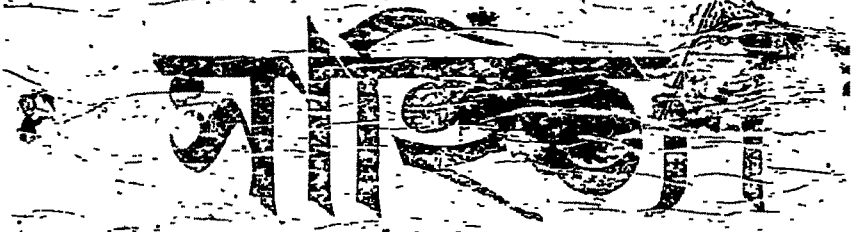

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এম্. এ. সি., এল্., শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীঅক্ষয় সেন, শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি. এল্, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীবর চক্রবর্ত্তী, এম্. এ., শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	৫০১	৮। সহযোগী সাহিত্য	৫৫২—৫৫৮
২। ভাইফোঁটা (চিত্র)	৫২০	৯। ইতিহাস	৫৫৯
৩। নাতিনী-সংবাদ (কবিতা)	৫২৯	১০। সাহিত্য	৫৬১
৪। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ	৫৩১	১১। জীবনচরিত	৫৬৮
৫। তিব্বত (ভ্রমণবৃত্তান্ত)	৫৩৫	১২। সমাজনীতি	৫৬৫
৬। সীতারাম	৫৪১	১৩। নবমালিকা (কবিতা)	৫৬৮
৭। বিদ্যাপতি	৫৫২	১৪। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৫৬৯
		১৫। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৫৭৩

কলিকাতা,
১৩৫।১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩৫।১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ চারি আনা।

শর্ম্মা কোম্পানীর জ্বরারির অপূর্ব্ব মহৌষধ।

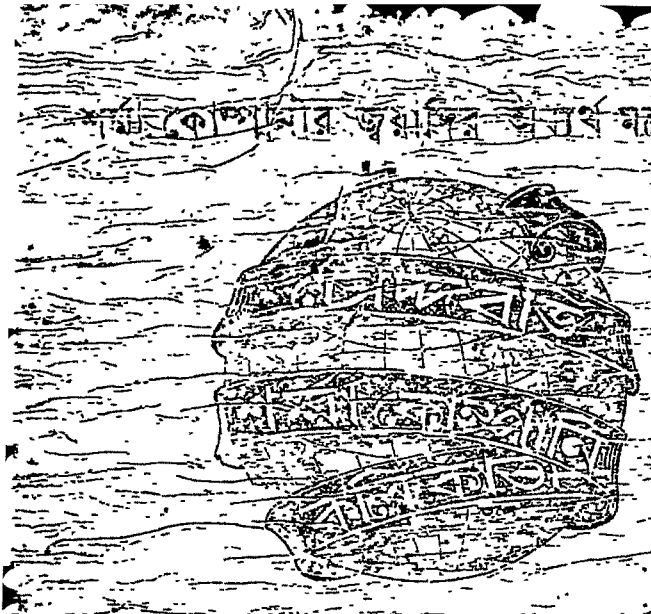

মূল্য প্রতিকৌটা ॥৵ আনা, ডাকমাশুল ।৵ আনা।

(একত্রে ১০ কৌটা পর্য্যন্ত ৷৹ মাশুলে যায়।)

১০০০০০ এক লক্ষ বড়ি বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধন, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই আজ "চোদ্দবড়ির" অত্যাশ্চর্য্য গুণে চমৎকৃত। আজ সকলেই "চোদ্দবড়ির" মুখে পুরাতন জ্বরের যে এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে, রোগ সত দিনের পুরাতন হউক না, ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ২।৪ দিনেই প্রকাশ পায়। প্লীহা, যকৃত প্রভৃতির পীড়ায় যেখানে কোন ঔষধ সুফল দেয় নাই, সেখানেও ইহার রোগনাশক ক্ষমতা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাইবে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণজ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, যাবতীয় চিকিৎসায় যাঁহারা সুফল পান নাই, তাঁহারা এই ঔষধের অপূর্ব্ব শক্তি পরীক্ষা করুন,—ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

প্রশংসাপত্র।—প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার প্রকাশিত চোদ্দবড়ি লইয়া গিয়া আমার এক স্ত্রীলোককে দিয়াছিলাম। তিনি ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতি দিন দুই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ প্রায় ৫ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "জীবনরক্ষক" পুস্তক বিতরিত হইতেছে। ৵০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকি।

শর্ম্মা কোম্পানী।

১৯ নং সেক্রেটারিয়েট লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

উপন্যাস লহরী

মাসে মাসে নূতন উপন্যাস।

প্রতিমাসে একখানি সম্পূর্ণ ও একখানি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

অর্থাৎ বৎসরে

বার-খানি ছোট ও

একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস।

তাহার উপর আবার

উপহার! উপহার! উপহার!

সে উপহারও যে সে পুস্তক নহে, সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস

কলঙ্কিনী মূল্য ১৲ এক টাকা।

আকার। উপন্যাস-লহরীর প্রতি সংখ্যায় অন্যূন ৬৪ পৃষ্ঠা থাকিবে,

বৎসরে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় "উপন্যাস লহরী" সম্পূর্ণ হইবে।

সুলভের চূড়ান্ত। সস্তার একশেষ।

অগ্রিম মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ও উপহারের খরচ।

সর্ব্বত্র বৎসরে দুই টাকা।

ভি, পিতে উপহার লইলে ২৷৵০ দুই টাকা দুই আনা মাত্র।

সম্পাদক বাঙ্গালার সেই সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আগামী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জেনুয়ারি ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

ঠিকানা—নিউ ক্যানিং প্রেস, ৪০ নং চুনাপুকুর লেন, চাঁপাতলা,

উপন্যাস-লহরীর পরিচয়।

উপন্যাস-লহরীতে কিরূপ উপন্যাস থাকিবে? ১ম সংখ্যা পাঠ করিলে ইহার কতক পরিচয় আপনারা পাইবেন। তবে এক কথায় এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহার সকল উপন্যাসই শিক্ষাপ্রদ হইবে। নায়কিক, সাংসারিক, ঐতিহাসিক এবং সত্য ও কল্পনামূলক বিচিত্র ঘটনা-পরিপূর্ণ সকল শ্রেণীর উপন্যাস, ইহাতে থাকিবে। এক বৎসরে এরূপ সুন্দর ছোট বড় মায় উপহার চৌদ্দখানি উপন্যাস। ব্যাপার বুঝুন!! মাসিকপত্রে উপন্যাসের এরূপ বিরাট আয়োজন বাঙ্গালায় এই প্রথম।

উপন্যাস-লহরীর মূল্যের পরিচয়।

মূল্য যে কিরূপ সুলভ, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। যদি ছোট (৫০ পৃষ্ঠার) উপন্যাসের মূল্য চারি আনা করিয়াও ধরা যায়, তবে বারখানায় মূল্য হয়, তিন টাকা। ইহা ব্যতীত উপহার ও একখানি বড় উপন্যাসের মূল্য প্রত্যেকের একটাকা ধরিলেও দুই টাকা হয়। তবেই চৌদ্দখানি উপন্যাসের মূল্যই একুনে অন্ততঃ পাঁচটাকা। আরো ডাকমাশুলের ব্যয়ও বৎসরে ছয় আনা লাগে। আমরা ৫।৵০ পাঁচটাকা ছয় আনার স্থলে কেবল মাত্র দুই টাকায় দিব। সুলভের আর বাকি কি?

উপন্যাস-লহরীর লেখকের পরিচয়।

লেখকেরও আর নূতন পরিচয় কি দিব? যে লেখনী হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন 'কনে বউ' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'প্রণয়-পরিণাম' 'বিমাতা' 'বড় ভাই' প্রভৃতি সর্ব্বজন-প্রশংসিত উপন্যাস সকল প্রসূত হইয়াছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাসই অধিকাংশ এই "উপন্যাস লহরীতে" প্রকাশিত হইবে, সুতরাং ইহার একখানি উপন্যাসও বাজে উপন্যাস নহে।

উপন্যাস-লহরীর প্রকাশের তারিখ।

প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখে নিয়মিতরূপে ইহা প্রকাশিত হইবে। কোন মাসিকপত্রই যে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহা বড় কলঙ্কের কথা। আমরা এই নিয়ম সম্বন্ধে বাধিব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি আগামী ১৫ই জেনুয়ারী প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

উপন্যাস-লহরীর উপহারের নিয়ম।

আমরা যেরূপ গ্রাহকসংখ্যার প্রত্যাশা করিতেছি, তাহাতে উপহার পুস্তক শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবার সম্ভব। সেই কারণ আমরা নিয়ম করিলাম আগামী শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, কেবল তাঁহারাই মায় উপহার দুই টাকায় পাইবেন। পরে মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

উপন্যাস-লহরী-কার্য্যালয়,
৪০ নং চনাপুকুর লেন,

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাকালীতৈল।

ব্রহ্মা গুরোর্বিশ্বজনীনমেতৎ উপাত্তমভ্যদ্ভুতশক্তি তৈলম্।
ধৃতজ্ঞতাপাশনিয়ন্ত্রিতোঽহং ভক্ত্যা ভজে তচ্চরণারবিন্দম্॥

এই সিদ্ধমহৌষধ—সর্ব্বপ্রকার বেদনার পক্ষে বড় রূপ; ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, পার্শ্বশূল, শিরঃপীড়া, চুল উঠা, চক্ষে, ঊর্দ্ধগজনিত চক্ষুরোগ, কর্ণশূল, কানের পূঁয, কানে তালা লাগা, বধিরতা, হৃৎস্পন্দন, ব্রন্‌কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসির বেদনা, আঘাতজনিত বেদনা, ফোলা ও যন্ত্রণা, সর্দ্দিজনিত গলার বেদনা, উদরাধ্মান, মেসেঁতা, পদ্মকাঁটা, দাদ, চুলকানি, খোস্, নানাবিধ ক্ষত, ব্রণ, অগ্নি অথবা অন্য কোনও উষ্ণদ্রব্যজনিত জ্বালা ও রক্তচুষিত দংশনের যাতনা নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয়। ইহা প্রত্যহ মাত্রেরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে রাখা নিতান্ত আবশ্যক; এই কারণে সাধারণের সুবিধার জন্য চারি আনা মূল্যের পর্য্যন্ত শিশির ব্যবস্থা করিলাম।

যাহারা বহুদিন শিরঃপীড়া, বাত ও কর্ণরোগের নিমিত্ত বহুমূল্য চিরপ্রচলিত তৈলাদি ব্যবহার করিয়া কোনও ফল পান নাই, তাহারা এই তৈল যথাবিধি ব্যবহার করিলেই, ইহার বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সন্তোষজনক পরিচয় পাইবেন।

মূল্য ১ ঔন্স্ সিসি ১৷৷০; ৪ আং সিসি ১, ২ আং সিসি ৷৷০; ১ আং সিসি ৷৷

মহাত্মপ্রসাদলব্ধ মহাকেশ্বর বটিকা।

সাদা আমাশয়, রক্ত আমাশয়, গ্রহণী ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৷০ ছয় আনা।

শ্রীচিন্তামণি শর্ম্মা। মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্

আফিস্—কলিকাতা লাইব্রেরি, ২৫ নং স্কুলিয়া ষ্ট্রীট।
আফিস্—মির্জাপুর মেডিক্যাল হল; ২৬ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, চীনাবাজার।
শ্রীযুক্ত নটবর পাল অ্যাণ্ড্ কোং; চীনাবাজার।
মহানন্দ বিশ্বাস অ্যাণ্ড্ কোং; ১১৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়; ৫ ভবানীচরণ বন্দ্যের লেন

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

নবদ্বীপ নগরে জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন দরিদ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। জগন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে বিশ্বম্ভর মিশ্রের জন্ম হয়। ইনি চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বাল্যকালে তাঁহাকে সকলে নিমাই বলিয়া ডাকিত। তিনি অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বন করিলে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর মিশ্র, অন্যথা নিমাই পণ্ডিত, অন্যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, তৎকালীন কতক লোকে একজন ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তিনি দেখিতে গৌরবর্ণ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কখনও কখনও তদীয় অনুচরেরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াও উল্লেখ করেন।

অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া এক্ষণকার কালেও যে একবারে অসম্ভব, তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে এক্ষণেও যে দুই এক জন অবতার না পাওয়া যায়, তাহা নহে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তমলুক মহকুমায় আমি এক কল্কি-অবতার দেখিয়া আসিয়াছি। মাণিককালী নামে একজন অতি ভয়ানকাকার কৃষ্ণত্বক্ গোদা কুম্ভকার জলামুঠা পরগণায় আপনাকে কল্কি অবতার বলিয়া খ্যাপন করিলে, তাহার দুই-তিন সহস্র শিষ্য তাহাকে তদ্রূপ বলিয়া পূজা করিয়াছিল। বিশ্বম্ভর মিশ্রের অন্ততঃ গৌর-বর্ণ ছিল, জলামুঠার কল্কিমহাশয়ের তাহাও নাই। আবার সে দিন দেখিতে দেখিতে ঈশ্বর না কি পরমহংস সাজিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, শুনিতে পাই।

অতঃ একবারে অসম্ভব না হইলেও, এক্ষণে ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষিত সমাজে ঈশ্বরের কাচ কাচা কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশ যখন মুসলমান রাজত্ব বা অরাজকের অধীন ছিল, যখন প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার জ্যোতিঃ দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছিল, যখন ব্যাকরণ পড়িয়া লোকে পণ্ডিত হইত, এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন কুজ্ঝটিকায় স্থাণু যেমন মনুষ্য বলিয়া অনায়াসে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ

অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে মনুষ্যকেও ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি হওয়া ততদূর অসম্ভব ছিল না। বিশ্বম্ভর মিশ্রের জীবনবৃত্তান্তে আমরা সেই অতীতের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। অদ্য আমরা সেই চিত্র কীদৃশ, তাহারই কিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাঙ্গলা দেশে ইংরেজাধিকার অদ্য দেড় শত বৎসরেরও অধিক হয় নাই। এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে নূতন রাজার প্রতাপে নূতন সভ্যতার সংঘর্ষে এদেশে কিরূপ সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রামমোহন আবির্ভূত হইয়া গৌরাঙ্গকে একবারে না হউক, অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। যে সমাজবিদ্রোহীর দল বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গপদবীর অনুসরণ করিয়াছিল,—তাহারা আর

"হরের্নাম হরের্নাম-হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অদ্য এ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত নহে। কেবল 'নাম ভজ, নাম জপ' এ বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা হরিভক্তিকে দোষ বলিয়া মনে করেন, ভক্ষ্য দ্রব্যকে আত্মরুচির শেষ সীমা অবধি টানিয়া লইয়া যাইতে চান, এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মকে ভ্রান্ত ও ব্রাহ্মণপন্থাকে অসৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, রাধাকৃষ্ণের নামেও তাঁহাদের হুঙ্কার উপস্থিত হয়। মহরমের দেখাদেখি যে সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি, সে সঙ্কীর্ত্তনের যুগ বোধ করি চলিয়া গেল। এখন গির্জ্জায় খ্রীষ্টভজনার অনুকরণে নূতন ব্রাহ্ম উপাসনার যুগ উপস্থিত। দেড় শত বৎসরের মধ্যেই এই ব্যাপার। প্রায় ত্রিশতবর্ষব্যাপী মুসলমান অধিকারের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা পাঠককে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়র খিলজীর পাঠানেরা নবদ্বীপ ও গৌড়রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া এ দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। তাহারা আর এ দেশ হইতে চলিয়া গেল না। তাহাদের ঔরসে এদেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে মুসলমান প্রজার উৎপত্তি আরম্ভ হইল। অনেক লোক তাহাদের বলপ্রয়োগে জাতি হারাইয়া মুসলমান হইল; অনেকে বা মুসলমান হইলে লাভ আছে দেখিয়া মুসলমান হইল; দুই এক জন বা প্রতিমা ও নানা দেবদেবীর পূজা বাস্তবিকই পাপ মনে করিয়া আল্লা ও তাঁহার নবির শরণাগত হইল। এইরূপে দেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে হিন্দু

অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চ শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যেরাও অনেকে ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। উত্তর বঙ্গেই এই ঘটনা সমধিক ঘটিয়াছিল। বৈদ্যজাতীয় রাজা গণেশের পুত্র মহারাজ যদুসেন, মুসলমানদের রাজা হইয়া মুসলমান হওয়াই শ্রেয় বিবেচনায়, সুলতান জেলালুদ্দীন নাম ধারণ করিলেন, এবং তিনি এক জন গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দুদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। বিবেচক ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রশান্ত সাত্ত্বিকধর্ম্মের সহিত বিজেতা দস্যুদলের প্রচণ্ড রাজসিক ধর্ম্মের তুলনা করিয়া তাহাতে বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাইলেন না। মুসলমানদের দাম্ভিকধর্ম্মের যথেচ্ছাচার এবং জীবহিংসা, বিশেষ গোহত্যা, তাঁহাদের চক্ষে অতীব হেয় বিবেচিত হইত। মুসলমানদিগকে বাহুবলে বলীয়ান্ দেখিয়াও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-অনুচরেরা তাহাদের আচার ব্যবহার জঘন্য বলিয়া তৎপ্রতি পরাঙ্মুখ থাকিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম-পন্থী ও মহম্মদ-পন্থীদের মধ্যে বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। মুসলমানেরা ব্রাহ্মণদিগকে হিন্দু ও 'কাফের' বলিয়া অবজ্ঞা করিত; ব্রাহ্মণেরাও তেমনি তাহাদিগকে 'ম্লেচ্ছ' ও 'নীচ' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু ম্লেচ্ছ ও 'নীচ' দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তাহারা মনে করিলেই ব্রাহ্মণের মন্দির ভাঙ্গে, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করে ও জাতি লয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রতিশোধ দিতে বা প্রতীকার করিতে অক্ষম। অনেক শ্রেষ্ঠ কুলীন পরিবারেও যবনসংস্পর্শদোষ পঁহুছিতে লাগিল। দেশে এক প্রকার হাহাকার পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণদের চক্ষে কলি-যুগ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল; অমানিশার অন্ধকারের ন্যায় দেশব্যাপী বিষাদের ছায়া চারি দিক ছাইয়া ফেলিল; সুখ দুঃখের সংসার ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে যেন বিমিশ্র ক্লেশের আগারে পরিণত হইল; লোকের মন উদাসীন ও বৈরাগ্যপ্রবণ হইল। এইরূপ বিশ্বাসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-সমাজ কি প্রকারে রক্ষা পাইল, ইহাই বিচিত্র।—ফলতঃ রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু যে প্রজ্ঞা ও পৌরুষ মানবের অভ্যুদয়ের মূল কারণ, তাহার প্রভাব দিন দিন উপক্ষীণ হইতে লাগিল। বখ্‌তিয়ারের আগমনের তিন শত বৎসর পরে ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত বাঙ্গালী সমাজ, মৃত না হইলেও, মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াসসাহী বংশের শেষ রাজা ফতেশাহ বাঙ্গলার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে, ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, হাবসীরা

শকাব্দে) নিমাই পণ্ডিতের জন্ম হয় বলিয়া কথিত আছে। এই রাজা স্বীয় হাব্‌শী সৈন্যগণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার রাজপুরীর প্রধান খোজা বারিক সুলতান সাহজাদা উপাধি ধারণ ও তদীয় সিংহাসন অধিকার করিল। রাজ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পর মুক্ত-আওীন নামে হাব্‌শী সেনাপতি বারিকের প্রাণ সংহার করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সুলতান ফিরোজশা হাব্‌শী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। তৎপুত্র মামুদশাও বিদ্রোহী ভৃত্যের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। এই ভৃত্যের নাম সিদ্দী বদরদিওআনা। তাহার প্রকৃতি রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ ছিল, এবং তদীয় অত্যাচারে দেশশুদ্ধ লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন নিমাই পণ্ডিতের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন সৈয়দ হুসেন নামক বদরদিওআনার প্রধান অমাত্য বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচারী প্রভুর প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বয়ং তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং কিছু কালের জন্য বাঙ্গলা দেশে শান্তি পুনঃসংস্থাপিত করেন।

চৈতন্যের বাল্যে এই সকল লোমহর্ষণ যুদ্ধবিপ্লব সংঘটিত হয়। কিন্তু তদীয় ভক্ত জীবনচরিত-লেখকেরা তাহার কোনও উল্লেখ করেন না। ফলতঃ, চৈতন্যের জীবনের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই সকল ঘটনার কোনও বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। তবে দেশে এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ অরাজক অত্যাচার ও দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ জন্মিয়াছিল, জানা যায়। চৈতন্যের ভক্ত জীবনচরিত-লেখকেরা তাঁহার জন্মকালে যে-সকল সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা। তিনি হরিনাম সঙ্গে লইয়া ভূমিষ্ঠ হউন বা না হউন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব ও জনপদপীড়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সৈয়দ হুসেন রাজা হইয়া সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহা নামে বিখ্যাত হয়েন। ইনি এক জন অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইহার জীবনবৃত্তান্ত তাদৃশ পরিস্ফুটরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি সৈয়দ-বংশোদ্ভব হইয়াও বাল্যে একজন ব্রাহ্মণের গরুর রাখালমাত্র ছিলেন।—তজ্জন্য উত্তরকালে তিনি রাখাল বাদসা নামে পরিচিত হয়েন। আজিও মালদহ জেলায়—যথায় তাঁহার রাজধানী ছিল,—তাঁহাকে এই নামে উল্লিখিত হইতে শুনিয়াছি। তৎপ্রদেশে তাঁহার নাম আজিও সমধিক বিখ্যাত। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, তাঁহার পিতা একজন সৈয়দ-বংশীয় দরিদ্র

মুসলমান ছিলেন; এবং কোনও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় জাতিভ্রষ্ট গর্ভধারিণী সহায়হীনা হইয়া পড়িলে, হুসেন স্বগ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে গরুর রাখালিতে নিযুক্ত হয়েন। নতুবা সে সময়ে খাঁটি সৈথ বা সৈয়দের বেটা যে ব্রাহ্মণের গরুর রাখালি করিবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। মুসলমান-সংসর্গে তৎকালে অনেক স্ত্রীলোকের জাতি যাইত। এবং ঈদৃশ অবস্থায় হীনজাতীয় দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা উভয় সমাজেরই এক প্রকার বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইত। ফলতঃ ত্রিশতবর্ষব্যাপী মুসলমান রাজত্বের ফলে এ দেশে এক জাতীয় নীচ মুসলমানের উৎপত্তি হয়। রাখাল হুসেন প্রথমে এইরূপ এক জন নীচ মুসলমান ছিলেন। এই শিশুর ললাটে বিধাতা কিরূপ সমৃদ্ধি লিখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে রাখালি তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আপনাকে এক জন সৈয়দের বেটা বলিয়া চিনিতে পারিলেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে নানা উচ্চ আশার প্রভাব বিস্তৃত হইল। তিনি গ্রাম ছাড়িয়া তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ বা সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজসরকারে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, হুসেন রাজধানীতে আসিয়া এই সুবুদ্ধি খাঁয়ের অধীনে কোনও এক সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েন। সুবুদ্ধি খাঁ একটি জলাশয় খনন করাইতেছিলেন, হুসেন তাহারই তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার কোনও দোষদর্শনে রুষ্ট হইয়া, তদীয় প্রভু তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে কঠিন বেত্রাঘাত করেন; হুসেন যখন রাজা হয়েন, তখনও তাঁহার শরীরে এই বেত্রাঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এইরূপ দুরবস্থা হইতে তিনি ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকেন। চাঁদপুরের এক কাজী সাহেব তাঁহার পরিচয় পাইয়া, অর্থাৎ তাঁহাকে সৈয়দের পুত্র জানিয়া, আপন কন্যা দান করেন; এবং ইহার পরই তাঁহার উন্নতির দ্বার অপাবৃত হয়। হিন্দুর পক্ষে জাতি ও কুল যেরূপ উন্নতির বাধাদায়ক হয়—মুসলমানের পক্ষে তদ্রূপ হয় না। মুসলমান মাত্রেই সমান। দাসত্ব হইতে সিংহাসনে হাত বাড়াইলেই মুসলমানে অনেক সময়ে পায়। তিনি ভদ্রসমাজে স্থান পাইয়া ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন; এবং স্বীয় বুদ্ধি ও শৌর্য্য বলে গৌরবান্বিত হইয়া অবশেষে রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হয়েন। ইহাতে তাঁহার ঈদৃশ দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রধান অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হয়েন।

কোন রাজার আমলে তিনি প্রথমে প্রধান অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঠিক জানা যায় না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ে রাজধানীতে ঘোরতর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপ সময়ে প্রতিভাশালী দক্ষ লোকের উন্নতির বড় সুবিধা। বাপের বেটা হইয়া কেহ এমন সময়ে বড় কক্ষে পায় না। জমীদারের ছেলে দেখিতে দেখিতে লুটপাটে এক দিনে দরিদ্র হইয়া যায়; দরিদ্রের পুত্র সৌর্য্যবীর্য্যশালী হইলে দলের নেতা হইয়া এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইয়া উঠে। হুসেনের ভাগ্যেও তাহা ফলিয়াছিল। তখন কে কবে রাজা হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা এক জনকে বা সিংহাসন দিতেছিল, এক জনকে বা সিংহাসন হইতে টানিয়া ফেলিতেছিল। হুসেন সম্ভবতঃ সৈনিকবেশে রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপন পৌরুষ দেখাইয়া নায়কের পদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং নায়ক হইতে অমাত্যের পদ লাভ করেন। যাহা হউক, সিদ্দী বদরদিওআনা যে সময়ে রাজা ও সৈয়দ হুসেন তাঁহার প্রধান অমাত্য, তখন রাজার নৃশংস অত্যাচারে উদ্বেজিত হইয়া রাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান লোকে প্রধান অমাত্য হুসেনের শরণাপন্ন হয়। হুসেন নিজে উৎপীড়ক বা অন্যায়কারী ছিলেন না;—প্রভুর উৎপীড়ন ও অন্যায় কার্য্য দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকিবে।—অবশেষে ঈদৃশ প্রভুকে বিনাশ করিয়া তাঁহার স্থান অধিকার পূর্ব্বক অত্যাচারের স্রোত নিবারণ করা হুসেনের চক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দেশের অনেক লোকে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল।—হুসেনের সেনা গৌড় নগর অবরোধ করিল।—সিদ্দি বদর দিওআনাও সৈন্য সামন্ত লইয়া সম্মুখসংগ্রামে অগ্রসর হইল, এবং এক ভীষণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র লোকের সহিত ধরাশায়ী হইয়া নিজ প্রাণবায়ু আকাশে উড়াইয়া দিল।

ইহার পর, যে সকল সৈনিকের সাহায্যে হুসেন সিদ্দি বদরদিওআনাকে পরাস্ত করিলেন—তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে, হুসেন তাহাদের অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনার প্রভুশক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন। লোকে দেখিল, তিনি রাজার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন। তাঁহার ক্রোধ যেমন ভয়ঙ্কর, তাঁহার প্রসাদ তেমনি শুভঙ্কর। তিনি যথাস্থানে দণ্ড ও দান মান বিস্তার করিয়া আপন সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিলেন। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। অরাজকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া

তাঁহার সুশাসনে হিন্দু মুসলমান শান্তি সুখ ভোগ করিতে লাগিল। হুসেন সাধু মুসলমানের ন্যায় হিন্দুর মন্দির ভগ্ন ও দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিতে বিরত ছিলেন না। প্রত্যুত, তাহা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। সে সময়ে তাহা অত্যাচার বলিয়াই গণনীয় ছিল না।—হিন্দুদের বহুকাল 'গা-সওয়া' হইয়া গিয়াছিল।—কিন্তু তিনি হিন্দুদের উপর হিন্দু বলিয়া বিশেষ বিদ্বেষবান্ ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি আপন বাল্য-প্রভু ব্রাহ্মণকে এক জমীদারী প্রদান করেন, এবং তিনি অনেক হিন্দুকে ভাল ভাল চাকুরিও দিয়াছিলেন। ফলতঃ, রাজস্ববিভাগের কার্য্য হিন্দুরা যেমন বুঝিত—মুসলমানেরা তেমন বুঝিত না। তাহাতে হুসেনের পূর্ব্ব হইতেই রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কার্য্যে হিন্দুরা নিযুক্ত হইত।—কিন্তু পূর্ব্বের বিদ্রোহবার্ত্তা স্মরণ করিয়া হুসেন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। রাজবাটীতে তাঁহার এক দল শরীররক্ষক রাজপুত বা দেশোআলী সৈন্য ছিল, এবং কেশব ছত্রি নামে এক জন ক্ষত্রিয় তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। মাধাইপুরের এক জন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি আপন "দবিরখানা" বা Private Secretaryর পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহারই ভ্রাতা আর এক জন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সাকর মল্লিক উপাধি দিয়া আপন সভাসদ্ করেন। এই দুই ভ্রাতা হুসেন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ্য ত্যাগ করিয়া যবন হয়েন, এবং প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন; হুসেন তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দবিরখানাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সাকর মল্লিক পলাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। এই দুই ব্যক্তি রাজসম্মান রাজপ্রসাদ হারাইয়া,—এক্ষণে জাতিচ্যুত হইলে লোকে যেমন ব্রাহ্ম হয়,—তদ্রূপ বৈষ্ণব হইয়া, গৌরাঙ্গের দলে প্রবিষ্ট হয়েন; এবং এক জন সনাতন গোস্বামী ও অপর জন রূপ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। "গা হারালেই বৈষ্ণব" এই যে একটী কথা অস্মদ্দেশে জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ঘটনাবলীই তাহার মূল।

হুসেনের এক সময়ের মনিব সুবুদ্ধি রায় কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই; যথা:—

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী। দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব কৈল।
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী। ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।

পাছে যবে হুসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল। প্রভু কহে ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইল॥ নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারনের চিহ্নে। এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥ আর নাম লইতে কৃষ্ণের চরণ পাইবে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা। রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
তাঁহারে মারিব আমি তার নহে কথা॥ প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মরিবে। কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা। মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
করোয়ার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা॥ প্রভুর লাগে না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা। রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥ পাঁচো পয়সা হয় একেক বোঝাতে॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে। আপনা রহে এক পয়সায় চাবনা খাইয়া।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥ আর পয়সা বেনিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়। দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে তাঁরে করান ভোজন।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥ গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা। রূপ গোঁসাঞি আসি তাঁরে বহু প্রীত কৈল।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥ আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইল॥”

বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী যাহা শুনিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবনিন্দা যমদণ্ডের হেতু বিবেচনা করিতেন। সুতরাং তদীয় বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা করা যায় না। হুসেন সাহার ন্যায় রাজা স্ত্রীর কথায় যে ঈদৃশ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। সুবুদ্ধি খাঁ বা সুবুদ্ধিরায়ের প্রকৃত নাম সুবুদ্ধি ভাদুড়ী। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। ইনি ভাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর দুই পুত্রের নাম জগদানন্দ ও কেশব। ইহারা যথাক্রমে জগদানন্দ রায় ও কেশব খাঁ নামে বিখ্যাত। (১) সুবুদ্ধি রায়ের পরিবারে আলিয়ারখানী নামে যবনদোষ ঘটে। (২) কি কারণে এই দোষের উৎপত্তি হয়, তাহা জানা যায় না। কুলজ্ঞেরা লিখিয়া গিয়াছেনঃ—“আলিয়ার খান যবন সুবুদ্ধি রায়কে দণ্ডবান করিয়াছিল।” ইহার অর্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। আলিয়ার খাঁ কে, তাহাও জানা যায় না। হুসেন সাহার সহিত এই বিবরণের কি সম্পর্ক, তাহাও জানা যায় না। তবে কৃষ্ণদাসের বিবরণের সহিত উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে এইরূপ বিবেচনা হয় যে, হুসেন সাহা রাজা হইয়া প্রথমতঃ সুবুদ্ধি রায়কে খুব বাড়াইয়াছিলেন,

(১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ; ১৭৯ পৃঃ। (২) গৌড়ে ব্রাহ্মণ; ১৬৯ পৃঃ।

কিন্তু তাঁহার কোন দোষ দেখিয়া অবশেষে হুসেনের আজ্ঞায়, আলিরাখাঁ নামক হুসেন সাহার কোন মুসলমান কর্ম্মচারী সুবুদ্ধি রায়ের অপমান করে, এবং তাহাতে তাঁহার জাতি যায়, এবং নিগৃহীত হইয়া তিনিও গৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হয়েন। বোধ হয়, সাকর মল্লিক, ওরফে রূপগোস্বামীর পলায়নের পর সুবুদ্ধি রায়ের লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। কেন না, রূপের দ্বাদশ বন চিনিবার পর সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, প্রকাশ পায়।

ফলতঃ, গৌরাঙ্গ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন লোকের ধনমান বড়ই অস্থির ছিল। অবস্থাচক্র সে সময়ে বড়ই প্রবল বেগে ঘূর্ণ্যমান ছিল। আজ যে ব্যক্তি রাজা, কাল সে ব্যক্তি পথের ভিখারী; আজ যে ব্যক্তি সম্মানিত, কাল সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হইত। সাংসারিক সমৃদ্ধির ঈদৃশ অস্থিরতা দেখিয়া বৈরাগ্যমার্গই অনেকের চক্ষে প্রশস্ত বোধ হইত। মুসলমান রাজত্বে আইন কানুনের বড় একখানা চলন ছিল না। যেখানে যে বলসঞ্চয় করিতে পারে, সেখানে সেই রাজা। দেশাধিপতিরা মনে করিলেই লোকের সর্ব্বস্ব লুট করিতে পারিত। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া চিরকালই তাঁহার অপবাদ আছে।—রাজ্যে কখন বা অরাজক, কখন বা যথেচ্ছাচারবশতঃ সে সময়ে তিনি কিছু অধিক চঞ্চলা হইয়াছিলেন। উচ্চপদ লাভ করিতে পারিলে, অধিকারী যে তাহা নিরাপদে দীর্ঘকাল ভোগ করিবেন, তাহার আশা কিছু কম ছিল।—To make hay while the sun shines,—ইহাই কর্ম্মচারীদের হৃদয়ের গুপ্ত বাসনা ছিল। এইরূপ অবস্থায় পদস্থ ব্যক্তিরা যত শীঘ্র সম্ভব অর্থসঞ্চয় করিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেন, এবং অনেকে দবিরখানা ও সাকর মল্লিকের ন্যায় ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইতেন।

রাজ্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের দশা কিরূপ ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এখন আর হিন্দু রাজা নাই যে, ব্রহ্মত্র দিয়া ব্রাহ্মণের বিদ্যার সম্মান করিবে।—হিন্দু রাজত্বের সামন্ত রাজারা এই সময়ে জমিদারে পরিণত হয়েন। এই জমিদারীও বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারেরা প্রায়ই লুণ্ঠিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন। ইহারাই ব্রাহ্মণদের উপজীব্য হইয়া ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করা ইহাদেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।—স্মৃতিশাস্ত্র পড়িলে অগ্রে রাজার সভা-পণ্ডিত ও ধর্ম্মাধিকরণিক হওয়া যাইত; বেদ পড়িলে ঋত্বিক ও পুরোহিত হওয়া যাইত। সে সব পথ

এখন একবারেই রুদ্ধ। এখন যদি কাহারও গরু-গলায় দড়ি দিয়া যবে, তবেই স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের কিঞ্চিৎ তৈলবট লাভ হয়, এবং বিবাহে বা শ্রাদ্ধে পুরোহিতের যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্য। এখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য পড়িবার প্রয়োজনাভাব। এখন রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সুক্কণ্ঠনের আবশ্যকতা হইয়াছে। সুতরাং কেবল বাননাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের দশা উত্তরোত্তর হীন হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যার পুরস্কার ও গৌরব কম, সুতরাং অনুশীলনও কম।

ফলতঃ, এই সময়ে বিদ্যা বংশ ও ব্রহ্মচর্য্যের কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অস্মদ্দেশে কিঞ্চিৎবিদ্রূপসংযুক্ত একটি কবিতা প্রচলিত আছে; তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবি যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিতাটি এই:—

"চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুই নিমে তার নাম। মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
রংযা বেটী নোটাবুদ্ধি ঘটে কত্তে খায়। এই কালে রাঢে বলে পড়ে গেল ধুম।
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। বড় বড় ঘর সত হইল নির্ধূম।
ত্রিবিলার পঞ্চধর দ্বারে করে সাথ। কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যানে বলে।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ। সেই ছোঁড়া গনে ফবে কুলে কত্তে ভাগী।
কাপার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত্ত। তদবধি কুলে আছে দরিদ্রের দাগ।
প্রাচীন স্মৃতির নত নন্দা হাতে গত। দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় গায়।"

গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ অতীব দরিদ্র ছিলেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে এই কথাই লেখা আছে; কিন্তু কিরূপে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত, তাহা লিখিত হয় নাই। জানা যায়, জগন্নাথের নিজের টোল ছিল না; কেন না, অন্যের টোলে গৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে, জগন্নাথ একজন ব্যবসায়ী অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন না। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট, এবং তাঁহার পিতার নাম কুবের মিশ্র। কুবের মিশ্রের সাত পুত্র; জগন্নাথ তাঁহাদের অন্যতম। সম্ভবতঃ। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং পিতার তাদৃশ বিষয় বৈভব না থাকায়, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই বসবাস করেন।

দরিদ্রের অনেক সন্তান কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। অন্নবস্ত্রের কষ্টের মধ্যে শিশুজীবন শীর্ণ, রুগ্ন ও কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহা সচরাচর দেখা যায়। জগন্নাথ এবং শচীরও অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হইয়া মরিয়া

গিয়াছিল। কেবল দুইটি সন্তান রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বড়টির নাম বিশ্বরূপ ও ছোটটির নাম বিশ্বম্ভর। অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে বলিয়া, যমের মুখে ভিক্ত বোধ হইবে বিবেচনায়, প্রতিবেশিনীরা শেষ পুত্রটির নাম রক্ষা করিলেন,—"নিমাই।" এই সরল বিশ্বাস আজিও আমাদের পুরবাসিনীদের কোমল হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই।

বিশ্বম্ভর অপেক্ষা বিশ্বরূপ বয়সে অনেক বড় ছিলেন। পিতা মাতার সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই দেখিয়া, নিমাইএর শৈশবেই বিশ্বরূপ বিবেকী হইয়া বাহির হইয়া যান। পুত্রকে এইরূপে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাদের ক্রন্দনে শিশু নিমাইএর হৃদয়ও যে ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ আচরণ অবশেষে তাঁহারও আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, এবং তিনিও অবশেষে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যান। তদ্বিবরণ পরে সবিস্তার আলোচিত হইবে।

সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বিবেচনা হয় যে, উপভোগের জন্যই ঈশ্বর আমাদের জীবনের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবন অতি উৎকৃষ্ট আনন্দময় পদার্থ; তবে ইহা মধ্যে মধ্যে ক্লেশেও দগ্ধ হইয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, জীবনের আনন্দ আমাদের প্রযত্নে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং ক্লেশ আমাদের প্রযত্নে হ্রাস হইতে পারে। অতএব সমীচীন পদ্ধতি অনুসারে, কিসে আমাদের জীবন অপেক্ষাকৃত মধুময় ও ক্লেশবিহীন হইবে, ইহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হওয়াই আমাদের পৌরুষ এবং মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, ইহাও স্বীকার্য্য যে, যাহাকে আমরা জীবন বলি, তাহা অনন্তকালস্থায়ী নহে। ইহার পূর্ব্বেও একটা জীবন ছিল, পরেও একটা আছে। পূর্ব্বে কি ছিল ও পরে কিরূপ হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই।—তবে পরজীবন যে এই জীবনেরই অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থা, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং এ জীবনে যাহা বিশুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া গণ্য, পরজীবনে তাহারই উপায়সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

তদনুসারে আমাদের দীর্ঘদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, জীবনের এই চতুর্ব্বিধ লক্ষ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই জীবনে যদি অকর্ত্তব্যের পরিহার ও কর্ত্তব্যের আচরণরূপ ধর্ম্মসঞ্চয়, অর্থলাভ, এবং অভিলাষের তৃপ্তির সহিত মোক্ষের অনুশীলন না করা হইল, তাহা হইলে বেদপন্থীদের সমীচীন বিবেচনায় জীবন ব্যর্থ।

গৃহস্থাশ্রম ব্যতিরেকে সর্ব্বসামঞ্জস্যে এই চতুর্বর্গসাধনের উপায়ান্তর নাই। অতএব সন্ন্যাসীদের জীবন ব্যর্থ। পিতামাতার শুশ্রূষা, পুত্রকন্যার লালন-পালন, উপযুক্তরূপ শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠন, জীবনের পরম ধর্ম্ম। দাম্পত্য-প্রীতি জীবনের উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু। সন্ন্যাসী এ সকলেই বঞ্চিত। বৈধ-ভাবে অর্থ কাম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে অবৈধভাবে অনেক সময়ে তাহার সেবা করিতেও দেখা যায়।

সন্ন্যাসী যদি গাছের পাতা খাইয়া বন্য পশুর ন্যায় থাকিতে পারে, তবে সমাজের গলগ্রহ বলিয়া নিন্দনীয় হয় না, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাদৃশ নিন্দার ভাজন হয়। সে কাহার জন্য জীবনের ভার বহন করে, তাহা স্পষ্ট নয়। অন্য লোকে কেন যে তাহার উদরান্ন অর্জ্জন করিয়া দিবে, তাহাও সুব্যক্ত নয়। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই সন্ন্যাসের দোষ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের সমাজে, অন্ততঃ আধুনিক সমাজে, সন্ন্যাসী পূজ্য। ফলতঃ, শাস্ত্রে, মনুষ্য যখন অকর্ম্মণ্য হয়, তখন সন্ন্যাসের বিধান আছে, কিন্তু তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া শাস্ত্রে চিরকালই নিন্দনীয়,—অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রে।—বৌদ্ধেরা এই শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া তরুণ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীর দল বাড়াইয়া গিয়াছে।—তদবধি এ দেশে আর্য্যবিগর্হিত সন্ন্যাসের বাড়াবাড়ি।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইল, শুকাইয়া গেল। তিনি জীবন্মৃত হইলেন। তাঁহার জীবনের যবনিকা এইখানেই নিপতিত। শিক্ষার দোষে, সময়ের দোষে, যেমন একটি ফুল প্রস্ফুটিত না হইয়া বৃন্তে শুষ্ক হইয়া যায়, এইরূপে তাঁহার জীবন বিকশিত হইতে না পারিয়া তেমনি শুকাইয়া গেল।

কেন বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলেন?—তিনি দেখিলেন, সংসারে সুখ নাই। জনক জননী অনবরত প্রপীড়িত, ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি অকালে মরিয়া গেল। নিজে ভাল খাইতে পান না, ভাল পরিতে পান না,—মান নাই, সম্ভ্রম নাই; দরিদ্র বলিয়া লোকে অবহেলা করে। এমন জীবনে সুখ কি? বিবাহ করিলে পিতা মাতার ন্যায় তাঁহারও একটি কষ্টের সংসার উৎপন্ন হইবে। তাহা অপেক্ষা তিনি ভাবিলেন যে, সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল—তাহাতে গৃহীর দ্বারে গেলেই উদরান্নের উপযুক্ত ভিক্ষা মিলে, লোকে ভক্তিও করে।

বিশ্বরূপ যদি বেদপন্থার উপদেশ শ্রবণ করিতেন, তবে তিনি জানিতেন

যে, বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জনপূর্ব্বক যৌবনে গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসী হইলে তাহাতে দোষ আছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে যদি তাঁহার উদরান্ন না জুটিত, তবে তাঁহার পক্ষে প্রথমে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, পরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনীয় ছিল। তিনি সন্ন্যাসী না হইয়া যদি সৈনিক হইতেন, তবে আমরা প্রীত হইতাম, এবং তাঁহার জীবনকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিতাম। তাহাও অসম্ভব হইলে, যদি কৃষি বা বাণিজ্য অবলম্বন করিতেন, অথবা শিল্পের অনুশীলনে নিযুক্ত হইতেন, যে কোন রূপে—সমাজের প্রয়োজনীয় কোনও একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতা মাতার শুশ্রূষা করিতেন, এবং তাঁহাদের অন্নকষ্টমোচনের উপায় করিতেন, তাহা হইলে প্রীত হইতাম।

বিশ্বরূপের জননী বৃথাই তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। সন্তান পিতামাতার যত্নে, বিশেষ দরিদ্র পিতামাতার কষ্টের অন্নে লালিত হইয়া এই কবিল—য, বাপমাকে কাঁদাইয়া এ অসময়ে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভক্ত বৈষ্ণবেরা যাহাই বলুন, ঈদৃশ ব্যবহার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। ভাগবত পড়িলে যদি এমন ফল ফলে, তবে তাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দাও!

পরান্নপুষ্ট অনাতুর সন্ন্যাসীরা স্বাবলম্বনে পরাঙ্মুখ বলিয়া ভদ্র ও শিষ্ট সমাজে কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবারই পাত্র। যখন ইহাদিগকে ভিক্ষার জন্য কপটভাব ভেক ধারণ করিতে দেখা যায়, যখন ইহারা অজ্ঞলোকদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া উদর পোষণ করিতেছে দেখা যায়, তখন ইহাদের উপর ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া থাকা যায় না।

গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনের বিবরণ শেষ হইল। এক্ষণে আমরা গৌরাঙ্গের জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করিব।—বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে।

পাঠককে বলা বাহুল্য যে, আমরা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করি না। গৌরাঙ্গকে কেন, কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বর বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।—যাঁহারা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, যেন তাঁহারা এই প্রবন্ধ না পড়েন। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা রক্তমাংসে গড়া মনুষ্যের প্রকৃত জীবনকাহিনী অবগত হইয়া নীতিসংগ্রহের বাসনা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি জন্য এই প্রবন্ধ রচিত, এবং তাঁহারা যদি এই চিত্র সত্যের ছায়াস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন, তবেই শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

গৌরাঙ্গ আপনার সময়ের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই; অন্যথা তিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন কেন? কিন্তু সকল বিষয়েরই দেশ কাল পাত্র আছে। যে যেমন ভক্ত, তাহার দেবতাও তাদৃশ। চৈতন্য অদ্য জীবিত থাকিলে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, জানি না।—চৈতন্য কেমন লোক ছিলেন, ইহা দেখা যেমন আবশ্যক, তেমনি শ্রীবাসভবনে যাঁহারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেমন লোক, তাহাও যথাসম্ভব দেখা আবশ্যক হইবে।

চৈতন্যে আমরা ঈশ্বরত্বের কোনও চিহ্নই দেখিবার আশা রাখি না। যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ধ বিবেকশূন্য বিশ্বাসের সহিত অণুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রে প্রশংসা বা সহানুভূতির যোগ্য কিছু আছে কি না, আমরা বিশেষরূপে তাহারই অনুসন্ধান করিব। আর তিনি নিজে সজ্ঞানে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া খ্যাপন করিয়াছিলেন কি না—ইহারও আমরা অনুসন্ধান করিব। মনুষ্য দেখিয়া লোকের কিরূপেই বা ঈশ্বরভ্রম জন্মে, তাহাও আমাদের আলোচ্য হইবে। তিনি জগতে নূতন কোনও সত্যের প্রচার করিয়াছেন কি না, ইহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এবং মোটের উপর তাঁহার কার্য্যে, উপদেশে ও দৃষ্টান্তে আমাদের কোনও হিত বা অহিত সাধিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহাও বিবেচিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ভাইফোঁটা। (চিত্র)

চাঁদপুরের বাগ্‌চীদের মেয়ে চারুশীলা এবার অনেকদিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষেই তাহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে আজ দুই বৎসর ভাইফোঁটা দেয় নাই, তাই শাশুড়ীকে লিখিয়া পাঠাইল, এবার ভাইফোঁটার আগে আর সে শ্বশুরবাড়ী যাইবে না; শাশুড়ী একমাত্র পুত্রবধূকে বড়ই ভালবাসিতেন, সুতরাং তাহার প্রস্তাবের অন্যথাচরণ করিলেন না; তাহাকে অগ্রহায়ণ মাসে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

চারুশীলার বয়স এই সবে তের বৎসর। দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মিষ্ট, মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে, এমন কোন কাজই নাই, যাহা সে পারে না; যদিও বাপের বাড়ী আসিয়া তাহার তিন বৎসরের ছোট ভাইটিকে কোলে পিঠে করিয়া, তাহার মুখে পুনঃপুনঃ চুম খাইয়া, এক শত বার করিয়া তাহাকে বিভিন্ন রকমে সাজাইয়া তাহার দিন কাটিয়া যাইত, এবং দুই এক দিন অন্তরই তাহার ছোট বোন লক্ষ্মীর ঝাঁকড়া চুলের গোছা ও কতকগুলা গুছি লইয়া চুল বাঁধিতে বসিয়া বেলা দুইটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজের পছন্দমত করিয়া চুল বাঁধিতে পারিত না, তথাপি রান্না হইতে সংসারের সকল রকম কাজেই তাহার দক্ষতা ছিল। তাহা ভিন্ন শান্তিপুরে তাহার শ্বশুরবাড়ী; সে তাহার ননদের কাছে একটু একটু গান গাহিতে শিখিয়াছিল, এবং কখন কখন তাহার বালিশের নীচে বিষবৃক্ষ বা বৌঠাকুরাণীর হাট দেখা যাইত।

চাঁদপুর গ্রামখানি বড় সুন্দর। বাগচীদের বাড়ী একেবারে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত; বাড়ীর কাছে একটা প্রকাণ্ড দিঘি, এই কার্ত্তিক মাসেও দিঘিতে জল থৈ থৈ করিতেছে; সমস্ত গ্রামের মেয়ে পুরুষে এই দিঘিতে স্নান করে। দিঘির পর পারে গোচারণের মাঠ। রাখালেরা সেখানে গরু চরায়, গান করে, অদূরবর্ত্তী ছোলার জমীতে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় কপাটী খেলে, এবং কখন বা যে সকল খেজুর গাছে গাছিরা রসসঞ্চয়ের জন্য 'ঠিলি' বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ঝিল্লীরব-মুখরিত সন্ধ্যাকালে মাঠ হইতে ফিরিবার সময় সেই সকল ঠিলি খুলিয়া রস খায়, আর অন্ধকারে দৈবাৎ কলসীর মধ্যে নিহিত মানকচুর টুকরার সন্ধান না পায়, নিঃসন্দেহচিত্তে সেই কটু রস পান করিয়া সমস্ত রাত্রি মুখ চুলকাইয়া মরে।

দিঘির একপাশে একটা পোড়ো মাঠের উপর কতকগুলি বুনো আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। এই নূতন পল্লীখানির নাম 'বুনোপাড়া'। বুনোরা চাসবাস করে, গৃহস্থের বাড়ী কৃষাণ খাটে, বাড়ীতে শাক সব্জী লাগাইয়া তাহাও বিক্রয় করে। বুনোদের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী, অনেক সময় রেজাগিরি করিয়া ইহারা দু পয়সা উপার্জ্জন করে; কাহারও পাকা ইমারত প্রস্তুতের জন্য ঢেঁকিতে সুরকী কোটার নাম রেজাগিরি, এই কার্য্য বুনোদেরই একরকম একচেটিয়া। অনেক বুনো শুধু ঘরে বসিয়া খায়, তাহাদের মেয়েরা 'গতর' খাটাইয়া দু পয়সা আনিয়া তাহাদের প্রতিপালন করে; ইহা যেন তাহাদের

পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বুনোদেব বিবাহের সময় একটা চমৎকার আচার প্রচলিত আছে; বিবাহ শেষ হইলে বরটি ধীরে-ধীরে একটা কুঁড়ের চালে চড়িয়া বসে, আর তাহার বিবাহিতা স্ত্রী সেই স্বামিরত্নকে আহ্বান করিয়া বলে—

"চালে হ'তে নামো তুমি,
ঘুঁটে কুড়িয়ে পুরলো আমি।"

কোন কোন বুনো স্বামী স্ত্রীর এই অভ্রান্তবাণীকেই চিরজীবনের সম্বল মনে করিয়া এক পয়সাও উপার্জ্জন করে না; শুধু কোন একটা উৎসব উপলক্ষে ধেনোমদ খায়, মাদল বাজায় আর অন্যের দুর্ব্বোধ্য বিচিত্র সুরে গান গাহিয়া স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ গ্রামে বর্গীর হাঙ্গামার মত একটা বিকট কলরবের স্রোত প্রবাহিত করে।

কালীপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুনোদের মধ্যে এখনো মাদলধ্বনি বিরাম নাই।

চাঁদপুরের বাজার বেশী বড় নহে। সাহেবদের নীলকুঠি হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে; এই রাস্তার ধারে খান-কয়েক দোকান। কোন দোকানে কাপড় বিক্রয় হয়, ময়রার দোকানে মুড়া, মুড়কী সাধারণ রকমের সন্দেশ পাওয়া যায়, এবং একটা মুদীর দোকানে তেল, নুন, লাল, নীল, সাদা, নানা রঙ্গের ফেটির সুতা, তামাক, সুপারী মসলাও বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে চারুর ঘুম নাই। কখন রাত্রি পোহাইবে, কতক্ষণে সে ভাইফোঁটার আয়োজন করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। অনেক রাত্রে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিক ফরসা হইবামাত্র চারুর ছোট বোন লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাজী হাতে লইয়া ফুলবাগানে ফুল কুড়াইতে গেল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতেই যমপুকুর পূজা করিবার নিয়ম—সে এবার পুকুর পূজা করিতেছে; তুলসীতলায় একটা ছোট পুকুর কাটিয়াছে, পুকুরের মধ্যে জল ঢালিয়া তাহাতে হেলেঞ্চা কল্মীর লতা পুতিয়াছে, পুকুরের পাড়ে হলুদগাছের চারা লাগাইয়াছে, এবং মুগকলাই ছিটাইয়া দিয়াছে; মুগকলাইয়ের নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, এখনো পাতা গজায় নাই; পাছে ছাগল কি গরুতে তাহার সাধের পুকুরের লতা পাতাগুলি খাইয়া যায়, কি কোন লোকে আসিয়া খাওয়া দাওয়ার পর পুকুরটি স্পর্শ করিয়া তাহা পচাইয়া দেয়, এই ভয়ে

ঠাকুরদাদা মহাশয়কে অনুনয় বিনয় করিয়া বেড়া দিয়া পুকুরটি ঘিরিয়া লইয়াছে।

লক্ষ্মী শিউলীতলায় আসিয়া সাজী ভরিয়া শিউলী ফুল কুড়াইল। প্রস্ফুটিত, সুন্দর, শিশিরসিক্ত ফুলগুলি লোহিত বৃন্তে শুভ্র কোমল সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়া আছে; আর বালিকা রক্তিম উষায়—জীবজগৎ জাগ্রত না হইতেই, কিংবা তাহার তরুকোটর হইতে বাহির হইবার আগেই, দহিয়াল তাহার পুচ্ছ খুলিয়া মুক্ত আকাশে একবার পাখিকটা উড়িয়া আসিয়া উচ্চ তরুশাখায় বসিয়া উষার আগমনী গান ধরিবার পূর্ব্বেই, বনদেবীর মত নিশ্চিন্ত চিত্তে ফুল কুড়াইয়া সাজী ভরিয়া ফেলিল; তাহার পর গোটাকতক জবা, করবী, স্থলপদ্ম উঁচু উঁচু ডাল নোয়াইয়া পাড়িয়া, ফুলগুলি পুকুরের ধারে লইয়া আসিল। পুকুরটি সবত্নে নিকানো হইলে তাহার চারিদিকে ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে, কাল রাত্রে শুইবার সময় তাহার দিদি খুব ভোরে তাহাকে জাগাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিল।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি গিয়া দিদিকে ডাকিল। চাক উঠিয়া দেখিল, সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে, চারি দিক পরিষ্কার, উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে; লক্ষ্মীর উপর রাগ করিয়া বলিল, "এতখানি বেলা হয়েছে, এতক্ষণ আমাকে জাগিয়ে দিস্‌নি কেন লো রাক্ষসী?"—লক্ষ্মী বলিল, "সত্যি দিদি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, পুকুর সাজাতে সাজাতে মনে পড়লো, তা, এখনো ত বেশী বেলা হয় নি।"

চারু কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দুর্ব্বা তুলিতে গেল। ফুলবাগানে—চামেলী ফুলের জাফরীর কাছে বেশ বড় বড় সুন্দর দুর্ব্বা জন্মিয়াছিল; চারু কতকগুলি দুর্ব্বা তুলিয়া সেগুলি ধুইয়া একখানি রেকাবীতে রাখিল, তাহার পর চন্দন পাটা পাড়িয়া চন্দন ঘষিতে লাগিল। ধান, দুর্ব্বা ও চন্দনে রেকাবখানি সাজান হইলে, চারু রামা পিসিকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিল।

চারুশীলাদের বাড়ীর কাছেই রামার ঘর। রামা জাতিতে কৈবর্ত্ত, শুদ্ধ, শান্ত অতি পবিত্রচরিত্রা বিধবা। সংসারে সে নিতান্ত একাকিনী, কিন্তু সুদ্ধ চাঁদপুর গ্রামের সকলেই তাহার আপনার। গ্রামের পুরুষবর্গের সকলের সঙ্গেই তাহার এক একটা সম্বন্ধ আছে,—দাদা, খুড়ো, জেঠা ইত্যাদি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে একটা সাধারণ পদবী দিয়াছিল,—পোট্ পিসি। যে

বালক বাল্যকালে বামাকে পিসি বলিয়া ডাকিয়াছে, এখন তাহার শিশুপুত্র তাহাকে দেখিলে দুই হাত তুলিয়া আদর করিয়া বলে,—"পিত্তি তোলে কল না।"—কেহ যদি বলে, "বামা তোমার দিন চলে কেমন করে?"—তাহা হইলে সে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দেয়, "কেন, আমার এত সব সোনাবচাঁদ ভাইপো ভাইঝি থাকতে আমার অভাব কি?"

সত্যই সংসারে বামার কোন অভাব নাই। সকলেই তাহাকে ভালবাসে; সে যে গরীব, সংসারে সে যে দুঃখিনী বিধবামাত্র, তাহাকে দেখিলে এ কথা কাহারও মনে উদয় হয় না। পাড়ার বৌ ঝিরা তাহাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে, গিন্নিরা তাহাকে সৎপরামর্শদাত্রী বলিয়া মনে করেন। কোন যুবতী শাশুড়ীর নিকট গালাগালি খাইয়াছেন, তিনি বামার নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া দুঃখভার লাঘব করিলেন; বামা হাসিতে হাসিতে সেই রূঢ়-চারিণী শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিল, এবং এ কথা সে কথার পর বলিল "হ্যা দেখ মাসীমা, তুমি তোমার বৌ'মার মনে ও রকম ক'রে কষ্ট দিয়ো না, তোমার ত ঐ একটি বৈ বৌ নয়, মুখভার ক'রে থাকে, সে কি দেখতে ভাল হয়? কোন দোষ করে ত দু কথা বুঝিয়ে বো'ল, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়। মনে ব্যথা দিয়ে কথা বল্লে কখন কাউকে আপন করা যায় না।" বামা এমনি ভাবে কথা পাড়ে, এবং তাহার মন্তব্য প্রকাশ করে যে, গৃহিণী তাঁহার বধূর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পান না; পেয়ে বামাকে বধূকে ডাকিয়া শাশুড়ীবধূর মনোমালিন্য দূর করিয়া দেয়।

ছোট ছেলে পিলে ভুলাইতে, তাহাদের ঘুম পাড়াইতে বামা বড় ওস্তাদ। ছেলেরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য। দশবৎসর বয়সে চারুশীলার বিবাহ হইয়াছে; বিবাহের পরদিন সকাল বেলা চারু কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিল, সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে না। প্রিয়তমা কন্যাকে বিদেশে পরের বাড়ী নিতান্ত অপরিচিত লোকের মধ্যে পাঠাইতে মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বিদায় না দিয়া উপায় নাই। কাহাকে তাহার সঙ্গে পাঠান যায়, এই কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু চারু কাহারও সঙ্গে যাইতে রাজি হইতেছে না, অবশেষে মা যখন চারুকে বলিলেন, "তোমার বামাপিসি, তোমার সঙ্গে যাবে, কেঁদ না লক্ষ্মী মা আমার।"—তখন চারু অনেকটা স্থির হইয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, বামাপিসি সঙ্গে থাকিলে আর তাহার ভয় নাই, যেন সেই বর্ষীয়সী বিধবা রমণী সেই দূর দেশে তাহার বিশ্বাসিনী, দেবতার

শ্রান্ত, শিশুহৃদয়খানিকে বিদেশিনীবর্গের হাস্যকৌতুকময় সোৎসুকদৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া আবার মায়ের ধন মায়ের কাছে ফিরাইয়া আনিয়া দিবে। গৃহিণীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামা চারুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল, এবং ছাদ্‌না-তলায় দাঁড়াইয়া চারুর চোখ মুছাইয়া যখন বলিল :—

"চারু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে রাঙ্গাপিসি সঙ্গে সেজেছে।"

কুনোবিড়ালের বদলে রাঙ্গাপিসি সঙ্গে গেলে কেমন হয়, চারু?" তখন এই বিষাদময় বিদায়দৃশ্যের মধ্যে, অশ্রুতে তাহার চোখের পাতা ভিজে থাকিলেও, মেঘের অন্তরালপথে প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ-কিরণের ন্যায় মৃদুহাস্য তাহার ওষ্ঠ-প্রান্ত রঞ্জিত করিয়াছিল।

সেই সময় হইতে চারুর সঙ্গে রামার বেশী আত্মীয়তা হইয়াছিল। নিজের কিছু কাজ পড়িলেই সে রামাকে ডাকিত। আজ সকালে লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া জানিলে রামা স্মিতমুখে বলিল, "কি মা চারু, আজ আবার সকাল বেলা পিসিকে কি দরকার; শ্বশুরবাড়ী কিছু খবর টবর নিয়ে যেতে হবে না কি?"—বিবাহের সময় ছাদ্‌না-তলার কথা গুলি চারু আজও ভোলে নাই, তাই বলিল, "না পিসি, তুমি একবার কুনোবিড়ালের কাজ করছ, আর তোমাকে কুকুর বিড়ালের কাজ কর্‌তে হবে না। তুমি এই টাকাটা নিয়ে হাটে যাও, ভাল ঝাড়াপান, আর ভাল সন্দেশ টন্দেশ যা পাও, নিয়ে এসগে, আমি আজ ভাইফোঁটা দেব।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ক্রয়বিক্রয়ের কিছু ধুমধাম আছে বলিয়া, আজ খুব সকালেই হাট বসিয়াছে। রামা পানের দোকানে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া একপণ ঝাড়া পান কিনিল, কিন্তু সেই একপণ পান কিনিতে তাহাকে দেড়পণ কথা খরচ করিতে হইল; বারুইমাগী ভারি রাচাল, পানের গোছার উপরে ও নীচে দুই দশটা ভাল পান দিয়া ভিতরে 'কুলের পাতার মত' ছোট ছোট পান গুঁজিয়া দিয়াছে; রামাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা!—রামা পানের গোছা খুলিয়া সমস্ত ছোট পান ফেরত দিল, এবং নিজের হাতে ভালপান গোছাইয়া লইয়া গোছা বাঁধিল। বারুই বলিল, "এমন বাছাবাছা পান আমি কাউকে দিইনে"—রামা তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "একপণ পান কিন্তে এত পয়সাও কাউকে দিইনে!"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে পল্লীগ্রামের ময়রারা ছানার সন্দেশ তৈয়ারী করে, বামা এই ছানা এবং গোল্লা রসগোল্লা প্রভৃতি কয়েক রকম মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। এতক্ষণ চারু বসিয়া বসিয়া সুপারি কাটিতেছিল। সুপারি কাটা হইলে সে সুপারি, ধ'নের-চাল, লবঙ্গ, এলাচ, প্রভৃতি মসলা দিয়া রেকাবী সাজাইল; এবং ভাইফোঁটা দিবার জন্য মাঝের ঘরে তিনখানা আসন পাতিল; পরিষ্কার গেলাসে তিন গেলাস জল রাখিল, রেকাব ভরিয়া সন্দেশ আনিল। তাহার পর লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী! তুই দাদাকে আর যোগীনকে ডেকে আন, আর তুইও কাপড় ছেড়ে আয়; কিছু খাস্‌টাস্‌নিতো? তুইও ফোঁটা দিস্।"

লক্ষ্মী তাহার আঁচল লুটাইতে লুটাইতে ঝাঁকড়া কালো কুঞ্চিত কেশের স্তবক দুলাইতে দুলাইতে উপেন ও যোগীনকে ডাকিতে গেল। সুরেন সকলের ছোট, তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র, চারু তাহাকে একখানি নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া গায়ে জামা, পায়ে মোজা দিয়া দিল, এবং কেবেপের চাদর খানিতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, মাথার নরম পাতলা চুলগুলির মধ্যে একটি সিঁথি কাটিয়া, তাহাকে একখানি আসনের উপর বসাইয়া দিল।

উপেন ও যোগীন কাপড়চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত হইয়া আসনের উপর বসিল। তাহাদের দেখাদেখি সুরেনও কোন রকম অস্থিরতা প্রকাশ করিল না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া রেকাবীর উপর সজ্জিত স্তূপাকার সন্দেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; বুঝিল, আজিকার আয়োজন কিছু গুরুতর।

চারু প্রথমে বামহস্তে রেকাব হইতে ধান ও দূর্ব্বা তুলিয়া লইয়া তিনবার তাহার দাদার মাথার উপর দিল, এবং বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়া চন্দন তুলিয়া দাদার কপালে তিনটি ছোট ফোঁটা দিল, তাহার পর মসলা পান ও সন্দেশপূর্ণ দুখানি রেকাবী দাদার উভয় হস্তে স্থাপন করিয়া তাহাকে নতমস্তকে প্রণাম করিল। অনন্তর চারু ছোট ভাই দুইটির কপালেও পূর্ব্বোক্তরূপে ফোঁটা দিল। যোগীন চারুকে প্রণাম করিল দেখিয়া সুরেনও দিদির পায়ের কাছে মাথা লুটাইল। এইবার লক্ষ্মীর ফোঁটা দিবার পালা। দিদির দেখাদেখি লক্ষ্মীও ভাইফোঁটা দিল। চারু বলিল, "লক্ষ্মী, তুই দাদাকে ফোঁটা দিলি, ভাইফোঁটার মন্তর বলেছিস?" লক্ষ্মী দিদির দিকে মুখ তুলিয়া, তাহার চক্ষের উপর কৌতূহলদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল "কোন্ মন্তর দিদি, তুই ত মন্তর বলিস্‌নি!" চারু হাসিয়া বলিল, "দূর ছুঁড়ি, মন্তর কি চেঁচিয়ে বলে? মনে মনে বল্‌তে

হয়, সেই যে তোকে বলেছিলাম, ভায়ের কপালে—" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "মনে হয়েছে :—

"ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়োরে পড়লো কাঁটা।"

এমন সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়,—গৌর বর্ণ, উন্নত দেহ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুলগুলির অধিকাংশই শুভ্র, মুখে শিশুর ন্যায় সরল প্রসন্ন হাসি,—সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীগণ তাহাদের উৎসব লইয়া ব্যস্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রীতিভরে তাঁহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং বাল্যকালের এমনি একটি মধুর উৎসব-হিল্লোলিত হৈমন্তিক প্রভাত, শৈশবের নিত্যসহচর ভাইভগিনীগণের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখ, কথায় কথায় তাহাদের সঙ্গে আড়ি ও ভাব, পিতা মাতার শান্ত, সুন্দর মুখচ্ছবি—একে একে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; আজি জীবনের এই প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়াও তাঁহার মনে হইল, সে যেন সে দিনের কথা; কিন্তু শৈশবের সেই আনন্দময় খেলাঘর এখন ভগ্ন, বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে আর কেহ নাই, সেই সকল চিরপরিচিত মুখ একে একে পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়াছে; সে কালে যাহারা নিতান্ত আপনার ছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, কেবল তিনিই একা সকলের স্মৃতি বুকে ধরিয়া সকলের চিন্তাভার মাথায় লইয়া অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন, এবং এক অভিনব জগতে বাল্যের সেই খেলার পুনরভিনয় দেখিতেছেন। এক সময়ে যাহাদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল, তাহারা ত বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন যাহাদের নূতন করিয়া পাইয়াছেন, তাহাদের লইয়া নূতন অভিনয়েই তাঁহার আনন্দ, তাই তিনি চারু ও লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তোরা দুই বোনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইফোঁটা দিচ্ছিস, আমি বুড়োটা কি একেবারেই বাদ পড়িলাম? হায়, হায়, বুড়ো বলে একবার কি জিজ্ঞাসাও কর্ত্তে নেই? আমি আজ তোদের কি করে বোঝাব যে, আমিও একদিন উপেন যোগীনের মত ছেলেমানুষ ছিলাম, আমারও কপালে ফোঁটা দিবার লোক ছিল।"

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদামহাশয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, তুমি যে ভাইফোঁটার একটা শ্লোক বলেছিলে, সেটা আবার বল না!"

দাদামহাশয় চারুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার কোমল পুষ্পস্তবকতুল্য প্রফুল্ল গাল দুটি টিপিয়া বলিলেন, "তুই ত পর হয়ে গিয়েছিস্

চারু, তোকে আর বেঁধে রাখবার যো নেই, লক্ষ্মী এখনো খুব হয় নি, ও এখনও মধ্যে মধ্যে আমার মাথার পাকা চুল দুই এক গাছা তুলে দেয়, লক্ষ্মীকে এখন একটি বাঙ্গা বরের কোলে তুলে দিয়ে যেতে পারেই বাঁচি। এক মাথা পাকা চুল নিয়ে বুড়ো মাথাটা তা হলে জ্বালাতন হয়ে মরবে—কি বলিস্ লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী সুরেনের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, আজ আমি তোমার মাথা থেকে একপণ পাকা চুল তুলে দেব, শোলোকটা বল!" দাদামহাশয় বলিলেন, "বড় ভাইকে ফোঁটা দিয়া প্রণাম করবার সময় বলতে হয়,

"ভ্রাতর্ম্মমুজ্জাতাহং ভুঞ্জ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমস্তস্যরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

তা তোরা ত ভাইফোঁটা দিলি, এখন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারবি ত ?" চারু বলিল, "তা পারবো ঠাকুরদাদা, তুমি আজ বাজার থেকে আমাদের ভাল তরকারী আনিয়ে দাও।"

ঠাকুরদাদা নিজে হাটে চলিলেন,—আজ হাটে নানা রকম জিনিস্ আসিয়াছে,—তিনি ভাল মাছ, পটল, লাল আলু প্রভৃতি তরকারী কিনিয়া আনিলেন। হাটে বেশী তরকারী কিনিতে হইল না; বনো-বাড়ী হইতে লাউ, সুয্যি কুমড়ো আনাইয়া লওয়া হইল; পালঙ্ শাক, বেগুণ বাগানেই যথেষ্ট ছিল। নানা রকম তরকারী, ডাল, মাছ, মুড়িঘণ্ট, তিলপিঠিলি বেগুণ ভাজা, লাল আলুর গুড় অম্বল, নলেন গুড়ের পায়েস, একটা ভোজের আয়োজন হইল। মুড়িঘণ্ট পায়েস মা রাঁধিয়া দিলেন, মাছ, কলায়ের ডাল চারু নিজে রাঁধিল। বিধবা পিসিমা নিরামিষ তরকারী, সুক্তনি, গুড় অম্বলে সিদ্ধহস্ত, সেগুলি তিনিই রাঁধিলেন। দাদামহাশয় কলায়ের ডাল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, ডাল কে রেঁধেছে রে ? অনেক দিন এমন ডাল রান্না খাইনি।" চারু আড়াল হইতে বলিল, "ভাল হয়নি বলে বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে, কত্তামার মত রান্না কর্ত্তে পারিনে ব'লে অত ঠাট্টা কেন ঠাকুরদাদা একবার তাঁর দেখা পাই ত ভাল ক'রে রান্নাটা শিখে নিই।"

কর্ত্তাদাদা হাসিয়া বলিলেন, "তোর কত্তামা ভালই রাঁধ'তো বটে, তা তুইও বড় সুন্দর রেঁধেছিস্, তোর রান্না খেয়ে তোর শ্বশুর ভারি খুসী হবে।"

এই প্রশংসায় চারুর মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল, সে আর এক বাটী ডাল আনিয়া ঠাকুরদার পাতে ঢালিয়া দিল। কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন, "কলি কি

[illegible]মসে খাওয়া দাওয়ার উপর একটু লোভ হয় বটে, তা, এত [illegible]লি খাইয়ে কি তোর বুড়ো দাদাকে মোর ফেল্‌বি ?"

[illegible]লে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া উঠিল। চারু পান ছেঁচিয়া এক [illegible]রেকাবে করিয়া তাহার ঠাকুরদাদাকে আনিয়া দিল। তিনি আহারান্তে [illegible]য়ন করিলে লক্ষ্মী তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া এক দুই করিয়া গণিয়া পাকা চুল তুলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "কত চুল তুল্‌বি ভাই, ও আর গুণে ফুরুবে না—যা, তুই খেলা করগে।"

সন্ধ্যাকালে কর্ত্তা মহাশয় কাপড়ের দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই খানি ঢাকাইশাড়ী আনিয়া দুই ভগিনীকে দান করিলেন, বলিলেন, "তোদের ভাই বোনের মধ্যে যেন চিরদিন এমনি ভাব থাকে; তোদের হাসিমুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন এ বুড়োর বাকি দিন কটা সুখে কেটে যায়।"

অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে পড়িতে চারু শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু পিতৃগৃহের এই আনন্দস্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

নাতিনী-সংবাদ।

বিপ্রহর; শুয়ে শুয়ে ধবল শয্যায়,
টানিতেছি আল্‌বোলা; চিত্ত জানেলায়
চিত্তরি লুতিকাজাল বুনিতেছি সুখে;
হেনকালে সুটপায়ে মৃদুহাস্য মুখে,
সৌপিন নাতিনী মোর উপস্থিত আসি।
বসাইনু কাছে তারে যতনে সম্ভাষি।
নবীনা নাতিনী মোর, নাম নৃত্যকালী,
New-year's দিনে যেন নাব্রিঙ্গির ডালি,
উচ্চ ক্লাসে পড়ে বালা, মহিলা-কালেজে;
লঙ্কা-মরিচের ঝালে মাংস যথা মজে—
(আমি গো ব্রাহ্মণ নহি, দোহাই পাঠক;)
তিনী-কথা হিঙ্গু দিলে, প্রকাশে চটক
সুবাসন কলাইর ডাল সুমধুর,
তেমতি তেজাল' মোর নাতিনী চতুর।
কথায় কথায় বলে Tennyson, Shelley,
সবীব রবীন্দ্রনাথে পাড়ে কত গালি—
"হমুকবণেতে পটু, মৌলিকতা নাই,
সাহিত্য-বড়বাজারে মহাধূর্ত্ত চাই।"
"পুরাতন সন্দেশেতে পুরি কিছু ক্ষীর,
রদন-মধরা করে সন্দেশ বাহির,
তেমতি বঙ্কিমচন্দ্র করে গুণপনা,
ডুমা ফট্ হিউগোর কদর্য্য নমুনা।"
ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাষা ইংরাজিতে ভাজা;
ভ্যাকোডিল্ পুষ্পে যেন মনসার পূজা;
মাথেমেতে জুবুড়ানো যেন দিশি কটি—"
(নৃত্যকালী ভাল বড় বাসে পাওকটি—
তাই গো এ Simileটি তার চাঁদমুখে
লেগেছিল বড় ভাল।) আমি হেঁট মুখে,
শুনিতেছিলাম সব, হইবে কি করি,
বাসব-যবের যেন বাক্‌শূন্য সব।
হেনকালে (আজি হায়! প্রাতঃকালে উঠি,
স্মরেছিনু তব মুখ বঁধি! ও কপটী,

ভাই গো আমার হেল এ ঘোর দুর্দশা।
তাড়াতে অলক্ত, ফুলে রক্ত পায় দশা।
নামের মাহাত্ম্য তব ভুবনবিদিত,
যে নাম স্মরণমাত্র, হয় পরাজিত
গর্ব্বিত বিপক্ষদল, প্রাবৃ-বেলা-কালে,
চাবি ছকা, দুই ঘোম্ বায় রসাতলে।)
হেনকালে, ছাড়ি মক্ষঃস্থল-আলোচন,
নাতিনী সদরে আসি জেল আক্রমণ;
অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে ভামুসিংহে ছাড়ি,
মোরে লক্ষি, বসনরি ভোঁ দিল দাগি।
(ছাড়ি আর দাগিতে হ'ল না ভাল মিল—
বঙ্গীয় সমালোচক কিল খেয়ে কিল
অনায়াসে করে চুরি সাহিত্য-বাজারে,
তাইতে সাহস হেল তব দরবারে
হে পাঠক। ছত্র দুটি করিবারে পেশ।)
হাসিয়া নাতিনী কহে—"বেশ দাদা বেশ।
ঘুচ্ল নেয়েস, তবু নাহিক সরম;
বুঝিবে না এ জনমে কর-কণ্ডুয়ন?
কত পদ্য ছাপাইলে, কলঙ্কের কালি,
বঙ্গবাসী পত্রিকায় গেলে কত গালি?
বঙ্গবুকে ফলে কবি যেন black berry,
ঝরে না'ক একটিও মুকুল-মঞ্জরী।
কবি হেম, দ্বিজেন, নবীন আর রবি,
অন্তঃপুর দাদামণি তুমিও যে কবি।
বুঝি গো এ ঠানদিদির house-keeping,
শিখাইয়া দিল তোমা কবিতা-pudding."

নাতিনীর ঠানদিদি, আমার গৃহিণী,
পাশে ছিল বসি; এই কথা গুলি শুনি
উত্তরিল—"লো নাতিনী, বুড়া পেয়ে বুঝি,
করিস্ ভুৎসনা? তোর আইলে গুরুজি
(নাতিনী-জামাই মোর) কবিস্ লো রঙ্গ,
বুঝা যাবে কার কত বাক্যের প্রসঙ্গ।
আমিও বরন চিনি, আমিও সহরি।
নয় তোর বুড়াদাদা সামান্য হনরি।
অসামান্য কবি উনি, জানি বিলক্ষণ,
মন দিয়া শোন্ যত কবির লক্ষণ—
খোকা চোখে একটীরে বাসেন উনি ভাল;
ওঁর চক্ষে ভুরু হ'তে প্রভাপ্রতি কাল;
জীর্ণ শীর্ণ শাটী পরি দাঁড়ালে সমুখে,
ভাবেন অপ্সরা মোরে না জানি কি চখে;
বারাণসী চেলি পরি জ্যাকেট আঁটিয়া
দাঁড়াইলে, দেখেন না বারেক চাহিয়া।
খোকা যবে চক্ষু বুজি স্তনদুগ্ধ খায়,
ভোলানাথ, এক দৃষ্টে পাগলের প্রায়,
চাহিয়া থাকেন মম (ভেবে হাসি পায়)
কহেন—"ওঃ! কি বহস্য! এমনি কবিয়া
প্রকৃতির উপাধানে নাথাটি রাখিয়া,
এমনি, শিশুর মত, নিশ্চিন্ত, বিহ্বল,
থাকিতে শিখিব কবে আমরা সকল?
গোলাপ কেতকী পদ্ম ভালবাসে লোকে;
উনি শুধু একদৃষ্টে দোপাটীর দিকে
রহেন তাকায়ে; তার একটি পাপড়ি
দুষ্ট সমীরণ যদি লয় কভু হরি,
অমনি কবির নেত্রে বহে অশ্রুধারা;
সম্রাটের রাজ্য যেন গেছে রসাতল!
চালের ডালের দর না জানেন উনি।
দিবানিশি ওঁর মুখে এই কথা শুনি,
বৃন্দাবনে ফুটিয়াছে গন্ধরাজ ফুল,
গোকুলে অশোকতরু ধরেছে মুকুল।
মোর আদরের কথা কি কব নাতিনি?
কবি সোহাগের আমি বড় সোহাগিনী।
কাড়ি লয়ে কনকের চারু বক্ষ-চুর,
বাঁধি দেন দুই হস্তে পুষ্পের কেয়ুর।
প্রায় বুড়া; তবু ভবা রসের পশরা,—
কি সাহসে ওঁর সাথে করিস্ ঝগড়া?"

এত বলি গৃহিণীটি, নাতিনীর সঙ্গে,
বসে গেল চালি দিল হাসির তরঙ্গে,
এক পাশে, শয্যাতলে, ভবে হয়ে সারা,
দেখিতে লাগিনু সেই হাসির ফোয়ারা;
ভুলিয়া আশঙ্কা, আশা, উৎসাহ, আহ্লাদ;
ফুরাইল এতক্ষণে "নাতিনী-সংবাদ"।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে কে না জানে? তিনি প্রতি গ্রামে ও পাড়ায় বিদ্যমান।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

জৈব তড়িৎ।

জীবশরীরে স্বভাবতঃ তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব আছে কি না,—এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আজ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের শরীরে অনেক সময় এক প্রকার তড়িৎ দেখা যায়; কথিত আছে, ইহারা এই বিদ্যুৎ দ্বারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে, এবং কখনও কখনও দুর্ব্বল জলচরদিগকেও তদ্দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ভক্ষণ করে। মৎস্যশরীরস্থ এই তড়িতের অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্‌মাত্রই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েক জাতীয় মৎস্য ব্যতীত অপর জীবশরীরে যে ইহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাতে আবার অনেকেই সম্পূর্ণ সন্দেহের আভাস দিয়াছেন।

প্রাচীন জীবতড়িৎবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে জগৎবিখ্যাত তড়িৎবিদ্ গাল্‌ভনি ও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌ডিনির নামই উল্লেখযোগ্য। তড়িৎবিজ্ঞানের উন্মেষকালে, বিদ্যুতের সাহায্যে আল্‌ডিনি সাহেব যে সকল বিস্ময়কর কার্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবতড়িৎবাদী পণ্ডিতের সংখ্যা অনেক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বহুকাল অবধি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফরষ্টার নামক লণ্ডনের জনৈক অপরাধীকে গুরু অপরাধে দণ্ডিত করিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পরে, ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া, অপরাধীর দেহ জীবনশূন্য স্থিরীকৃত হইলে, আল্‌ডিনি প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত, উক্ত মৃতদেহে তড়িৎপ্রবাহ চালন করিতে আরম্ভ করেন। জীবদেহে তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়া, তদ্দ্বারা জৈবিক বিদ্যুতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা, আল্‌ডিনির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, ব্যাটারির একটি তার ফরষ্টারের মৃতদেহের নিম্নাংশে ও অপরটি তাহার কর্ণমূলে সংযুক্ত রাখিয়া, কিয়ৎকাল তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিলে, ফরষ্টার হঠাৎ এক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, এবং পরে তাঁহাদিগকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া এরূপ যাতনাব্যঞ্জক মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাঁহারা ফরষ্টারের পুনর্জীবনের আশায় আশান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ-রোধ করিবামাত্র সমগ্র মৃত্যুচিহ্ন পুনরায় দেখা গিয়াছিল। আল্‌ডিনি এই পরীক্ষার আশানুরূপ ফললাভে উৎসাহিত হইয়া, বিদ্যুৎপ্রবাহ ও অ্যামোনিয়া ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ মৃতদেহে এক যোগে ব্যবহার করিয়া, আরও অনেক সজীবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আল্‌ডিনির পরীক্ষার এই বিস্ময়কর ফল জগতে প্রচারিত হইলে,—জীবদেহে সর্ব্বদাই যে বিদ্যুৎ প্রবহমান, এবং এই বিদ্যুতই যে জীবনীশক্তির মূল কারণ, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। আল্‌ডিনির শিষ্যগণের অত্যুচ্চ জয়নিনাদে, প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের কণ্ঠধ্বনি বহুকাল শ্রুত হয় নাই, নিরপেক্ষ বিজ্ঞানবিদ্‌গণও অনেক দিন অবধি

এ বিষয়টির পুনরালোচনা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। সম্প্রতি রিচার্ডসন নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত এ প্রসঙ্গে পুনর্বার আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীবশরীরে স্বভাবতঃ কোনও তড়িৎ-প্রবহমান নাই। যে তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা বাতুলতা, তাঁহার মতে আর কিছুই হইতে পারে না। আল্‌ডিনি যে প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতদেহে সজীবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, রিচার্ডসন ঠিক সে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছেন, তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা শবের হৃৎপিণ্ড ও শরীরের সকল পেশী উত্তেজিত হয় না। যে সকল পেশী প্রাণিগণ যথেচ্ছ সঞ্চালিত করিতে পারে, তড়িৎ দ্বারা কেবল সেইগুলিই সজীব হয়; মৃতদেহের এই-জাতীয় পেশী উত্তেজিত করিতে তড়িৎপ্রবাহের কোনও আবশ্যকতা হয় না, সহজাধিক অল্প উপায়ে ইহাদের ক্ষণিক সজীবতা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। রিচার্ডসন এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে, আল্‌ডিনির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের যে ঘনিষ্ঠতা কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাও যে সম্পূর্ণ ভুল, ডাক্তারটি তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই। স্নায়ুমণ্ডলী যে জ্ঞানোৎপত্তি ও জ্ঞানের আধ্যাত্মিকাশ সম্বন্ধে রিচার্ডসন এক নূতন মতবাদ প্রচার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি বলেন, স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়া এক প্রকার তরল পদার্থ-সর্ব্বদাই জীবশরীরে প্রবহমান আছে; ইহাই স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে রক্তের সহিত সংযুক্ত রাখে; ইন্দ্রিয়দের দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের উদয়, উক্ত স্নায়বীয় পদার্থ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানানুভূতি কালে, উক্ত পদার্থের একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থান্তর সংঘটিত হয়;—রিচার্ডসনের মতে, স্নায়বীয় পদার্থের এই আণবিক অবস্থাবৈচিত্র্যই, জীবের জ্ঞানবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। ইনি আরও অনুমান করেন, প্রাণিগণের নিদ্রাদি অচেতন অবস্থাও উক্ত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; আমরা যেমন শৈত্যসহযোগে যে কোনও তরল পদার্থকে ক্ষণিক কঠিন অবস্থায় আনিতে পারি,—তেমনই স্নায়বীয় পদার্থটি কোনও প্রকারে কঠিন ও নিশ্চল অবস্থায় নীত হইলেই, সম্ভবতঃ প্রাণিগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে, রিচার্ডসন আদ্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতের পোষক প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, ইহাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথায় গঠিত না করিলে, এ সিদ্ধান্ত কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। জৈব বিদ্যুৎ বিষয়ক, রিচার্ডসনের মত প্রচারিত হইবামাত্র, তাঁহার প্রচারিত যুক্তি সকল খণ্ডিত করিবার জন্য, আল্‌ডিনির শিষ্যগণ মহা আয়োজন করিতেছেন। ইতিমধ্যেই টার্কিনফ্ নামক অনেক বিজ্ঞানবিৎ তড়িৎমান যন্ত্রের সাহায্যে জীবশরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আল্‌ডিনির শিষ্যগণের পরীক্ষাদি আজিও শেষ হয় নাই। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রকাশিত হইলেই, সম্ভবতঃ এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হইবে।

কেরোসিন।

কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া, গত কয়েক বৎসর হইতে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক জন বিজ্ঞানবিদ্, ইহা পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় উদ্ভিজ্জধ্বংসাবশেষ পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; আবার কতকগুলি পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া, কেরোসিনটা মৃত্তিকাপ্রোথিত জীবশরীরজ পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়া, নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গত বৎসরের "সাহিত্যে", * ভূতীয় মতাবলম্বী এক পণ্ডিত

* ১৩০১ সালের মাঘ-সংখ্যক "সাহিত্যে," "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়ের মতবাদ সমালোচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল প্রথমোক্ত-সিদ্ধান্তদ্বয়ের মতামত আলোচিত হইবে।

কেরোসিন বিশ্লেষণ করিয়া, বিশ্লেষণলব্ধ পদার্থ সকলের পাথুরিয়া কয়লার উপাদানগুলির সহিত ঐক্য দেখিয়া, অনেকেই কয়লা ও কেরোসিনের উৎপত্তিও এক বলিয়া, স্থির করেন।

অনেকদিন অবধি কেহই এই মতবাদের যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই,—কেবল অধ্যাপক হোফার নামক জনৈক ভূতত্ত্ববিদ্ "সম্ভবতঃ" কেরোসিন একটি জীবমূলক পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র। হোফার তাঁহার মতের অনুকূলে কোনও বিশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পারায়, বিশেষতঃ জীবদেহের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেনের চিহ্নমাত্র উহাতে দেখিতে না পাইয়া, প্রথমতঃ সকলেই তাঁহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হোফার ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, গত বিশ বৎসর হইতে, কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্বের নিরূপণার্থ, নানা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণাদি করিতেছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, ডাক্তার ইংলার নামক জনৈক রসায়নবিদের সাহায্যে, জীবদেহ হইতে কৃত্রিম কেরোসিন প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার অনাদৃত পুরাতন সিদ্ধান্তটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই কৃত্রিম কেরোসিনে নাইট্রোজেনের লেশমাত্র নাই, এবং ইহা সর্ব্বাংশে আকরিক তৈলের ন্যায় হইয়াছে। হোফার বলেন, কেরোসিনে নাইট্রোজেনের অভাব বলিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন;—জীবশরীরের সর্ব্বাংশে নাইট্রোজেন থাকে না, বহুকাল ভূ-প্রোথিত থাকায় জীবশরীরের নাইট্রোজেন-যুক্ত মাংসল অংশ শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং মৃত্তিকাযুক্ত হইয়া শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহার নাইট্রোজেনহীন বসা-অংশ, অপর তৈলজ পদার্থের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয় না ও ভূগর্ভস্থ অপর পদার্থের সহিত মিশ্রিতও হয় না; এজন্য মাংসের অংশের ন্যায়, ইহা বিকৃত হইয়া পড়ে না। হোফারের মতে, এই জীববসাই চুঁয়াইয়া গিয়া, ভূগর্ভস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে সঞ্চিত হয়, এবং পরে কেরোসিনে রূপান্তরিত হয়।

আজকাল আবার আমেরিকার কয়েকটি কেরোসিন-আকরে, নাইট্রোজেনযুক্ত তৈল দেখা যাইতেছে; ইহাতে অধ্যাপক হোফারের দল কেরোসিনের জীবমূলকতা সম্বন্ধে অনেক নূতন যুক্তির উত্থাপন করিতেছেন। এখন ইঁহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য এই যে,—কেরোসিন জীবদেহজ না হইলে, উদ্ভিজ্জ-কঙ্কাল হইতে নাইট্রোজেন কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? হোফারের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আজও এ সকল প্রতিবাদের খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিগণের আর একটি মতবাদের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমেরিকা ও রুসিয়ার অনেক স্থানে এক প্রকার আকরিক বাষ্প পাওয়া যায়; আজকাল তাহা জ্বালাইয়া অনেক কলকারখানা চলিতেছে, এবং রাজপথে আলোকপ্রদান প্রভৃতি অনেক কার্য্যও ইহা দ্বারা সুসাধিত হইতেছে। পাথুরিয়া কয়লা এবং এই বাষ্পের উপাদান প্রায় একই দেখিয়া, বাষ্পটিও কয়লার ন্যায় উদ্ভিজ্জমূলক বলিয়া, সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং উক্ত বাষ্পে যে কিছু নাইট্রোজেন মিশ্রিত দেখা গিয়া থাকে, তাহা বহির্স্থ বায়ুর সহিত মিশ্রণের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অধ্যাপক হোফার পূর্ব্বোক্ত আকরিক বাষ্পের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া, উহাতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন মিশ্রিত দেখিতে পাইয়াছেন,—এবং উহা যে কিছুতেই বায়ুর মিশ্রণ দ্বারা হইতে পারে না, তাহাও স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। হোফার বলেন, কেরোসিন ও আকরিক বাষ্প উভয়ই জীবমূলক পদার্থ, ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জমূলক পদার্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

সম্প্রতি গন্থেল নামক জনৈক পণ্ডিত, তাঁহার সুদীর্ঘ সমুদ্রপর্য্যবেক্ষণের কার্য্যবিবরণীতে,

সাগরগর্ভের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক হোক্সারের মতবাদের প্রতিপোষক অনেক কথা দেখা যায়। গম্বেল তাঁহার সামুদ্রিক পর্য্যবেক্ষণকালে দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই সমুদ্রতলে এক প্রকার স্নেহপদার্থ অল্পাধিকপরিমাণে দেখা গিয়া থাকে; ইহা সমুদ্রচর জীবের দেহজ পদার্থ-ব্যতীত আর কিছুই নয়। বহু পুরাতন কবর খনন করিলে, তাহাতে যে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রায় সেই প্রকার। হোক্সারের শিষ্যগণ বলেন,—সম্ভবতঃ এই পদার্থ সহস্রাধিক বৎসর কর্দ্দমাবৃত থাকিয়া, ভূগর্ভস্থ নানা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনবশে, শেষে কেরোসিন ও আকরিক বাষ্পে পরিণত হয়।

স্বমতপোষক নানা যুক্তি প্রদান করিলেও, হোক্সারের মতবাদ আজও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। বিজ্ঞানজগতের শীর্ষস্থানীয় অনেক বিজ্ঞানাচার্য্য, আজও প্রাচীন সিদ্ধান্তিগণের দলভুক্ত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা হোক্সারের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা নূতন সিদ্ধান্তটা বিবেচ্য ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদের মূল ধ্বংসী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্র।

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য বহুদিন হইতে নানা দেশে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই অভীষ্টফললাভে কৃতকার্য্য হন নাই। আজকাল যে ব্যোমযান দেখা যায়, তাহাতে চালকের ইচ্ছানুসারে গতি নিয়মিত করিবার বিশেষ কোনও উপায় নাই; বায়ুর গতি দ্বারাই আধুনিক বেলুনের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। কাযেই এই সকল ব্যোমযান দ্বারা লক্ষ্যহীন হইয়া আকাশে বিচরণ করা ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আবার এই অসম্পূর্ণ ব্যোমযানে আরোহণও সকল সময়ে নিরাপদ নয়—স্পেন্সার সাহেবের ন্যায় অনেক গগনপর্য্যটকের বিপদ্‌কাহিনী প্রায়ই শুনা যাইতেছে।

নানা যত্নে এ পর্য্যন্ত ব্যোমযানের বিশেষ কোনও উন্নতি করিতে না পারায়, কেবল বাষ্প বলে না চালাইয়া, ইহাতে অপর শক্তি সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্ক্রু আকারের চাকা ঘুরাইয়া, আজকাল বৃহৎ জাহাজাদি চলিতেছে দেখিয়া, একজন মার্কিন শিল্পী স্ক্রুর পাখা ঘুরাইয়া আকাশবিহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কোনও বাষ্পাদির সাহায্য না লইয়াই কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু যন্ত্রটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত পক্ষ দ্বারা পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইবার জন্য, য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানসমাজে পরীক্ষাদি চলিতেছে; সম্প্রতি দুই একটি যন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের একটিতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই,—তবে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আকাশচর প্রাণিগণের ভ্রমণকৌশলাদি পরীক্ষা করিয়া, ইহার মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য যে প্রকার প্রয়াসবান হইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, আকাশভ্রমণ ব্যাপারটা চিরকালই ইতর পক্ষিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কৃত্রিম পক্ষের সঞ্চালন দ্বারা কি উপায়ে একটি পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের ভার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে,—এই প্রশ্নের সমাধানার্থ এখন সকলেই ব্যস্ত; এবং পক্ষী সকল ক্ষুদ্র ডানা দুটি আন্দোলন করিয়া কি কৌশলে তাহাদের শরীর বহন করে, তাহার নিরূপণার্থ অনেকে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

বার্লিনবাসী লিলিয়েন্থাল-নামক জনৈক শিল্পী, পক্ষীর উড়িবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া, তাহার সাহায্যে একটি আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য গত ২৩ বৎসর হইতে পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন; সম্প্রতি তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হইয়াছে। এই পুস্তকে লিখিত পরীক্ষার বিবরণগুলি পর্য্যায়ক্রমে এমন সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, কোনও পাঠকই লিলিয়েন্থালের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন না। গ্রন্থকার বলেন, আকাশচর প্রাণিদের পক্ষসঞ্চালনে বিশেষ কোনও কৌশল নাই; ইহাদের পক্ষের বক্রতাই একমাত্র পরীক্ষণীয়; পক্ষিগণ উড়িবার সময় শরীরের গুরুত্ব ও বায়ুর গতি অনুসারে তাহাদের পক্ষযুগল নানা প্রকারে বক্রাকার করিয়া থাকে,—এই বক্রতা-বশতঃই বৃহৎ বৃহৎ পক্ষিগণ অত্যল্প শক্তির সাহায্যে, আকাশে ভ্রমণ করিতে পারে। লিলিয়েন্থাল আরও বলেন, প্রবল বায়ুতে দুইটা সুদীর্ঘ পক্ষ দ্বারা অণুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না হইয়া, পক্ষিগণ যে বেশ স্থিরপক্ষে শূন্যে বিচরণ করে, তাহারও গূঢ় কারণ,—পক্ষ বাঁকাইবার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

লিলিয়েন্থাল ও তাঁহার ভ্রাতা, এ বিষয়ের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে ঊর্দ্ধোত্থিত করিতে হইলে, মিনিটে কতবার পক্ষ আন্দোলন আবশ্যক, এবং এ কার্য্য কত শক্তির সাপেক্ষ, এখন তিনি এই সকল গণনা করিতেছেন। লিলিয়েন্থাল যে আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে হস্তসঞ্চালনের কোনও আবশ্যকতা থাকিবে না; দ্বিচক্র যান চালনের ন্যায়, কেবল পদদ্বয় সঞ্চালিত করিলেই, কৃত্রিম পক্ষযুগল আন্দোলিত হইয়া চালক সহ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে।

কৃত্রিম পক্ষ দ্বারা আকাশভ্রমণের উপযোগিতা সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়াও লিলিয়েন্থাল আজও একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই,—কল্পিত যন্ত্রটির পক্ষের আকৃতি কি প্রকার হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বৃহৎ পক্ষীদিগের মধ্যে আমরা সচরাচর দুই শ্রেণীর পক্ষ দেখিতে পাই; শকুনপ্রভৃতি মাংসভোজী পক্ষীর পক্ষদ্বয় প্রায়ই সুপ্রশস্ত হইতে দেখা যায়, এবং উড়িবার সময় ইহাদের পক্ষ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়; কিন্তু সমুদ্রচর পক্ষীদের পক্ষ অধিক বিস্তৃত হয় না, এবং ইহা প্রায়ই অল্প প্রশস্ত ও সুক্ষ্মাগ্র হইতে দেখা যায়। পক্ষ সকলের এই আকৃতিগত পার্থক্যের কারণ কি, এবং কোন্ শ্রেণীর পক্ষই বা কল্পিত যন্ত্রে অধিকতর উপযোগী হইবে, লিলিয়েন্থাল এখন এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধানার্থ সচেষ্ট আছেন। একটি অল্পশক্তিসাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশভ্রমণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কৃত্রিম পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, পক্ষীর উড়িবার কৌশলের অনুকরণ করাই যে একমাত্র উপায়, লিলিয়েন্থাল তৎপ্রণীত গ্রন্থের উপসংহারভাগে, তাহা বেশ সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহার কল্পনা যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহারও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন,—এখন তাঁহার আশ্বাসবাণী সফল হইলেই মঙ্গল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

তিহরী।

গঙ্গোত্রীর পথে তিহরী প্রধান সহর। একদিন বৈশাখ মাসের সুন্দর অপরাহ্নে আমি প্রথম এই স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ করি। মসুরী হইতে তিহরী প্রবেশের যে পথ, আমরা সে পথ দিয়া আসি নাই; শ্রীনগরের পথে তিহরী প্রবেশ করিয়াছিলাম।

সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একটি দ্রব্যে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল; ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে, কিন্তু আমার সঙ্গীর চক্ষে তাহার মূল্য অনেক। বহুদিন পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক পর্ব্বতগহ্বরে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কত নির্ঝরিণীর পূত শীতল বারি করপুটে পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়াছি, পাষাণহৃদয় হিমালয়ের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মহাপ্রেমের অনন্ত উৎস লোকলোচনের অদৃশ্য অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহারই দুই একটি সামান্য চিহ্ন এই সব নির্ঝর। আমরা অনেক নির্ঝরের জল পান করিয়াছি, কিন্তু এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে, পথিপার্শ্বে একটি নির্ঝরের যে জল পান করিয়াছিলাম, তাহা অমৃত-ধারা; এমন সুমিষ্ট জল আমি কখনও পান করি নাই। তিহরী-রাজ সেই নির্ঝর বাঁধিয়া দিয়া তাহার মুখের কাছে একটি গোমুখ পাথরে ক্ষোদিত করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। সেই গোমুখ হইতে দিবসরজনী অজস্রধারে ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্ত পতিত হইতেছে। হিন্দুর রাজধানীর প্রবেশদ্বারে হিন্দুর পরমদেবতা দয়াবতী গাভীর মূর্ত্তি অকাতরে তৃষ্ণাতুর পথিককে জল দান করিতেছে। পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা গোমুখের ভিতর দিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে; এখানে সেই গঙ্গোত্রীর পথে প্রথমেই আমরা তাহার একটা ছোটো খাটো নমুনা দেখিলাম।

সেই নির্ঝরের নিকট হইতে বাহির হইয়া ছোট একটি পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াই আমরা সম্মুখে একটি সুন্দর উদ্যানবেষ্টিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কখনও তিহরীরাজ্যে যাই নাই; সেই বৃহদায়তন অথচ সুদৃশ্য অট্টালিকা, তাহার চারি দিকে সুন্দর উদ্যান ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকা দেখিয়া, আমরা তাহাকেই রাজবাড়ী মনে করিয়াছিলাম। বাড়ীর বহিরংশ ইংরাজী ধরণে প্রস্তুত; বাগানও বোধ হয় কোন সাহেবের পছন্দ মত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিতর-বাড়ীর গঠন সেকেলে বড় মানুষের অন্তঃপুরের মত। আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বাড়ী দেখিতেছি ও তাহার সমালোচনা করিতেছি, এমন সময়ে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই আর একজন পর্ব্বতবাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারও গন্তব্য স্থান তিহরী; সেখানে রাজদরবারে তাহার কি আবেদন আছে, সেই জন্য সে দূর পর্ব্বতগৃহ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছে। সে বলিল, আমরা যে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, এটি বাগানবাড়ী; রাজকুমারেরা মধ্যে মধ্যে এখানে বেড়াইতে

আসেন; সহর এখনও প্রায় এক মাইল দূরে। আমরা আর কখনও তিহরী সহর দেখি নাই শুনিয়া সে লোকটি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল, এবং সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে, এ ভরসাও যথেষ্ট দিল। বনে জঙ্গলে পর্ব্বতগুহায় কোনও গোল নাই, কোনও অসুবিধা নাই; প্রকৃতি মাতা তাঁহার সুবিশাল গৃহদ্বার সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, অসঙ্কোচে সেই মাতৃক্রোড়ে স্থান পায়; বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতগহ্বরে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করা যায়; ভগবানের করুণাধারায় তৃষ্ণা দূর হয়, প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রতিদিন কত ফল মূল সঞ্চিত হইতেছে, অনায়াসে গ্রহণ কর, কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু লোকালয়ে তাহা হইবার যো নাই, প্রতিপদে তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, লোকালয়ে সব নিয়ম, সব আদব কায়দা, সামাজিক কৃত্রিমতা; তাহারই মধ্যে তোমাকে চলিতে হইবে, তাহার একটিকেও অবহেলা করিবার শক্তি তোমার নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। লোকালয়ে তুমি সামাজিক জীব, বনে জঙ্গলে তুমি মুক্তপক্ষ অসামাজিক জীব। তাই লোকালয়ে প্রবেশ করিতে সে সময়ে আমাদের মনে একটু সঙ্কোচের ভাব উদিত হইয়াছিল। পথ ঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য, একটা বাসস্থান গোছাইয়া দিবার জন্য একজন লোক পাইয়া, মনটা একটু ভাল বোধ হইল। রাজারাজড়ার দেশ, আর আমরা রুক্ষকেশ মলিনবসন লোটা-কম্বল-ধারী সন্ন্যাসী; রাজদ্বারে যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আমাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আগন্তুক পথিকের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। দ্বিতল বাড়ী, নিম্নতলে হাইকোর্ট বসে, উপরে রাজকুমারেরা থাকেন। রাজকুমার তিন জনই আজমীর কলেজে পড়েন, গ্রীষ্মের অবকাশে এখন বাড়ীতে আছেন; শীঘ্রই কলেজ খুলিবে, এবং তাঁহারাও চলিয়া যাইবেন। কুমারেরা রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন না।

সন্ধ্যা প্রায় আগত দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটি স্থানে আমাদের সঙ্গী আমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটা ছোট গলির মধ্যে প্রবেশ করিল; আমরা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি; সে আর ফিরিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এক দোকানদারকে

করিয়া জানিলাম, এখানে কোনও দোকানে বাসা মিলিবে না; মুসাফির লোকের বাসের জন্য রাজার নির্ম্মিত অনেকগুলি বাড়ী আছে, সেখানেই সকলকে থাকিতে হয়; থানাদারের নিকট যাইয়া বলিলেই, সে একটা বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

এইবার আমাদিগকে থানায় যাইতে হইবে। আমার সঙ্গী এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন অগ্রসর নন। বনে জঙ্গলে ধর্ম্মোপদেশ দিতে তিনি খুব তৎপর, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় থাকিব, কি খাইব, এ সকলের বন্দোবস্ত করিতে তাঁর অনিচ্ছা। 'যাহা হয় হইবে,' এই তাঁর 'মটো', কিন্তু আমি সে ভাবের হইলে হয় ত সে দিন রাস্তার ধারেই কতক রাত্রি পড়িয়া থাকিতে হইত, নেবে নগররক্ষকগণের কুলের গুঁতা ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া পলায়নের পথ পাইতাম না। যাহা হউক, সঙ্গীমহাশয়কে এক স্থানে বসাইয়া রাখিয়া আমি থানাদারের বাসায় গেলাম; দেখিলাম, আফিসেই তাঁহার বাসা, তিনি অন্তঃপুরে আছেন; কখন বাহিরে আসিবেন জিজ্ঞাসা করায়, "থোড়া সবুর করনে হো গা" জবাব পাইলাম। সবুরে মেওয়া ফলিবে কি না, বুঝিতে পারিলাম না, তবুও বসিয়া থাকিতে হইল। দীর্ঘ আধ ঘণ্টা অন্তঃপুরের পথ পানে চাহিয়াই কাটিয়া গেল, অবশেষে থানাদার মহাশয় দর্শন দিলেন। উচ্চ গদীর উপর তাকিয়া লইয়া যখন তিনি বেশ ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন, তখন আমিই সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া আমার আরজ নিবেদন করিলাম। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সঙ্গে কয় জন মানুষ, তাহা লিখিয়া লইয়া নিকটস্থ এক জন পেয়াদার উপরে আমাদের ভার দিলেন; আমি যখন বাহির হইয়া আসিব, তখন থানাদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় আদমিকা সিধা ভেজনে হোগা?" থাকিবার স্থানেরই সুবিধা হইতেছিল না, এখন আবার সিধাও পাঠাইতে চায়। আমি ভদ্রভাবে সিধা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, বাজার হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি আমাদের আছে, তাহাও বলিলাম, এবং পয়সা দিয়া যদি থাকিবার স্থান মিলিত, তাহা হইলে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, এ কথাও জানাইয়া দিলাম। তিনিও একটু খাটো স্বরে বলিলেন যে, রাত্রিও হইয়াছে, এত রাত্রিতে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইবে কি না সন্দেহ, সুতরাং আমরা বাজার হইতেই খাবার কিনিয়া লই। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বাহির হইলাম।

একখানি দ্বিতল টিনের ঘরের উপর আমাদের বাসা হইল। রাত্রের অন্ধকারে রাজপথের দিকের বারান্দায় আসিয়া আমরা বসিলাম; পেয়াদা চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, কোথায় কি আছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। পেয়াদা মহাশয় যে লণ্ঠনটি আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি লইয়া গেলেন। অনেক কষ্টে রাস্তা খুঁজিয়া নীচে নামিলাম। যে দোকানে খাবার কিনিতে যাই, সেই বলে, অপরিচিত বিদেশী লোককে সরকারের বিনা হুকুমে খাবার বেচিতে পারিব না। বিষম জ্বালা, আবার সরকারের হুকুম কোথায় আনিতে যাই? এমন সময়ে দেখি, আমাদের গৃহপ্রদর্শনকারী পেয়াদা-মহাশয় সেই পথে যাইতেছেন। তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলায়, সে এক দোকান-দারকে বলিয়া দিল। আমি সেখান হইতে খাবার কিনিয়া ঘরে ফিরিব, এমন সময়ে এক জন লোক সেখানে আসিয়া জুটিল, এবং আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া কোথা হইতে আসিতেছি প্রভৃতি খবর লইল। দেরাদুনে থাকি, আমি বাঙ্গালী বাবু, এই কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপ মিয়াজি-কো জান্‌তা?" কোন্ মিয়াজি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "দেরাদুন্‌কা বাঙ্গালী বাবু কালীকান্ত সাহেব যো স্কুল বানায়া, উয়ো স্কুলমে মিয়াজি পড়্‌তা।" বুঝিলাম, মিয়াজি অপর কেহ নহেন, বর্ত্তমান রাজকুমারের মাতুল 'মিয়াজিৎ সিং' আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে, আমি তাহাকে জানি, কিন্তু সে যে আমার বিশেষ পরিচিত, আমার ছাত্র, তাহা আর ভাঙ্গিলাম না, বলিবার দরকারও ছিল না; চুপচাপ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা কিন্তু তাহা হইল না। আমি বাসায় পৌঁছিয়া খাবার রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছি, এমন সময়ে সেই লোকটি আসিয়া আমাদের বাসার সন্ধান লইয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম যে, একটি লোক আমার সন্ধান লইয়া গিয়াছে।

ক্ষুধার অত্যাচার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা দুই জনে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম; গল্পের প্রধান বিষয় তিহরীর ইতিহাস; আমি যাহা যাহা জানিতাম, সমস্ত বলিতে লাগিলাম, কথায় কথায় বিলম্ব হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় আটটা, এমন সময়ে তিন চারি জন অশ্বারোহী ও মশাল হস্তে দুই তিন জন বরকন্দাজ আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল; মশালের আলোকে দেখিলাম, অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী 'মিয়াজিৎ সিং'। ছাত্র হইলেও এ অবস্থায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করা আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়া, অন্ধকারে পথ অনুসন্ধান করিয়া নীচে যাইতে না যাইতেই তাঁহারা সকলে

দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ না দিয়া আসিয়া এ ভাবে থাকা যে আমার পক্ষে নিতান্তই যুক্তিরহিভূত হইয়াছে, অন্য কথার পূর্ব্বে নিম্নাজি তাহাই আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। অবশ্য, তাহার সে অনুযোগের কোনও জবাব আমার তহবিলে ছিল না; আমি সে কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলাম; আগন্তুক অপরিচিত ভদ্রলোক কয় জনকে সাদর সম্ভাষণ করিলাম, এবং আমাদের জীর্ণ ছিন্ন কম্বলাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

অল্পনই চারি দিকে ধূম পড়িয়া গেল; থাকিবার জন্য ভিন্ন বাড়ীর ব্যবস্থা হইল; কিন্তু আমার সঙ্গী আর সে স্থান ত্যাগ করিয়া 'পাদমেকং' যাইতেও স্বীকৃত নন; কাজেই সেখানেই আমাদের শয়নের জন্য চারপাই, বিছানা আসিয়া হাজির হইল। বাজার হইতে আহারের জন্য যে দ্রব্যগুলি আনিয়াছিলাম, চাকরদের পদতলে পড়িয়া তাহাদের মিষ্টান্ন-জীবন ধূলিকণায় পরিণত হইল।

এত রাত্রে সিধা আনিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিতে গেলে সমস্ত রাত্রিই সেই কার্য্যে অতিবাহিত হইবে ভাবিয়া, রাজবাড়ী হইতে আর নিয়া আসিল না। আজ সন্ন্যাসীর অদৃষ্টে রাজভোগ;—অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছি না,—সত্য সত্যই রাজভোগ। মনে পড়ে, কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন হিমালয়ের মধ্যে এক স্থানে দুইপ্রহরে রুটীর সঙ্গে বনের শাক ভাজা খাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম; সেই দিন আমার সঙ্গী পূজনীয় স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "আজ আমাদের রাজভোগ!" সেই শাকরুটী বা বনের ফল মূল বা অনেক দিন কেবলমাত্র ঝরণার জল খাইয়াই কত দিন অতিবাহিত করিয়াছি।

প্রত্যূষে বন্দী ও স্তুতিপাঠকগণের গীতধ্বনি এবং নহবতের মনোহর ও শ্রুতিসুখকর প্রভাতী গানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যায় শয়ান অবস্থাতেই যথার্থ হিন্দুরাজ্যের প্রভাব বুঝিতে পারিলাম। সংস্কৃত পুস্তকাদিতে প্রভাতে স্তুতিপাঠকদিগের সুমধুর গীতধ্বনিতে রাজা মহারাজাগণের নিদ্রাভঙ্গ হইত, পড়িয়াছিলাম; কিন্তু জিনিসটি কি, তাহা আজ বুঝিলাম। ওদিকে নহবতে সুন্দর তানলয়ে বিভাসটোড়ী আলাপ করিতেছে, এ দিকে তার-স্বরে সুগায়কগণ প্রভাতপবন কম্পিত করিয়া গান করিতেছে। বৈশাখের প্রভাত যেন মহাসৌন্দর্য্যময় বোধ হইল। হিমালয়ের জনশূন্য ক্রোড়ে বৃক্ষ-

তলে অনেক নিশা যাপিত হইয়াছে, প্রভাতে বিহঙ্গের বৈতালিক গানে বৃক্ষপত্রের মৃদুকম্পনে ও বৃক্ষচ্যুত পত্রস্পর্শে অনেক দিন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে এক প্রকারের আনন্দ, সে এক রকমের সুখ; আর এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সুকোমল শয্যায় নিশাযাপন, প্রভাতে নহবতের বাদ্য ও বৈতালিকের কণ্ঠধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ, এ আর এক রকমের আনন্দ। কোনটি উৎকৃষ্ট, আর কোন্‌টি অপকৃষ্ট, তাহার তুলনা আমি এতদিন পরে করিতে পারিতেছি না।

শ্রীজলধর সেন।

সীতারাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গলা দেশের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচন করিয়া এক জন বিচক্ষণ ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর যাহাই হউক, "বহিঃশত্রুর পক্ষে বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করা বড়ই দুষ্কর ব্রত। ভারতভাগ্যবিধাতা বৃটীশসিংহ যদি সকল স্থান হইতেই অধিকারচ্যুত হন, তথাপি কেহ বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়িত করিতে পারিবে না।" *

উত্তরে উত্তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গ—সমুন্নত করিয়া ভীমকলেবর হিমালয় সতর্ক প্রহরীর মত বীরদর্পে দণ্ডায়মান; দক্ষিণে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বঙ্গোপসাগর প্রলয় গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিশব্দিত করিতেছে; পূর্ব্বে ব্রহ্মসীমায় অভেদ্য গিরিপ্রাচীর; কেবল পশ্চিম-সীমা কথঞ্চিৎ অরক্ষিত, কিন্তু তাহারও স্থানে স্থানে কত মহাবন, কত খণ্ড গিরি, কত বন্ধুর পথ। বীরধাত্রী বসুন্ধরা যদি বঙ্গভূমি বীরসন্তানের জন্মভূমি করিতেন, তবে বহিঃশত্রুর পক্ষে বঙ্গ-দেশ আক্রমণ করা সত্যই দুষ্কর ব্রত হইত।

সেকালে পথঘাটের সুব্যবস্থা ছিল না; নদীবহুল বঙ্গ-দেশে বর্ষাসমাগমে জলস্থল পরস্পরকে এমন অভিন্নভাবে প্রেমালিঙ্গন করিত যে, মনে হইত, বুঝি সমুদায় দেশ জলার্ণব,—কোন দিকেই কূল কিনারা নাই। সেই জন্য দিল্লীর ফৌজ সহসা বঙ্গভূমি আক্রমণ করিতে পারিত না; যাহারা আক্রমণ করিবার জন্য আসিত, বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাদিগকে অল্প দিনের মধ্যেই

* Stewarts' History of Bengal,—Preliminary Discourses, viii.

আক্রমণ করিয়া বসিত ; শত্রুর আক্রমণ বীরপ্রতাপে প্রতিহত করা সহজ, জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ নহে ; দিল্লীশ্বরের অনেক ফৌজ এই রূপে বঙ্গ দেশে জীর্ণ কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত।

পাঠান বা হিন্দু জমিদারগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া পশ্চিম সীমা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীর ফৌজ বহু বৎসরেও গৃহপ্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না ; সুতরাং মোগল আসিত ; কখন কখন বাঙ্গলা দেশ পদানত করিত, আবার অবসর বুঝিয়া বাঙ্গালী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিত।

মহারাজা মানসিংহ পাঠানের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে পাঠান আর ভাল করিয়া মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই। উড়িষ্যা পাঠানের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল ; অবসর পাইলে তাহারা সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিত। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আর পাঠানরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে নাই। পাঠান-শক্তি চূর্ণ হইলে, বাঙ্গলা দেশে জমিদার-দিগের শক্তিই একমাত্র প্রতিকূল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল। যত দিন দিল্লীর প্রবল প্রতাপ ছিল, ততদিন জমিদারদিগের বিচ্ছিন্ন শক্তিতে মোগল শাসন-কর্ত্তা বিচলিত হইতেন না। কিন্তু সাহজাহানের শেষ জীবনে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল।

বাদশাহের পুত্রগণ পিতার জীবনকালেই সিংহাসন ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন ; যে যেখানে ছিলেন, সাহাজাদাগণ সকলেই সসৈন্যে রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন ; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতা পুত্রে গৃহকলহ উপস্থিত হইল ; বাঙ্গালা দেশের উপর কাহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিল না। আরঙ্গজীব যখন পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইলেন, ভারতবর্ষে তখন বাহু-বলের প্রবল প্রতাপ। বাঙ্গলার জমিদারদিগের মধ্যেও বাহুবলের অভিনয় আরম্ভ হইল। কে কাহার রাজ্য কাড়িয়া লয়, তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকিল না। মোগল রাজপ্রতিনিধি ঢাকায় রাজধানীতে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন, নবাব ইব্রাহিম খাঁ একদিনের জন্যও সে বাহু-বলের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন না ;—দয়া করিয়া যে রাজা মোগলকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন, ইব্রাহিম খাঁ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং মোগলের শাসনক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়িল।

সকলেই তাহা বুঝিল। উড়িষ্যাসীমায় দাঁড়াইয়া পরাজিত পাঠান সর্দার-

গণ তাহা দেখিলেন, বিদ্রোহলোলুপ বাঙ্গালী জমিদারগণ তাহা দেখিলেন, কেবল দেখিলেন না নবাব ইব্রাহিম খাঁ। সুতরাং উপযুক্ত অবসর পাইয়া দেশের মধ্যে তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমান অঞ্চলের সভাসিংহ সেই বিদ্রোহের মূল।

সভাসিংহ এক জন ক্ষুদ্র জমিদার; বর্দ্ধমানাধিপতির এক জন সামন্ত মাত্র। কিন্তু ক্ষুদ্র জমিদারীর মানসম্ভ্রম লইয়া সভাসিংহ সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উড়িষ্যাবাসী পাঠানদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। রহিম খাঁ তখন পাঠানদিগের সর্দার; পাঠান সর্দার মহোল্লাসে সুবর্ণরেখা উত্তীর্ণ হইলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণরাম প্রকাশ্য যুদ্ধে নিহত হইলেন, রাজকুমারী বন্দিনী হইলেন, রাজকুমার জগৎ রায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, বর্দ্ধমান মোগলের হস্তচ্যুত হইল।

এব্রাহিম খাঁ সংবাদ পাইয়াও বিদ্রোহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমার জগৎ রায় চাকায় উপস্থিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার আশায় যখন সত্য সত্যই করুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তখন ইব্রাহিম খাঁ যশোহরের ফৌজদার নূর উল্যার উপর এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিরস্ত হইলেন। নূর উল্যা নিরাপদে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন; সিপাহীগণ যুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি সসৈন্যে হুগলী পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী-সেনার ভেরীনিনাদে ফৌজদারের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শত্রুসেনা আক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না; স্বয়ং সসৈন্যে হুগলী দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া শত্রুসেনার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষা হইল, ফৌজদার রজনীযোগে নৌকারোহণে যশোহরে পলায়ন করিলেন। হুগলী দুর্গ সভাসিংহের হস্তগত হইল। ভাগীরথীর উভয় তীরে,—কলিকাতা, চন্দননগর এবং চুঁচুড়ায়,—ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অনুমতি চাহিলেন, এবং সেই অনুমতি উপলক্ষে ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই বুঝিল,—"জোর যার মুলুক তার," মোগল আর কাহাকেও বাহুবলে রক্ষা করিবে না, মোগলের প্রবল পরাক্রম এতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে!

সত্য সত্যই মোগল পরাক্রম নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সভাসিংহ এবং

রহিম খাঁ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রবল গর্জ্জনে সিংহনাদ করিয়া দিক্‌দিগন্তে সেনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল, নদীয়া ও বর্দ্ধমানের বিস্তৃত জনপদ বিধ্বস্ত হইল, সভাসিংহ বর্দ্ধমানে রাজধানী নিরূপণ করিয়া রহিম খাঁকে মুকসুদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রিয়বিকার সভাসিংহের কাল হইল। তিনি কামান্ধ হইয়া বর্দ্ধমান-রাজকুমারীকে সবলে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। বীর-বালিকা বসনাঞ্চলে শাণিত ছুরিকা লুকাইয়া রাখিতেন, সভাসিংহ তাহা জানিতেন না। সেই ছুরিকা উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সভাসিংহ বিকট আর্ত্ত-নাদ করিয়া বালিকাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, বালিকা সেই শাণিত লৌহ আপন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিলেন।

সভাসিংহ পরলোক গমন করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ নিরস্ত হইল না। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ দেশ লুণ্ঠনে ব্যস্ত হইলেন; রহিম খাঁ রুহিম শাহ নামে বাঙ্গলার স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। ভাগী-রথীর পশ্চিম তীর রুহিম শাহের করায়ত্ত হইল। ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দিনযাপন করিতেছিলেন, সুতরাং বিদ্রোহবার্ত্তা অবগত হই-য়াও প্রতিবিধানের আয়োজন করিলেন না। যাঁহারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কেবল এই বলিয়াই নিরস্ত করিলেন যে, "গৃহবিবাদ বড় ভয়ানক বিপদ; তাহাতে লিপ্ত হইলে পরমেশ্বরের সন্তানগণ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে; নরহত্যা মহাপাপ; ঘরে ঘরে বিবাদ বাধাইয়া অনর্থক নরহত্যা করিয়া ফল কি? বিদ্রোহীদিগের বাহুবল পরি-শ্রান্ত হইলে তাহারা আপনিই সরিয়া পড়িবে;—না হয়, দিন কতক বাদশা-হের অল্পবিস্তর রাজকরের ক্ষতি হইবে।"*

বিদ্রোহীদল মুকসুদাবাদ ও কাশিমবাজার লুটিয়া লইল, সুতানটির চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল, টানার দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল, রাজমহল ও মালদহ পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিয়া লইল। আরঙ্গজীব এই সকল কথা অবগত হইয়া, ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপন পৌত্র আজিমশানকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

সভাসিংহ পাঠানের সহায়তা লইয়া স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন

* Stewart.

করিয়াছিলেন। মোগল নিদ্রামগ্ন, পাঠান নতশির;—এসময়ে কাহারও সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া বাহুবলে হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে কি হইত, সভাসিংহ তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। সভাসিংহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সভাসিংহ যখন মোগলপ্রতাপ বিধ্বস্ত করিতেছিলেন, তৎসমকালে দক্ষিণ বঙ্গে আর এক জন বাঙ্গালী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ইনিই ইতিহাসবিখ্যাত সীতারাম রায়। মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, তখন সীতারামের নাম দক্ষিণ বঙ্গে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সীতারাম পাঠানকে আহ্বান করেন নাই, একাকী বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারাম দেশ লুণ্ঠন করেন নাই, ধীরে ধীরে যাহা হস্তগত করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। সীতারামের স্বাধীন রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; প্রভাতের সুখস্বপ্নের মত অল্পক্ষণেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন তাহার সকল কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিবারও উপায় নাই। কিন্তু সেই সুখস্বপ্নলুব্ধ কায়স্থসন্তান ষোল বৎসর ধরিয়া কেমন করিয়া নিপুণ হস্তে রাজ্যের গঠন ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠালাভ করিবার অবসর পায় নাই,—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কি সেকালে, কি একালে, বাঙ্গালী সীতারামের ইতিহাস সংকলনের জন্য সময় ও অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় নাই। সেই জন্য সীতারামের জন্মভূমিতে সীতারামের উপন্যাস আছে, সীতারামের ইতিহাস নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুর্শিদ কুলী খাঁ ব্রাহ্মণসন্তান। দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান, সুতরাং অতি অল্প বয়সেই দাস-বিপণীতে নীত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ব্রাহ্মণবালক হাজি সুফিয়া নামক এক জন সম্পন্ন মুসলমানের ক্রীতদাস হন। বালকের নিষ্পাপ কিশোরকান্তি দেখিয়া মুসলমান স্নেহার্দ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর দাসকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ আপন পুত্রদিগের সঙ্গে ইস্পাহান নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে দেশে ব্রাহ্মণবালকের তীক্ষ্ণ প্রতিভা অল্প দিনেই বিবিধবিদ্যা অধিকার করিল, কিন্তু আশ্রয়দাতা সুফিয়া ততদিন জীবিত রহিলেন না। হাজি সাহেবের

পুত্রগণ ক্রীতদাস বলিয়া কোনও রূপ অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণবালক জাফর খাঁ নামে পরিচিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাফর যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ কলহ; গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কাবেরীর জলস্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, মোগল সেনা সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিবিধ জনপদে মোগল-পতাকা বিস্তার করিয়াছে; মুসলমান শাসন সমূলে উৎখাত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায়, গিরিদুর্গবিজয়িনী মহারাষ্ট্রবাহিনী "হর হর মহাদেও" রবে অসি হস্তে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে; স্বয়ং সম্রাট আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জাফর খাঁ দাক্ষিণাত্যে বেরার প্রদেশের মুসলমান দেওয়ান হাজি আবদুল্লার অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের বিশেষ কোনও গৌরব ছিল না; কিন্তু প্রতিভাগুণে এই সামান্য পদে থাকিয়াই জাফর খাঁ সম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তখন আর পদোন্নতিলাভে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমে করতলপ খাঁ উপাধি পাইয়া হায়দ্রাবাদের দেওয়ান হইলেন, এবং তথা হইতে বিশৃঙ্খল বাঙ্গলা দেশের রাজস্বনির্ণয়ের জন্য ১১১৩ সালে ঢাকার নবাব দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। * করতলপ খাঁ সেই সূত্রে মুর্শিদ কুলী খাঁ নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। †

হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, শিক্ষা দীক্ষা এবং সহবাসবশে কুলী খাঁ খাঁটি মুসলমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমান শাসনে ঐকান্তিক অনুরাগ, মুসলমান শক্তির বিস্তারে অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিল বলিয়া, কুলী খাঁ মুসলমানদিগের নিকটে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করেন, এ দেশের তখন এতই বিশৃঙ্খল অবস্থা যে, অন্যান্য দেশের রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া বাঙ্গলা

* দেওয়ানের প্রধান কার্য্য ছিল রাজস্বসংগ্রহ। নবাব-দেওয়ানের সনদে কি কি কথা লিখিত থাকিত, তাহার একটি আদর্শ Dow's History of Hindoostan নামক ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে।

† অর্ম্মি সাহেব ইঁহাকে জাফর খাঁ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মুতক্ষরীন-লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন কখন জাফর খাঁ, কখন বা মুর্শিদ কুলী খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দেশ রক্ষা করিতে হইত। রাজকর সংগৃহীত হইত না,—যাহা হইত, তাহাতে সামরিক ব্যয়ই কুলাইবা উচিত না।

অধিক দিন বিশৃঙ্খল ভাব থাকিল না। সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্মান্ তখন বাঙ্গলার নবাব নাজিম। তিনি বাহুবলে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান পদানত করিলেন, কুলী খাঁ কঠোর হস্তে রাজকর সংগ্রহ করিয়া বৎসরে এক কোটী টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাঙ্গলা দেশে মোগলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সূত্রপাত হইল। ইহাতে কুলী খাঁর প্রশংসাবাদে দিল্লীর দরবার পূর্ণ হইয়া পড়িল। আজিমশ্মানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি গোপনে কুলী খাঁকে হত্যা করিয়া কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। কণ্টক দূর হইল না, আজিমশ্মানই বাঙ্গলা দেশ হইতে তাড়িত হইলেন। কুলী খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা দেশের রাজস্বনির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিলেন।

মোগল যত দিন সেনাসাহায্যে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততদিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তরবারি সাহায্যে দেশ জয় করা সহজ কথা, তরবারি সাহায্যে দেশ শাসন করা সহজ কথা নহে। লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া কিছু কাল তাহাদিগকে পদানত রাখিয়া ফল কি? তাহারা ত অবসর পাইলেই আবার অধীনতা অস্বীকার করিবে? কুলী খাঁ তাহা বুঝিলেন। তিনি তরবারির শাসন সহিত করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন। সমুদায় দেশ ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া চাকলার চাকলায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ একের জমিদারী অন্যের নামে লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দখলী সনন্দ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যাঁহারা এতদিন বহিঃশত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া সেকালের অধীনতা অস্বীকার করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে এখন গৃহভেদী জ্ঞাতিশত্রুর গোপন আক্রমণের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইল। সে আক্রমণের গতিরোধ করা সহজ নহে। নূতন নূতন সাহসী প্রতিভাশালী ধনাকাঙ্ক্ষিগণ নবাবের উৎসাহে বিদ্রোহী জমিদারগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া নূতন নূতন রাজবংশ সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুলী খাঁর শাসনসময়ে এই সকল কারণে অনেক নূতন নূতন রাজ্য

ও রাজধানী সংস্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল নবোদ্গত রাজ্য মোগলের অধীন হইল, কিন্তু বিচক্ষণ মোগলপ্রতিনিধি এই সকল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা থাকিল, জীবন সবলের বিচারক্ষমতা থাকিল, স্বদেশে ইচ্ছানুরূপ রাজ্য-শাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল, কেবল বর্ষে বর্ষে মোগল বাদশাহকে রাজকর দিবার ব্যবস্থা রহিয়া গেল। সুতরাং অনেকেই সহজে ইহাতে সম্মত হইয়া মোগলকে করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করা ত সহজ হইল, কিন্তু মোগলকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন করা কি সম্ভব নহে? বাঙ্গালী সে কথা জানিয়া বিচার করিতে সম্মত হইলেন না। মোগলের বাহুবল কত? মোগল সেনার শিক্ষাকৌশল কিরূপ? কি উপায়ে দুর্গরচনা করিলে, কি প্রণালীতে সেনার শিক্ষা দিলে, কর প্রদান না করিয়াও স্বাধীন রাজ্য গঠন করা যায়, সে কথা কাহারও মস্তকে স্থানলাভ করিল না।

আশু নিরুদ্বেগ হইবার জন্য সকলেই করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু করপ্রদান করিয়াও নিষ্কৃতি হইল না। মুর্সিদ কুলী খাঁ "শুভ পুণ্যাহ" নামে এক নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। বৈশাখ মাসে রাজধানী মুর্সিদাবাদের শেঠভবনে এই পুণ্যাহের সূচনা হইল।* যাহার নিকট যত রাজকর প্রাপ্য, তাহা পরিশোধ না করিলে আগামী বর্ষের জন্য কাহাকেও জমিদারী শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইত না। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ করিবার ভরসায় প্রদানত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, জমিদারীর জীবন কেবল এক বৎসর। যে কারণেই হউক, বৎসরের রাজকর কপর্দ্দকমাত্র বাকী থাকিলে, পর বৎসরে জমিদারী অন্যের হস্তগত হইবে। তখন মোগল রাজনীতির গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন।

মুর্সিদ কুলী খাঁ আপন দৌহিত্রীপতির উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার অত্যাচারের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কত জমিদার বন্দী হইলেন, কত জনের রাজবাটী ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল, কত জনকে বাঁধিয়া মুর্সিদাবাদে লইয়া চলিল। সেখানে নানাপূতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যে এক নরককুণ্ড পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে; গর্ব্বান্ধ মুসলমান তাহার নাম রাখিয়াছে "বৈকুণ্ঠ"! রাজকর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া

* The Fifth Report.

হিন্দু জমিদারগণ সশরীরে সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ধর্ম্ম গেল, স্বাধীনতা ত পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল; মুসলমান শাসনের উপর লোকের মন ক্রমেই বিচলিত হইয়া উঠিল। (১)

এই সকল বিশৃঙ্খলার অবসর পাইয়া, সীতারাম ধীরে ধীরে মহম্মদপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন; এক জন ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সীতারাম কায়স্থ বটে,—কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ; (২) পাছে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিলে সীতারামের বীর চরিত্রে বাঙ্গালীর কলঙ্ক বিদূরিত হয়, ইহাই বোধ হয় 'ইতস্ততের' মূল।

যাঁহারা পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ, তাঁহাদের জীবনচরিত সমালোচনা করিবার সময়ে সহসা একপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে বাঙ্গালী করযোড়ে মোগলের দ্বারদেশে সসম্ভ্রমে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান, সীতারাম যে সেই বাঙ্গালী, সে কথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সমসাময়িক বাঙ্গালী যে ভাবে চিন্তা করিতেন, যে ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, সে উপায়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, সীতারাম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই;—বোধ হয়, সেই জন্যই ইংরাজ লেখক তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি সীতারাম যে বাঙ্গালী কায়স্থ, সে বিষয় আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই,—তাঁহার বংশ বাঙ্গলা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ক্রমশঃ।

(১) যাঁহারা এই বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থার সবিস্তার কাহিনী পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা হুইয়াট কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করিবেন; ইংরাজ দপ্তরের কাগজপত্রেও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

(2) J. Westland Esqr. C S.

আয়না। *

লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, জাপানী প্রাচ্য ভূখণ্ডের ফরাসী। সে যাহাই হউক, ফরাসীর কতকগুলা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে জাপানী ও ফরাসীর মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না।

ফরাসী বালিকা জন্মগ্রহণমাত্র সহজাতসংস্কারবশে, একখানি আয়নার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করযুগল প্রসারিত করে। সেই আয়নায় সে আপনার সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ এবং অঙ্গচালননৈপুণ্য দর্শন করিবে, এবং তদুভয়ের প্রশংসা করিবে। বালিকা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তাহার এই স্বভাবজ রুচিও তেমনই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বালিকার সপ্তদশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই চারি দিকে মুকুরমণ্ডিত কক্ষে অবস্থানই তাহার সুখের চরম আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। সত্য-সত্যই ভারসেলসের প্রাসাদে একটি কক্ষ আছে, সেটি ফরাসী রমণীর নিকট স্বর্গতুল্য। সেই দীর্ঘ কক্ষ হর্ম্ম্যতল হইতে ছাদ পর্য্যন্ত মুকুরে মণ্ডিত; আবার হর্ম্ম্যতল এমনই পালিশ করা যে, তাহাতে পদতলের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।

জাপানে উক্কি নামক গ্রামে, আয়না কাহাকে বলে, লোকে তাহাই জানিত না। সেখানে আপনাপন চেহারা সম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে হইলে, বালিকাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগের প্রেমিকগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করিতে হইত। বলাই বাহুল্য যে, প্রেমিকগণের প্রেমের প্রগাঢ়তার তারতম্যের অনুসারে সৌন্দর্য্যবর্ণনারও তারতম্য হইত।

এক জাপানী যুবক জাপানের জিন্‌রিকস্ গাড়ী টানিত। সে এক দিন রাস্তায় একখানা ক্ষুদ্র আয়না কুড়াইয়া পাইল; বোধ হয়, কোনও ইংরাজ-মহিলা জাপানে ভ্রমণকালে উহা ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

কিকিট্‌সাম ইতিপূর্ব্বে কখনও আয়না দেখে নাই। সে আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সে দেখিল যে, মুকুরমধ্যে তাম্রবর্ণ, বুদ্ধিব্যঞ্জক চক্ষুবিশিষ্ট, বিস্ময়বিস্ফারিত একখানা মুখ দেখা যাইতেছে।

কিকিট্‌সাম সেখানে জানু পাতিয়া বসিল, এবং সেই মুখ আনার দিকে

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

চাহিতে চাহিতে আপনাপনি মৃদুস্বরে বলিল, "এ আমার পরলোকগত পিতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার ছবি এখানে কেমন করিয়া আসিল? বোধ হয়, কোনও কারণে তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।"

সে রুমাল দিয়া সযত্নে আয়নাখানি মুড়িয়া ঢিলা জামার পকেটে রাখিল। বাটী ফিরিয়া অন্য কোনও গোপনীয় স্থানের অভাবে সেখানা একটা কলসের মধ্যে স্থাপন করিল; সে কলসটা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত না। কিকিটসাম তাহার স্ত্রীকে এ কথা বলিল না। কারণ সে ভাবিয়া দেখিল যে, রমণীগণের কৌতূহল বড় বেশী, তাহাতে আবার স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। কিকিটসাম বুঝিল যে, তাহার মৃত পিতার প্রতিমূর্ত্তি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইবার কথা, প্রতিবাসীদের মধ্যে জানাজানি হওয়া উচিত নহে।

কিছু দিন ধরিয়া কিকিটসাম বড়ই উদ্বিগ্ন রহিল। সে সর্ব্বদাই কেবল পিতার আলেখ্যের কথা ভাবিত, এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিয়া যাইত।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও সকল রহস্যজালজড়িত বা অসাধারণ কার্য্যের জন্য স্বামীকে স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কেন যে তাহার স্বামী যখন তখন বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিল, লিলিটসি তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশ্যই স্বামী যখনই গৃহে আসিত, তখনই স্ত্রীর মুখচুম্বন করিত। কিকিটসাম স্ত্রীকে বলিত যে, সে তাহাকে দেখিবার জন্যই এইরূপে গৃহে আসে। প্রথম প্রথম লিলিটসি সে কথায় বিশ্বাস করিত—ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, স্বামী চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীরবদনে প্রতিদিন যখন তখন গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল—তখন তাহার সন্দেহ হইল যে, তাহার স্বামী তাহাকে সত্য কথা বলিতেছে না। লক্ষ্য করিয়া লিলিটসি দেখিল যে, স্বামী গৃহে আসিয়া; একবার একাকী গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে না গিয়া চলিয়া যাইত না।

কোনও রহস্য ভেদ করিবার সময় স্ত্রীপ্রাণী রমণীগণও অন্য দেশের রমণীগণের ন্যায় অধ্যবসায়শালিনী হইয়া উঠে; লিলিটসি এই রহস্য ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে প্রতিদিন সেই কক্ষে অনুসন্ধান করিত, কিন্তু নূতন কিছুই দেখিতে পাইত না।

এক দিন লিলিটসি সহসা দেখিল যে, সে যে কলসের মধ্যে গোলাপের দলগুলি শুকাইতে দিত, তাহার স্বামী সেই কলসটি যথাস্থানে সংস্থাপন করি

তেছে। কিকিট্‌সাম্ বলিয়া যে, সেটা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে যথাস্থানে স্থাপন করিতেছিল; তাহার স্ত্রী স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিবার ভাণ করিল; কিন্তু স্বামী গৃহ হইতে গমন করিবামাত্র, একখানা টুলের উপর উঠিয়া, কক্ষমধ্য হইতে আয়না খানি বাহির করিল। না জানি এ কি হইবে ভাবিয়া, সে সেই আয়না খানি ভাল করিয়া দেখিল; দর্শনমাত্র সেই ভীষণ সত্য বুঝিতে পারিল। সর্ব্বনাশ!

ইহা ত কোনও স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি—আর সে কিকিট্‌সামকে এত ভাল, এত অনুরক্ত ভাবিয়া থাকে!

তাহার দুঃখ কথায় ব্যক্ত হয় না।

লিলিট্‌সি মেজের উপর বসিয়া পড়িল, আয়না খানা তাহার অঙ্কে পড়িয়া রহিল। তবে এই জন্যই তাহার স্বামী এতবার গৃহে আসেন! হায় হায়, এই রমণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্যই তাহার এত ব্যগ্রতা!

তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে আবার আয়না খানি দেখিল। আয়নার মধ্য হইতে সেই মুখ তাহার দিকে চাহিল; সে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার স্বামী কেমন করিয়া ঐ মুখের, ঐ দুষ্টামীব্যঞ্জক চক্ষের প্রশংসা করিতে পারেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এবার সে আয়নার সেই চেহারার একটা নূতন ভাব দেখিতে পাইল, পূর্ব্বে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই; সে ভয় পাইয়া স্থির করিল যে, সে আর সেখানার দিকে চাহিবে না।

আর কোনও কাজ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না; সে তাহার স্বামীর আহার্য্য প্রস্তুত করিল না। সেই আয়না ও আপনার ক্রোধ লইয়া হর্ম্ম্যতলে বসিয়া রহিল। কিকিট্‌সাম্ গৃহে ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; দেখিল, তাহার আহারের কোনও আয়োজনই নাই, তাহার স্ত্রীও নাই। সে কক্ষে কক্ষে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝিতে পারিল।

লিলিট্‌সি বলিল, "এই তোমার প্রণয়? আজও এক বৎসর আমাদের বিবাহ হয় নাই, ইহারই মধ্যে তুমি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছ?"

পত্নী পাগল হইয়াছে ভাবিয়া ভীত হইয়া তাহার স্বামী বলিল, "লিলিট্‌সি, কি বলিতেছ?"

"আমি কি বলিতেছি? তুমি কি বলিতেছ? তুমি আমার গোলাপের দলের মধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছ? এই লও—যত্ন করিয়া ইহা রাখিয়া

দাও—আমি এই দুষ্ট রমণীর প্রতিমূর্ত্তি চাহি না।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া তাহার স্বামী বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তুমি বুঝিতে পারিতেছ না; আমি কিন্তু পারিতেছি। তুমি ঐ কুৎসিত ভীষণদর্শন রমণীকে তোমার পত্নীর অপেক্ষা অধিক ভালবাস। সে যদি সুন্দরী হইত, তবে আমি কিছু বলিতাম না; উহার মুখশ্রী হীন, কুৎসিত; উহার চক্ষুতে দুষ্টামী জাজ্বল্যমান; উহাতে সকল কুভাব প্রকাশিত হইতেছে।"

ক্রোধান্বিত হইয়া কিকিট্‌সাম্ বলিল "লিলিট্‌সি, বলিতেছ কি! উহা আমার পরলোকগত পিতার প্রতিকৃতি। আমি ওখানা রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়া কলসমধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম।"

মিথ্যাকথা শুনিয়া ক্রোধে লিলিট্‌সির নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; সে চেঁচাইয়া বলিল, "বটে! তুমি কি বলিতে চাহ যে, আমি রমণীর মুখ আর পুরুষের মুখ চিনিতে পারি না?"

কিকিট্‌সামও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কলহ প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। গৃহের সদরদরজা একটু খোলা ছিল; একজন পুরোহিত পথে যাইতে যাইতে তাহাদের কলহের স্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি মুক্ত দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, এত রাগ কেন! এ কলহ কেন?"

কিকিট্‌সাম বলিল, "আমার স্ত্রী পাগল হইয়াছে।"

পুরোহিত বলিলেন, "সকল স্ত্রীলোকই কম-বেশী পাগল। যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা তোমার উচিত। কলহ করিয়া কোনও ফল নাই; পত্নীগণ পতির পরীক্ষাস্থল।"

"কিন্তু সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে!"

লিলিট্‌সি বলিল, "না, তাহা নহে। আমার স্বামী অন্য এক রমণীর প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছেন; আমি তাহা পাইয়াছি।"

কিকিট্‌সাম বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিমূর্ত্তি আমার নাই।"

গম্ভীরভাবে পুরোহিত বলিলেন, "আমাকে সে খানা দেখাও।"

লিলিট্‌সি বলিল, "এই দেখুন।"

পুরোহিত আয়নাখানা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেন। তিনি সেখানির

সম্মুখে মস্তক নত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কলহ পরিত্যাগ করিয়া, সুখে ও শান্তিতে একত্র বাস কর। তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ। ইহা কোনও পবিত্রচেতা পুরোহিতের আলেখ্য। তোমরা কি এমন পবিত্র মুখ দেখিয়াও ভুল করিয়াছ? আমি ইহা লইয়া গিয়া ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়া দিব।"

তিনি হস্ত তুলিয়া দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহার পর এই অনিষ্টের মূলকারণ আয়নাখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি।

"মহারাজাধিরাজ" শিবসিংহ যে দানপত্র বা শাসন অনুসারে "নবজয়দেব" "সুকবি" "পণ্ডিতঠক্কুর" বিদ্যাপতিকে জয়ইল তপ্পান্তর্গত নদীমাতৃক, নারণ্য, সরোবর, প্রচুরোর্ব্বর, পৃথুতরভোগ বিসপী গ্রাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে দান করিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণপত্রিকার নায়ব গ্রীয়র্সন সাহেব তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

এই দানপত্রে তিন স্থানে সন তারিখের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

(১) লসং ২৯২ শ্রাবণ শুক্ল ৭ গুরৌ।

(২) অব্দে লক্ষণসেনভূপতিসমে বহ্নিগ্রহ দ্বাঙ্কিতে মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকেমুনিতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।

(৩) সন ৯০৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাকে ১৩২১।

ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অথচ প্রথমটি অঙ্কে রাখিয়া দ্বিতীয়টি অক্ষরে রাখিবার জন্য লিখা হইয়াছিল। এখন, বহ্নি অর্থে তিন বুঝায়, সুতরাং বহ্নি-গ্রহ-দ্বি-অঙ্কিতের অর্থ ২৯৩ হইয়া পড়ে। বোধ হয়, অঙ্কের লিখায় ভুল হইয়াছে।

সন, সংবৎ ও শকাব্দ হইতে জানা যায়, ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দানপত্র রচিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ সেনের অব্দ কখন আরব্ধ হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে বিস্তর কলহ হইয়াছে। এই দানপত্র অনুসারে ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। রাজার অভিষেকসময় হইতে কি মৃত্যুর পরে এ অব্দের আরম্ভ, এখানে তাহার বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই।

श्रीराम।

श्रीगौरीगङ्गाभ्यां नमः॥ सिद्धिः॥

श्रीगजरथपुरात् समस्तपक्षिव्याविराजमानश्रीखानेश्वरोवरुत्रप्रसादमवाप्तो-नन्दिभावनापरोपकरणारावणसचाराजाधिराजश्रीमत्सिंहदेवादाः संसरविजय-विन. नरपतिलक्ष्मणायां विजयोयासनाद्व्यसुकलोकान् मुक्तवैकाश्च उमापतिधर-ज्ञातमनु-भवतां ग्रामोऽयमस्माभिः सपत्निकाभिमवजयश्रीमन्नराजपण्डितहलायुधमिश्रा-र्पितथः शासनीकृत्य प्रदत्तो ग्रामकृत्या वयमेतेषां वचनकरीभूकर्षणादि-कर्म करिष्यतेति कर्म २९२॥ श्रावणशुक्लसप्तमी॥ श्रीकारणं॥-

अब्दे लक्ष्मणसेनभूपतिमते-वह्निग्रहद्यङ्किते
मासि श्रावणसंज्ञके सुतिथौ पक्षेऽवलक्षे शुभे।
वीक्ष्यैवा सरितस्तटे गजरथेत्याख्याप्रसिद्धे पुरे
दिल्लीशाद्विजदेवाद्वपुलकः सभ्यायमर्थं शमम्॥
प्रज्ञावान् प्रचुरोर्वरं पृथुवरामीमं नदीमातृकं
सारस्यं समरीवरं च विजयीनामानमानीमतः।
श्रीविद्यापतिशर्मणे सुकृतये पुत्रादिभिर्भुञ्जतां
स श्रीमान् शिवसिंहदेवनृपतिर्भूमिं ददे शासनम्॥
येन साहसमवेन शक्तिना तुङ्गतारवरपूरवर्तिना
अस्मपतिवलयोर्जितं जितं गञ्जनाधिपतिगौडभूभुजाम्॥
रौद्यकुम्भ इव कुञ्जरेषा श्वेतपद्म इव ब्रह्मवन्दी।
यस्य कीर्तिनटकेतकान्या स्वामिनेति विलिनी धरित्र्याः॥
द्विषन्नृपतिवाहिनीरविरवाहिनीकोटिभिः
प्रतापतरुषण्डये समरमेदिनी प्लाविता।
समस्तधरिदङ्गनाचिबुरपाश्वयाशङ्कभं
सितप्रसरणाक्षरं जगति येन लब्धं यशः॥
मतङ्गजरथप्रदः कनकदानयज्ञाद्भ-
मुखाद्भुतमनुत्तं निजधनैः पिता थापितः।
सुखानि च महात्मना जगति येन भूमिभुजा-
परापरपयोनिधिप्रथममैक्षवं सदा॥
नरपतिकुलमान्यः करुणमिश्रावदान्यः
परिचितपरमार्थो दानतुष्टाधिसार्थः।

লিপাক্ষরিনিপবিতী ইবসিংহস্য পুবঃ-
স জয়তি খিনসিংহী বৈরিনাগেন্দ্রসিংহঃ ॥
ধামি স্ফুরন্ত্যামুক্তিনি কিমপি নৃপতয়ী দিন্দরীন্যে বৃথক্লা-
গাঙ্কীলব্ধাত্মনাত্তৈঃ সহিতমনুদিনং মুঞ্জমেতে স্বধর্ম্মে।
যে চৈনং গ্রামরত্নং নৃপকররহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ-
স্তেষা সত্কীর্ত্তিগাথা দিগি দিগি সুচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ ॥
সন ৯০৩ সম্বত্ ১৪৫৫ শাকে ১৩২১ মুদলক্ষ্ম শ্রীরস্তু ॥

এই দানপত্রে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে "নব-জয়দেব" ও "সুকবি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি যে নিজগুণে "স্বপ্রক্রিয়াভিঃ" জয়দেবের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন; সভাসদ্দিগকে উৎসাহ দিয়া তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। এই সকল কারণে তিনি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য বিসপী গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করিয়াছিলেন। বিসপীর বর্ত্তমান নাম বিসফী।

রাজদরবারে এতাদৃশ সম্মানলাভ বালকের ভাগ্যে ঘটে না। আমরা অনুমান করিতে পারি, এই সম্মানলাভের সময়ে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন পঁচিশ বৎসর হইয়া থাকিবে। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান করেন, খ্রীষ্টীয় ১৩৮২ অব্দে বিদ্যাপতির জন্ম হয়; অর্থাৎ আঠার বৎসর বয়সের সময় এ দানপত্র প্রাপ্ত হন। এ কথা কত দূর সঙ্গত, পাঠকগণ অনুমান করিবেন।

বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি সম্পূর্ণ করেন; ইহার অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, ১৩৭০/৭৫ হইতে ১৪১০/১৫ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভৈরব সিংহ মিথিলায় রাজত্ব করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার রাজত্বকালে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হয়। বিদ্যাপতির অমানুষী জীবনীশক্তি কল্পনা না করিলে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এবং এরূপ কল্পনা করিলে, বিদ্যাপতিকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক করিয়া লওয়া হয়। অথচ, বিদ্যাপতি যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বৈষ্ণবমাত্রই স্বীকার করেন। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহ দর্পনারায়ণ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচিত হইয়া থাকিলে, বিদ্যাপতি উহা রচনা করিয়াছিলেন, সম্ভব হইতে পারে। আমরা দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ দিলাম।

পিতার জীবিতাবস্থায় শিবসিংহকে মহারাজ বলিত। এইরূপে নরসিংহ দর্পনারায়ণের জীবিতকালে, তাঁহার দুই পুত্র বীরসিংহ ও ভৈরব সিংহ, রূপনারায়ণকে রাজা বা ভূপতি বলিয়া উল্লেখ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রূপনারায়ণকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া, ভৈরবসিংহে হরিনারায়ণ উপাধির আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ভৈরবসিংহের উপাধি রূপনারায়ণ ছিল।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ শিবসিংহের দানপত্রের কিয়দংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার সহিত মিলাইলে, তাহাতে এই কয়েকটি ভ্রম লক্ষিত হইবে।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১ম পংক্তি—ভূপতিমিতে।	ভূপতিমতে।
দ্ব্যষ্টিভ।	এটি শুদ্ধ পাঠ, কিন্তু মূলে দ্ব্যষ্টিত আছে।
২য় পংক্তি—শুভতিথৌ।	মুনিতিথৌ (সপ্তমী তিথিতে)
৪র্থ পংক্তি—বিবর্দ্ধ।	বিবৃদ্ধ।
৬ষ্ঠ পংক্তি—বিসপীনানানমসীমতঃ।	বিসপীনামান্নমাসীমতঃ।
৭।৮ পংক্তি—	
শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজ-কৃতী সীর-শ্রীশিবসিংহনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্।	শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে পুত্রাদিভির্ভুং ক্ষতাং স শ্রীমান্ শিবসিংহদেবনৃপতির্গ্রামং দদে শাসনম্।

"শাসনপত্র।

"শ্রীরাম।

"হরপার্ব্বতীকে নমস্কার। সিদ্ধি।

"ঝামেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রশান্তচিত্ত ক্রিয়াবান্ ভবানীভক্ত ধ্যানপরায়ণ সমরবিজয়ী মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শিবসিংহদেব (যাঁহার অপর নাম রূপনারায়ণ) গজরথপুর হইতে জয়ইল তপ্পার অন্তর্গত বিসপীগ্রামনিবাসী জনগণ ও কৃষকসমূহকে আদেশ করিতেছেন যে, এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা স্বীয় কৃতি দ্বারা জয়দেবের সমকক্ষ মহারাজপণ্ডিত শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরকে এই গ্রাম শাসনপত্র দ্বারা দান করিলাম। আপনারা ইঁহার আদেশ অনুসারে কর্ষণাদি কার্য্য করিবেন ইতি। লসং ২৯২, শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষ ৭মীতিথি। বৃহস্পতিবার।

শ্লোক।

"বাঘমতীনদীর তীরস্থিত প্রসিদ্ধ গজরথপুরবাসী, দানে মুক্তহস্ত, প্রজ্ঞাবান্, নৃপতি শ্রীমান্ শিবসিংহ দেব ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের ৭মীতিথিতে বৃহস্পতিবারে সভামধ্যে সভাসদ্ সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার নিমিত্ত অবশ্যের সহিত ও সরোবরের সহিত বিস্তীর্ণ প্রচুরোর্ব্বর নদীমাতৃক বিসপীগ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনপত্র দ্বারা দান করিলেন।

"তিনি সাহসী, শস্ত্রসঞ্চালনক্ষম ও অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর গজনী প্রতিম পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন। বজ্রতুল্য বক্ষঃস্থল সদৃশ, ও শ্বেতপদ্মে শৈবালসংস্পর্শ-ন্যায়, অভিনব কনকাকুসুমবৎ তাঁহার যশঃপ্রভা শশলাঞ্ছনকে মলিন করিয়াছিল। তিনি বিপক্ষ-সৈন্য-শোণিতের কোটি কোটি নদী দ্বারা স্বীয় প্রতাপতরু-বৃদ্ধির নিমিত্ত সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছিলেন।

"তাঁহার যশোমালী দিগঙ্গনাগণের কেশপাশ বাসিত করিয়াছিল; তাঁহার যশঃপ্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইয়াছিল।

"তিনি অসংখ্য গজ ও রথ দান করেন; তিনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় সুবর্ণরাশি বিতরণ করেন, তিনি লোকার্জ্জিত অর্থ হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত মনুষ্যের প্রতিকৃতি পিতা দ্বারা দান করাইয়াছিলেন; তিনি শস্ত্র ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র সংযোজিত করিয়াছিলেন কীর্ত্তিলাভ করেন।

"ত্রাহ্মকুলপূজ্য কর্ণসদৃশ দাতা পরমার্থপরায়ণ নৃপতি প্রভূত অর্থ বিতরণ দ্বারা যাচকগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, পবিত্রচরিত্র বৈদ্যি-কবি-কেশরী দেবসিংহ-পুত্র শ্রীমান্ শিবসিংহদেবের জয় হউক।

"যদি কোন হিন্দু অথবা মুসলমান নরপতি এই গ্রাম বলপ্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি শোণিত, পূকরমাংস, আত্মমাংস ভক্ষণ করিবেন ও তিনি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন।

"যাঁহারা রাজদত্ত এই গ্রাম সুশাসনে রাখিবেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা বন্দিগণ দিগ্বিগন্তে চিরকাল ধ্বনি করিবে। সন ৯৮৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাক ১৩২১।

"শুভ হউক, শ্রী হউক!"

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

"শ্রীমান্ নরসিংহ দেব মিথিলার অধিপতি। রাজগণের মুকুটমণি দ্বারা তাঁহার চরণ অর্চ্চিত। তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে আগত অর্থিগণকে মণি, সুবর্ণ, ভূমি ইত্যাদি বাঞ্ছাধিক দান করিয়া, কর্ণ ও বলিকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন।

"তদীয় পুত্র শ্রীমান্ ভূপতিনারায়ণসিংহ। তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও প্রতাপবান্ ছিলেন। সমরক্ষেত্রে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ে রণোল্লাসে বিচরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্মানার্হগণ ও বিদ্যার আশ্রয় ছিলেন, সমরবিজয়ী ও সফলক্রিয় ছিলেন।

"শ্রীমান্ মহারাজ ধনাদিত্যদেবের জয় হউক। যিনি স্বীয় পৌরুষ দ্বারা পঞ্চগৌড়েশ্বরকে দমন করিয়াছিলেন, মহারাজ ভৈরব সিংহ যাঁহার অনুজ; যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় চিরস্থায়ী।

"তিনি বেদজ্ঞ, দেবীভক্তিপরায়ণ, আরব্ধচিন্তাপর ও সমরে শত্রুবিজয়ী ছিলেন। প্রত্যক্ষ নারায়ণস্বরূপ ভূপতি কামনারায়ণ সকলের কল্যাণসাধনার্থ বিদ্যাপতিকে দুর্গোৎসবপদ্ধতি রচনা করিতে আদেশ করেন।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

ইতিহাস।

মামুদ ও সোমনাথ।

ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অত্যাচারে ভারতবর্ষের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। স্বধর্ম্মের প্রতি জাত্যন্তিক ভক্তিবশতঃ, মুসলমান নৃপতিগণ, ভারতের প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তিকলাপ যেখানে যাহা পাইয়াছেন, প্রায়সাধ্য সকলই বিলুপ্ত করিয়াছেন। পরন্তু, এই ধর্ম্মান্ধতার বশেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ, সত্যের সহিত মিথ্যার যোজনা করিয়া, স্বজাতীয় বীরবৃন্দের সেই ধ্বংসের কার্য্যগুলিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্মান্ধ নৃপতির চূড়ান্ত উদাহরণ, সুলতান মামুদ: এবং এইরূপ ধর্ম্মান্ধ ঐতিহাসিকের চূড়ান্ত উদাহরণ, ফেরিস্তা। আর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথের মূর্ত্তিবিনাশ, এবং ফেরিস্তা-লিখিত তাহার বিবরণ, এইরূপ ধর্ম্মান্ধতার চূড়ান্ত কীর্ত্তি।

ভারতবর্ষে মসলেম্।

সুলতান মামুদ তাঁহার ষোড়শ আক্রমণ উপলক্ষে সোমনাথের মন্দির ও মূর্ত্তি বিচূর্ণ করেন, এ কথা আমরা বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি। মামুদের অত্যাচারে সোমনাথের উদর বিদীর্ণ হইয়া রাশি রাশি মণি-মাণিক্য বর্ষণ করিয়াছিল, এ কথা কে না জানে? আর সোমনাথের সেবকগণ অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তিরক্ষার্থ মামুদকে যে লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাও কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু কথাগুলা একেবারেই অলীক। ব্রাহ্মণেরা ঘুষের প্রস্তাব করেন নাই; সোমনাথও আপন উদর হইতে মণি মুক্তা প্রসব করেন নাই। এ সকল কেবল "মুসলমানের রচা কথা।"

মামুদ ও সোমনাথ।

কেবল মুসলমানের রচা কথা নহে; ইহাতে সত্যপ্রিয় ইংরাজ ঐতিহাসিকেরও হাত আছে। আমরা বিগত অক্টোবর মাসের "কলিকাতা রিবিউ" অবলম্বন করিয়া সোমনাথ-বিনাশের প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

১৭৬৭—৭২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ডো তাঁহার "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" প্রকাশিত করেন। ঐতিহাসিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি ফেরিস্তারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ফেরিস্তা যাহা বলেন নাই, এমন অনেক কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এগুলি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত; অথবা পারস্য-ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞানাভাবের ফল। বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার লিপিত বৃত্তান্ত এই,—সোমনাথের মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। মূর্ত্তিটি প্রস্তরে গঠিত; প্রায় পাঁচ গজ লম্বা; তন্মধ্যে দুই গজ মৃত্তিকা-তলে প্রোথিত। মামুদ মূর্ত্তি দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে উহার নাক ভাঙ্গিয়া দিলেন। তার পর চূর্ণমূর্ত্তির দুই খণ্ড গজনীর মসজিদ ও রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে স্থাপন করিবার জন্য চালান দিলেন। মক্কা ও মদিনায় পাঠাইবার জন্য আরও দুই খণ্ড রাখিয়া দিলেন। মামুদ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া, একদল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত কয়েক ক্রোর স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিল।

কর্ণেল ডো ও সোমনাথ।

ওমরাহগণ টাকা লইবার জন্য তাঁহাকে জিদ করিতে লাগিল। সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেই পুতুল-পূজা বন্ধ হইবে না। কিন্তু সুলতান ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অর্থ লইয়া স্বদেশীয় সাধুদের মধ্যে বিতরণ করিলে অনায়াসে বেশ নাম কিনিতে পারিবেন। সুলতানের মন কতকটা ভিজিল বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমি পুতুল-বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে চাহি না; উহার ধ্বংসকর্ত্তারূপেই পরিচিত হইতে চাই।' সুতরাং পুতুল-ভাঙ্গার কাজ বন্ধ হইল না। অতঃপর তাঁহার অনুচরগণ সোমনাথের পেট চিরিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্য দেখ। পেটের ভিতর হইতে বাড়ি ভুঁড়ির পরিবর্ত্তে রাশি রাশি হীরা, চুণি, মুক্তা বাহির হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণেরা মামুদকে যাহা দিতে চাহিয়াছিল, উহাদের মূল্য তাহার শতগুণ বেশি। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা কেবল ধর্ম্মের জন্য মামুদকে টাকা দিতে চাহে নাই।" এই বৃত্তান্ত মোটামুটি দেবিস্তারেরই অনুবাদ। তবে অনুবাদে প্রমাদ আছে। ব্রিগস্ ফেরিস্তার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা মূলের অধিকতর অনুগত। ডো-সাহেবের প্রদত্ত এই অনুবাদ দেখিয়াই গিবন্, জেম্‌স্ মিল, প্রাইস্, এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকের দল প্রমাদে পড়িয়াছেন। কেবল সার্ উইলিয়ম্ হণ্টার তাঁহার 'গেজেটিয়রে' এই সোমনাথ-ব্যাপারের প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসার উইলসন সাহেবই কবেক জন পারস্য ঐতিহাসিকের প্রমাণ দিয়া, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত-বর্ণনার ভুল ধরিয়া দেন।

সম্রাট আক্‌বরের আদেশে "তারিখ-ই-আলফি" নামক হিজিরা এক সহস্র বৎসরের এক ইতিহাস লিখিত হয়। ইহাও ফেরিস্তালিখিত বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তিমাত্র। ফেরিস্তা, মিরখন্দ-প্রণীত প্রসিদ্ধ "রৌজতস্-সাফা" নামক ইতিহাসের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু মিরখন্দের কথা এই—"মন্দির ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করা হইল। সোমনাথের মূর্ত্তিপ্রস্তর টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, কতকগুলি গজনীর মস্‌জিদের প্রবেশপথে স্থাপিত হইল।" মিরখন্দ ও সোমনাথ। ইহাতে ঘুষের প্রস্তাব, অথবা পেটের ভিতর মণি-মুক্তা প্রভৃতির কোনও প্রসঙ্গ নাই। মিরখন্দের পুত্র কিম্বা মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র খোন্দামিরও ওরূপ কোনও কথা বলেন না। এ বিষয়ের সর্ব্বপ্রাচীন বিবরণ ইবুন্ আসির কর্ত্তৃক ১২৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত এক খানি ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেও ঘুষ বা পেট চেরার কোনও কথা নাই। ইবুন্ আসিরের সমসাময়িক লেখক ইবুন্ খলিফান আর একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "সোমনাথের কানে তিরিশটা মাকড়ী ছিল।" আবুল ফেদা বলেন, "সোমনাথকে পোড়াইয়া ফেলা হয়।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। তাহা লইয়া আমরা আর পাঠককে বিব্রত করিতে চাহি না। আমরা কেবল ঘটনার সমকালীন লেখক আল্‌বিরুনীর কথা পাঠককে উপহার দিয়া বিদায় লইতেছি। এ বিষয়ে আলবিরুনীর "তারিখ-ই হিন্দ" নামক গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণই প্রকৃত ও প্রামাণিক। পাঠক দেখিবেন, সোমনাথের হস্তপদবিশিষ্ট কোনও মূর্ত্তিই ছিল না, উহা প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ মাত্র।

"হিন্দুরা বলেন, নক্ষত্র সকল প্রজাপতির দুহিতা। উহারা সকলেই চন্দ্রের বিবাহিতা; কিন্তু চন্দ্র রোহিণীতেই অধিকতর অনুরক্ত। অপরাপর স্ত্রীগণ চন্দ্রের এই পক্ষপাতের কথা প্রজাপতিকে জানাইল। প্রজাপতি প্রথমতঃ জামাতা চন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে কোনও প্রতিকার না হওয়াতে, তিনি চন্দ্রকে এই অভিশাপ দিলেন যে, 'তুমি কুষ্ঠগ্রস্ত হও।' তখন চন্দ্রদেবের অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি প্রজাপতিকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, 'আমার কথা বিফল হইবার নহে। অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে পারি না; তবে কেবল এক পক্ষ ধরিয়া লজ্জানিবারণার্থ তোমার মুখ ঢাকিয়া রাখিতে পারি।'

আলবিরুনীর উপাখ্যান।

তখন চন্দ্র বলিলেন,—'কি প্রকারে আমি পাপমুক্ত হইব, বলিয়া দিন।' প্রজাপতি উত্তর করিলেন,—'তুমি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা কর।' চন্দ্র তাহাই করিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম, 'সোমনাথ'। সোম—চন্দ্র, নাথ—প্রভু। সুতরাং সোমনাথ শব্দের অর্থ, চন্দ্রের প্রভু। সুলতান মামুদ এই লিঙ্গমূর্ত্তি বিনষ্ট করেন। ভগবান মামুদের কল্যাণ করুন! (হিজিরা ৪১৬।)

মামুদ মূর্ত্তির উত্তরার্দ্ধ একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। অপরার্দ্ধ বেশভূষা ও স্বর্ণ রত্নাদি সহ গজনীতে নীত হইল। প্রস্তরমূর্ত্তির এক খণ্ড, থানেশ্বর হইতে আনীত পিত্তল-গঠিত 'চক্রস্বামী'-বিগ্রহের ন্যায়, সহরের সার্কাস-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। আর এক খণ্ড গজনীর মসজিদের প্রবেশদ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে—on which people rub their feet to clean them from dirt and wet."—(ভক্তগণ মার্জ্জনা করিবেন আমরা ছত্র টুক্ অনুবাদ করিলাম না বটে, কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।)

রিবিউর লেখক বলেন, "এই সোমনাথসংক্রান্ত চন্দন-তোরণের কথাগুলাও মিথ্যাতে পরিপূর্ণ। মামুদ উক্ত তোরণ গজনীতে লইয়া যাইবার আট শত বৎসর পরে, একজন অভিনয়প্রিয় গবর্ণর জেনেরল (লর্ড এলেনবরা) আফ্‌গানিস্তান হইতে উহাকে পুনরানয়ন করিয়া হিন্দুপ্রজার সান্ত্বনার্থ ভারতবর্ষের সহরে সহরে দেখাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই তোরণ যে কৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহা চিরদিন একটা কদর্য্য জাল ও প্রকাণ্ড তামাসা বলিয়া গণ্য হইবে।"

মন্তব্য।

সাহিত্য।

জর্জ্জ ইলিয়ট।

ইংরাজী সাহিত্যের মহারথীদিগের চিত্রশালায় প্রবেশ করিলে যে সকল যশঃসমুজ্জ্বল চিত্র প্রথমেই দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, জর্জ্জ ইলিয়টের চিত্রও তন্মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়,—তাঁহার মত রমণী কেমন করিয়া অমন সুন্দর উপন্যাস রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সে সকল ছাড়িয়া আমরা কেবল সাহিত্যের হিসাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিব। সে সম্বন্ধে "মোরাব" প্রবন্ধে প্রকাশিত মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসনের প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।—

লেখক বলেন যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে অসঙ্গত অধিক যশঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতিকূল স্রোত বহিতেছে, তাঁহার যশোহানি হইতেছে। এই প্রতিকূল স্রোত এতদূর বহিয়াছে যে, এখন লোকে তাঁহার সহৎ উদ্দেশ্য এবং উৎকৃষ্ট ক্ষমতার কথাও স্বীকার করিতে চাহে না। সেক্সপীয়রের সহিত তাঁহার তুলনা করা সমীচীন নহে, তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার তুল্য শক্তি সাহিত্যসংসারে সহজ-প্রাপ্য নহে। তাঁহার প্রচুর ও প্রকৃত শিল্পকৌশল ছিল এবং তাঁহার দর্শনজ্ঞান ও বিজ্ঞানব্যুৎপত্তিতে বরং সময় সময় সে কৌশল নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে তাঁহার উচ্চস্থানলাভ দর্শন হইতে নহে, পরন্তু এই শিল্পকৌশল হইতে। অধিক বয়সের সময় তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকলই তাঁহার যশঃস্তম্ভ। তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থনিচয় জটিলতাবর্জ্জিত।

যশ।

লেখকের মতে Silas Marner অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে বিজ্ঞানের বিভীষিকা নাই, পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্য নাই; নৈতিক সমস্যার সংখ্যাও অল্প। একটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামের

সাইলাস মার্নার।

কয় ঘর লোকের কথা লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত। ইহার পল্লিস্থলভ ছায়াস্নিগ্ধ মাধুরী, বচনার পারিপাট্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামঞ্জস্য, চরিত্র গভীর করুণভাব, এই সকলের সমাবেশে ইহা সাহিত্যশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার করুণ কবিত্বময়, নৈতিক ভাব মহৎ ও সত্য, গ্রন্থান্তর্গত চরিত্র সকল সজীব এবং উপন্যাস সাংশ মৌলিক, স্বাভাবিক ও নাটকোচিত।

পরিণতিপ্রাপ্ত রোমান্সের কথা ধরিলে সাইলস্ মার্নার ছাড়িয়া Adam Bede র কথাই ধরিতে হয়। সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর মতে ইহাই জর্জ্জ ইলিয়টের চমৎকার গ্রন্থ।

অ্যাডাম বীড।

তিনি আপনিই বলিয়াছেন যে, তিনি যে আর কখন অমন সত্য ও সুন্দর কিছু লিখিতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। ইহা সত্য বটে। কেবল তাঁহার এই পুস্তকই স্বতঃরচিত, এবং সুখসম্ভোগ ও অভিজ্ঞতার প্রবাহ-মান প্রবাহ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার পুস্তক সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচুর্য্য-ময়, হাস্যরসবহুল এবং বিষাদাক্কাবহীন। বোধ হয়, এই পুস্তকের রচনায় তিনি তাঁহার পথ্য প্রকৃতি ও স্বীয় ক্ষমতার সমগ্র ব্যয় করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ ইলিয়টের Mill on the Floss এ যে আত্মজীবনসম্বন্ধীয় ও ব্যক্তিগত বিষয় আছে—তাহা সত্য, কিন্তু তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিন সমান গৌরবোজ্জ্বল থাকিবার মত নহে। তবে Romola স্বতন্ত্র কথা, ইহা জর্জ্জ ইলিয়টের বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু

রোমলা।

ইহা কষ্টকল্পনাপ্রসূত, অত্যধিক মাত্রায় সুন্দর এবং একেবারে মলিনত্ববর্জ্জিত। কাজেই রোমলা অতি সুন্দর ও মহৎ সাফল্য-হীন উদ্যম। লেখিকার ইহার পরে রচিত গদ্য বা পদ্য সকল রচনাই ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সে সকলে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কৌশলগঠিত চরিত্রও আছে, তবু যেন সে সকল রচনায় ক্লান্তিলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ফিটার হ্যারিসনের মতে "Deronda" বা "Middlemerch" বা "Theophrastus Such" কিছুই প্রশংসার উপযোগী নহে। "Felix Holt"এ কতকগুলি সুন্দর দৃশ্য ও

অন্যান্য।

চরিত্র সন্নিবেশিত থাকিলেও, তাহা অ্যাডাম বীড বা সাইলাস মার্নারের তুল্য নহে। তাঁহার কবিতায় প্রকৃত কবিতা ভিন্ন আর সকলই আছে। বহু কষ্টে লেখিকা অতি কোমলভাষায় আপনার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত কবিতারচনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

কবিতায় ও রোমান্সে জর্জ্জ ইলিয়টের বিফল হইবার প্রধান কারণ, তাঁহার ভাব ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং সে সকলের সম্পূর্ণীকরণের বিবেকানুমোদিত। তাঁহার সময়ের লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সমসাময়িক রোমান্স লেখকদিগের

সাফল্যাভাব।

মধ্যে চিন্তায়, জ্ঞানে ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে, তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। রোমান্স রচনার কৌশলকে তিনি চিন্তা, উৎকর্ষ ও দর্শনের হিসাবে অনেকটা উচ্চে তুলিয়া দিয়াছেন। এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব জ্ঞানের আধিক্য এবং আদর্শের উচ্চতাই অধিকাংশ স্থলে সাফল্যাভাবের কারণ। তাঁহার পূর্ব্বে কখন অমন নৈতিকউদ্দেশ্যপূর্ণ, দায়িত্ববোধবিশিষ্ট রোমান্স রচিত হয় নাই।

মিষ্টার হ্যারিসন বলেন যে, এখন রোমান্স রচনার প্রভাতারুণরাগ সাহিত্যাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে সূর্য্য উদিত হইয়া আলোক বিকীর্ণ করিবে।

আবার সেপ্টেম্বর সংখ্যা "ন্যাশনাল রিভিউ" পত্রে শ্রীমতী গ্রীন লিখিয়াছেন যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তদনুসারে জর্জ্জ ইলিয়টের চিত্র আর একরূপ।

তন চাপম্যানের গৃহে লেখিকার সহিত জর্জ্জ ইলিয়টের প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও লোকে তাঁহাকে বিদুষী, শ্রমশীলা, চিন্তাশীলা বলিয়া জানিত, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্মান করিতে সম্মত ছিল না; লেখিকা বলেন যে, তিনি জর্জ্জ ইলিয়টের বিদ্যায় আকৃষ্ট না হইয়া বরং তাঁহার ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। লেখিকা বলেন যে, জর্জ্জ ইলিয়টের 'হামবড়া' ভাবটাই তাঁহার পক্ষে সে সময় বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

প্রথম দর্শন।

কিন্তু অতিরিক্ত সাফল্য ও তোষামোদেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল—তাঁহার সারল্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি ক্রমে অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সামাজিক হিসাবে ও মানসিক হিসাবে কৃত্রিম জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। লুইসের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের প্রথম অবস্থায় তাঁহার যে স্বাধীনতাবোধ ও পূর্ণহৃদয়তা ছিল, শেষকালে তাহা ছিল না। লোকে যেমন মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, তিনি তেমনই আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা কৃত্রিম। জর্জ্জ ইলিয়টের মত কৃত্রিম রমণী লেখিকা আর দেখেন নাই। তিনি অতি সুন্দর আদর্শের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু সে আদর্শ স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম মাত্র।

তিনি সর্ব্বদাই উপাসকদিগের কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাহাদিগের কথার উত্তর দান করিতেন, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। অপরিপক্ক জ্ঞানের ফলিলজল-জড়িত জনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, তাহাদিগের হৃদয়কে সেই জাল হইতে মুক্ত করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কখন তাঁহার কৃত্রিম আস্তুত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই।

সে যাহাই হউক, জর্জ্জ ইলিয়ট যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন, তৎবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল রচনায়, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক সকল আজও ইংরাজী-ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আদৃত। স্রষ্টা আজ অতীতের অন্ধকারপ্রদেশে বিলীন, কিন্তু সৃষ্টি আজও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

জীবনচরিত।

সুলতান।

তুরস্কে এখন যে ঘোর বিপ্লব বাধিয়াছে, তাহা সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। "ফর্টনাইটলি রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা সেই তুরস্কের সুলতানের পার্থিবজীবনের কয়টা কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অনেক আধাঢ়ে গল্পের নায়ক রাক্ষসের আহারের পরিমাণ করিতে হইলে, অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। তুরস্কের সুলতানের রন্ধনশালায় যে পরিমাণ আহারীয় প্রস্তুত হয়, তাহাতে কয়টা রাক্ষসের উদরপূরণ হইতে পারে, তাহা স্থির করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। সুলতানের প্রাসাদে রন্ধনশালার পাচক ভৃত্যের সংখ্যা চারি শতেরও অধিক। এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কারণ প্রাসাদে নিত্য ছয় সহস্র লোক আহার করে। প্রাসাদে তুরস্ক, ফরাসী সূপকার-সম্প্রদায়।

ও ইটালীয় সর্দ্দার-সূপকারের কেল্লা, কিন্তু একজন আস্বাদনকারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কোনও খাদ্যই সুলতানের উদরস্থ হয় না।

আরব্য উপন্যাসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান অবরোধের বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে তৎসম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তেমন প্রীতিপ্রদ নহে। প্রবন্ধলেখক মিষ্টার ডেভি সুলতানের অবরোধ সম্বন্ধে গোটাকতক মোটামুটি কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অবরোধের মহিলাগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত,—প্রথম কদাইন,—ইঁহারা প্রকাশ্যভাবে গৃহীতা না হইলেও কতকটা আইন-সঙ্গত পত্নী; দ্বিতীয় ইক্‌বাল বা অনুগৃহীতা,—ইঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রথম শ্রেণীস্থাগণ নির্ব্বাচিতা হয়েন; তৃতীয় গিউয়েও বা প্রভুর নয়নানন্দদায়িনী যুবতী;—ইঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতা হইয়া থাকেন। এই সকল শ্রেণী ক্রীতদাসী হইতে আনীতা; কাজেই তুরস্কের সুলতান দাসীসন্তান, কিন্তু কোন ক্রীতদাসী রাজপুত্র বা রাজকন্যা প্রসব করিবামাত্র, তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, এবং তিনি রাজ্ঞীপদে উন্নীতা হয়েন। অবরোধমধ্যে কোন রমণী উন্নীতা হইলে তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট তাঁহার কথা ব্যক্ত করা হয়, তখন তিনি স্বীয় স্বজনগণকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

অবরোধ।

সুলতানের জননী অবরোধের কর্ত্রী। মুসলমান আইন-অনুসারে-কাদাইন-শ্রেণীস্থা সকল মহিলার দাসী হইতে অধ পর্য্যন্ত সমস্ত হওয়া চাহি; কাজেই ইঁহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য আর এক জনকে অবরোধকর্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়। তুরস্কের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সুলতানের জননীই এ ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুলতানের জননীর মৃত্যু হয়, তবে পালিকা জননীই তাঁহার কার্য্য করেন। কারণ, তাহা মুসলমানদিগের বিধান যে, ধাত্রীর সহিত সম্বন্ধ, জননীর সহিত সম্বন্ধেরই মত। বর্ত্তমান সুলতানের অবরোধকর্ত্রী তাঁহার গর্ভধারিণী নহেন; লেখক শুনিয়াছেন যে, তিনি বুদ্ধিমতী ও অবরোধের সুশাসনে সক্ষম; তবে তাঁহার মত কতকটা সেকেলে রকমের।

লেখকের মতে সুলতানের সব অভ্যাস খুব সাদাসিদা রকমের; তবে তাঁহার পরিশ্রম খুবই। তিনি প্রত্যূষে ছয়টার সময় শয্যাত্যাগ করেন; তাঁহার পর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেক্রেটারীদিগের সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়া আহার করেন,—তাহার পর তিনি হয় গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসেন, নয় ত তাঁহার সুবৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ হ্রদে নৌবিহারে রত হয়েন। তৎপরে তিনি কাছারি করেন। রাত্রি আটটার সময় তিনি হয় একাকী, নয় এক জন দূতের সহিত আহার করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি প্রায়ই তাঁহার সন্তানদিগের সহিত খেলা করেন। ইহাই সুলতানের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। গৃহে প্রকৃত মানবকে দেখিতে হইলে গৃহের মানব সতর্ক, সে আপনার মনোবৃত্তিকে আবরণমুক্ত করিয়া প্রায়ই দেখায় না।

সুলতান।

সুলতান সাধারণ ইংরাজের মত সাদাসিদা পোষাক পরিধান করেন। তবে কোন বিশেষ কার্য্যের সময় তিনি জমকাল জরির কাজ করা কোট ব্যবহার করেন। অদ্য দিবস হইল, একজন মহিলা সুলতানের সহিত এক টেবলে আহার করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে কোন সুলতান, কোন খৃষ্টিয়ান মহিলাকে এ সম্মান প্রদান করেন নাই। আহারের পর মহিলা বলেন যে, একখানা চেয়ারের উপর একটা ইলুপ-ধরা কল পাতিয়া আছে। সুলতান বলেন, ও, ওটা অতি সুন্দর ফাঁদ। ওটা ইংলণ্ড হইতে আনান হইয়াছে। তাঁহার

আমি ঐ-কলে দশটা ইন্দুর ধরিয়াছি।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুলতানের আনন্দ কূপ পরিষ্কার।

সমাজনীতি।

ফরাসী।

নিষ্টার ভ্যান্ড্যাম্ ফরাসীদিগের বিষয়ে যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ফরাসী-দিগের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ফরাসীর নাড়ীনক্ষত্র সকলই জানেন; তিনি চব্বিশ বৎসরেরও অধিক কাল প্যারীতে বাস করিয়াছেন এবং সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতে ধোপা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মিশিয়াছেন। তবে তাঁহার এ পুস্তক প্রধানতঃ ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের জন্য লিখিত; তাই দুঃখের বিষয় যে, মাক্সওয়েলের চিত্রিত ইংরাজ-চিত্রের ন্যায় তাঁহার চিত্রিত ফরাসী-চিত্রেও যথেষ্ট অতিরিক্ত বর্ণসংযোগ হইয়াছে। আমরা কয়টি বিষয়ে তাঁহার মতের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গ-সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব (অল্প হইলেও) অস্বীকার করা যায় না। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের অলক্ষিত ছায়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা মাসিকপত্রসমূহে অনেকগুলি ফরাসী গল্প অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ের গল্পলেখকদিগের আদর্শও অনেকটা ফরাসী গল্প। ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত এখানে প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য।

বিদেশীয় সমালোচকগণ সর্ব্বদাই বলেন যে, ফরাসী শিল্প ও সাহিত্য নিশ্চয়তঃ কৃত্রিমতায় 'ফিলিং এর' বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার বলেন যে, ফ্রান্সে বিদ্যালয়ের নিয়মের দোষেই তাহা হইয়া থাকে। ইংরাজ বালকগণ বিদ্যালয়ে যে নীতিবিরুদ্ধ বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হয়, তাহা তাহাদিগের জীবনের অবশিষ্টকাল বিচ্ছিন্ন হয় না; সে বন্ধুত্ব স্কুলের বিদ্যালয়ে অসঙ্কুচ, সতন্ত্র সতন্ত্র ইংরাজের নিকট বিদ্যালয়ের স্মৃতি সুখসমুজ্জ্বল; উত্তরজীবনে যৌবনের সেই সুখস্মৃতি তাহাদিগের হৃদয় হইতে অপনীত হয় না। বিদ্যালয়ত্যাগের পরও ইংরাজ-গণ, পারিস, বংসরে একবার সম্মিলিত হইয়া সেই সুখময় অতীত জীবনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। যে-সময় হেমচন্দ্রের ভাবায়:—

"সবে নগ্ন ভাব,—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময়।"

সে সময়ের স্মৃতি ইংরাজ ভুলিতে চাহে না। যে সকল ইংরাজ তাঁহাদিগের স্কাণ্ডিনেভিয়ান ও নরম্যান পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লব্ধ অস্থির-ভ্রমণস্পৃহাবশতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারিগেরও নিকট, সে বিদ্যালয়ে তাঁহারা হোরেস ও ভার্জ্জিল, হোমার ও হেরোডোটাস-পাঠ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের স্মৃতি সুখানুকূল।

এ সৌভাগ্য ফরাসীর নিকট আনন্দময় নহে। বিদ্যালয়ের সেই অবিরলপরীক্ষা-

আইন, সেই অত্যাচারী শিক্ষক ও সেই ঘৃণ্য সহকারী শিক্ষক,—এই সকলের মূর্ত্তি ফরাসীর জীবনে বিষাদের ছায়া পাতিত করে। কাজেই যে অতীতজীবনের কথা ইংরাজ মনে করিতে চাহে, ফরাসী তাহা ভুলিতে চাহে।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইতে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত বালিকাগণকে চোখে চোখে রাখা হয়। বর—বালিকার অপরিচিত, উভয় পক্ষের পিতা মাতাই প্রায় বিবাহ স্থির করেন। বালিকা কখনও একাকিনী পথে বাহির হইতে পায় না, এবং সঙ্গীত বা অন্য কোনও বিদ্যার শিক্ষাকালেও তাহার সঙ্গে এক জন ধাত্রী চাই। পিতা মাতার সহিত বালিকা যখন বেড়াইতে বাহির হয়, তখন এই আদেশ দেওয়া হয় যে, সে দক্ষিণে বা বামে ফিরিয়া চাহিবে না; কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তাহার দিকে চাহিলে সে মুখ ফিরাইবে বা মৃত্তিকানিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া চলিবে; এবং পিতা মাতার বন্ধুগণ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে উত্তর দিবে। তাহার পাঠ্যপুস্তক অভিভাবক বাছিয়া দেন, সে গুলা নিতান্তই একঘেয়ে। সময়ে তাহার বিবাহ স্থির হয়; বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে ভাবী স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় না। বিবাহে তাহার বিকল্প থাকে না,—সে পিতা মাতার মতে মত দেয়; কারণ, খুব সম্ভবতঃ পিতা ভিন্ন অন্য যে সকল পুরুষের সহিত সে কথা কহিতে পাইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পঞ্চাশ পার হইয়াছেন। এ দেশে লোক প্রায় ত পঞ্চাশ পার হয় না; যাহারা হয়, তাহাদের জন্য ব্যবস্থা "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।"

বালিকার শাসন যেমন ভীষণ কঠোর, পত্নীর স্বাধীনতা তেমনই বিস্ময়কর। এই কঠোর শাসনের পর এই অপরিমিত স্বাধীনতা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। সময় সময় পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহের ফল শুভই হয়। পতিপত্নী পরস্পরের রুচি ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। পরিণামে বিশেষ অশান্তি—

পত্নী।

এরূপ কোনও ঘটনা ঘটে না। কিন্তু সময় সময় এমনও ঘটে যে, অন্য কোনও রমণীকে দেখিয়া স্বামী ভাবেন যে, তাহাকে তিনি সত্যই ভাল বাসিতে পারিতেন; আবার হয় ত পত্নীও সেইরূপ ভাবে অনুভূতা হয়েন। ধনবান ও অলস লোকদিগের মধ্যেই এরূপ ঘটনা অধিক ঘটিয়া থাকে। তখন,—তখনকার কথায় পরিহাসচ্ছলে ভুমা বলিয়া থাকেন,—"বিবাহ-যোয়াল এতই ভারী যে, তাহা বহিতে দুই জন লাগে—সময় সময় তিন জনও লাগে।"

গ্রন্থকারের মতে, পতিপত্নীর পরস্পরপ্রেমের উপর সংস্থাপিত সুখকর বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে, ফ্রান্সের সমাজের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই, পিতামাতার অতিরিক্ত ক্ষমতা কতকটা কমান চাই, এবং ফরাসীদিগের ধনতৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত করা আবশ্যক। এখন দেখা যাইতেছে, পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ফরাসীদিগের মধ্যে বিবাহে বিতৃষ্ণা ক্রমেই প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শেষ কথা।

তাঁহাদিগেরও প্রায় দুইটির অধিক সন্তান দৃষ্ট হয় না; কারণ, তাহাদিগের মৃত্যুর পর সে তাঁহাদিগের সম্পত্তিও নানাভাগে বিভক্ত হইবে, ইহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। ফরাসী রাজনৈতিকগণ স্বীকার করেন যে, জাতির হিসাবে এটা বড়ই আশঙ্কাপ্রদ ব্যাপার। কারণ, ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রায় সমান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে জার্ম্মানির জনসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; কাজেই ফ্রান্সের শত্রু জার্ম্মানির সেনাবল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

যবনিকা।

১

আজি এই নিশীথের নিভৃত শয়নে,
নিদ্রাহীন নয়ন আমার ;
শূন্যমনে, শূন্যপ্রাণে, চাহি বাতায়ন পানে
চিন্তাস্রোত তরঙ্গবেগে দিয়েছি সাঁতার।
হেরিতেছি হেমন্তের শিশির আকাশে,
দূরব্যাপী দিগন্তের গায়,—
আমারি আঁখির মত দেবতার আঁখি শত
জেগে-আছে পরিপূর্ণ কৃপা মমতায়।

২

সুমুখে পবিত্র-জলা জননী জাহ্নবী ;
মুখে তাঁর স্নেহের বচন ;
কি অপূর্ব্ব প্রীতিভরে ধরার মৃত্তিকা পরে
বহিছেন বিশ্বপতি-বাঞ্ছিত জীবন।
কুহেলিকা-ঢাকা চাক মূর্ত্তি প্রকৃতির ;
কভু মুখে নাচিছে কেবল,—
গঙ্গার অপর পারে, কোথা কোন্ দীপাধারে,
কা'র কুটীরের-আলো মুমূর্ষু, চঞ্চল।

৩

কি গভীর শান্তিময় সমস্ত সংসার !
কি স্বপন-সঙ্গীতে নিস্তব্ধ।—
সারা দিবসের রণ ; শ্রান্তদেহ, ক্লান্তমন,
অকাতরে নিদ্রা যায় সৈনিক সকল।
কিন্তু শান্তি কোথা এই হিয়ার মাঝার ?
সুখসুপ্তি কোথা এ নয়নে ?
হেরি শুধু চারি ধার গুপ্ত অশ্রু-পারাবার
উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে নিশ্বাস-পবনে।

৪

প্রকৃতি !—পাষাণময়ী প্রকৃতি আমার !—
আলেশব ধরিয়া ও বুকে,
পূতনা-রাক্ষসী প্রায়, বালকুটে ভরা, হায়,
একি স্তন্য দিয়েছিস্ সন্তানের মুখে ?
নিদারুণ আত্মঘাতী অতি এ বাসনা !
এ যে তুষা জলন্ত অনল !
জহ্নু-গণ্ডুষের প্রায় নিমেষে গ্রাসিতে চায়
বিশ্বের ভাণ্ডার-ভরা রত্নসম্বল।

৫

ভুলাইতে হেন মুগ্ধ প্রমত্ত হৃদয়
কবেছিস্ কত না প্রয়াস !
প্রত্যেক কলিজা ঘেরে পাকে-পাকে শত ফেরে
পরাইয়ে-দিলি শুধু সৌন্দর্য্যের ফাঁস !
কত নব নব দেশে লইয়া ত্রিদিবি,
প্রমোদের তরী ভাসাইয়া ;—
হায়। সে সাধন-ধন সৌন্দর্য্যের বৃন্দাবন
কোথায় মিলিবে মর্ত্ত্য-মরুভূ খুঁজিয়া ?

৬

দেখাইলি মার মুখ—সংসার-কাননে
একমাত্র স্বরগের ফুল,—
স্নেহের তিয়াসা ঘোর তাতেও মিটে না মোর—
নূতন আকাঙ্ক্ষা আসি করিল আকুল ;—
বিশ্বের যশোদা সেই কোথা মা আমার ?
কোন্ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া,
স্তব-গীতি গোচারণে পাঠায়ে জীবন-ধনে
আগ্রহ-চুম্বিত-স্তনে আছেন চাহিয়া ?

৭

তা'র পরে দিলি-তুই যৌবনের বনে
হেমে-গড়া প্রেমের হরিণী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটি ছুটি, লুকেতে, কোলেতে উঠি
কত খেলা খেলিল সে দিবস-যামিনী !—
নাহি তৃপ্তি !—ভাবিতাম, কোথা সে নয়নে
বিছাইয়া বাসর-শয়ন,
আমার সে বিশ্বপ্রিয়া, মালাগাছি গুছাইয়া,
চকিতনয়নে করে যামিনীযাপন।

৮

এইরূপে উপেক্ষায়, অভিমান ভরে,
শূন্য করি' অন্তর-আগার,
যাহা কিছু দিয়েছিলি, সকলি গিয়েছে চলি,—
জগতের, জীবনের, যৌবনের সার।
বরষার গুরু-গুরু নাহি সে গর্জ্জন ;
বসন্তের নাহি সে বিলাস ;
আর সে শরৎ-বুকে শেফালি ফুটে না সুখে
নিদাঘে বহে না সেই দক্ষিণ বাতাস !

৯

ভাই আজি, বে পাষাণী, নয়ন-সলিলে
তোরে আমি সাধি এইবার,—
এ জনমে যার লাগি কবেছিস্ সর্ব্বত্যাগী
খোল্ তবে সেই চির-বহস্যের দ্বার।
মরমের অতি গুহ্য গোপন-ভবনে
মিলনের স্বপন-সমান,
কোথা কার কথা, হায়, নিশিদিন হৃদে ভায়
তাই দেখিবারে চায় ব্যাকুল নয়ান।

১০

আছে প্রেম, নাহি যথা ইন্দ্রিয়-বিকার;
আছে সত্য, নাহিক সংশয়;
স্বরগ-মণ্ডিত সব; স্বর্গে গুপ্ত গীতরব;
সর্ব্ব বাসনার সেই বিশ্রাম-নিলয়।—
দারুণ দুরাশা তোর, হায় রে মানব!
বৃথা তোর বিলাপ-বেদন;
জীবন-বন্ধন-গাঁথা আগে না করিলে নাশ,
জীবনের বরনিকা কে করে মোচন?

১১

এই সে সংসার মাঝে সাধিয়া সংযম
ধর তুমি তপস্বীর বেশ;
কবি ধর্ম্ম আরাধনা পুণ্যের শিশির-কণা
যথা পাও, পান কর তুলিয়া নিঃশেষ;
কর্ম্ম-সুরধুনী-নীরে আত্মার কলুষ,
প্রাণপণে কর প্রক্ষালন;
শুভ ফুলদল দিয়া সর্ব্বগুণে আরাধিয়া
হও শুভ্র-দেহমনে ফুলের মতন।

১২

একদা আসিবে মৃত্যু, মুকুলমালা গলে,
হাতে মাল্য-চন্দনের থাল,—
ধূলিময়, ধূলি পরে' অলক্ষ্যে পড়িবে ঝরে
জীর্ণ বস্ত্র সম যত জড়ভাব জাল।
সহসা বিমুক্ত তব মর্ম্মের আত্মার
দিব্য নেত্র উঠিবে অলিয়া;
স্ফুরিবে আলোক-শিখা, ঘুচে যা'বে যবনিকা
সমুখে সে স্বপ্নরাজ্য হাসিবে ভাসিয়া।

২৮ কার্ত্তিক, ১৩০২।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত রসিক-চন্দ্র বসুর "রামপ্রসাদ" এই-সংখ্যায় শেষ হইয়াছে।

লেখক রামপ্রসাদের রচনা হইতে তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্যতম এই যে, রামপ্রসাদ বৈদ্য নহেন,—কায়স্থ। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ দেখিয়া আমরা রামপ্রসাদকে কায়স্থ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিলাম না। যাহা হউক, তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, এমন মনে করা যায় না; তাঁহার সকল প্রমাণ ও অনুমানও সেরূপ প্রবল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তিনি যে ভাবে রামপ্রসাদের জীবনকাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত স্বরূপ চন্দ্র রায় "হিন্দুসমাজের নিকট নিবেদন" নামক একটি সাময়িক প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"ধর্ম্ম যাহা, তাহা চিরদিই থাকিবে; আস্তিক মাত্রেরই ঈশ্বরে শ্রদ্ধা আছে, তাহা যাইবার নহে। সামাজিক আচরণ, দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে। অতএব যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ, উন্নতি ও ঐক্যের দিকে ধাবিত হইতে পারে, যাহাতে বাঙ্গলা, কনোজ, গুজরাট, পুনার সামাজিক আচরণবিধির বিভিন্নতা বিনাশিত হয়, যাহাতে অসংখ্য গ্রন্থের পরিবর্ত্তে চলিত ভাষায় "কলির ধর্ম্ম" নামক একখানা গ্রন্থে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যায়, * * * হিন্দুসমাজ হইতে এরূপ

অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না, সমাজের নেতৃগণ এবিষয়ে চেষ্টা করেন, এই আমাদের নিবেদন।" লেখকের এই আশার স্বপ্ন অত্যন্ত মনোহর, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধুদিগের চেষ্টায় এ স্বপ্ন কখনও সফল হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হিন্দু সমাজের 'নেতৃগণ' কাহারা? অসংখ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পরস্পরবিরুদ্ধ মতসমূহের কে সমন্বয় করিবেন? করিলেও কে সেই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিবে? বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষ মানব-জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও মানবসমাজে সম্প্রদায়ভেদ রহিয়াছে। যত দিন মানবের চিন্তাশক্তি আছে, তত দিন মতের বিভিন্নতাও থাকিবে। বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়াও সমগ্র মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে;—একটি সার্ব্বজনীন উন্নতির উদারমন্ত্রে সকল মতাবলম্বীর সমন্বয়ই উপযুক্ত আছে,—বিভিন্ন মত বা সঙ্কীর্ণ দেশাচার বা দূষিত সংস্কার কখনও উন্নতির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। শ্রীযুক্ত কালী গোপাল রুদ্রের "আসামী ভাষা" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। আসামী ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লেখকের মতে অনাবশ্যক এবং অনিষ্টাবহ। 'নব্যভারত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "বনগৌরবস্পৃহা" একটি অদ্ভুত সন্দর্ভ। লেখকের মতে টাকায় সব হয়—এবং "সম্পাদক বল, লেখক বল, টাকার এ জগতে সকলই ক্রয় করা যায়।" কোন্ হাটে? কেহ কখন নব্যভারতের সম্পাদকের নিকট কোনও সম্পাদকের দর চাহিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু হায়। এখনও অনেক দুর্ভাগ্য সম্পাদক 'অবিক্রি' পড়িয়া আছেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই লেখকেরা অনবরত এমার্সন ও কার্লাইলের ভান করেন, কিন্তু কলমের সম্মুখে যে একটি নহী গুণ, তাহা অনায়াসে এবং অসঙ্কোচে ভুলিয়া যান। হইতে পারে, 'ভবের হাটে' মাঝে মাঝে সম্পাদকের কেনাবেচাও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া একপ কোনও ঘটনাবিশেষকে চিরসত্যের উদাহরণস্বরূপে গ্রহণ করা কি একজন 'সম্পাদকের' সুবুদ্ধির কার্য্য? এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষকুমার বড়াল 'সারদামঙ্গল'-প্রণেতা স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর উপর একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

২

"এসেছিল সুধু গাহিতে প্রভাতি,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম ঘোরে প্রাণী ভাবি-স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

৩

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ।
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন।
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?

৪

মৃত তোর ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোর শিশু কাঁদ-পো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর।
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

৫

কাঁদ তুমি কাঁদ।—অস্থিছে শ্মশান—
কত মুক্তাহার, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান—
অবসান চিরতরে।
পুণ্যবতী নার পুত পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে।

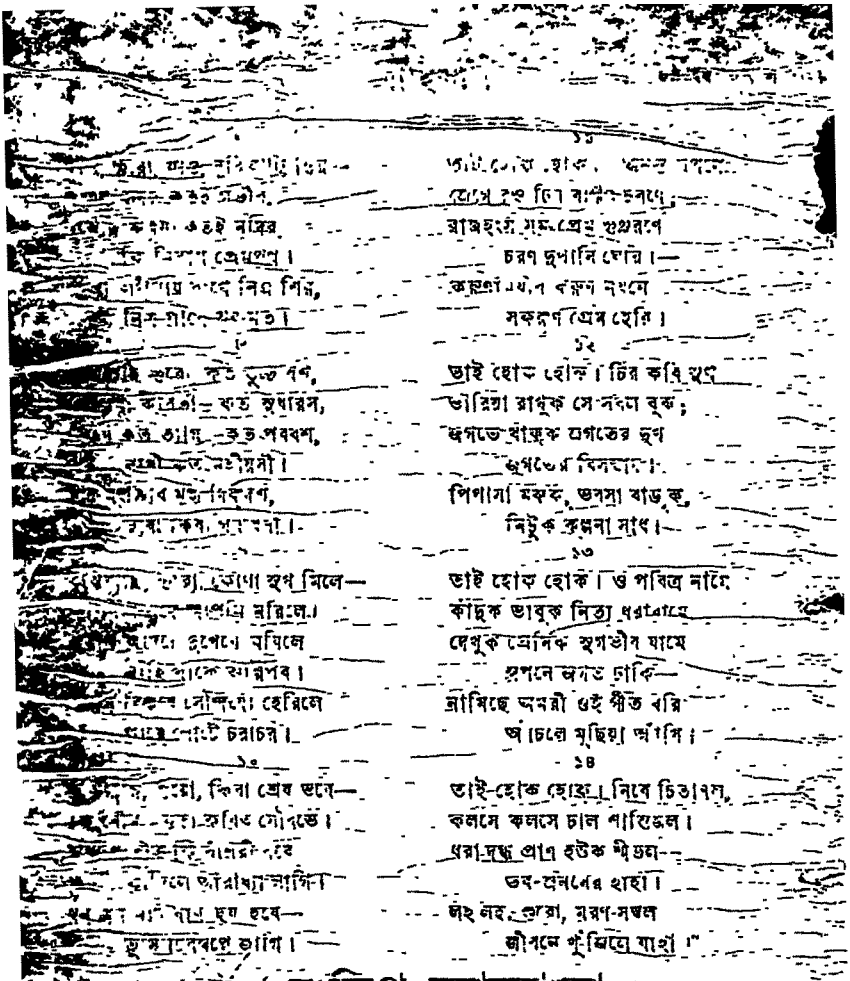

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিশুপাঠ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এই সচিত্র পুস্তক খানি শিশুদের জন্য রচিত। বাঙ্গালার শিশুপাঠ্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহার "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। "বালকপাঠ" তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিবে। গ্রন্থকার বাবু পদ্য ও গদ্য, উভয়বিধ রচনাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং অনেকাংশে বিষয়, ভাষা ও বিন্যাসে সফলতা লাভ করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ বাবুর শিশুপাঠ্য কবিতা গুলি যেমন বিশুদ্ধ, তাঁহার গদ্যও সেইরূপ আদর লাভ করিবে। বালকপাঠ্য বলিয়া মনোমত বিশুদ্ধ-সর্ব্বাঙ্গীন দেখা যায় না, স্কুলপাঠ্য-পুস্তকের-ভাষার যা বাঁধা নাই। "বালকপাঠ" ভাষা সেরূপ নহে। লেখক-ভাষা বিশুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার [illegible] কবিতাগুলি বালক-পাঠের দুই একটি সন্দর্ভ পড়িয়া আমরা [illegible] তাঁহার সকল সুন্দর সরল ভাষা মনে পড়ে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি [illegible] বিষয়ে আকর্ষণ করিতে। ইহার চিত্রগুলি যত্ননির্ব্বাচিত ও অনেক স্থলে সুন্দর হইয়াছে।

বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস।

৯১নং অপারসারকিউলার রোড, কলিকাতা।

(প্রেসিডেন্সি কালেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, (এডিনবার্গ) এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু, বি, মহোদয়ের সাহায্যে আমাদের এই এলোপ্যাথি ঔষধের কারখানায় প্রায় তিন শত রকম ঔষধ প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের কারখানায় যাবদীয় ঔষধ আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত হয়। হইয়া থাকে; ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে তালিকাপুস্তক পাঠান যায়।

সিরাপ অফ হাইপোফসফাইট অফ লাইম।

সর্দ্দি, কাশী, ক্ষয়কাশ, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুস রোগের অমোঘ ঔষধ। এই সিরাপ খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ইহার রং সুন্দর গোলাপী।

প্রতি বোতল ১৲ টাকা, ডজন ১১৲ টাকা।

কলেরা ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের জন্য।

ক্লোরোডাইন অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।৵০ আনা; ডজন ৩৸০, ঔষধের সহিত প্রয়োগবিধি দেওয়া যায়।

ডাক্তার কবিনিস্ ক্যাম্ফর; অর্দ্ধ আউন্স শিশি।১০; ডজন ৩৲ টাকা।

একোয়া-টাইকোটীস।

বা যমানী জল।

অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ ঔষধ। পেটে পেট কাঁপা, বুকজ্বালা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ তৎক্ষণাৎ দূর হয়, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও সুনিদ্রা হয়। ২৪ আউন্স বোতল ১৲ ডজন ৩৸০।

মফঃস্বলবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা যমানীজলসার প্রস্তুত করিয়াছি ইহার সহিত সাত গুণ জল মিশাইলে যমানীজল প্রস্তুত হয়।

৩ আউন্স শিশি ।৵০ ডজন ৫।০।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

এক্সট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কম্পাউণ্ড (গুলঞ্চ প্রভৃতি তরলসার) পালাজ্বর, বৌকালীন জ্বর প্রভৃতি সকলপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে কুইনাইন বা সিনকোনা নাই।

৬ আউন্স শিশি—১৲ টাকা। ডজন—৯৯৲ টাকা।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—ম্যানেজার।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জ্বর-প্লীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজার অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজস্ত্রীর বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু! বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-রমণী বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়। সুতরাং, যাঁহার জ্বরভাবের উপক্রম হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা করিতেছে, যাঁহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে; যাঁহার ক্ষুধা হয় না, যাঁহার কোষ্ঠ খোলসা হয় না, যাঁহার কাসি-সর্দ্দি হইয়াছে,—এইবেলা বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে না। বিজয়া বটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-প্লীহা-যকৃতাদি রোগে ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই যাঁহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—ডাক্তার কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর আত্মীয়বৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, আসামের কালাজ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগেই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	৷৷৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৷৵০	।০	৵০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়গ্রাম, পোষ্ট সাদিপুর,

মেডিকেল কলেজ হইতে ইংরেজিতে পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত।

৭৫।১ নং বিডন ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

চারিটী মহৌষধ।

যাঁহারা বহু দিনাবধি নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া হার মানিয়াছেন, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এবং জীবনে হতাশ ও বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন একবার মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টী তাচ্ছীল্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বাধক-বিজয়।

অনেকের বিশ্বাস বাধক রোগ জীবনের সঙ্গী, কোনও ক্রমেই আরোগ্য হয় না; কিন্তু আমার এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অবশ্যই তিরোহিত হইবে। বিষম-বেদনা ও যন্ত্রণা এবং হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাধক-রোগ এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য তিন পুরিয়া ১।০, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

জরায়ু-কল্যাণ।

জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা ও বেদনা, নাড়ীর বিকৃততা, আভ্যন্তরিক প্রদাহ ইত্যাদি অসুস্থতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক এবং অপরিসীম যন্ত্রণাপ্রদ। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে জরায়ু ও নাড়ী ঘটিত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ও পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ২ ঔন্স শিশির মূল্য ৫৷৷০ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রদর-চিন্তামণি।

এই পরম উপকারী ঔষধ সেবনে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং দাহ, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট সকল প্রকার প্রদর-রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১।০, প্যাকিং ৷৵০, আনা ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ক্ষত-নিসূদন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে খোষ, পাঁচড়া, ফোড়া, কাউর, ঘুর-ঘুরে, নালা ঘা, নারাঙ্গা, পশ্চিমে ধসা, সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা এবং জন্তুর দংশনজাত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে। ঘা যত দিনের পুরাতন ও যত পচা হউক না কেন এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে উপকার হইবে এবং কিছু দিনের মধ্যে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। মূল্য এক ঔন্স শিশি ১৲ টাকা,

ছত্রপতি শিবজীর জীবনচরিত।

(সচিত্র)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।

যিনি মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যন্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, আত্মসংযমে যিনি ব্রহ্মচারী, প্রজাবাৎসল্যে যিনি আদর্শ নরপতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মানুরাগে যিনি সকলের অগ্রগণ্য, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরের চরিত্র ইহাতে বহু অনুসন্ধানে গ্রন্থপাঠে যথাযথ রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল ইহারই উপকরণ সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার সুদূর মহারাষ্ট্র দেশ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু সন্তান মাত্রই যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সুমহৎ আদর্শ ও ব্রত প্রাপ্ত হন, তাহাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। মূল্যাদির বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

চিকিৎসা-জগতে নূতন আবিষ্কার!

কুষ্ঠ ব্যাধি ও বাতরক্ত পীড়ার পরীক্ষিত মহৌষধ।

কুষ্ঠঘ্ন তৈল, বটিকা, মলম ও পুরিয়া।

যত দিনের এবং যে প্রকারের কুষ্ঠ কিম্বা বাতরক্তের পীড়া হউক, উপরি উক্ত কয়েক প্রকার ঔষধ নিয়মমত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আমার ঔষধে পারদ কিম্বা কোন প্রকার ডাকারী দোষ নাই।

উক্ত বটিকা ও পুরিয়া সেবন করিলে, পারদ জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগও সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মলমে পারার ঘা, নালী ঘা ইত্যাদি সকল রকম ঘা আরোগ্য হয়।

বিশেষ সুবিধা।—৩৷৷০ টাকা অগ্রিম লইয়া দেড় মাসের ব্যবহারোপযোগী বটিকাদি পাঠাইব। প্যাকিং ও ডাকমাসুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ৪১ দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদি উপকার বোধ করেন, তবেই আমার প্রদত্ত ঔষধের মূল্য (অবশ্য অগ্রিম প্রদত্ত ৩৷৷০ টাকা বাদ দিয়া) পাঠাইবেন। রোগীর বয়স ও রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাকে জানাইতে হইবে। ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে অন্যান্য আবশ্যক বিষয় জানিতে পারিবেন।

এই ঔষধ সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরার" "সমভবাজার পত্রিকা" "হিন্দু পেটরিয়ট", "প্রকৃতি", "সঞ্জীবনী", "সুধাকর", "ট্রিবিউন" প্রভৃতি দেশের গণ্য মান্য সংবাদপত্র সকল কি বলিয়াছেন, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে ক্যাটালগ্ দেখুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ্ পাঠাইতে পারি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রামাণিক, রাণাঘাট,

কিম্বা ১৭৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।

৬, নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, ঘোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

ম্যারেজ ও ফ্যামিলি রিলিফ ফণ্ড।

ঠিকানা পোঃ অঃ বালিয়াপুরী; মহকুমা-মাণিকগঞ্জ।

নূতন প্রবর্ত্তন ও নূতন প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ নিম্ন অবস্থাপন্ন লোক সমূহের উপকার করিয়া উপরোক্ত দুইটী ফণ্ড স্থাপন করা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই মেম্বর হইতে পারিবেন। অপর কোন ফণ্ডে মেম্বর হইবার পূর্ব্বে আমাদের ফণ্ডের নিয়মাবলী একবার পড়িয়া দেখিবেন। ব্যারিষ্টার, হাকিম, উকীল, ডিক্রিক প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ডিরেক্টর হইয়াছেন। এক আনার ষ্টাম্প সহ আবেদন করিলে যে কোন ফণ্ডের নিয়মাবলী ও দরখাস্তের ফারম পাঠাইতে পারিবেন। কেহ এজেণ্ট হইলে কমিসন পাইবেন।

শ্রীনবেন্দ্র নাথ ঘোষ, বি, এ, সেক্রেটারি।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাশুল ⁄০ এক আনা।

"ইহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন সুরের লেন। শ্যামবাগান, সিমলা পোঃ, কলিকাতা; এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

নূতন গীতিগ্রন্থ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত

কল্কি-অবতার।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। ডাকমাসুল ১০ দুই পয়সা মাত্র।

২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে,

অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

কবিরাজ অভয় চরণ গুপ্ত কবিরত্নের

সুধাবটী।

১২০ বটীকার কৌটা—১৲ এক টাকা। প্রতি ১২ কৌটা—১০৲ দশ টাকা।

ইহা পাচক, রিরেচক, বক্তপরিষ্কারক এবং বলকারক; সুতরাং শরীরের ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লাবণ্য ও সাধন করিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহা আহার পরিপাক করিয়া মল নির্গত করে, অথচ অতিশয় ভেদ হয় না এবং শরীর বিচলিত করে না। আফিম ব্যবহারকারিদিগেরও বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোন পীড়ার উপক্রমে ২।১ দিন সেবন করিলে আর পীড়া হয় না। যে প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহা অল্পদিন সেবনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইহাতে কুইনাইন কিম্বা অন্য কোন দূষিত দ্রব্য নাই। অন্যান্য ঔষধের ন্যায় অল্প দিন পরেই পুনরায় জ্বর হয় না। অম্লপিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব একেবারেই দূর হইয়া মান ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ডাক্তার কবিরাজ বহুতর রোগীর প্রশংসাপত্র ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন।

অনেক সময় লেখার দোষে ঔষধ প্রেরণ করা হয় না। অতএব নাম গোপন না করিয়া স্পষ্ট হয়। বিদেশস্থ মহোদয়গণ ব্যবস্থা ও ঔষধের মূল্য ও মনি অর্ডার আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র চরণ গুপ্ত কবিরাজ,

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১নং নীলমাধব সেনের গলি, সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন।

আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি, "কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।" আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে অবিলম্বে আপনার স্ত্রীর জন্য এক বোতল ক্রয় করুন। তিনি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আপনি যদি বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করিতে [illegible] তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার [illegible] কুন্তলীনের নমুনা [illegible]। মনোনীত না হইলে ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। ইহাই "আমাদের নিবেদন।"

এইচ, বসু।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার;

২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩০২; পৌষ। ৯ম সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বি, এল্, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি, এল্, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্ এ, ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সাহিত্যের আদর্শ	৫৯১	১। সমাজনীতি	৬৩২
২। পোষলা (চিত্র)	৬০০	২। রাজনীতি	৬৩৪
৩। কুরুক্ষেত্র (সমালোচনা)	৬০১	৩। সীতারাম	৬৩৬
৪। মুখ নোকায় পা	৬২৫	৪। ত্রিলিন হাসি (কবিতা)	৬৪০
৫। নবযোগী সাহিত্য	৬২৭—৬৩৬	৮। মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা	৬৪০

কলিকাতা;

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

শর্ম্মা কোম্পানীর জ্বরাদির অব্যর্থ মহৌষধ।

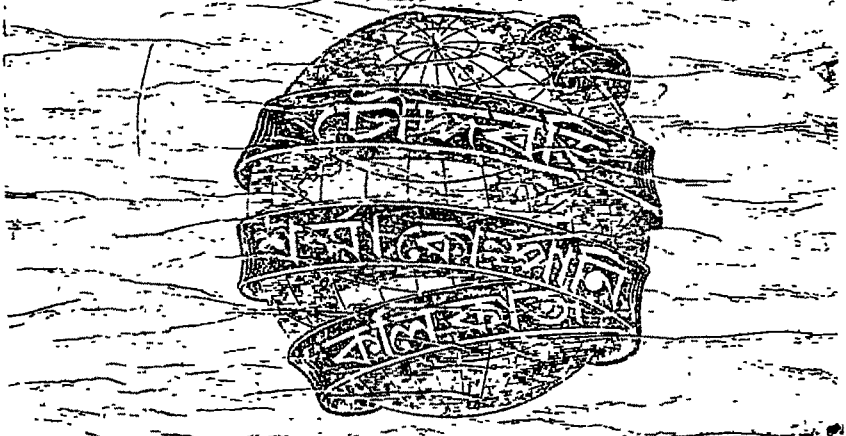

মূল্য প্রতিকৌটা ॥০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

(প্রকৃতে ১০ কৌটা পর্য্যন্ত ।০ মাশুলে যায়।)

১০০০০০ এক লক্ষ বড়ি বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই আজ "চৌদ্দবড়ির" অত্যাশ্চর্য্য গুণে চমৎকৃত। আজ জ্বরময় "চৌদ্দবড়ির" সুযশ। পুরাতন জ্বরের যে এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে, রোগ যত দিনের পুরাতন হউক না ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ২।৪ দিনেই অনুভব পায়। প্লীহা, যকৃত প্রভৃতির পীড়ায় যেখানে কোন ঔষধে ফল দেয় নাই, সেখানেও ইহার রোগনাশক ক্ষমতা খুব অল্প সময়ে প্রকাশ পাইবে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণজ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, নানারূপ চিকিৎসায় যাঁহারা সুফল পান নাই, তাঁহারা এই ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন, কথা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

প্রশংসাপত্র।—প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"আমি আপনার প্রকাশিত চৌদ্দবড়ি লইয়া গিয়া আমার এক প্রতিবেশীকে দিয়াছিলাম তিনি ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় প্রতিদিন জ্বর হইত, এই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ ৩ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "জীবন-রক্ষক" পুস্তক বিতরিত হইতেছে। ।০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি, এল্ প্রণীত

অবসর।

(স্বপ্রকাশিত গীতিকবিতা)

[উত্তম কাগজে উজ্জ্বল অক্ষরে সুচারুরূপে মুদ্রিত।]

ক্রাউন-আট পেজী এক শত সাট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অবসর সম্বন্ধে অভিমত,—

Babu Nabin Chandra Sen, poet :—

"I have gone through the poems spell-bound. There is feeling and freshness in them which is really refreshing. I have long been on the look-out for a rising star, and I am sure I shall not prove a false prophet if I say that I have at last seen one. Your *Meghdutta* first gave me its glimpses while your present book confirms my prophetic vision. May God grant you life and leisure to enrich the literature of our motherland. 16th Nov. 95.

"আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে 'অবসর' যে অতি উচ্চস্থানীয়, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ... The meeting of the Witangemot অতি উৎকৃষ্ট কবিতা; বাঙ্গালীর ভাষা ইংরাজিতে কবিতা লেখায় আমি বিপক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালী এমন সরস কবিতা ইংরাজীতে লিখিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।

দেবগৃহ;
২৫ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

শ্রীঅঘোরনারায়ণ বসু।

কলিকাতা; ২৮নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে ও অন্যান্য পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

দাসী, ডিসেম্বর ১৮৯৫।

"আমরা রবীন্দ্র বাবু, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী সে- প্রভৃতি কবিগণ হইতে অজস্র কুসুমোপহার পাইয়াছি। অবসরের ই হাঁদের দলের একজন, তাঁহার গীতি-কবিতার স্বাভাবিকত্বে ও সরলতা আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

মেঘদূত।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্. এ. সি, এস্. কৃত

মহাকবি কালিদাসের অতুলসুন্দর বিরহ-কাব্যের সুললিত বঙ্গকাব্যানুবাদ।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

The late Rai Bankim Chandra Chatterjee Bahadoor, C.I.E.:—

"I think very highly of your Meghdut. This saying includes every sort of detailed criticism of your work."

Babu Chandra Nath Basu:—

"..... The power, the art, the skill and the insight seen in your verse is a glory all your own."

The Honorable R. C. Dutt, C. S. C. I. E.:—

"..... The beauty and sweetness and skill of your style entrance the soul of the reader."

Prof. Krishna Kamal Bhattacharya:—

"..... A delightful work of poetry in Bengali."

Babu Rajendra Chandra Sastri:—

"..... None..... can compare to yours in point of general accuracy and literary excellence."

Sir R. C. Mitter, Kt.:—

"..... It will have a lasting place in Bengali literature."

The Hon'ble Justice Gurudas Banerjee:—

"..... The work deserves a high place in our poetical literature."

কলিকাতার সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। আমার নিকট হইতে লইলে ডাকমাশুল লাগে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক।

২৮ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস।

১নং অপারসারকিউলার রোড, কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সি কালেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, (এডিনবার্গ) এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এম, বি, মহোদয়ের সাহায্যে আমাদের এই এলোপ্যাথি ঔষধের কারখানায় প্রায় ভিন শত রকম ঔষধ প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের কারখানায় যাবদীয় ঔষধ আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত হয়। হইয়া থাকে; ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে তালিকাপুস্তক পাঠান যায়।

সিরাপ অফ হাইপোফসফাইট অফ লাইম।

সর্দ্দি, কাশী, ক্ষয়কাশ, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুস রোগের অমোঘ ঔষধ। এই সিরাপ খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ইহার রং সুন্দর গোলাপী। প্রতি বোতল ১৲ টাকা; ডজন ১১৲ টাকা।

কলেরা ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের জন্য।

ব্রোমাইড্ অফ্ আউন্স শিশি ।৵০ আনা; ডজন ৩৸০, ঔষধের সহিত প্রয়োগবিধি দেওয়া যায়।

ডাক্তার রবিনিস্ ক্যাম্ফর; অর্দ্ধ আউন্স শিশি।১০; ডজন ৬৲ টাকা।

একোয়া টাইকোটীস।

বা যমানী জল।

অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ ঔষধ। সেবনে পেট ফাঁপা, বুকজ্বালা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ তৎক্ষণাৎ দূর হয়, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও সুনিদ্রা হয়। ২৪ আউন্স বোতল ।৵০ ডজন ৩৸০।

মফঃস্বলবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা যমানীসলসার প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার সহিত সাত গুণ জল মিশাইলে যমানীজল প্রস্তুত হয়।

৩ আউন্স শিশি ॥০ ডজন ৫।০।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

এলট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কম্পাউণ্ড (গুলঞ্চ প্রভৃতি তরলসার) পাঁচাজ্বর, দৌকালীন জ্বর প্রভৃতি সকলপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে কুইনাইন বা সিনকোনা নাই।

৬ আউন্স শিশি—১৲ টাকা, ডজন—১১৲ টাকা।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বসু—ম্যানেজার।

স্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

[illegible] এক ডোজ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। [illegible], এবং যাহাদি রোগ নিবারণের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ [illegible] হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজাদি অট্টালিকায় এবং [illegible] সেবে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, [illegible] কি গৃহবিবাদে, —সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিজয়া ইংরেজ [illegible] বিজয়া বটিকা পরম প্রিয়। হা! যত ইংরেজ-স্কুল এবং ইংরেজ-মহিলা বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ [illegible] হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহস্র রোগের ঔষধ হইয়াও কোনটার উপযুক্ত হইয়াছে, যাহার চক্ষু জ্বালা, [illegible] যাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, যা কোমর বাঁধিয়াছে; ইহার [illegible] না, যাহার পেট খোলসা হয় না, যাহার কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়াছে,—এই [illegible] বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে না। বিজয়া বটিকার গুণ্ডি পেকেই ম্যালেরিয়া জ্বর পলায়ন করে।

অধিকন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি অন্ন পৌহা-পক্ষতাদি রোগে [illegible] ভুগিতেছেন, দাঁত-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই যাঁহার দাড়াতে জ্বর থাকে,—ডাক্তার-কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগী ও বিজয়া বটিকা [illegible] আরাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর আত্মীয়-স্বজন মুগ্ধ হইতেছেন। লম্পট্য, পাপাজন, আসামের কামাখ্যার, [illegible] পূর্ণিমার দিন, দুইনাইনে আটকান জ্বর, পক্ষাঘাত জ্বর,—সর্ব্বপ্রকার জ্বরকেই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	৸০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৲০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৷৵০	।০	৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৫৪	৪৷০	।০	৵০

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

[illegible]—[illegible] ঔষধের উৎপত্তি-স্থান [illegible], [illegible] মাদিপুর, [illegible] কুঠিয়াল—কলিকাতা [illegible] নং, সি, [illegible] লেন; অথবা—[illegible]

মেডিকেল কলেজ হইতে ইংরেজিতে পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত।

৭৫।১ নং বিডন ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

চান্দিচী মহৌষধ।

যাহারা বহু দিনাবধি নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, ডাক্তারী ও কবিরাজীচিকিৎসা করাইয়া হার মানিয়াছেন, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এবং জীবনে হতাশ ও বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন একবার মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টী তাচ্ছীল্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বাধক-বিজয়।

অনেকের বিশ্বাস বাধক রোগ জীবনের সঙ্গী, কোনও ক্রমেই আরোগ্য হয় না ; কিন্তু আমার এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস চিরদিনই তিরোহিত হইবে। বিষম বেদনা ও যন্ত্রণা এবং হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাধক রোগ এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য তিন শিশির ১৲, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

জরায়ু-কল্যাণী।

ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা ও বেদনা, নাড়ীর বিকৃততা, আভ্যন্তরিক প্রদাহ ইত্যাদি অসুস্থতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক এবং অপরিসীম যন্ত্রণাপ্রদ। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে জরায়ু ও নাড়ী ঘটিত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ও পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ২ ঔন্স শিশির মূল্য ৷৷০ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রদর-চিন্তামণি।

এই পরম উপকারী ঔষধ সেবনে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং দারুণ দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট সকল প্রকার প্রদর রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ২৲, প্যাকিং ৷৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ক্ষত-নিসূদন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে ঘোর, পাঁচড়া, ফোড়া, ঘুঁউর, ঘুর, নালী ঘা, নারঙ্গি, গঙ্গিমে ধরা সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা এবং অস্ত্রের দংশনজাত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে। ঘা যত দিনের পুরাতন ও যত পচা হউক না কেন এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে উপকার হইবে এবং কিছু দিনের মধ্যে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। মূল্য এক ঔন্স শিশি ১৲ টাকা প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীলখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।

যিনি মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যন্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, আত্মসংযমে যিনি ব্রহ্মচারী, প্রজারঞ্জনে যিনি আদর্শ নরপতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মানুরাগে যিনি সকলের অগ্রগণ্য, সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরের চরিত্র ইহাতে বহু অনুসন্ধানে ও বহু গ্রন্থপাঠে যথাযথ রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল ইহারই উপকরণ-সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার সুদূর মহারাষ্ট্র দেশ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু সন্তান মাত্রই যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সুমহৎ আদর্শ ও ব্রত প্রাপ্ত হন, তাহাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। মূল্যাদির বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

চুলকোঁকড়ান তৈল।

এই মদগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহারে চুল আপনা হইতে কোঁকড়াইয়া যায়, এবং সর্ব্বক্ষণ মস্তিষ্ক শীতল রাখে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

চুলের কল্প।

এই কল্প জলের ন্যায় তরল। যত দিনের বা যেরূপ পক্ককেশ হউক না কেন, লাগাইবামাত্র উজ্জ্বল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ২।৩ মাস কাল থাকে মূল্য ১৲ এক টাকা।

দে মল্লিক এণ্ড কোং।

২৯ শোভারাম বসাকের লেন, কলুটোলা; কলিকাতা।

সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের

২ দুইখানি মনোহর নূতন উপন্যাস

(১) পারিজাত-মালা, (২) মোহন-মালা।

দুইখানির মূল্য ।৷০ হিসাবে ১৲ টাকা। সুতরাং অতি কম। দুইখানিতে ১৮টি গল্প আছে। গল্পগুলিতে প্রাণমন হরণ করিবে। পড়িতে আরম্ভ করিলে ভাবে তন্ময় হইয়া, পাঠক আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই মোহিত হইবেন। এমন অপূর্ব্ব চুট্‌কি গল্প বাঙ্গালায় আর নাই। 'পারিজাতের' সৌরভ যেমন স্বর্গীয়, 'মোহন-মালা'র গৌরব তেমনই দেশ-প্রসিদ্ধ; পাঠক, কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে লইবেন? সতী নারীর ইহা অবশ্য পাঠ্য, সাধক ও সংসারির ইহা কল্পতরু স্বরূপ। হারাণবাবুর অমৃতময়ী লেখনী ইহাতে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। গল্পপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা এই অমৃতসমুদ্রে অবগাহন করুন। ছাপা ও কাগজ উত্তম।

"বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম"।

বঙ্কিমের জীবনীসহ, মূল্য ।৷০ আনা। মনোহর গল্প 'দুইভাই' ৵০ ও "একটি চিত্র" ৵০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা-জগতে নূতন আবিষ্কার!

কুষ্ঠ ব্যাধি ও বাতরক্ত পীড়ার পরীক্ষিত মহৌষধ।

কুষ্ঠঘ্ন তৈল, বটিকা, মলম ও পুরিয়া।

যত দিনের এবং যে প্রকারের কুষ্ঠ কিম্বা বাতরক্তের পীড়া হউক, উপরি উক্ত কয়েক প্রকার ঔষধ নিয়মমত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। আমার ঔষধে পারদ কিম্বা কোন প্রকার অপকারী পদার্থ নাই।

উক্ত বটিকা ও পুরিয়া সেবন করিলে, পারদ জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগও সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত মলমে পারার ঘা, নালী ঘা ইত্যাদি সকল রকম ঘা আরোগ্য হয়।

বিশেষ সুবিধা।—৭৷৷০ টাকা অগ্রিম লইয়া দেড় মাসের ব্যবহারোপযোগী বটিকাদি পাঠাইব। প্যাকিং ও ডাকমাসুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ৪১ দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদি উপকার বোধ করেন, তবেই আমার প্রদত্ত ঔষধের মূল্য (অবশ্য অগ্রিম প্রদত্ত ৭৷৷০ টাকা বাদ দিয়া) পাঠাইবেন। রোগীর বয়স ও রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাকে জানাইতে হইবে। ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিলে অন্যান্য আবশ্যক বিষয় জানিতে পারিবেন।

এই ঔষধ সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিরার" "অমৃতবাজার পত্রিকা", "হোপ" "হিন্দু পেটরিয়ট", "প্রকৃতি", "সঞ্জীবনী", "সুধাকর", "ইণ্ডিয়ান বিউন" প্রভৃতি দেশের গণ্য মান্য সংবাদপত্র সকল কি বলিয়াছেন, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে ক্যাটালগ্ দেখুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ্ পাঠাইতে পারি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রামাণিক, রাণাঘাট,

কিম্বা ১৭৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

স্বাস্থ্যবিষয়ক নূতন পুস্তক !

আমিষ ও নিরামিষ আহার !

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।

৬, নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

ম্যারেজ ও ফ্যামিলি রিলিফ ফণ্ড।

টিকানা পোঃ অঃ বানিয়াপুরী, নহকুমা মাদিকগঞ্জ।

নূতন ধরণে ও নূতন প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ নিম্ন অবস্থাপন্ন লোকের উপযোগী করিয়া উপরোক্ত দুইটী ফণ্ড স্থাপন করা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এ পুস্তক মাত্রেই যেমন হইতে পারিবেন। অপর কোন ফণ্ডের নেম্বর হইবার পূর্ব্বে আমাদের ফণ্ডের নিয়মাবলী একবার পড়িয়া দেখিবেন। ব্যারিষ্টার, হাইকোর্টের এটর্ণি, উকিল, প্লিডার প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ডিরেক্টর হইয়াছেন। এক আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে যে কোন ফণ্ডের নিয়মাবলী ও দরখাস্তের ফারম পাইতে পারিবেন, কেহ এজেণ্ট হইলে কমিসন পাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ, বি, এ, সেক্রেটারি।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাশুল ।০ এক আনা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উত্তম পাণ্ডিত্য ও হৃদয় নিঃসৃত আছে। উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে। শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন সুরের লেন। পোয়াবাগান, সিমলা পো, কলিকাতা। এই ঠিকানায় প্রাপ্তিব্য।

সাহিত্যের আদর্শ।

ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি সাহিত্যেও ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস প্রকাণ্ড মহাভারত লিখিয়া পতিপ্রাণা গান্ধারীর মুখে গাইলেন—

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়। তাঁহার সেই ছত্র কাহার না মুখস্থ আছে, যে ছত্রে তিনি ভগবানকে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমোল্লাসে গাইয়াছেন;—

"জয়োঽস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

ভগবানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহারা ভগবানের আশ্রিত, তাহাদিগেরই জয় হউক।—কেবল এই কথা সঙ্গীত হইয়াছে, এমন নহে, কাণ্ড মহাভারতে সেই ধর্ম্মপক্ষই, সেই ভগবদাশ্রিত দেবপক্ষই প্রবল হইয়াছে। মনুষ্যের পাপচিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে, কুরুপক্ষীয় চিত্র অপেক্ষা আর কোন্ চিত্র উজ্জ্বল? কিন্তু তদপেক্ষাও আর এক উজ্জ্বলতর চিত্র আছে—সে চিত্র পাণ্ডবপক্ষীয় কৃষ্ণার্জ্জুনসহায় ধর্ম্মপক্ষ; এই চিত্রের বর্ণগৌরবে পাপচিত্র নিষ্প্রভ; ধর্ম্মের জয়ে পাপ বিধ্বস্ত—একেবারে সমূলে নিপাতিত। পবিত্র কুরুক্ষেত্রনামক ধর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এক প্রকাণ্ড চিত্র বাল্মীকির। বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণ ভক্তির সুপ্রসারিত মহাদেশ—সে দেশেও ধর্ম্ম বিজয়ী। ধর্ম্মের বিজয়পতাকা অযোধ্যা হইতে লঙ্কার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত উড়িতেছে। রাক্ষসকুল এত যে প্রবল, তাহা ভগবদ্ভক্তির প্রবলতর তরঙ্গে নিপাতিত হইয়াছে। রাম-পক্ষের পুণ্যময় রাজ্য, কি লঙ্কা, কি অযোধ্যা, সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামরাজ্যের সময় হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ, কুমারী অন্তরীপ কি, লঙ্কার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষেত্র। মহাদণ্ডকারণ্যেও আর অপুরুষভয় নাই। কোথায় অরণ্যে বসিয়া কোন্ শূদ্র তপস্যা করিতেছে, সেও রামচন্দ্রের স্পর্শে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

পৌরাণিক কাব্য ছাড়িয়া, প্রকৃত সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ কর; সেখানেও সেই দৃশ্য। যে ক্ষেত্রের অধিনায়ক, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিগণ, সে ক্ষেত্রেও সেই ধর্ম্মের জয়। কালিদাস কি

ধর্ম্মময় তুলিকারাগে কুমারের অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন! সেখানে উমার তপস্যা, হিমালয়ের শিবানুরাগ কেমন অসাধ্যসাধন করিয়াছে। সেই বর্ণগৌরবে সমগ্র কাব্য উদ্ভাসিত। আর শকুন্তলা,—বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলা—যাহার চিত্রে জগৎ মুগ্ধ, সেই শকুন্তলায় কিসের চিত্র? তাহাতে ঋষির আশ্রমচিত্র, শকুন্তলার সহৃদয়তার চিত্র,—যে সহৃদয়তা সমস্ত পশুপক্ষীকেও প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিল; শকুন্তলার প্রগাঢ় প্রেমানুরাগের চিত্র—যে জগৎ বিসারী প্রেমানুরাগ এক প্রবল পতিভক্তিতে সমুন্নত হইয়া তাহাকে তপস্বিনী করিয়াছিল। আর ধর্ম্মময় চিত্র দুষ্মন্তের—যিনি প্রবল ধর্ম্মানুরাগে পূর্ণ হইয়া তেমন জগৎললামভূতা, ঋষিজনপ্রেরিতা, তদাত্মসমর্পিতা, অনায়াসলব্ধা, ভাবিণ্যময়ী শকুন্তলাকে সভার মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আবার যখন সেই শকুন্তলাকে মনে পড়িল, তখন তাহার অনুতাপচিত্র দেখিলে কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? কালিদাস সেই ধর্ম্মানুতাপচিত্র "চিত্রদর্শন" অঙ্কে কত উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ধর্ম্মানুতাপ দেখিতে চাও, তবে দেখ, ভবভূতির "ছায়ার" অঙ্কে। রামের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়চিত্র সেই অঙ্কে প্রতিফলিত। এই সমস্ত চিত্র দেখিয়া বল দেখি, আর্য্য সাহিত্য পড়িয়া ধর্ম্মানুরাগে তোমার হৃদয় পূর্ণ হয় কি না? সহস্র পাপপ্রলেপে তোমার হৃদয় কলুষিত থাকুক না কেন, তবু এই আর্য্য সাহিত্য পাঠে তোমার হৃদয় একটু ধর্ম্মানুরাগে উত্তপ্ত হইবেই হইবে। একটু ধর্ম্মের দিকে বিচলিত হইবেই হইবে। আর্য্য সাহিত্যের ইষ্টার্থ বা অধ্যয়নফল এতই সুন্দর, এতই উৎকৃষ্ট, এতই শাস্তরসপরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

কিন্তু ইউরোপীয় বা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের ফল কিরূপ? যে আদর্শ আর্য্য সাহিত্যের প্রাণ ও গৌরব, যাহা সেই সাহিত্যকে জগৎললামভূত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই উচ্চাদর্শের ধর্ম্মনৈতিক সুন্দর আদর্শ কি আমরা ইংরাজী সাহিত্যে দেখিতে পাই? তাহাতে মনুষ্যসমাজ ও মানবপ্রকৃতির চিত্র আছে বটে, কিন্তু সে চিত্র কি ততই ধর্ম্মগৌরবে পূর্ণ? ইংরাজী সাহিত্যে স্থলে স্থলে ধর্ম্মসৌন্দর্য্য নাই, এমত নহে; কিন্তু তাহা এতই নিবিড়বনাচ্ছন্ন যে, তাহার কান্তি তত পরিদৃশ্য হয় না। ঘন বনমধ্যে যেন একটি নবমল্লিকা নিভৃতে তাহার সৌন্দর্য্য লইয়া বিলীন হইয়াছে। চারি দিকে কণ্টকপূর্ণ বিটপী লোকলোচনের অপ্রিয়তা সাধন করিয়াছে।

চারি দিকে হিংস্র জন্তুগণের মহাভীষণ রবে অরণ্য পরিপূর্ণ—এতই পরিপূর্ণ যে, সে রবে পক্ষীর সুকণ্ঠনিঃসৃত কাকলী মিলাইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়গণ স্পর্দ্ধা করেন যে, আমরা প্রকৃতির চিত্রকর; যেন প্রকৃতি-চিত্র প্রাচ্য সাহিত্যে নাই। প্রকৃতি-চিত্র আর্য্য সাহিত্যে আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও আছে; তবে প্রভেদ এই, ইংরাজী সাহিত্যে সেই প্রকৃতির সমলা নগ্নমূর্ত্তি, আর্য্য সাহিত্যে তাহার ধর্ম্মোন্নত মধুরিমা। ইংরাজী সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির পাশব ও আসুরিক বর্ণগৌরব, আর্য্য সাহিত্যে সেই প্রকৃতির দেবতুল্য ভাবের উৎকর্ষ। মানব প্রকৃতি দেবভাবে সমুন্নত হইয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহা আর্য্যচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই সৌন্দর্য্যে তাহার আসুরিক ভাব প্রচ্ছন্ন; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজী সাহিত্যে মানব প্রকৃতির পাশব ভাবের এবং ঐন্দ্রিয়িক প্রবৃত্তিসমূহের এত প্রাধান্য যে, তাহাতে তাহার দেবভাব সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কাব্য সাহিত্যের যিনি অগ্রগণ্য, ইংরাজ জাতির গর্ব্বস্বরূপ সেই সেক্‌স্‌পিয়ারের দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় এ কথা প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। আমরা তাঁহার কাব্যবিশেষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র নাটকাবলির অধ্যয়নফলস্বরূপ যাহা পাই, তাহারই বিষয় বলিতেছি।

সেক্‌স্‌পিয়ার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জগতের জনসমাজ এবং মানবপ্রকৃতির চিত্রকর; কেবল চিত্রকর নহেন, তিনি একজন মহাকবি। তিনি সেই জনসমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও লোকজনের সজীব চিত্র দিয়াছেন। চিত্র সকল এত পরিপাটী, এত প্রকৃত, এত প্রস্ফুটিত, যেন ফটোগ্রাফের মত বোধ হইতে থাকে। তাঁহার নাটকীয় ব্যক্তিগণকে যেন সজীব মনে হয়। এ বড় কম ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার যে সকল নাটক বিয়োগান্ত নহে, তাহাদিগের ধাতু এই প্রকার। কিন্তু কবির প্রধান সম্পত্তি তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি। এই দৃশ্যকাব্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এ রাজ্যে তিনি শুদ্ধ চিত্রকর নহেন, এখানে তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেদীপ্যমান। কাব্যরসে তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি উচ্ছলিত, সৃষ্টি চাতুর্য্যে তাহা পরিশোভিত। এজন্য ট্র্যাজিডিসমূহই তাঁহার যশের প্রধান নিদানস্বরূপ হইয়াছে। ট্র্যাজিডি ও কমিডি, এই উভয়বিধ রচনাকৌশলে তিনি ইউরোপীয় কাব্যজগতে অসামান্য কবি। তাঁহার এই অগ্রগণ্য ট্র্যাজিডিসমূহ সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

সেক্‌স্‌পিয়ার মানবপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য, এবং সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য কি না, সে কথার বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে তিনি যাহা বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত, আমরা তাহারই কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি অসাধারণ কবিরূপেই সুবিখ্যাত। কোনও প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহার মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রাঙ্কনে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন :—

"O Nature! O Shakespeare! Which of ye drew from the other!"

"হে প্রকৃতি! হে সেক্‌স্‌পিয়ার, তোমরা কে কাহার অনুচিত্র!"

যদি তিনি মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপ চিত্র দিয়াছেন? মানবপ্রকৃতি দোষগুণের আধার;—তাহাতে একাধারে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব বিদ্যমান। আহার, নিদ্রা, রোগ, শোক, কামাদি রিপুর সহিত মানব পশুবৎ; বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচারাদি সম্পন্ন হইয়া মানবের মনুষ্যত্ব; এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি গুণে মনুষ্য দেবতুল্য। এই ত্রিবিধ গুণে—এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে—মানবপ্রকৃতি সমলা। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারেও মানবের পাপাংশই অধিক। জনসমাজের অধিকাংশ লোকে কিছু শ্রেষ্ঠগুণের পরিচয় নাই, সমাজের অধিকাংশই রাজসিক, এবং তমোগুণান্বিত; সুতরাং জনসমাজ অধিকতর সমল। যিনি সেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিতে যাইবেন, তাঁহাকে ততোধিক সমলা প্রকৃতিরই ছবি আঁকিতে হইবে এবং যাঁহাকে জনসমাজের চিত্র দিতে হইবে, তাঁহাকে রাজসিক ও তমোগুণান্বিত সাধারণ লোকসমাজেরই প্রতিকৃতি দিতে হইবে; নহিলে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্র যথাযথ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয় জনসমাজ যে সকল বিশেষ দোষগুণের আধার, তাহাতে যে বিশেষ প্রকার তমঃ ও রজোগুণের বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপীয় কবির চিত্রে তাহারই প্রকৃত ছবির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সেক্সপিয়ারে যদি প্রকৃতি যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার চিত্রগুলিতে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের আলোকান্ধকার এবং দোষ গুণই ঠিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; আলোক আঁধার এবং দোষ গুণ সেইরূপ পরিমাণে প্রতিবিম্বিত, যেরূপ পরিমাণে প্রকৃতিতে তাহা জাজ্বল্যমান। তাহার কমও নহে বেশীও নহে। পরিমাণের ন্যূনাধিক্য ঘটিলে চিত্র প্রকৃতির যথাযথ প্রতিবিম্ব হইবে না। ইউরোপীয় জনসমাজে ও লোক-

চরিত্রে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার বিশেষ দোষ গুণের সমাবেশ, সেক্সপিয়ার তাহারই অনুকৃতি। তৎকালে খৃষ্টানের মনে মানবপ্রকৃতি যত দূর মলিন, তত দূর মলিনতা সেক্সপিয়ারে। চিত্রকররূপে সেক্সপিয়ার এইরূপ; কিন্তু সেক্সপিয়ার ত নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকর নহেন; তিনি যে স্রষ্টা; তিনি কিসের সৃষ্টি করিয়াছেন?

জনসমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া যিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যেন তাহার যথাযথ ফটোগ্রাফ ছবি তুলিতে পারেন, তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, তাহাতে দোষের ভাগই প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। কবি জগতের শিক্ষাদাতা। কবি কিরূপে শিক্ষা দিবেন? যাহাতে জনসমাজের সেই দোষের পরিমাণ কমে, প্রকৃষ্ট উপায় তাঁহাকে করিতে হইবে। জনসমাজকে অধিকতর সত্ত্বগুণসম্পন্ন করা কি উপায়ে সম্ভবে, তাহারই নির্ণয় করা কবির কার্য্য। কবি সেই উপায়াবলম্বনে জগতের গুরু। এই উপায়ের ভেদেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কবির প্রভেদ। এই উপায়াবলম্বনে কবি সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিক্ষাদাতা। পাশ্চাত্য কবি যাহার সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাচ্য কবি তাহা করেন নাই; প্রাচ্য কবি বিভিন্ন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক জন মানবসমাজের রজঃ ও তমোগুণকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার কুফল কত ভয়ানক; অন্য জন সত্ত্বগুণকে সমুজ্জ্বল করিয়া সেই দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সাত্ত্বিক রাজ্য কি সুখের আলয়। এক জন ঘোর নরকের সৃষ্টি করিয়া তাহার দাহ ও যন্ত্রণা দেখাইয়া লোক-সমাজকে পাপ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য জন স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও সুখের দিকে লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়ার নরক ও তাহার যন্ত্রণার সৃষ্টি, প্রাচ্য কবি ব্যাস বাল্মীকি পুণ্যময় [illegible] স্বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা নিজ নিজ সৃষ্টিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কোন্ কবি অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, লোকসমাজের ফলাফল দর্শনে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হিন্দু জনসমাজ কি ইউরোপীয় জনসমাজ অধিকতর ধর্ম্মশীল, অধিতকর সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ, অধিকতর দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও ভক্তিগুণে সম্পন্ন? কোন্ জনসমাজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবলা? এই প্রশ্নের সমাধান করিলেই সেই কবিগণের সৃষ্টির ফলাফলও নির্ণীত হইবে।

পাশ্চাত্য কবির উপকরণ তদীয় সৃষ্টির অনুকূল। তাঁহার উপকরণ ট্র্যাজিডি। ট্র্যাজিডি যে ধরণের রচনাপ্রণালী, তাহাতে নরকের সৃষ্টি ও তাহার দাহ এবং যন্ত্রণা দেখাইবারই উপযোগী। ট্র্যাজিডি অসুরসৃষ্টির যত উপযোগী, দেবসৃষ্টির তত উপযোগী নহে। কারণ ট্র্যাজিডিতে মানবীয় প্রচণ্ড পাশব প্রবৃত্তিকে এত প্রবলা করিতে হয়, যেন তাহা খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। অনেক সময়ে সেই প্রচণ্ডতা প্রায় অমানুষী হইয়া পড়ে। আমরা সচরাচর সংসারক্ষেত্রে রিপুপ্রাবল্যের যে প্রকার দৃষ্টান্ত পাই, তাহাতে খুন দেখিতে পাই না। খুন জন-সমাজে কিছু সর্ব্বদা ও সচরাচর ঘটিতেছে না। বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত জনপূর্ণ সমাজে দুই দশটি খুন ঘটে। সেই খুনে দেখিতে পাওয়া যায়, হয় লোভ, না হয় বিদ্বেষ, না হয় হিংসা, না হয় স্ত্রীর প্রতি সন্দেহজনিত কোপাগ্নি, অতিমানুষী সীমায় উঠিয়া খুনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেক্‌স্‌পিয়ার সংসারক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত পাইয়া তাঁহার ট্র্যাজিডির সৃষ্টি-রাজ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি লেডি ম্যাকবেথ ও লর্ড ম্যাকবেথের সৃষ্টি করিয়াছেন। ওথেলো এবং ইয়াগো, রোমিও এবং জুলিয়েট, ব্রুটস এবং রিচার্ড প্রভৃতি সবগুলই তাঁহার অমানুষী সৃষ্টি—ট্র্যাজিডির সম্যক্ উপকরণ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নরকযন্ত্রণা ও দাহ। এই সৃষ্টির মধ্যে রিপু-প্রাবল্য আসুরিক সীমায় আসিয়াছে। শ্লিগেল্ (Schlegel) বলিয়াছেন, লেডি ম্যাক্‌বেথ একটি Female Fury স্ত্রী অসুরী। তত সাহস, বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং নির্দ্দয়তা কেবল অসুরেই সম্ভব। সেই লেডি ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে আমি যাহাকে স্তন পান করাইতেছি, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারি। আমাদের পূতনাসুরীর সঙ্গে তাহার কত সাদৃশ্য! পূতনা স্তনপান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিল। ততই বিশ্বাসঘাতকতা, ততই দেব-দ্রোহিতা পূতনায়ও লক্ষিত হয়। যে আসুরিক প্রেমে প্রজ্বলিত হইয়া জুলিয়েট সুন্দরী রোমিওর কাছে নানা বাক্‌ছলে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার যৌবনলালসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি যদি সেইরূপ করিয়া এক জন রাম বা লক্ষ্মণের কাছে যাইতেন, তাঁহার কি দশা ঘটিত? নিশ্চয়, সূর্পণখার মত তাঁহার দশা ঘটিত। সূর্পণখা বিফল হইয়া মহা সমরাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, জুলিয়েট আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছিলেন। সামান্য সূত্রে ইয়াগোর চাতুরীজাল এত অমানুষী সীমায় আসিয়াছিল যে, তাহাতে তাহার অন্নদাতা ওথেলোকে স্ত্রী-হত্যা পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। রিচার্ড না বলিয়াছিল যে, আমি যখন প্রকৃতির হস্তে বিকলাঙ্গ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, তখন আমি কর্ত্তব্যেও অসুর হইয়া উঠিব।

——"Since I can not prove a lover,
* * *
I am determined to prove a villain."

প্রকৃতপক্ষেও সেক্‌স্‌পিয়ার তাহাকে অসুররূপেই প্রদর্শিত করিয়াছেন। আর আমরা কত বলিব?

শুদ্ধ সেক্‌স্‌পিয়ারে কি এই আসুরিক আদর্শ? বিলাতী শ্রব্য কাব্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে (Paradise Lost) কি আদর্শ দিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বহুকাল পূর্ব্বে কলেজে মিল্টনের কিয়দংশ পড়িয়াছিলে? পরে, ঘরে বসিয়া তাহার অপরাংশের অধ্যয়ন শেষ করিয়া থাকিবে? সেই পাঠের কিরূপ স্মৃতি তোমার অন্তরে জাগিতেছে? তোমার অন্তরে সেটানের (Satan) ভীষণ আসুরিক মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোন্ মূর্ত্তি তত জাজ্বল্যমান? সয়তান মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানরূপে কার্য্য করিতেছে। ত্রিভুবন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র—সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অপরিমেয় শক্তি ও কৌশলে ভগবানের সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত। যে ভগবান বাস্তবিক সর্ব্বশক্তিমান, সেই বজ্রধর মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে যে কোথায় আছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সয়তানের প্রভূত বিক্রম ও আসুরিক ক্ষমতা, তাহার দেবদ্রোহিতা ও দেবদ্বেষ কাব্যময় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। সয়তানের পরই "এড্যাম এবং ইভের" দেবদ্রোহিতা এবং দেবভক্তির বিচ্যুতি-চিত্র—সয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া কেমন তাহারা পাপে অনুরক্ত হইল, এবং তাহার ফলাফল কি হইল,—পাপের এই বিষময় পরিণাম দেখাইবার নিমিত্ত মিল্টনের এত আয়োজন। মিল্টনের মনে মানবপ্রকৃতির যে তমোময় মলিন ভাব, সেই ভাবে সেই প্রকৃতিকে চিত্রিত করিবার জন্য, তাঁহার মহাকাব্যের সৃষ্টি। তবে তিনি তাহার দেবভাব দেখাইবেন কিরূপে? যে প্রকৃতির প্রভূত বল আসুরিক প্রবৃত্তিস্রোত, যে অদম্য কুপ্রবৃত্তিস্রোত কোন নৈতিক শাসনে শাসিত নহে, সেই আসুরিক প্রকৃতির পাপময়

চিত্র মিল্টন আঁকিয়াছেন। যেমন কুরুপক্ষে গদাধারী আসুরিক দুর্য্যোধনই প্রবল; যাহার প্রাবল্যে লোভী দ্রোণ ও কর্ণের সামরিক বীর্য্য অধীন হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করিতেছে, কোন নৈতিক শাসন ও কাহারই সুপরামর্শ মানিতেছে না—গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সেই আসুরিক বলপ্রধান কুরুপক্ষ যেমন দেবদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতের মহা ব্যাপার এবং তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া পৃথিবী তোলপাড় করিতেছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর চিত্র মিল্টনের মহাকাব্যে। এই চিত্রে কলঙ্কারোপ করে, এমত প্রতিযোগী দেবচিত্র নাই।

এই পাপপূর্ণ সংসারের অনুচিত্র আঁকা তত্ত কঠিন নহে। কারণ, পাপপূর্ণ সংসার তো পড়িয়া রহিয়াছে—যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই পাপের কলঙ্কিত মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ফটো তোল। কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়ার এ ফটো তুলিয়া তো সন্তুষ্ট হয়েন নাই; তিনি তদপেক্ষা অনেক দূর আসিয়াছেন। তিনি সেই ফটো হইতে লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা সামান্য সংসারে নাই, অথবা যদি থাকে, ক্বচিৎ কখন তেমন আসুরিক সৃষ্টি জন্মে। আর্য্যকবি ঠিক ইহার বিপরীত দিক দেখান। তিনি দেখান, ধর্ম্মের অসাধারণ মূর্ত্তি। যে সকল ধর্ম্মমূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ছবি আর সাহিত্যে দিবার প্রয়োজন কি? একবার চক্ষু চাহিলেই চারি দিকে সে প্রকার সামান্য মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। সাহিত্যে যে ছবি আঁকিবে, তাহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে। সেই ছবিতে অসামান্য রূপের সমাবেশ চাই। সেই অসামান্য রূপ সামান্য চিত্রের রূপ দেখিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অমানুষী রূপ-সৃষ্টির আদর্শ আর্য্য কবিগণ তিলোত্তমায় দেখাইয়াছেন। তিলোত্তমা যেমন বাহ্য রূপের সৃষ্টি, আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ সকল তেমনি মানসিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। তিলোত্তমা গড়িতে যে সেক্‌স্‌পিয়ার জানিতেন না, এমত নহে—তিনি অনেকগুলি বাহ্য তিলোত্তমা গড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিলোত্তমা মিরাণ্ডা—"Of every creature's best" রোস্যালিণ্ড এবং হার্মিয়ন্। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা গড়িতে গিয়া তিনি আর্য্যকবিগণের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। তাঁহার মিরাণ্ডা শকুন্তলার নিকট পরাভূত। তাঁহার রোস্যালিণ্ড, হার্মিয়ন্, ইস্যাবেলা ও

হেলেনা তত অসামান্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি নহে। কিন্তু ট্র্যাজিডিতে তিনি আর এক প্রকার তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়া লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি যত আসুরিক দৈত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রোমিও, জুলিয়েট, টাইবল্ট, ইয়াগো, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ, গনাবিল, জন, রিচার্ড দি থার্ড প্রভৃতি নাহিলে কি ট্র্যাজিডির ভয়ঙ্কর চিত্র ও খুন সংঘটিত হয়? আমাদের সাহিত্যে এরূপ অসুরের সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহারা অসুর বলিয়াই কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী ও দেববিদ্রোহী। মিল্টনের মহাকাব্যে একমাত্র প্রকাণ্ড অসুরের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে তদ্রূপ কত শত অসুর। বৃত্র, তারক, রাবণাদি অসুর ও রাক্ষসসমূহ দেবদ্রোহী হইয়া কি তুমুল কাণ্ডই না ঘটাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অসুরনাশন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ধর্ম্মবীর সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং লোকের দৃষ্টি সেই অসুর হইতে সুর-সৌন্দর্য্যের দিকেই পতিত হয়। তাহাতে ধর্ম্মের জয় হয়। আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্মের জয় অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাপের বিক্রমকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শন করা যদি মহাকবির পরিচায়ক হয়, তবে তাহার সহিত ধর্ম্মকেও মূর্ত্তিমান করিতে কি কবিত্বের পরিচয় হয় না? মানবপ্রকৃতির এক দিককে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া অন্য দিককেও সুমুজ্জ্বল করা উচিত। তাহা হইলেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেওয়া হয়। ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে শুধু সয়তানকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইলে কি হইবে? তাহার সঙ্গে ভগবানের অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সৌম্য মূর্ত্তিরও শোভা দেখান উচিত। তবে ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শোভা ও ভীষণ মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান হইবে। আর্য্য-সাহিত্যে এইরূপ সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য। তাহাতে প্রকৃতি, পুরুষের পার্শ্বে সংসারের কদম্বমূলে পরিশোভিতা। তাহাতে মূর্ত্তির দুই দেশই সমান উজ্জ্বল। দেহের সকল অবয়ব সমান পরিস্ফুট ও সমপরিমাণবিশিষ্ট। তাহাতে স্কন্ধ-কাটার সৃষ্টি নাই; কিম্বা প্রকাণ্ড ধড়বিশিষ্ট অঙ্গহীন অসুরের সৃষ্টি নাই। সেক্‌স্‌পিয়ারে অসুরনাশন চিত্রেরও সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির তত বর্ণগৌরব নাই, যদ্দ্বারা ম্যাক্‌ডফ্‌ কি ব্যাঙ্কো, ম্যাক্‌বেথের উপর উঠিতে পারে। রিচার্ড দি থার্ড, জন এবং ব্রুটসের প্রতিযোগী চিত্র কই? তাঁহার আসুরিক কৃষ্ণমূর্ত্তি সকল অসামান্য সৃষ্টি, কিন্তু তদ্বিপরীত শ্বেত মূর্ত্তি সকল অতি সামান্য চিত্র। সুতরাং কৃষ্ণকায়গণই অধিকতর মূর্ত্তিমান হইয়াছে।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া মানবকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া, ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির আসুরিক সৃষ্টির সমর্থন করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা কত দূর পাপনিবারণ হয়, সে কথার বিচার না করিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, ট্র্যাজিডি পাঠের সেইরূপ সুফল সম্ভাবিত, তাহা হইলেই বা কি হইল? মানবকে শুধু পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কি যথেষ্ট হয়? মানবের পারমার্থিক ক্ষুধা কিরূপে সন্তৃপ্ত হয়? যে পারমার্থিক লালসায় উত্তেজিত হইয়া মানব জগৎকে শোভিত করিয়াছে, জগতে শান্তি ও অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছে, মানবের সেই পারমার্থিক লালসা যে অত্যন্ত প্রবলা। মানব-হৃদয় যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তিরসের আধার, সে রসের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানব অহরহ ব্যস্ত রহিয়াছে। জেল দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, লোককে ধর্ম্মশীল করিতে হইবে। কিসে সদ্বৃত্তিসমূহের তৃপ্তিসাধন হয়, তাহার উপায় কি? তন্নিমিত্ত কি ধর্ম্মাদর্শসৃষ্টির আবশ্যকতা নাই? এক জন পরম পবিত্র পুণ্যবান লোকের চরিত্রপাঠে যত পবিত্রোষ ও আনন্দ জন্মে এবং মন যত আকৃষ্ট হয়, তত কি পাপচরিত্রের ভীষণ পরিণাম-কল্পনায় হইতে পারে? মহাজনের উদারতাগ এবং দানবীরের মহত্বে মন যত মোহিত হয়, অন্তরের যত স্ফূর্ত্তি হয়, তত কি আর কিছুতে হইতে পারে? পাপকণ্টক কাটিয়া মনুষ্যের মনে সুবীজ-রোপণের বিশিষ্ট উপায়—পুণ্যের পবিত্রতাদর্শন ও ধর্ম্মাদর্শ।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিলে যেমন পাপস্পর্শ ঘটে, তেমনি ধর্ম্মের পুণ্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদা দেখিলে মনের মলিনতা অপনীত হইয়া পবিত্রতার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির ও রামের চিত্র সর্ব্বদা কল্পনায় রাখিলে কি মন পবিত্র হয় না? অথচ যুধিষ্ঠির ও রামের পবিত্রতা সচরাচর মানবে পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের পুণ্যময় চিত্র অসাধারণ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মানবসমাজ তাঁহাদের আদর্শে উন্নীত ব্যতীত কিছু অবনত হইবে না। পুণ্যের আকর্ষণ এমনি, পবিত্রতার লাবণ্য এমনি, ধর্ম্মের জ্যোতিঃ এমনি যে, অতিমানুষ হইলেও তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মানব সেই ক্ষমতায় নীরমান না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের অতিমানুষ ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া মানবসমাজ সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সেই লাবণ্যে মোহিত হয় এবং সেই

জ্যোতিঃতে আলোকিত হয়। মানব-প্রকৃতিতে যে দেবত্বের সমাবেশ আছে, সেই দেবত্বের সহিত এই আকর্ষণশক্তি। নহিলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মবল কিরূপে হিন্দু সমাজকে চালাইয়া আসিতেছে; তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু সমাজ আজিও অসাধারণ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

যাহা অলোকসাধারণ, তাহাই অতিমানুষ। অতিমানুষ বা অসামান্য না হইলে প্রাকৃত জনগণের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। যাহা সর্ব্বদা ও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে না। যাহা অসামান্য ও অদ্ভুত, তাহাই বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, সুতরাং অনেক কাল স্মরণ থাকে। যাহা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত, তাহাই কবির সৃষ্টিরাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং কবির সৃষ্টি প্রায় অদ্ভুত হইয়া পড়ে। অদ্ভুতকে আরও অদ্ভুত এবং চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি প্রকৃতির সীমা একটু অতিক্রম করিয়া অতিমানুষে আসিয়া পড়েন। লেডি ম্যাক্‌বেথ সেই একটু প্রকৃতি-অতীত সীমার দৃষ্টান্ত। ওথেলোও কিয়দংশে অস্বাভাবিক চিত্র। তদ্রূপ রিচার্ড দি থার্ড, গনারিল, ক্রটস, জন প্রভৃতি। মহাকাব্যের কল্পনায় এই অতিপ্রাকৃতিক বা অতিমানুষ কল্পনা কিছু অধিকতর দেখা যায়। কারণ, অতি অদ্ভুত নহিলে লোকের চিরস্মরণীয় হয় না। মিল্টনের সয়তানের কল্পনা অতি-অদ্ভুতে পরিপূর্ণ। অতি অদ্ভুত বলিয়া সেই সৃষ্টি এত মহান্ ও প্রকাণ্ড যে, মানবকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। তদ্রূপ, এডাম এবং ইভের সরলতা এবং পবিত্রতা অতি-অদ্ভুত। তাঁহার নরকের চিত্র যত অদ্ভুত ও বিস্তৃত, Paradiseএর বর্ণনা তত নহে। এ জন্য তাঁহার নরকচিত্রই অধিকতর স্মরণীয় হইয়াছে।

পপের অতিমানুষ চিত্রের দোষ এই, মিল্টনের সয়তানের মত, তাহার প্রকাণ্ডতা, উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্যে মন এত আকৃষ্ট হয় যে, সেই চিত্রকে যত দূর ঘৃণার্হরূপে সৃষ্টি করা অভিপ্রেত, তাহা তত ঘৃণার্হ বোধ হয় না। কারণ, তাহার প্রকাণ্ডতা বা অদ্ভুতরসে কতকটা চিত্তরঞ্জন ঘটে। সয়তানের অদ্ভুত বৃহৎ কল্পনায় মন মোহিত হওয়াতে, তাহা তত ঘৃণার্হরূপে প্রতীয়মান হয় না। অথচ সয়তান স্বয়ং পাপমূর্ত্তি। কিন্তু অতিমানুষ পুণ্যের চিত্রে এরূপ কুফল ফলে না। পুণ্যচিত্রমাত্রই ত সাধারণ জনগণের চিত্তরঞ্জন, তাহাতে সেই চিত্রে অদ্ভুতের সঞ্চার হওয়াতে সামান্য জনগণ দ্বিগুণ মোহিত

হয়। প্রাকৃতিক কি না, এ বিষয় তাহারা বিচার করিতে যায় না ও চায় না। অতিমানুষী পুণ্যের পবিত্রতায় তাহাদের মন এত মোহিত হইয়া পড়ে যে, সে বিচার অন্তরে স্থান পায় না, বা মূলেই উদিত হয় না। সেই পবিত্রতা তাহাদের কল্পনাকে চিরদিন অধিকার করিয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনুষ্যের পশুবৃত্তি। ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি তাহার দেবভাব। কাম, ক্রোধ, লোভাদির অতি অদ্ভুত কল্পনা আসুরিক এবং দয়া ধর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতির অতি অদ্ভুত কল্পনাই দেবোচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই আসুরিক কল্পনার সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য্যে দিব্য কল্পনা বিমলিন ও প্রচ্ছন্ন; কিন্তু আর্য্য-সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। তথায় পাশব মানবপ্রকৃতি, দিব্য প্রকৃতির ছটায় নিষ্প্রভ। রামের পুণ্যজ্যোতিঃ মানবকল্পনাকে এত অধিকার করিয়াছে যে, রাবণের চিত্র আর স্মরণ থাকে না; তাহা যেন পাপান্ধকারে বিসর্জ্জিত হয়। ভরত ও রামের প্রগাঢ় পুণ্যরসে মন এত বিগলিত হয় যে, তাহাতে কৈকেয়ী ও মন্থরাকে অধিকতর ঘৃণিত বোধ হয়। তাহাদের পাপকল্পনা, ভরত ও রাম, এবং কৌশল্যা ও সীতার চরিত্রকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পাপের নিশান্ধকারে অস্ত গিয়াছে।

অতিমানুষ ধর্ম্মাদর্শ যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরে, অতিমানুষী ভ্রাতৃভক্তি তেমনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নে, এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবে। পিতৃভক্তি পরশু ও ভৃগুরামে। ভৃগুরাম বুঝি পিতৃভক্তির অবতার ছিলেন। তিনি সেই পিতৃভক্তিতে চালিত হইয়া পিতৃাদেশপালনার্থ মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিতে পারিলেন, এমন আশা ছির রহিয়া তিনি মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বাস্তবিক তিনি সেই মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের সৃষ্টিচাতুর্য্য দেখাইতে হইলেই অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করা চাই। তাই অদ্ভুত রসেই গাম্ভীর্য্যসাধন হয়। মিল্টনের সয়তান-সৃষ্টিতে যেমন অদ্ভুতের প্রকাণ্ড রচনা দেখা যায়, আমাদের মহাকাব্যেও তেমনি অদ্ভুত কাণ্ড সকল বর্ণিত হইয়াছে। না হইলে রসের প্রগাঢ়তা হয় না। পিতৃভক্তির অমানুষী পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্যই তদ্রূপ অদ্ভুত মাতৃহত্যার কাণ্ড কল্পিত হইয়াছে। পরশুরাম সেই পিতৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির অবতার পঞ্চ পাণ্ডব। পিতৃগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ ভগীরথ কি

অসাধ্যসাধনই না করিয়াছিলেন। পতিভক্তির দৃষ্টান্ত আমাদের আর্য্য-সাহিত্যে অসংখ্য;—সতী, পার্ব্বতী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কুন্তী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী প্রভৃতি। তাঁহাদের অমানুষ প্রেম, ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দানবীর—কর্ণ, বলি ও হরিশ্চন্দ্র। অমানুষ সত্যপালন রামচন্দ্রে। অমানুষ ব্রহ্মচারী-লক্ষ্মণ।

আর্য্যসাহিত্যের এক দিকে এই সমস্ত ধর্ম্মাদর্শের পবিত্র সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে আসুরিক সৃষ্টিসমূহে পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম। এক দিকে পাপের দমন, অন্য দিকে পুণ্যের আকর্ষণ—এই উভয়বিধ চিত্রে সম্পন্ন হইয়া আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সেই আদর্শ যেমন জন-সমাজকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তেমনি পুণ্যের পথে আকৃষ্ট করে। সে আদর্শ মানবকে কেবল নিষ্পাপ নহে, তাহাকে দেবতা করিতে চাহে। তদপেক্ষা উচ্চাদর্শ আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।

এই দেখুন, আর্য্যসাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাচিত্র আমাদের এই কথা কেমন সমর্থন করিতেছে।

ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে, যখন তিনি শোণিতাক্ত হইয়া কাতরস্বরে রোদন করিতেছেন, তখন অশ্বত্থামা তাঁহার সন্তোষার্থ পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক আনিবার জন্য সেনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ঘোর নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া যে বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই হত্যাকাণ্ড ও শিশুমস্তক-ছেদনের কথা শুনিলে কাহার শরীর না শিহরিয়া উঠে? যে দুর্য্যোধনের সান্ত্বনার্থ তিনি এ কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনি পর্য্যন্ত তাহাতে সন্তোষলাভ করা দূরে থাক, বরং বিষণ্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীয় এই ভয়ানক আসুরিক বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কাহার মনে ঘৃণার সঞ্চার না হয়? কিন্তু এই পাপচিত্রের পরই পাণ্ডবপক্ষে কেমন এক বিপরীত সুন্দর দৃশ্য অভিনীত হইতেছে!—দ্রৌপদী পঞ্চ শিশুর হত্যা শুনিয়া কাঁদিয়া অধীরা হইয়াছেন; তাঁহার কাতরতা দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার প্রবোধার্থ এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন,—"দেবি! আমি এখনি তোমাকে সেই নৃশংসের পাপমুণ্ড আনিয়া দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি স্নান করিলে তাহার পাপকার্য্যের কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে।" তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তিনি অশ্বত্থামাকে আবদ্ধ করিয়া আনিয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে উপনীত করিয়া

দিলেন। সেই পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁহার পঞ্চশিশুহন্তাকে দেখিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে:—

"সুশোভনা দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে পশুর ন্যায় সেইরূপ রজ্জুবদ্ধ, নিন্দ্য পাপকার্য্য হেতু লজ্জায় অবনতমস্তক এবং অপমানসহকারে আনীত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং তাঁহার রজ্জুবন্ধন দেখিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন,—'নাথ! এ ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করুন। ইনি আমাদিগের গুরু। যাঁহার নিকট আপনি গূঢ়মন্ত্র এবং ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রণকৌশল লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শরীরার্দ্ধ কৃপীও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; সাধ্বী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন করেন নাই। মহাত্মন্! গুরুকুলের অপকার করা আপনাদিগের উচিত নহে। প্রত্যুত তাহার পূজা ও বন্দনা করাই উচিত। নাথ! গৌতমনন্দিনী পুত্রশোকপীড়িতা হইয়া যেন আমার ন্যায় অশ্রু ত্যাগ না করেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, তিনি সপরিবারে নিরন্তর বিষম শোকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকেন।"

পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর এত দূর ক্ষমা, এত দূর ধর্ম্মানুরাগ দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়! এই অমানুষী সহৃদয়তা, ক্ষমা ও ধর্ম্মানুরাগের চিত্র নিশ্চয়ই অশ্বত্থামার ঘোর বীভৎস চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলে, এবং চিত্তকে এত উদারতায় পূর্ণ করে, এত শান্তরসে আর্দ্র করে, এত ধর্ম্মানুরাগে অনুরক্ত করে যে, সেই পাপচিত্রের স্মৃতি যেন মন হইতে অপনীত হয়, এবং ধর্ম্মের প্রভূত বল—যে বলে দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে দেখিবামাত্র উত্তেজিত হইলেন, শোক তাপ সব দূরে গেল—সেই বল অন্তরে অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে।

ট্র্যাজিডির উচ্চতা ভয়ানক এবং করুণ রসে। ট্র্যাজিডিতে করুণের কিরূপ স্থান, তাহা আমরা "সাহিত্যে খুন" নামক প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ট্র্যাজিডির পরিণামে খুন ঘটাতে বীভৎস রসের ঘোর সঞ্চারে কি ভয়ানক, কি করুণ, উভয়কে মন্দীভূত করে। স্বচক্ষে খুন দেখিলে, কি খুনের নাম শুনিলে, কি স্মৃতিপথে খুনের উদয় হইলেই, অমনি বীভৎসের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে এবং হৃদয় কম্পিত হয়। সেই ভাব একেবারে তিরোহিত না হইলে আর অনুকম্পার উদয়

হয় না। অনুকম্পা কাহার জন্য হয়? যে ব্যক্তি খুন হয়, সর্ব্বস্থলে যে তাহার প্রতি অনুকম্পা হয়, এমত নহে। একটি প্রকৃত ঘটনা লইয়া দেখ, "নবীন এলোকেশীর" খুনে পাপীয়সী এলোকেশীর প্রতি সাধারণ লোকের অনুকম্পার উদয় হয় নাই, নবীনই অনুকম্পার ভাগী হইয়াছিল। তদ্রূপ "হ্যাম্‌লেট" নাটকে খুনকারী ছোট হ্যাম্‌লেটের প্রতিই অনুকম্পার উদয় হয়। লর্ড ম্যাক্‌বেথ্ নিহত হইলে কি তাহার নিমিত্ত তত অনুকম্পা হয়, না কীচক ও দুঃশাসন বধে তাহাদের প্রতি অনুকম্পার সঞ্চার হয়? কিন্তু যেখানে ধর্ম্মপক্ষ নিগৃহীত বা নিহত হয়, সেইখানেই সেই নিগৃহীত ও নিহত ব্যক্তি অনুকম্পা-ভাজন হন। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, কৌশল্যা, কুন্তী, উত্তরা, পঞ্চপাণ্ডব, ডেসডিমোনা, কিং লিয়র, ক্লনষ্ট্যান্স, অফেলিয়া প্রভৃতি এ কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু ট্র্যাজিডির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তদধিক আর কিছু হয় না। ট্র্যাজিডি পাপের ঘোর নরককুণ্ড এবং পাপ ক্রমে ক্রমে কেমন ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা দেখাইবার যেমন প্রকৃষ্ট উপায়, বিভিন্ন অবস্থায় পুণ্যের জ্যোতিঃ কেমন ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিবার তেমন উপায় নহে। "কিং লিয়রে"ও তাহা ঘটে নাই। রাজা নিগৃহীত হইয়া কেবল মাত্র অনুকম্পাভাজন হইয়াছেন। এক দিকে কর্ডেলিয়া, অন্য দিকে অপর দুই কন্যার চরিত্র এবং সংসারের গতি বিলক্ষণ বিকাশ করিয়া দেখাইবার নিমিত্তই যেন রাজার নাটক-মধ্যে সমাবেশ। যেরূপে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নানাবিধ দুরবস্থায় দলে দলে পদ্মফুলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং এক অতি মহান্ ধর্ম্মাদর্শের সৃষ্টি হইয়া শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যেমন আর্য্য-সাহিত্যের অন্তর্গত মহাকাব্যের প্রকাণ্ড প্রসারে সম্ভাবিত হইয়াছে, এমত আর কিছুতেই হয় নাই। "শকুন্তলায়" দুষ্মন্তচরিত্রে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান, তাহা যুধিষ্ঠির কিম্বা রামের উচ্চতায় উঠে নাই। সেক্‌স্‌পিয়ারের ট্র্যাজিডির কথা দূরে থাক, তাহার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ত এ কথা মূলেই সম্ভাবিত নহে; এমন কি, বিলাতী ল্যাটিন্ এবং গ্রীক মহাকাব্যে কি সেরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়? তাহাতে শৌর্য্য বীর্য্যের বিকাশ আছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং রামের মত তেমন ধর্ম্মবীরত্বের প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সৃষ্টি কই? রাম এবং যুধিষ্ঠির মানবের কল্পনাকে একেবারে জুড়িয়া বসে;—যেন সেখানে আর কিছুরই

সমাবেশ হইবার যো নাই। তাঁহারা কি কেবল লোকের অনুকম্পাভাজন, না ধর্ম্মবীরের প্রকাণ্ড চিত্র? তাঁহাদের সেই সমগ্রকল্পনাবিস্তৃত চরিত্র দর্শনে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাঠকের মনে এত শান্তরসের সঞ্চার হয় যে, তাহাতে অনুকম্পা আর স্থান পায় না।

অনুকম্পার ডেস্‌ডিমোনা উদ্ভাসিতা। রাজা লিয়র এত কষ্টভোগ করিয়াছেন যে, তাঁহার দুরবস্থায় কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। কর্ডেলিয়া পুত্রশোকে পাগলিনী, যেমন পাগলিনী পতিবিয়োগবিধুরা উত্তরা। তাহারা সকলেই পরকে কাঁদাইয়া বড় হইয়াছে। তাহারা নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়াছে। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই শেষ। ট্র্যাজিডির ঘোর অন্ধকারক্ষেত্রে ডেস্‌ডিমোনা একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। দিনদেবের প্রখর জ্যোতিঃ যখন রাহুগ্রস্ত হয়, যখন সেই রাহুর ছায়াপাতে দিবসের মুখ ম্লান হয়, দিবা দ্বিপ্রহর যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন যেমন একটি ক্ষুদ্র তারকার সামান্য জ্যোতিঃ দেখা যায়, ডেস্‌ডিমোনা সেইরূপ একটি নক্ষত্র। নাটকের কৃষ্ণভাগ তাহার শ্বেতচিহ্ন একটু ফুটিয়াছে। অনুকম্পা সেই চিহ্নকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ট্র্যাজিডির কার্য্যই এইরূপ। ট্র্যাজিডি পাপছবির ঘোর অন্ধকারে ধর্ম্মের একটু জ্যোৎস্না ফুটাইতে চাহে। কিন্তু ধর্ম্মের সম্যক্ ছবি ও তেজ তাহাতে দেখা যায় না। ট্র্যাজিডি একাধারে তত স্থান পায় না। ধর্ম্মের ঈষদাভাস ব্যতীত তাহার মুখ সম্যক্ বিকাশ করিয়া দেখাইতে গেলে, ট্র্যাজিডির রস ভঙ্গ ঘটে। ভয়ানকই তাহার প্রধান রস, করুণা তাহার পরিণাম। সেই স্থলে ধর্ম্ম যত দূর ফুটে, তত দূর পর্য্যন্তই তাহার সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মকে অধিকতর ফুটাইতে গেলে শান্তিরসের আবির্ভাব ঘটে; আর ট্রাজিক রস থাকে না। সুতরাং ট্র্যাজিডি শান্তিরসকে প্রবল করিতে পারে না। শান্তিরস প্রবল হইয়াছে আর্য্যসাহিত্যে, নাটকে ও মহাকাব্যে। সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সম্যক্ বিকীর্ণ হইয়াছে।

ট্র্যাজিডিতে পাপচিত্র যেমন ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে, পাপের গতি ক্রমে ক্রমে যেমন উচ্চতায় উঠিয়াছে, আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্ম তদ্রূপ। এ সাহিত্যে ধর্ম্মের বীরত্ব। মিল্টনে যেমন পাপের বীরত্ব ও জয়, আর্য্যমহাকাব্যে তেমনি ধর্ম্মের বীরত্ব ও জয়। সেই বীরত্বকে সম্যক্ রূপে ফুটাইবার জন্য, তাহার পার্শ্বে আর দ্বিবিধ বীরত্বের বিরাট বিকাশ আছে। এক বীরত্ব ভীমের শারীরিকবলবীর্য্য, অন্য বীরত্ব অর্জ্জুনের শৌর্য্য,

ও সাময়িক বীরত্ব। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে বীরত্ব "ইতিহাসে" (History) প্রকাশিত, সেই বীরত্ব অর্জ্জুনের। আর ইউরোপীয় মহাকাব্যে যাহা Ajax, Hercules, Samson প্রভৃতির বীরত্ব, তাহা ভীমের মহাশক্তি। এই শক্তি দুর্য্যোধনে ছিল বলিবা, দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিযোগী। ভীমের বীরত্ব ধর্ম্মাধীন, দুর্য্যোধনের বীরত্ব তাহা নহে। সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতিযোগী কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিযোগী দ্রোণ। দ্রোণের আসুরিক বীরত্বের প্রতিযোগী ঘটোৎকচ। ভীষ্মের প্রতিযোগী সমস্ত পাণ্ডববীর; যেমন অভিমন্যুর প্রতিযোগী সমস্ত কুরুবীর। কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতিযোগী কে? তিনি অর্জ্জুনের বা ভীমের বীরত্বে প্রধান নহেন। সে বীরত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি অনেকবার লজ্জিত হইয়াছেন,—কর্ণের কাছে অপ্রতিভ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বীরত্বে প্রধান, সে বীরত্বের প্রতিযোগী কুরুপক্ষে কেহ ছিল না। সে বীরত্বের উচ্চতায় অর্জ্জুন, ভীম, সকলেই অবনত। অবনত বলিয়া ভীম ও অর্জ্জুনের গৌরব এবং আসুরিক বীরত্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-বীরত্বের পার্থক্য। ধর্ম্মবীরত্বের উচ্চতা ভীষ্মে ছিল বটে, কিন্তু ভীষ্ম পাপ-পক্ষে আবদ্ধ হইয়া তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পাপপক্ষ ধর্ম্মের বীরত্বে যে কিছুতেই উঠিতে পারে না,—পাপপক্ষের তেজে ধর্ম্মবীরত্ব যে কেমন অবসন্ন হয়, তাহা কুরুপক্ষে ভীষ্মদেবের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ধর্ম্মতেজ কেমন ক্রমশঃই উচ্চতায় উঠিয়াছে, তাহা পাণ্ডবপক্ষে প্রতীয়মান। ধর্ম্মের এই প্রশান্ত আদর্শ আর্য্যসাহিত্যে। আর আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের মহান্ চরিত্রের আলোচনায় প্রতীত হয়, পাপপক্ষের বল ও কৌশল যত কেন শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না, তাহা দৈববল ও কৌশলের নিকট একেবারে পরাভূত। দৈববল সর্ব্বোচ্চ বল; দেবপক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পক্ষ। দেববীর্য্য, মানবীয় সর্ব্ববিধ বীর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পার্থিব সকল বলের উপর দৈববল বিজয়ী। ধর্ম্ম অবশ্য দৈববলের আশ্রিত, সেই দৈবাশ্রিত ধর্ম্মপক্ষের সমকক্ষ কি পাপপ্রবণ ও পার্থিব বলে বলীয়ান কুরুপক্ষ হইতে পারে? কুরুপক্ষে ধর্ম্মের বীরত্ব ছিল না, সুতরাং দেবপক্ষেরও সহায়তা ছিল না; এই নিমিত্ত তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম কি ভারতের নায়ক?—না, ভীম যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শাসিত; অর্জ্জুনও তদ্রূপ; নিজে যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণাধীন। তবে ধরিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতের নায়ক।—যিনি বিশ্বরাজ ও ব্রহ্মাণ্ডপতি

যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে প্রতীয়মান, তিনি ভারতেও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। ভারতক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হয়েন নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বঘটে ও সর্ব্বস্থানেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল অখণ্ডনীয় এবং বিজয়ী। সহস্র সহস্র নারায়ণী সেনা এক নারায়ণের সমতুল্য নহে। সমস্ত কুরুবীর তাঁহার কৌশলশক্তিতে পরাভূত। মহাভারত মধ্যে যেমন পদে পদে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, মিল্টনের মহাকাব্যে কি সেরূপ হয়? তথায় ভগবান্ নিস্পন্দ ও অদৃশ্য। তিনি তেমনই নির্জ্জীব, যেমন রামচন্দ্র মাইকেলের "মেঘনাদবধে"। কিন্তু এই রামচন্দ্র রামায়ণের মহাকাব্যে কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন?

মহাভারতে যে পর্ব্ব, রামায়ণেও সেই কাণ্ড। প্রভেদ এই, রামায়ণে এক রামচন্দ্রে সকল বীরত্ব একত্রীভূত; মহাভারতে যাহা ভীমের বল, অর্জ্জুনের বীরত্ব এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মগৌরব, যে সমস্তই একাধারে রামচন্দ্রে সমাবিষ্ট। তিনি তদপেক্ষাও অধিক। রামচন্দ্রে শুধু যে বল, বীর্য্য ও ধর্ম্ম, এমত নহে; তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবশক্তিও দেদীপ্যমান। এই রামচন্দ্রের প্রভূত শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ব্যাস কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামচন্দ্র রামায়ণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার মূর্ত্তি যেমন, উজ্জ্বল, তেমন উজ্জ্বল রামায়ণে আর কে? বাল্মীকি সেই রামচন্দ্রে সমস্ত বলবীর্য্য ও শক্তি নিহিত করিয়া দিয়া, আবার যে সমুদায় একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে ত্রিবিধ বীরত্ব ভারতের ভীমার্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে, সেই ত্রিবিধ বীরত্ব রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানে। রামে একদা সর্ব্ববিধ বীরত্ব;—আবার লক্ষ্মণ ও হনুমানের পার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মবীরত্ব অধিকতর জাজ্বল্যমান। ধনুর্ভঙ্গপণে ও অসুরনাশনে তাঁহার ভীমের বীরত্ব সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ভার্গববিজয়ে ও রামরাবণের যুদ্ধকালে, তাঁহার অসামান্য শৌর্য্য ও সামরিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অথচ তিনি ধর্ম্মবীরত্বে লক্ষ্মণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের বীরত্বের পরিচয় অযোধ্যা হইতে তাঁহার বনগমনকালে যেমন, বনে বনে আশ্রমবাসী ঋষিগণের কাছে, সুগ্রীবপক্ষীয় বানর জাতির কাছে এবং রাক্ষসকুলের কাছেও তেমনি। সেই বীরত্বে সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, এবং রাক্ষসপক্ষীয় মারীচ প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবণ রাক্ষসকুলও অবনত। মন্দোদরী বারম্বার রাবণকে সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। কেন

করেন? কেবল কি রামকে মহাবীর জানিয়া সকলে রামের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন?—তদপেক্ষা অন্য এক বিক্রম রামচন্দ্রে ছিল। সেই বিক্রম তাঁহার দৈববল। যে বলের তেজ রামচন্দ্রে ছিল, সেই দৈববলের বিক্রম অনুভব করিয়া মন্দোদরী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বাস্তর্য্যামী প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ সনাতনই হইবেন। রক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভিত সেই ক্ষয়রহিত, পরিমাণশূন্য, সত্যপরাক্রম, অজেয়, সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সকলের হিতকামনায় মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস পরিবারগণের সহিত মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াপহ দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করিয়াছেন।"—লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ অধ্যায়।

তবেই, এক রামচন্দ্রে বাল্মীকি, সমগ্র পার্থিব বল দৈববলের সহিত নিহিত করিয়া, তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় বীররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সৃষ্টির বিশ্লেষণ—শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মপুত্র, অর্জ্জুন ও ভীম। এ এক অপূর্ব্ব মহান্ সৃষ্টি; সমুদায় বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ও পরমেশ্বরের বল একাধারে সন্নিবিষ্ট। ইহা বড় মহা-কল্পনা আর কি হইতে পারে? ট্রাজিডি এত উচ্চতায় কি উঠিতে পারে? ধর্ম্মের এত উচ্চ গৌরবে, ট্রাজিডির উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিলাতী আসুরিক ও পার্থিব বলবীর্য্যপূর্ণ-কল্পনা-সমন্বিত মিল্টন কখন সে উচ্চতায় যাইতে পারেন নাই। তিনি শিব গড়িতে গিয়া তাঁহার মহাকাব্যে ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীক এবং লাটিন মহাকাব্যেও পার্থিব বল ও আসুরিক বীর্য্য। অন্যদেশীয় মহাকাব্যে এই বাল্মীকির সৃষ্টি ও সুরসৌন্দর্য্য কোথায়! এই ধর্ম্মাদর্শ, বীরত্বসৃষ্টি, ও সুরশোভাবিকাশের বিস্তারিত লীলা-ক্ষেত্র রামায়ণ ও মহাভারত। আর্য্যকবিগণ সেই মহাকাব্যের মহাসাগর হইতে বারি আহরণ করিয়া এক এক ক্ষুদ্র কাব্যের সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে মন্দাকিনীর স্বর্গস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই স্রোতে অবগাহন করিলে লোক স্নিগ্ধ হয় ও অমৃতাস্বাদন করে। সে অমরসুধা কি আর কোন জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? তাহা কেবল ভারতের অমূল্য নিধি, অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও দিব্য সৌন্দর্য্য। তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে জগৎ মোহিত!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পৌষলা।

পৌষলা জিনিষটি সম্পূর্ণ এদেশী হইলেও, এই শব্দটি নাগরিকবর্গের নিকট কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসযুক্ত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, সুতরাং পল্লীগ্রামের পৌষলা কাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এই শব্দটির একটি পরিস্ফুট ব্যাখ্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সহরাঞ্চলে যাহার নাম বনভোজন, পল্লী অঞ্চলে তাহাই পৌষলা নামে আখ্যাত; তবে এই ভোজনক্রিয়া সাধারণতঃ পৌষ মাসেই সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম পৌষলা হইয়াছে। বৎসরের অন্য কোন সময়ে, পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজেও বনভোজনের রীতি নাই; কেবল পৌষ মাসেই পল্লীবাসীর হৃদয়ে এই সঙ্ঘের আধিক্য ঘটিবার কারণ কি, কোন কোন ভোজনতত্ত্ববিৎ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এ প্রশ্নকে নীরব থাকিতে হইবে, এবং অনুমান হয়, কেহই ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন না।

তথাপি আমার মনে হয়, পৌষমাসই পৌষলার উপযুক্ত কাল। এই সময় পল্লীগ্রামে গৃহস্থ সাধারণের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের প্রায় কোন অভাব থাকে না; আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণ প্রীতিকর, এবং তরুলতাবেষ্টিত ছায়াচ্ছন্ন কাননভূমি অত্যন্ত শোভাময় এবং সুপরিষ্কৃত। অন্তঃপুরের বৈচিত্র্যহীন চির-অভ্যস্ত পাকশালায় নিয়মিতরূপে বারো মাস আহার করিতে করিতে একটা অতৃপ্তির ভাব আসিয়া মনকে অন্তঃপুর হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; আমাদের অবরোধবদ্ধ, ক্ষুদ্র, রুদ্ধ পাকগৃহ ছাড়িয়া একবার বহিঃপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাসাদদ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, এবং বালক, যুবক ও বৃদ্ধ অতি অল্প লোকেই সে উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারে।

বৎসরের মধ্যে এই সময়ই পল্লীগ্রামে খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইয়া থাকে। ধান কাটাই মাড়াই হইয়া গোলায় উঠিতেছে, অনেকের বাড়ীতেই গুড়ের 'বাইন' নিত্য নূতন খেজুরে গুড়ে হাঁড়ী কলসী পূর্ণ, ক্ষেতে আহরি, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবি-শস্যের অবস্থা বেশ ভাল। সকলের

ঘরে অপর্য্যাপ্ত তরকারী, যাহার বাড়ীতে একখানি সামান্য কুটীর, তাহারও ঘরের পাশে দুটি বেগুন গাছে কালো কালো বেগুন ঝুলিতেছে, সম্মুখে দুই হাত জমিতে পালঙ শাক লক লক করিতেছে, সিম ও লাউ গাছ ঘরের চালে লতাইয়া উঠিয়াছে, খুঁজিলেই দুই একটা লাউ এবং দশ বিশ গণ্ডা আলতা পাতি সিম পাওয়া যায়, কানাচের সজিনা গাছে থোকা থোকা সজিনা ফুল। মেটে আলু, শাদা ও লাল আলু, মূলো, কচু, বেগুণ, পেঁয়াজের কলি প্রভৃতি নানা রকমের তরকারীতে বাজার সরগরম; এ সময় মাছেরও অভাব থাকে না, বাগ্দিনীরা সকাল বেলা গৃহস্থবাড়ীতে ছোলা মটরের শাক এবং তারামণির ফুল চেঙ্গারি বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসে, সুতরাং নিতান্ত সহর ঘেঁসা না হইলে, কোন পল্লীবাসীই সহরাঞ্চলসুলভ শীতকালের প্রধান তরকারী কপি ও কড়াইশুটীর জন্য কিছুমাত্র হা হুতাশ করে না।

পৌষমাস আরম্ভ হইবামাত্র ছেলেদের মধ্যে পোষলা করিবার জন্য মন্ত্রণা চলিতে থাকে। পাঠশালায় গুরুমহাশয় আসিবার আগে, স্কুলে টিফিনের সময়, বৈকালে খেলা করিবার অবসরকালে, এমন কি রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়াও, এই গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ চলে। কেহ এক মাঠের নাম করিল, এক জন প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না ভাই, ও-মাঠ বড় জলটানা" (অর্থাৎ নিকটে কোন জলাশয় নাই), হয় ত আর একটা মাঠের নাম হইল, তাহার নিকটে কোন জলাশয় আছে বটে, কিন্তু নিবিড়ছায়াপূর্ণ বৃক্ষরাজির বড় অভাব, মধ্যাহ্নকালে রাঁধাবাড়া এবং খাওয়াদাওয়া গাছের ছায়া ভিন্ন ফাঁকা জায়গাতে হওয়া সম্ভব নহে; অনেক তর্ক বিতর্কের পর বসন্তপুরের মাঠেই পোষলা করিতে যাওয়া স্থির হইল; কারণ, তাহার নিকটেই দীঘি আছে, এবং তাহা জোড়া বটগাছ হইতে বড় বেশী দূরও নহে, পোষলা করিবার পক্ষে এমন উত্তম স্থান আর নাই। এই শুভকার্য্যের জন্য একটা রবিবার নির্দ্দিষ্ট হইল।

পল্লীবাসীদিগের মধ্যে যে সকল গরীবের ছেলে বেশী পয়সা সংগ্রহ করিয়া বাজার হইতে আবশ্যক জিনিসপত্র কিনিয়া বিশেষ ধুমধামে পোষলা করিতে না পারে, তাহারা সকলেই নিজের নিজের আহারের উপযুক্ত চাল, ডাল, লবণ, তেল, বেগুণ, আলু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট মাঠে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে দুই একটি করিয়া পয়সা চাঁদা দিতে হয়; এই

প্রয়নাম মাছ, পায়েসের জন্য দুধ, গুড় ইত্যাদি জিনিস ক্রীত হইয়া থাকে। নানা রকমের চাউল, এবং নানা বর্ণের ডাল তাহাদের খাদ্য দ্রব্যে এক নূতন আস্বাদন প্রদান করে।

এইরূপে চাল-ডাল বাঁধিয়া এবং মায়ের কাছ হইতে দুইটি করিয়া চাল্লিটি পয়সা চাহিয়া লইয়া, বিপিন ও বিনোদ দুই ভাই এক রবিবারের সকাল বেলা তাহাদের বন্ধুবর্গের সহিত বসন্তপুরের মাঠে পোষলা করিতে গেল। দামিনী ও বিধু বিনোদ বিপিনের ছোট; দামিনীর বয়স আট বৎসর, বিধুর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সকাল বেলা দাদাদের সঙ্গে পোষলা করিতে যাইতে না পাইয়া ভাই বোনে ভারি হাঙ্গামা বাধাইল। মা পুত্র কন্যা দুটিকে ভুলাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, বাক্স হইতে করাসী ছিটের পুরাতন দোলাইয়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া সেই ব্যাকুলা কন্যার সদ্যোবিবাহসম্ভাবিতা মেয়ের জন্য প্রদান করা হইল, বিপিনের এক বন্ধু তাহাদের বাড়ীর জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের বিসর্জ্জনের সময় চালীর এক অংশ হইতে খানিক রাঙ্গতা তুলিয়া সৌন্দর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ তাহা বিপিনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য দান করিয়াছিল, বিপিন সেই তুচ্ছ পদার্থ অমূল্য রত্নের মত যত্নে রাখিয়াছিল;—দামিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুতুলের গহনা গড়াইবার উদ্দেশ্যে সেই রাঙ্গতার কিয়দংশও তাহাকে অর্পণ করা হইল। বিধুকে অন্য দিন অপেক্ষা বেশী করিয়া সরাগুড় দিয়া মুড়ি দেওয়া হইল, কিন্তু তাহার ঝোঁক ছাড়িল না। বেলা বেশী হইয়া উঠিল, রাখাল গোয়াল হইতে গরু বাহির করিয়া মাঠে চরাইতে লইয়া গেল, ভিখারিণীর দল পিতলের চক্‌চকে ঘটি হাতে করিয়া "রাধাকৃষ্ণ, চাট্টি ভিক্ষে পাই গো মা!"—বলিয়া গোময়লিপ্ত অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল, বাগ্দিনী ঝুড়ি বোঝাই করা শাক আনিয়া "ছোলার শাক নিতে হবে গো মাঠাকরুণ"—বলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এমন সময় দত্তদের নগিন্নি স্নানান্তে মুক্তকেশে শুভ্রবেশে একখানি হাতা হাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৌ মা, এখনো আগুন দাওনি, আজই একবার সকাল ক'রে খোলা জ্বালবো মনে কচ্চি।" বিপিনের মা বলিলেন, "না মা! আজ রবিবার ইস্কুলের ত তাড়াতাড়ি নেই, ভাই এখনো আকার আগুন দিইনি, বিপিনরা দু ভায়ে আজ পোষলা করতে গিয়েছে, এরা ভাই বোন যেতে পায় নি বলে কেঁদে খুন হোল, তা বল দেখি ঠাকুরণ, ওদের কি করে তাদের সঙ্গে ছেড়ে দিই?"—দত্তগৃহিণী বলিলেন,

"তা এক কাজ কর না কেন? তোমাদের ঐ গোয়ালবাড়ীটাতে আজ ওদের পোষলা রেঁধে দাও, তা হ'লেই ওরা শান্ত হবে।"

বিপিনের মা দেখিলেন, এ যুক্তি মন্দ নয়। ছেলে মেয়ের জন্য গোয়াল-বাড়ীতেই পোঁবলা রাঁধা স্থির করিলেন। গোয়াল-বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার, ঝরঝরে; এক দিকে গরুর গোয়াল, অন্য দিকে ঢেঁকিঘর, তার পাশেই এক-খানা লম্বা চালা, এই চালাতে না আছে, এমন জিনিস নাই,—কতকগুলো কাঠ, ঘুঁটে, গোটাকতক মাটীর কলসী, অধিকাংশেরই কাঁধাভাঙ্গা; একটা ছোট বাঁশের মাচা, তাহার উপর দুই ছালা শিমুলের তুলো, কতকগুলো পাট কাটি, চুকোশাকের বিছন আটি করিয়া বাঁধা, আধ কলসী পালুঙের বীচি, আধখানা ভাঙ্গা জাঁতা, দুখানা বরগা, খান দুই তিন ছেঁড়া চাটাই এবং এক কোণে একটা ইন্দুরের গর্ত্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত একরাশ ঝুরো মাটি।

গোয়ালবাড়ীর পাশে বেগুণ ও শাক সবজীর বেড়। প্রাঙ্গণখানি ছায়াচ্ছন্ন; একটা কাঁকুড়া কুলগাছ, একটা শিউলীগাছ, একটা লম্বা নিমগাছ এবং গোটাকত পেয়ারা ও কাঁঠালের অনতিদীর্ঘ চারা সমস্ত উঠানটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের কিছু ঊর্দ্ধে উঠিলেই দূরে দিঘীর প্রান্তবর্ত্তী বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া, নিম্ন বৃক্ষের শাখাপত্রের ব্যবধানপথে সকৌতুকে এই গোয়ালবাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তখন বৃক্ষশাখায় পক্ষিকুল বসিয়া সহর্ষে গান আরম্ভ করে, রাখালবালক বাছুর বাঁধিয়া গোদোহনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ফকিরের মা গোয়ালকাঁড়নি আইরির ডালের স্বভাবরচিত প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী দ্বারা এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে; এবং বিপিনের ছোট বোন দামিনী তাহার মেয়ের বিবাহকার্য্য স্থগিত রাখিয়া পুতুলের কাপড় ছোপাই-বার উপযুক্ত বুটি শুকাইবার জন্য শিউলী গাছের তলায় কোঁচড় ভরিয়া পুষ্প-সংগ্রহে রত হয়। তাহার পূর্ণ মুখখানিও প্রভাতের প্রস্ফুটিত শিউলী ফুলের মত সুকোমল এবং সুন্দর, এবং খাবার কম হইয়াছে বলিয়া মায়ের উপর অভিমান করিয়া ছলছল চক্ষে ফুল কুড়াইতে আসিলে, মধুর প্রভাতে তাহার সেই মুখখানিও এমনি শিশিরসিক্ত দেখায়; কিন্তু কোন মুখখানি দেখিবার আশায় অরুণদেব যে প্রত্যহ প্রভাতে নিয়মিতরূপে নিমগাছের অন্তরাল হইতে আপনার হাস্যকৌতুকপূর্ণ মুখখানি বাড়াইয়া দেন, তাহা

নিঃসন্দেহে বলা যায় না; তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, গোবিন্দপুর গ্রামের একটি গৃহস্থের গোয়ালবাড়ীর এই প্রাভাতিক দৃশ্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর হয় না।

কুলগাছের তলে একটি তিউড়ী খুঁড়িয়া দামিনী ও বিধুর জন্য তাহাদের মা পোষলা রাঁধিতে বসিলেন। বেড়ের মধ্যে বেগুণ গাছে কাল কাল বেগুণ এবং চালের উপর শিম ফলিয়াছিল, তাহাই তুলিয়া আনিয়া কাজিয়া দিলেন, গাছ হইতে একটা পাতি লেবু তুলিয়া অম্বলের কাজ শেষ করা হইল। কিন্তু ভাই বোন পায়েসের জন্য বড় ধুন লাগাইল, তাই তিনি গোবরার মাকে শীতল ঘোষের বাড়ী হইতে আধ সের টাটকা খেজুরে গুড় আনিতে বলিলেন। শীতল ঘোষ চৌধুরীদের অনেকগুলি খেজুর গাছ ঝাটিয়াছিল, প্রত্যেক গাছের খাজনা স্বরূপ তাহার নিকট হইতে দুই সের করিয়া গুড় পাওয়া যাইত; যাহারা গুড় না লইয়া পয়সা লয়, তাহারা দুই আনা হিসাবে খাজনা পায়, কিন্তু ছেলেপিলের বাড়ী গুড় না লইলে চলে না বলিয়া, বিপিনের মা পয়সার পরিবর্ত্তে গুড় লইতেন।

গোবরার মা গুড় লইয়া আসিল। সকালে মাঠে লইয়া যাইবার আগে রাখাল বুধী গাইকে দুহিয়া রাখিয়া গিয়াছে, বিপিনের মা আধ সের দুধ, এক মুঠো আতপ চাউল ও টাটকা খেজুরে গুড় দিয়া ছেলে মেয়েকে পায়েস রাঁধিয়া দিলেন। দামিনী ও বিধু পোষলা করিয়া শান্ত হইলে গৃহিণী একটা কাঁটা পরিষ্কার করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখন বেলা অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। নদীতে স্নান করিতে যাইবার আর সময় ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি কূপ হইতে দুই ঘড়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিয়া ভিজে চুলগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধিয়া রান্না ঘরে চলিলেন। চুল ঝাড়টা শুকাইবারও অবসর হইল না, কারণ বাড়ীর কর্ত্তাটি শীঘ্রই জমিদারবাড়ী হইতে বুভুক্ষু অবস্থায় আসিবেন, এবং মাঠ হইতে রাখাল কৃষাণের ফিরিতেও অধিক বিলম্ব নাই।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পোষলা অনেক বাড়ীতে এই রূপেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু বুড়াদিগকে পোষলায় মাতিতে দেখাই অধিক পরিমাণে আমোদজনক। মাসের অর্দ্ধেক অতীত হয় দেখিয়া বৃদ্ধ জমীদার রামকিঙ্কর রায়ের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর পোষলার আয়োজনে মন দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রিয়তম বয়স্য গদাধর চন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গেল, তাহার প্রতি

কপি, কড়াইসুটী এবং কমলালেবু আনিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে সেই দেবদুর্লভ তরকারী আসিয়া পঁহুছিলে, বন্ধু বান্ধব-বর্গকে লইয়া বাবু পোষলা করিতে চলিলেন; দলে অনেক লোক—প্রায় পঞ্চাশ জন হইবে; পাড়ার অনেক আমোদপ্রিয় যুবক সঙ্গে যুটিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিন সকালবেলা বাবু সদলবলে নেপাল মাঝির নৌকায় চড়িয়া ভৈরব পার হইলেন। সঙ্গে রন্ধনের সরঞ্জাম অনেক রকম চলিল; চাউল অধিমণ, প্রচুর পরিমাণে তৈল, ঘৃত, তরকারী, দুই তিন রকমের ডাল, মসলা বাটা, বড় বড় কড়া, ভাত ডাল রাঁধিবার পিতলের ডেক্‌চী ইত্যাদি। বেলা দশটার সময় নদীর পশ্চিম পারে, মাধবপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল; নৌকা তীরে লাগিবামাত্র সকলে ঝুপঝাপ করিয়া নামিয়া পোষলার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিতে চলিল, দুই জন গোয়ালা চাকর জিনিষপত্র পাহারা দিতে লাগিল।

মাধবপুর গ্রামখানি সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীর পাউড়ীর ঠিক উপরেই দুই তিন খানি বড় বড় আটচালা ঘর, এটি মণ্ডলদের গোলাবাড়ী, ভিতরে সারি সারি গোলা; প্রাঙ্গণে তিন চারিটা উচ্চ নারিকেল গাছ—গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীর হইতে এ গুলি চিত্রের ন্যায় সুন্দর দেখায়। পাউড়ীর উপরে ঝাউ ও দেবদারু গাছের সারি,—উর্দ্ধশাখায় বসিয়া নানা রকম বিচিত্র বর্ণের পাখী কলরব করিতেছে; দোয়েল গান ধরিয়াছে, শ্যামা শিষ দিতেছে; হলদে পাখী 'বৌ কথা কও'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোন্ অনুদ্দিষ্টা, অভিমানগ্রস্তা, নীরব পল্লীবধূর অভিমানভঙ্গের নিষ্ফল আশায় আপনার কণ্ঠস্বরকে ক্লান্ত করিয়া তুলিতেছে। নদীর ক্রমনিম্ন তীরদেশে সাদা-কালো ছাগলের দল মাথা নীচু করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, একটা কুকুর দীর্ঘ ঘাস ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া প্রাণপণ শক্তিতে এক খানা হাড় চিবাইতেছে, নদীকিনারায় শৈবালরাশির মধ্যে সম্মুখের দুই পা বাঁধা একটা ঘোড়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুখ নামাইয়া কি খাইতেছে, এবং দূরে দূরে দুই তিনটা ডাহুক ও জলপিপি আবক্ষ দীর্ঘ প্রদেশের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর অপর পারে এক জন ধোপা এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পাটের উপর ময়লা কাপড় আছড়াইতেছে, তাহার সঙ্গিনী দুইটি স্ত্রীলোক সদ্যোধৌত কাপড়ের দুই পাশ ধরিয়া মাঠের উপর মেলিয়া দিতেছে, এবং এক একবার হাঁড়িতে করিয়া জল লইয়া তাহার উপর ছড়াইয়া

দিতেছে। একটু দূরে কতকগুলা গরু চরিতেছে, একটা ইটের পাঁজার কাছে দাঁড়াইয়া দুই জন রাখাল 'পাল্লা দিয়া' নদীজলে ঢিল ছুড়িতেছে, কাহার নিক্ষিপ্ত ঢিল বেশী দূরে যায়, ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ব্যস্ত,—এদিকে তাহাদের দুই একটা গরু চরিতে চরিতে দল ছাড়িয়া ধোপার কাপড়ের উপর গিয়া পড়িল, আর ধোপার ছয় বৎসরের একটি ছেলে বাম হস্তে একটা প্রকাণ্ড পেট মোটা ডাবা হুঁকা ও দক্ষিণ হস্তে চিতের ডাল লইয়া গরু তাড়াইয়া চলিল।

মাধবপুরে গৃহস্থপল্লীর অল্প দূরে একটা প্রকাণ্ড বাগান। সেই বাগান পোষলার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। বাগানটি ছায়াপূর্ণ, আবর্জ্জনাবর্জ্জিত, নদী হইতে অধিক দূরে নহে; এই বাগানে আম, তেঁতুল, কতবেল, চালতা এবং লিচু গাছের সংখ্যাই অধিক, অন্যান্য গাছও অনেক আছে। একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে তিন চারিটা বড় বড় তিউড়ি খোঁড়া হইল। যুবকের দল বৃক্ষশাখায় সাদা, লাল, হলদে রঙ্গের শীতবস্ত্র ঝুলাইয়া, জুতা ছাড়িয়া, কেহ তরকারী কুটিতে, কেহ চাউল ধুইতে, কেহ কাঠ কাটিতে বা উনান জ্বালিতে—প্রবৃত্ত হইল। চারি দিকে সকলেই শশব্যস্ত, হাস্যকলরবে চারি দিক পরিপূর্ণ,—যেন এই শান্ত অরণ্য-ভূমিতে কতকগুলি লোক মৃগয়া করিতে আসিয়াছে। দূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ঘুঘুর দল এই কলরবের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া, গলা ফুলাইয়া, মাথা নোয়াইয়া 'ঘুঘু' 'ঘু' শব্দে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়বেগ প্রশমিত করিতেছে। জামরুল গাছের ডালে কাঠঠোকরা 'ঠক্' 'ঠক্' শব্দে তাহার দীর্ঘ কঠিন চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষবল্কল ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং অদূরে একটা কদম্বের আগডালে একটা চিল বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এবং মাঝে মাঝে অতি করুণ, তীব্র স্বরে শীতকাতর জীবনের কঠোর বেদনা ব্যক্ত করিতেছে।

কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর অনুগত দুই চারি জন ব্রাহ্মণযুবক রন্ধনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ, সকল বিষয়েই তাহারা ধনুর্দ্ধর। গাঁজা টানিতে, মদ খাইতে, মারামারি করিতে, অপরাধে বা নিরপরাধে বাবুর জুতা খাইতে এবং বাবুর প্রসন্নতালাভকালে প্রহারের সুদ ও আসল পোষাইয়া রসগোল্লা গিলিতে অত্যন্ত মজবুত; সকাল নাই, বিকাল নাই, দুপর নাই, সন্ধ্যা নাই, সকল সময়ই তাহারা গোবিন্দপুরের গ্রাম্য রাস্তায়, নদীর ধারে, পুকুরের পাড়ে,

গৃহস্থের বাগানের প্রান্তবর্ত্তী সরু গলি পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; পরিধানে চওড়া পেড়ে কাপড়, পায়ে সদ্যোব্রস জুতা, গায়ে কামিজ বা কোট, কখন তাহার উপর কোঁচান চাদর, কখন র‍্যাপার, কাহারও হস্তে ছাতা, কাহারও হাতে ছড়ি,—কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছে, সর্ব্বজ্ঞের প্রপিতামহও তাহা বলিতে পারেন না! কিন্তু কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর এই সকল কিঙ্করের গতি ত্রস্ত, মুখের ভাব ব্যস্ত, চক্ষু সর্ব্বত্রগামী, দেখিয়া মনে হয়, কোনও ধনবানের বংশধর বুঝি পিতার অগণিত অর্থে আপনাদিগের তীক্ষ্ণ বিষদন্ত ক্ষয় করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাহারও চাল চুলা নাই, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্র কৃষ্ণকিঙ্করের তৈলাক্ত স্কন্ধে ভর করিয়াছে;—এ দিকে তাহাদিগের দুঃখিনী মাতা পৈতা কাটিয়া কিম্বা কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচিকার কাজ করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন। ইহারা কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; তাহাদিগকে পথে দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধূলা ছাড়িয়া রাস্তা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যুবতীর দল সভয়ে ঘোমটা টানিয়া পথ হইতে দশ হাত তফাতে দাঁড়ায়। গাছিরা খেজুর গাছে ঠিলি বাঁধিতে উঠিয়া দেবাৎ ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠে, এবং রস চুরী যাইবার ভয়ে ঠিলির মধ্যে পর্য্যাপ্তপরিমাণে মানকচু রাখিয়া দেয়, কিন্তু 'নষ্টস্য কান্থা গতিঃ'—সন্ধ্যার পর পাঁচ সাত জনে মিলিয়া রস চুরী করিতে গিয়া যখন ইহারা দেখিতে পায়, বেবাক ঠিলির মধ্যেই মানকচু চাকা চাকা করিয়া কাটা রহিয়াছে, তখন নিরাশ ক্রোধে চঞ্চল হইয়া ঠিলিগুলি ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রস্থান করে,—প্রভাতে নির্ব্বোধ গাছিরা বুঝিতে পারে, ঠিলিতে মানকচু না দেওয়াই ছিল ভাল, রস চুরী যাউক, ঠিলিগুলি ভাঙ্গিত না।

যাহা হউক, এই সকল আটপিটে 'দশকর্ম্মান্বিত' ব্রাহ্মণযুবক এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বন হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল, খন্তা দিয়া মাটি খুড়িয়া উনন প্রস্তুত হইলে—রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। বেলা অনেক হইয়াছে, এবং শীত কিছু কমিয়াছে দেখিয়া, তৈলচর্চ্চিত দেহে অনেকে স্নান করিতে আসিল।

তখন বেলা বারটা।—গ্রামের গৃহস্থ রমণীগণ সংসারের কাজ সারিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন, নিশ্চিন্ত মনে স্নান করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে

কত গল্প, কত ক্ষুদ্র দুঃখসুখের কথা, কত হাসি, কত বেদনাভরা সাশ্রু-কাতর বচন ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার সংখ্যা নাই; ছোট ছোট মেয়েরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গামছা ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিতেছে, কোনও বার গামছা ভরিয়া গুগলি উঠিতেছে, কোনও বার শুধু বালি উঠিতেছে, আর তাহাদের ওষ্ঠস্খলিত কৌতুকতরল সরল হাস্যে নদীতট প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুই তিন জন বৃদ্ধা জলের ধারে এক খানা কাঠের গুঁড়ির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া তেল মাখিতেছে, মাটি দিয়া মাথা ঘসিতেছে, কেহ বা বালি দিয়া বড়া মাজিতেছে, কয়েকটা বক নিয়তটবর্ত্তী শুশুনির ডালের উপর তাহাদের দীর্ঘ লঘু পদ শনৈঃ শনৈঃ নিক্ষেপ করিয়া আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পোষলার দল নদীতে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, নিতাই বাক্সির মাছের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে;—খালুয়ের ভিতর নানা রকম মাছ,—মোটা মোটা গল্লা চিংড়ি, মাঝারী রকমের কালবাস, নৌচি, মিরগেল, বড় বড় খয়রা—দেখিয়া বাবুদের মনে যৎপরোনাস্তি লোভের সঞ্চার হইল, তাহারা খালুই সমেত সমস্ত মাছ পোষলার কাছে লইয়া গেল, নিতাই বাবুদের অনুসরণ করিল, তাহার পুত্র বাঁশি দাঁড়ের উপর জাল খানি ঝুলাইয়া গৃহে চলিল। কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু গ্রামের বাজারে মাছের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, বিশেষতঃ মাছ গুলি খুব টাট্‌কা। বাবুদের মাছের দরকার অত্যন্ত বেশী, এ কথা বুঝিতে পারিয়া নিতাই খালুয়ের সমস্ত মাছের দাম দু টাকা চাহিল। কিন্তু অবশেষে বারো গণ্ডা পয়সাতেই সমস্ত মাছ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, যদিও এইরূপ 'থাওক' সমস্ত মাছ বেচিয়া তাহার লাভ হইল না; কিন্তু কি করিবে? কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু জমীদার, তিনি ইচ্ছা করিলে নিতাইকে 'ভিটে-মাটি' ছাড়া করিতে পারেন। যাহা হউক, এতখানি লোকসান দিয়াও সে ভরসা করিল যে, এবার বাবুকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর কাছের আম কাঁঠালের বাগান খানি কিছু কম টাকায় জমা করিয়া লইবে।

রান্নাবাড়া সমস্ত ঠিক হইলে হঠাৎ দেখা গেল, একটা জিনিষের বড় অভাব রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে পেঁয়াজ আনা হয় নাই। নৌকা করিয়া নদী পার হইয়া গ্রামের বাজার হইতে পেঁয়াজ আনিতে অনেক বিলম্ব হইতে

পাবে, হয় ত এত বেলায় সব্জীরা দোকান তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, ভাবিয়া দুই জন মোসাহেব তখনই সব্জীপাড়ার দিকে ছুটিল; এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে এক কোঁচড় পেঁয়াজ ও আদঝুড়ি পেঁয়াজের কলি লইয়া উপস্থিত হইল। "রামকান্ত বড় যোগাড়ে ছোকরা" বলিয়া সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রামকান্তও আত্মপ্রসাদে প্রচুর স্ফীত হইয়া দংষ্ট্রা পংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল, "আমাদের বাবুর হুকুম হলে কি না করতে পারি? দুফুর রাতে বাঘের দুধ মিলাতেও এ শর্ম্মা অক্ষম নয়।"—কিন্তু তৎকালে ব্যাঘ্রদুগ্ধের বিশেষ কোনও আবশ্যকতা অনুভূত না হওয়াতে, রামকান্তের এই বাহাদুরী পরীক্ষা করিবার কাহারও অবসর হইল না। বিশেষ তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়—একটি তিউড়ীর উপরে এক প্রকাণ্ড কড়াইয়ে পায়েস চড়িয়াছে, টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, আর একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া কাঁধে এক জন লোক প্রকাণ্ড একখান হাতা দিয়া নূতন খেজুরে গুড় এবং আতপ চাউল মিশ্রিত সেই দুগ্ধরাশি আলোড়িত করিতেছে, অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সন্নিবদ্ধ। কেবল একটু দূরে একটা আমগাছের ছায়ায় দুই তিনটি ছেলে 'দাঙাগুলি' খেলিতেছিল, এবং আরও খানিক দূরে বৃক্ষাদিবর্জ্জিত, রৌদ্রতপ্ত 'উকনে'-পূর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলি অধিকবয়স্ক বালক মহা উৎসাহে ব্যাট্‌বল খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় মিষ্টান্ন ও দধি লইয়া ময়রা এবং গোয়ালা পোষলা ক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইল। ময়রার পো আধাছানার সন্দেশ যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টার ত্রুটী করে নাই; গোপবৃদ্ধও 'শুকোদই' পাতিবার সমস্ত অব্যর্থ কৌশল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সন্দেশ ও দধি দেখিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর গদাধরপ্রমুখ বয়স্যবর্গ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এ সন্দেশ গোয়ালাবাড়ীর দিক দিয়াই যায় নাই; এই যে দই, ইহাকে 'শুকো' বলিলে কাহাকে "রাশি" উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিস্তর গবেষণা দ্বারাও নিরূপণ করিতে অক্ষম। গোয়ালা এবং ময়রা উভয়েই তাহাদের সযত্নরচিত সামগ্রীর এইরূপ বিধ সমালোচনা শুনিয়া, এই সকল চাটুকারপুঙ্গবের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির প্রতি স্বগত যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, তাহা শঙ্কর বিকল্পে উদ্দেশে বর্ষিত হওয়া ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কখনও খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত হয় নাই।

রন্ধন শেষ হইলে সারি সারি পাতা পড়িয়া গেল, ছেলেরা দাঁড়াগুলি এবং র‍্যাট্‌বল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া সারি বাঁধিয়া বসিয়া গেল। কয়েক জন পরিবেশক ভিন্ন সকলেই ভোজনে যোগ দিল; ধীরে ধীরে আহার শেষ করিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল।

লোহিত সূর্য্য বাগানের অন্তরালে পশ্চিম আকাশপ্রান্তে নামিয়া পড়িয়াছে, বাগানের অসমোচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া মাঠের উপর পড়িয়া ক্রমে দীর্ঘতর হইয়া মিলাইয়া গেল। ক্রমে গোধূলির ছায়া জলস্থল সমস্ত আচ্ছন্ন করিল। পোষ্টলার দলস্থ সকলে মোটা কাপড়ে সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া নৌকায় উঠিল। যখন গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগান হইল, তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাগানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকচ্ছটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং নদীর অপরপারস্থ বাগানের অভ্যন্তরবর্ত্তী বুনোপাড়া হইতে ম্লান মৃৎপ্রদীপ মৃদু আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

পারঘাটের কাছে বটগাছের নীচে আসিয়া নৌকা লাগিল। তখন পারঘাটের খেয়া নৌকায় মদকপূর্ণ একগাড়ী গুড় নদী পার হইতেছিল, অদূরস্থিত গৌরদাস বাবাজীর আখড়া হইতে খোল করতালের আওয়াজ আসিয়া একটা আসন্ন কীর্ত্তনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল, এবং পারঘাটার উপরে শিমুলগাছের নীচে মাঝিদের অন্ধকারময় শয়নকুটীর হইতে কে এক জন গাহিতেছিল;—

"বেলা গেল সন্ধে হ'ল পার কর আমারে।"

অন্ধকারপূর্ণ স্তব্ধ সায়াহ্নে নদীপ্রান্তবর্ত্তী কুটীরশায়ী একটি নিরক্ষর ব্যক্তির তাললয়হীন এই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে একটি অস্পষ্ট বেদনার প্রতিধ্বনি, শান্ত সন্ধ্যার মর্ম্মপ্রবাহী সংযত আকাঙ্ক্ষার একটি অত্যন্ত মৃদুকল্লোল শ্রোতার সমবেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় মনোহরগঞ্জের ডাকহরকরা অনেক দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাঝি, নৌকা বাঁধো!"

গান বন্ধ করিয়া নীলমণি মাঝি শশব্যস্তে ডাকের নৌকা ঘাটে লইয়া আসিল। ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া ডাকহরকরা নৌকায় উঠিয়া

ডাকের বোঝাটা নৌকার উপরে ফেলিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ইঃ—বড্ডা জাড়, নীলুদাদা কল্‌কেটা কোথায় গো!"

তামাক সাজিয়া ডাকহরকরা টিকে ধরাইবার জন্য চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল, এদিকে পোষলার দল জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথ দিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কুরুক্ষেত্র।

ইতিহাসাংশ।

কুরুক্ষেত্রের কাব্যাংশ ও দর্শনাংশের ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ইতিহাসাংশের সমালোচনা করিব।

কুরুক্ষেত্র ও রৈবতকে আবিষ্কৃত বা প্রচারিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকলের মূল কি? তাহা কি কেবল কল্পনাবিজৃম্ভিত, অথবা ইতিহাসের সত্যভিত্তির উপর নির্ম্মিত? এ কথার মীমাংসা প্রথমেই করা উচিত। আমি রৈবতকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম,—"কবি প্রতিভার আলোকে ভূত ইতিহাসের অন্ধকার ছায়া আলোকিত করেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে পুরাতত্ত্ববিদেরা বহু গবেষণায় আবিষ্কৃত ইতিহাসছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।" এ মন্তব্য কি কুরুক্ষেত্র রৈবতক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? এক কথায় কবিপ্রতিভা এ ক্ষেত্রে আমাদের যে অভিনব চিত্র কৌতূহলময় পুরাতত্ত্বজগতে উপনীত করে, তাহা কি ইতিহাসের অনুরূপ?

প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে, ঐতিহাসিক কাব্যে কতটুকু ইতিহাস রক্ষা করা আবশ্যক। কাব্যের প্রত্যেক চরিত্র কি ইতিহাসসঙ্গত হওয়া চাই, অথবা মূল প্রতিপাদ্য ইতিহাসের অবিরুদ্ধ হইলেই হইবে? এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের সূচনা পড়িয়া ১৮৮৩ সালে যে মন্তব্য প্রকাশিত করেন, আমার মতে তাহাই সমীচীন। সে মন্তব্যের অনুবাদ এই,—"শেষ কথা, তোমার কাব্য কি ইতিহাস ও রাজনীতির

অনুগত হইবে? আমি পূর্ব্বে ইতিহাসের সহিত কাব্য সম্পর্কহীন করিতে বলিয়াছি, কিন্তু ইতিহাসের বিপরীত করিতে বলিতে পারি না। কাব্যোক্ত চরিত্র চিত্রণে তাহাও করিতে পার; কিন্তু জাতীর জীবনের ব্যাপক ঘটনাবলির অপলাপ করিবার উপদেশ দিতে আমার ত সাহস কুলায় না। অর্থাৎ, জাতীয় কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য, ইতিহাসের অবিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, কাব্যোক্ত চরিত্রবিশেষ ইতিহাসের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি নাই।

রৈবতক কুরুক্ষেত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি? শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবধর্ম্মপ্রচার ও ভারতসাম্রাজ্যস্থাপন, এবং সেই উদ্যমে ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত প্রতিকূল অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের মিলিত শক্তির সংঘর্ষ। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার ও সাম্রাজ্যস্থাপন স্বয়ং বঙ্কিম বাবু * তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে এ তত্ত্ব এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের অনুমত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর অকাট্য যুক্তি, প্রচুর পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের সমক্ষে আমার প্রমাণবিন্যাস ধৃষ্টতামাত্র। বঙ্কিম বাবুর উপর আমি কি বলিতে পারিব? অতএব কাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নবধর্ম্মপ্রচার ও ভারতসাম্রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কিছু না বলিয়া, অপর প্রতিপাদ্য ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের মিলিত শক্তির সংঘর্ষের আলোচনা করি।

শ্রীকৃষ্ণপরিচালিত ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত প্রতিকূল অনার্য্য ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির এই সংঘর্ষের কোন আভাষ কি মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়? আমার মতে মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত ঈষৎ অনুধাবন করিয়া পাঠ করিলে এরূপ আভাষের ইঙ্গিত অনেক স্থলে মিলিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন, শক্রযজ্ঞনিবারণ, ইন্দ্রের বিপক্ষে গোবর্দ্ধনধারণ, অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডবদাহন, এ সকল উপাখ্যানের অর্থ কি? ঋষিশাপে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাধহস্তে অপমৃত্যু এবং যদুবংশধ্বংস, তাহার অব্যবহিত পরে দস্যু কর্ত্তৃক দ্বারবতীপুরী ও যদুপত্নীলুণ্ঠন; মুনি বাক্যে পরীক্ষিতের নাগদংশনে অকাল মরণ, জন্মেজয়ের সর্পসত্র, জরৎকারু ঋষির নাগকন্যা বাসুকী ভগ্নীর পাণি

* বঙ্কিম বাবু স্বরচিত "ধর্ম্মতত্ত্বের" এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, 'বেদে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে'—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

গ্রহণ এবং তাঁহারই গর্ভজাত আস্তিক ঋষির নাগযজ্ঞে সর্পজাতির প্রাণ-রক্ষা, এ সকল ঘটনার কি কিছু তাৎপর্য্য আছে? ইহা কি কবির অমূলক কল্পনা, অথবা বাতুলের অলীক জল্পনা? যাঁহারা এই সকল অতিপ্রকৃত অলৌকিক ব্যাপার বাস্তব বিবরণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের সহিত বিচারের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্য শ্রেণীরও দুই-এক জন পাঠক থাকিতে পারেন, এই আশায় পূর্ব্বোক্ত ঘটনা * সকলের কিছু আলোচনা করিতেছি। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম বাবু কালীয়দমনকে কাল ও ঈশ্বর সম্বন্ধে রূপকাখ্যান বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। হয় ত তাঁহার নিরূপণই ঠিক। কিন্তু গো ও গোপগণের প্রতি অত্যাচারকারী যমুনাতীরবাসী অনার্য্য সম্প্রদায়বিশেষের নিবারণ অর্থ করিলে অধিক সঙ্গত হয় না কি? অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে যতটুকু বৃত্তান্ত আছে, তাহাতে কোন্ অর্থ সমীচীন, নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের অন্যান্য ঘটনার সহিত সমাবেশ করিলে, অনার্য্যনিসূদন অর্থই সুসঙ্গত মনে হয়।

শক্রযজ্ঞনিবারণে আমরা প্রথম শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্মের বিপক্ষে নবধর্ম্মমতস্থাপনের স্পষ্ট পরিচয় পাই। 'কর্ম্মবলেই জীব সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। এ জগতে সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে হয়; ইন্দ্র কি তাহার অন্যথা করিতে পারেন? তবে ইন্দ্রের উপাসনায় ফল কি? অতএব কর্ম্মেরই পূজা কর। কর্ম্মই দেবতা।' † অবশ্য এরূপ প্রচলিতের বিরোধী মত প্রচারে ইন্দ্রের বা ইন্দ্রপূজকদলের বিদ্বেষ আপতিত হইবার সম্ভাবনা। তাহারা যে ক্রুদ্ধ হইয়া গোকুল অবরোধ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আর ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ যে গোপাল ও গোবৎসের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া ভুজবলে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুলের রক্ষাবিধান করিবেন,

* এ স্থলে বলা উচিত যে, এ সকল ঘটনার প্রকৃত তত্ত্বার্থ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্বতঃ প্রতিভাত হয় নাই। রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কবি নবীন বাবুর মুখে প্রসঙ্গতঃ যে সব ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাষ পাই, মহাভারতাদির সাহায্যে তাহারই বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

† সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মনৈবোপপদ্যতে।
কিমিন্দ্রেনেহ ভূতানাং স্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্॥
অনীশেনাত্মথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্।
তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ॥

তাহা ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অনুরূপই। গোবর্দ্ধনধারণের এরূপ ব্যাখ্যান (যাহার আভাষ কবি রৈবতকে দিয়াছেন) কি অসঙ্গত? কালীয়দমনে আমরা যে অনার্য্যপ্রশমনের ইঙ্গিত পাই, খাণ্ডবদাহনে তাহার সুস্পষ্ট আভাষ। উপগল্পের আবর্জ্জনা পরিহার করিলে ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সন্নিহিত খাণ্ডববন, যাহা 'রাক্ষস দানব ও নাগগণের কান্তারদুর্গস্বরূপ ছিল, সেই ভীষণ অরণ্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সাহায্যে দগ্ধ হইয়াছিল। আর ঐ খাণ্ডববন রক্ষার জন্য ইন্দ্র (আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রপূজক দল) বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারত হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাই। 'প্রজ্বলিত হুতাশন সেই মহারণ্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিয়া ভীষণ শব্দে রুপবান্ করিতে লাগিলেন।' 'শত সহস্র জলদগণ দেবরাজের অনুজ্ঞাক্রমে খাণ্ডববনের উপর স্থূল ধারাতে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।' 'যে সকল রাক্ষস দানব ও নাগগণ একত্র সংহত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিলেন কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন।' 'ঐ বনদহনসময়ে অগ্নি কেবল অশ্বসেন, ময় ও শার্ঙ্গক নামক পক্ষিচতুষ্টয়, এই ছয় জনকে দগ্ধ করেন নাই।' ময় অর্জ্জুনের শরণাগত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা পায়। পরে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করিয়া আপন অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। অশ্বসেন বহু ক্লেশে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সে অর্জ্জুনের বৈরিতা ইহজন্মে ভুলে নাই। কুরুক্ষেত্রে কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণের সহায় হইয়া অর্জ্জুনের প্রাণনাশে প্রায় সফলমনোরথ হয়।

এইবার শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যু ও যদুবংশধ্বংসের আলোচনা করি। মহাভারত মৌষল পর্ব্বে এ বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত আছে। "একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকা নগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ইনি বভ্রুর পত্নী; ইনি কি প্রসব করিবেন।' ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে কহিলেন, 'এই বাসুদেবতনয় শাম্ব মোষতর লৌহময় মুষল প্রসব

* বিষ্ণুপুরাণেও এই তিন জনেরই নাম নির্দ্দেশ আছে। ভাগবতে তাঁহাদের সহিত দুর্ব্বাসারও সাক্ষাৎ পাই। 'বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ'। ১১ স্কন্ধ, ১ অধ্যায়।

করিবে।—ঐ মুষলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। বাসুদেব জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিবেন।' অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব এক ঘোরতর মুষল প্রসব করিল। রাজা রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।" বিষ্ণুপুরাণ মতে 'ঐ লৌহচূর্ণ তীরসংলগ্ন হইয়া এরকা বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইল। যাদবগণ সেই মুষলের শেষ কিয়দংশ চূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। জরা নামক ব্যাধ ঐ লৌহখণ্ড খানি গ্রহণ করিল'। পরে প্রভাসতীর্থে যদুবীরগণ গৃহবিবাদে মত্ত হইয়া ঐ এরকা আঘাতে পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিল। কেবল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জীবিত রহিলেন। স্বল্পক্ষণ পরে বলরাম যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাকুলিত চিত্তে সেই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় গান্ধারী তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, এবং দুর্ব্বাসা * যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি নারদ দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন।' ঐ সময় জরা ব্যাধ মৃগভ্রমে 'মুষলাবশেষ লৌহ দ্বারা তাঁহার পাদদেশ বিদ্ধ করিল।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার পর মানবদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এ ঘটনাটির তাৎপর্য্য কি? যাঁহারা ঋষিবাক্যে পুরুষের এক রাত্রের মধ্যে মুষলপ্রসবের কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কুলনাশন মুষল (যাহা ঋষিশাপে প্রসূত) ঋষিপ্রযুক্ত গৃহভেদকৌশল বই আর কিছুই নহে। ঋষিশাপে যে গৃহবিবাদ হইয়া যদুবংশ ধ্বংস হয়, ইহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। এই শাপ (দেখিতে পাই) মুষল প্রসূত করিয়া তজ্জাত এরকা দ্বারা সেই ধ্বংসকার্য্য নিষ্পাদন করে। পরে সেই মুষলেরই অংশ লইয়া অনার্য্য ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যু ঘটায়। যদু বৃদ্ধেরা সেই মুষলের প্রতীকারচেষ্টা করিয়াছিলেন, গৃহবিচ্ছেদনিবারণের প্রয়াস করিয়াছিলেন; সফল হন নাই। মুষলের কিয়দংশ রহিয়া গেল। আর মুষলচূর্ণই এরকায় রূপান্তরিত হইয়া ঋষিবাক্যের অমোঘতা সপ্রমাণ

* বিষ্ণুপুরাণে গান্ধারীর কোন উল্লেখ নাই; কেবল দুর্ব্বাসারই উল্লেখ আছে—যথা, সংস্মারয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ।

করিল। এই ঘটনায় আমরা ব্রাহ্মণের সহিত অনার্য্য সম্মিলনের কিছু আভাস পাই। সে আভাস অন্যান্য ঘটনায় স্ফুটতর হয়।

এই মুষলবৃত্তান্তে, দুর্ব্বাসার যেন বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, মনে হয়। যে ঋষিরা মুষলসংক্রান্ত অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুর্ব্বাসার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আর অপমৃত্যুর পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসাবাক্য স্মরণ ও সম্মাননা করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ শুনিয়াছি। ইহা কি দুর্ব্বাসার কৃষ্ণদ্বেষের স্পষ্ট প্রমাণ নহে? মহাভারত বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, পাণ্ডবেরা যখন রাজ্যচ্যুত বনচারী, তখন দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের হিতার্থে সশিষ্য তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে যান, এবং কৃষ্ণের ভয়ে পলায়নপর হইয়া বিফলমনোরথ হয়েন। বঙ্কিমবাবুর মতে এ উপাখ্যানের এই অর্থ যে, শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাড়াইয়াছিলেন। পুরাণান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দুর্ব্বাসাকে ত্রিভুবনে তাড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। এই কক্ষে দুর্ব্বাসা যে যদুবংশধ্বংসে ও শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুসংঘটনে প্রধান উদ্যোগী হইবেন, ইহার আর বিচিত্র কি? অতএব মূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব এইরূপ বলিয়া মনে হয়। দুর্ব্বাসাপ্রমুখ এক সম্প্রদায় ঋষি যদুবংশীয়দিগের মধ্যে গৃহবিবাদ উৎপাদন করিয়া সবংশ শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ সাধন করে। আর তাঁহাদিগের ঐ কার্য্যে অনার্য্যের সম্প্রদায়বিশেষ তাহাদিগের সহিত যোগ দান করে। এই যোগদানের ইঙ্গিত অনার্য্যহস্তে শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। স্পষ্ট আভাস পাই,—যদুপুরী ও যাদবপত্নীলুণ্ঠনে। মহাভারতে দেখিতে পাই যে, যদুবংশধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ যাদবরমণীগণের রক্ষা জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। 'তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থে গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা না করে।' 'মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণকে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি কৃষ্ণোক্তিই এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ। পরবর্ত্তী ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার সমূলকতা প্রমা-

* যদুবংশীয় বজ্রের বিনাশও অনার্য্য কর্ত্তৃকই সাধিত হইয়াছিল। 'মহাবীর বজ্র ঐ সময় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনই সেই রক্ষণাগমভূত মুষল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল।'—মহাভারত মৌষল পর্ব্বাধ্যায়।

পিত হয়। মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান মত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সুহৃদের শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া 'সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় সেই যাদবকামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণ সহিত ক্রমে ক্রমে নদীতীর-কানন ও পর্ব্বত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধ পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্য পরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যাদবরমণীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া দস্যুগণ অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিল। দস্যুগণ লগুড় হস্তে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। ঐ সময়ে যদুবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দস্যুগণ তাঁহার সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট রমণীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।'

এ ঘটনার * অর্থ কি এই নহে যে, যদুকুলক্ষয়ে অবসর পাইয়া অনার্য্য সম্প্রদায় অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবীরকে নিরাকৃত করিয়া যাদবরমণী অপহরণ করিয়াছিল?

এই সকল প্রমাণের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়াও কেহ হয় ত বলিবেন, 'ভাল, কৃষ্ণের বিপক্ষে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র মানিলাম, ক্ষত্রিয়ের সহিত অনার্য্য শক্তির সংঘর্ষও না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের সংমিলনের প্রমাণ কই?' প্রমাণ ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর বিশদ ভাবে দেখা যায়।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, অভিমন্যুতনয় পরিক্ষিৎ একদা নিবিড় বনে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিয়া পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক মুনির সন্নিকটে উপস্থিত হন, এবং মুনির মৌনব্রত না জানিয়া রোষপরবশ হইয়া একটি মৃত সর্প তুলিয়া মুনির গলদেশে স্থাপন করেন। ইহাতে মুনির তেজস্বী পুত্র শৃঙ্গী পরিক্ষিৎকে এই অভিশাপ দেন যে, নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সেই ব্রাহ্মণাপমানকারী রাজাকে সপ্ত রাত্রির

* বিষ্ণুপুরাণে ধনাপহরণের কথারও উল্লেখ আছে। অবজ্ঞায় বচস্তস্য জগৃহুস্তে তদা ধনম্। ইত্যাদি। এই দস্যুগণ তথায় আভীর ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সর্পেই বধালয়ে প্রেরণ করিবে।' শমীক ঋষি যথাসাধ্য পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পুত্র প্রসন্ন হইলেন না। তখন তিনি শিষ্য-মুখে রাজার নিকট পুত্রের নির্ব্বন্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। পরিক্ষিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া একস্তম্ভসুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, চিকিৎসক প্রভৃতি লইয়া সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। সপ্তম দিবসে 'তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দুঃসহ বিষবহ্নি দ্বারা' রাজাকে প্রাসাদ সহিত ভস্মীভূত করিল।

কশ্যপ নামে এক ঋষি পরিক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; কিন্তু তক্ষক তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল।

এ ঘটনার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নহে যে, ব্রাহ্মণ ও অনার্য্যের মিলিত শক্তির অবমাননাকারী পরিক্ষিৎ ছদ্মবেশী আততায়ীর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন; আর কশ্যপপ্রমুখ ব্রাহ্মণ স্বপক্ষের অনার্য্যের অর্থে বশীভূত হওয়ায় এই বিনাশসাধন অতি সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল?

জনমেজয় পিতার বৈরনির্য্যাতনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া নাগ জাতির উচ্ছেদ-সাধক সর্পযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। এ কার্য্যে তদানীন্তন প্রধান প্রধান ঋষিরা তাঁহার সহায় হইলেন। সপ্ত ভার্গব, কৌৎস, জৈমিনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণপ্রধানেরা তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন। অধিক কি, শ্রুতশ্রবা ঋষির ঔরষে 'সর্পী'র গর্ভজাত সোমশ্রবও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। হীনবল নাগজাতি সহসে বিনষ্ট হইতে লাগিল। 'ঋষিগণ সেই সুমহান সর্পযজ্ঞে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে অতি ভীষণাকার সর্পসকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল।' 'যাজকগণ যখন সর্পগণকে উদ্দেশ করিয়া অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করেন, তখন শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, স্থবির শিশু শত সহস্র সর্পগণ কৃপণস্বরে পরস্পর আহ্বানানন্তর বিবিধ শব্দে চীৎকার পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হব্যবাহে পতিত হইতে লাগিল।' নাগজাতি ধ্বংসাবশেষ হইলে আস্তিক ঋষি জনমেজয়ের নিকট অবশিষ্ট সর্পকুলের প্রাণভিক্ষা করিয়া নাগযজ্ঞ নিবারিত করিলেন। অর্থাৎ, আস্তিক ঋষি অনার্য্য জাতির পক্ষ হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ জনমেজয়ের সহিত সন্ধি করিয়া হতাবশিষ্ট অনার্য্যদিগের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই আস্তিক ঋষিটি কে, একটু বুঝিয়া দেখা উচিত।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব পাঠে জানা যায় যে, জনমেজয়ের রাজ্যকালে বিচক্ষণ নাগনায়কেরা 'যাহাতে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ না হয়, বা হইলে ব্রিফেল হইয়া যায়', এমন কোন উপায় স্থির করিবার জন্য এক দিন এক মন্ত্রণাসভা করেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, যেহেতু 'সর্পসত্র না হইবে এমন নহে, এবং যাহা হইতে আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত, সেই রাজা জনমেজয়ও সামান্য পুরুষ নহেন', অতএব এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইবার উপায় এই যে, ধীশক্তিসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপস্যারত মহর্ষি জরৎকারুর সহিত বাসুকিভগিনী জরৎকারুর বিবাহসম্বন্ধ ঘটনা হউক, তাহা হইলে ঐ বিবাহজাত আস্তিক মুনি নাগগণকে সর্পযজ্ঞ হইতে উদ্ধার করিবেন। তদবধি বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে কন্যাবস্থায় রাখিলেন। পরে বিবিধ কৌশলে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া জরৎকারুর সহিত ভগিনীর পরিণয় সম্পাদন করিলেন। কিন্তু বনের পাখীকে কত দিন পিঞ্জরে রাখা যায়? ঋষি অল্প দিনেই সামান্য কারণে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় উগ্র তপস্যায় নিরত হইলেন। বাসুকি এ সংবাদে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুভগে! সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করিয়াছি, তাহা নিষ্ফল না হয়। জরৎকারু কহিলেন, ভ্রাতঃ! তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।' নাগেন্দ্র বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে ভগিনীর বাক্য গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তক্ষক কর্ত্তৃক পরিক্ষিতের গুপ্তহত্যার পর, তৎপুত্র জনমেজয়ের প্রতিহিংসার ভয়ে নাগজাতি আকুল হইয়াছিল; পরে নাগরাজ স্বীয় ভগিনীর ব্রাহ্মণ ঋষির সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার ঔরসজাত পুত্র আস্তিকের সাহায্যে নাগকুলকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য মিলনের ইহা অপেক্ষা আর কি স্পষ্টতর আভাষ হইতে পারে।

সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনে ও খাণ্ডবদাহনে আমরা আর্য্য অনার্য্য শক্তির সংঘর্ষের পরিচয় পাই, গোবর্দ্ধনধারণে ও ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবধর্ম্মপ্রচারের ইঙ্গিত পাই, এবং ঋষিশাপে যদুবংশধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যু, দস্যু কর্ত্তৃক

যাদবপত্নীলুণ্ঠন, ব্রহ্মশাপে পরিক্ষিতের অকালমৃত্যু, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ এবং বাসুকিভগ্নীর গর্ভজাত আস্তিকের সাহায্যে সর্পজাতির প্রাণরক্ষা প্রভৃতি ঘটনায়, ক্ষত্রিয়শক্তির সহিত মিলিত ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য শক্তির সংঘর্ষের স্পষ্ট আভাস পাই। অতএব এখন বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, রৈবতক কুরুক্ষেত্রের যাহা মুখ্য প্রতিপাদ্য,—শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্যের প্রতিকূলে নবধর্ম্মপ্রচার ও ভারতসাম্রাজ্যস্থাপন, এবং সেই উদ্যমে ক্ষত্রিয়-শক্তির সহিত প্রতিকূল অনার্য্য ও ব্রাহ্মণ্যের মিলিত শক্তির সংঘর্ষ—এ কথা কবিকল্পনা নহে। ইহা সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। আর কাব্যে কবি উক্ত প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিয়া ইতিহাসের অনুসরণই করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের মূল প্রতিপাদ্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে আলোচনা করিলাম। অতঃপর কাব্যগত চরিত্র ও ঘটনাবিশেষের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে, কাব্যোক্ত চরিত্র ও ঘটনায় কত টুকু ঐতিহাসিকতা থাকা আবশ্যক। এখন বঙ্কিম বাবুর সেই মন্তব্য স্মরণ করুন। 'কাব্যোক্ত চরিত্র চিত্রণে তাহাও (ইতিহাসের বিপরীত) করিতে পার।' চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা, ঘটনা সম্বন্ধেও তাহাই। কাব্যোক্ত ঘটনাবিশেষ অনৈতিহাসিক হইলেও ক্ষতি নাই। এ বিষয়ে যুক্তির অবতারণা অপেক্ষা মহাকবির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অধিক উপযোগী হইবে; কারণ, এরূপ স্থলে মহাকবির নজির অকাট্য।

সেক্সপিয়র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিচার্ড, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম হেনেরি সর্ব্বজনবিদিত। ঐ সকল নাটকের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এক জন সুবিজ্ঞ সমালোচক এইরূপ লিখিয়াছেন। * 'সেক্সপিয়র যে স্থলে কালের ক্রম ও ঘটনার বাস্তবতার ব্যতি-

* Even when he makes free with chronology and varies from the actual order of things it is commonly in quest of something higher and better than chronological accuracy; and the result is in most cases favourable to right conceptions; * * If he brings in fictitious persons and events mixing them up with real ones it is that he may set forth those parts and elements and aspects of life which lie without the range of common history, enshrining in representative ideal forms the else neglected substance of actual characters.

ক্রম কালের যাথার্থ্য অপেক্ষা কোন উচ্চতর উৎকৃষ্টতর তত্ত্বের অনুরোধে সাধিত হইয়াছে। আর সেই ব্যতিক্রমের ফল প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের অনুকূল হইয়াছে। যে স্থলে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার সহিত কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনের প্রচলিত ইতিহাসের বহির্ভূত অংশ ও প্রণালী প্রকটিত করা; বাস্তব চরিত্রের অনুদ্দিষ্ট সারতত্ত্ব মনঃসৃষ্ট চরিত্রে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। আর ইহাও বক্তব্য যে, সেক্ষপিয়র কৃত অনেক ইতিহাসবিপর্য্যয় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের গবেষণার সহিত অবিকল মিলিয়াছে; যেন কবি ভূত-ইতিহাস সঙ্কলনে কোন সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির সাহায্য লইয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার নাটকে আলোচিত কোন ঐতিহাসিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার যাহা অভিমত বলিয়া বোধ হয়, সেই অভিমতের সহিত আমাদের শেষ আলোচনা ও চরম গবেষণায় আবিষ্কৃত তত্ত্বের ঐক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।*

সেক্ষপীয়রের ঐতিহাসিক কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, স্কটের ইতিহাস-মূলক উপন্যাস সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। আইভ্যানহো, কেনিল্‌ওয়ার্থ, ট্যালিস্‌ম্যান্, কওন্টিন্ ডারওয়ার্ড প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসে স্কট্ মূল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। প্রত্যেক অবান্তর চরিত্র বা ঘটনা বিষয়ে ইতিহাসের খুঁটি নাটি রক্ষা করিতে প্রয়াস পান নাই।

বিদেশী কবির নজির যদি কেহ অগ্রাহ্য করিতে উৎসাহী হন, সেই জন্য দেশী কবির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত বীর-চরিত নাটকের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কবি রামরাবণের যুদ্ধরূপ মূল প্রতিপাদ্যের অনুসরণ করিয়া অবান্তর চরিত্র চিত্রণে ও ঘটনার সমাবেশে ইচ্ছামত বাল্মীকির বিপরীতাচরণ করিয়াছেন। দেখা যায় যে, কবি কল্পনা-বলে লঙ্কাযুদ্ধের এক অভিনব ইতিহাস উদ্ধারন করিয়াছেন। প্রাচীন

* "Indeed some of those deviations have been remarkably verified by the researches of later times; as if the poet had exercised a sort of prophetic power in his dramatic retrospections. So that our latest study and ripest judgment in any historical matter handled by him will be apt to fall in with and confirm the impressions at first derived from him.—*Hudson's Shakespere—His Life art and characters, Vol. II. pp. 5—6.*

নজিরের বলবত্তা যদি কেহ অস্বীকার না করেন, তবে তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন। আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী অথবা সীতারামের প্রসঙ্গ করিব না, কারণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেও ঐ সকল উপন্যাস স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর মতেই ঐতিহাসিক নহে। কিন্তু যে উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নামে বিশেষ ভাবে আখ্যাত করিয়াছেন, সেই রাজসিংহের আলোচনা করুন। মূল প্রতিপাদ্য ছাড়িয়া দিলে ঐ উপন্যাসের কতটুকু, কয়টি চরিত্র, কতগুলি ঘটনা, ইতিহাসসঙ্গত? কিন্তু সে জন্য কি রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হইবে না? অতএব মহাকবির নজির দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ইতিহাসমূলক কাব্যের ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্য মূল প্রতিপাদ্য ইতিহাস-অবিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; অবান্তর চরিত্র-চিত্রনে বা ঘটনার সমাবেশে কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ অসঙ্গত নহে।

আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্রের যাহা মূল প্রতিপাদ্য, তাহা ইতিহাসের বিপরীত নহে। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বধৃত নজির মত, কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার থাকে না। যদি মূল প্রতিপাদ্যের সহকারী প্রত্যেক ঘটনা বা প্রত্যেক চরিত্র ইতিহাসবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও নহে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে কবি ঠিক অন্যরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার কাব্যোক্ত অধিকাংশ চরিত্র ও ঘটনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক।

আমরা দেখিয়াছি যে, তিনটি প্রবল প্রতিকূল শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে কুরুক্ষেত্র কাব্য। সে শক্তিত্রয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য জাতি হইতে উদ্ভূত। ক্ষত্রিয়শক্তির কেন্দ্রস্থল শ্রীকৃষ্ণ; ব্যাসার্জ্জুন তাহার পৃষ্ঠপোষক। ব্রাহ্মণশক্তি কেন্দ্রীভূত দুর্ব্বাসায়, তাহার ক্রীড়নক কর্ণ। আর অনার্য্য শক্তির আধারভূত বাসুকি—অনার্য্যের নেতা ও ঈশ্বর। অতএব কাব্যোক্ত চরিত্র সকলকে উক্ত শক্তিত্রয়ের মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপ বলিয়া ধরিলে, তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব আর বিচারের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে এত দূর ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে যে, ইতিহাসনিপুণের কঠোর বিচারেও উহার ঐতিহাসিকত্বের ক্ষুণ্ণতা হয় না। অতএব আমরা ঐ ভাবে কুরুক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথম শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার আলোচনা করি।

ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান না হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন না। যখন পৃথিবীর পাপরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া ধরাতলকে গুরুভারাক্রান্ত করে, তখনই ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ মানুষের দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমরা অবতার বলিয়া স্বীকার করি, তখন আমাদের ইহাও স্বীকার্য্য যে, তাঁহার সাময়িক ভারতে ঘোরতর ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কবি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্তর বিগ্রহ বহ্নি জ্বলিতেছে বাহ্যে রাজ্যে
কিবা ঘাত কিবা প্রতিঘাত;
অন্তর বিগ্রহ বহ্নি জ্বলিতেছে সমাজেতে
কি স্বার্থের ভীষণ-সংঘাত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-দুই বিদ্যুতাগ্নি-পূর্ণ মেঘ
ছুটিছে কি বেগে খরতর;
আঘাতিতে পরস্পরে মত্ত আধিপত্য তরে
নিবারিতে বাড়াবে না কর?
ধর্ম্মেও মোহান্ধ নর কামনার মরীচিকা
নিরন্তর করি অনুসার;
কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরন্তর
কাঁদে নাকি হৃদয় তোমার।

অতএব,

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার;
ভারতে মহাভারত কৃষ্ণ অবতার।

আর,—

বেদভারে প্রপীড়িত যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন
উষ্ণ জীবশোণিতে প্লাবিত;
প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিতে হায়
এই মহাধর্ম্ম প্রচারিত।

সেই মহাধর্ম্ম কি, আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি।

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম নহে যজ্ঞ-পূর্ণ কর্ম্ম
ধর্ম্ম কৃষ্ণ! সর্ব্বভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম্ম, নারায়ণে কর্ম্মফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।

শ্রীকৃষ্ণচরিতের এই মুখ্যতত্ত্ব। এ তত্ত্বকে কেহ কি অনৈতিহাসিক বলিয়া অপলাপ করিবেন?

শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-লীলার প্রধান প্রধান ঘটনা কবি এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

শুনিলাম যেই দিন
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র-যজ্ঞ করেছে বারণ,
ভক্তিতে বিহ্বল গোপি গোপাঙ্গনাগণ;
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণ মন
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান;
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-প্রাণ।
* * *
কৃষ্ণনাথ! বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত,
কি শক্তি শরীরে মনে করিত সঞ্চার।
সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত,
নাচিতাম গাহিতাম করিতাম রব।
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল
নাচিত হাসিত গোপ গোপাঙ্গনাগণ।
বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরজনে
শুনিতাম যেন দূর সমুদ্র-গর্জ্জন
ভারতের কি বিরাট হাহাকারধ্বনি!
শুনিতাম গোপমুখে বসি নিরজনে
মথুরার নিদারুণ শোক-সমাচার
পীড়িতের আর্ত্তনাদ দুঃখীর রোদন,
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর।
* * * *
বধিলাম কংসরাজে, করিনু মথুরা
রাহুমুক্ত, শান্তিশশী হাসিল আবার।
হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সমরে
বিমুখি মগধপতি সপ্তদশ বার।
পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ।

দিয়া প্রেমপুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে
পাণ্ডবের ভুজবল করিনু বরণ।
জ্ঞানবল ভুজবল করিয়া আশ্রয়
হইলাম কর্ম্মক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর
বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়
করিনু পাণ্ডব শক্তি শান্তি দৃঢ়তর।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধে করিয়া নিধন
নিবারিনু রাজমেধ ঘোর অনাচার।
করিনু বিমুক্ত বন্দী নৃপতি মণ্ডল
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার।
আনন্দে ভরিল প্রাণ, বসি বৃন্দাবনে,
গোচারণে যেই ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্বপন
সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত
এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন।*

* * *

আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে
দেখা দিল করিতেছি যবে নির্ব্বাপণ;
হইল নির্ম্মলাকাশে অশনির মত
পাণ্ডবের বনবাস মস্তকে পতন;
বিস্মিত, স্তম্ভিত ভীত কম্পিত হৃদয়
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিনু ভীষণ।

* * *

ত্রয়োদশ বর্ষ পরে হইতে অতীত
বিরাট বিস্ময়ে চক্ষে করিনু দর্শন

---

* অন্যত্র এই সকল ঘটনার এইরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ।

অপূর্ব্ব জীবন-লীলা কংসের নিধন
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ব্বাসন,
নিবারিতে রক্তস্রোত সমুদ্রের পারে।
সেই জরাসন্ধবধ অদ্ভুত কৌশল—
কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ নিবারণ
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনাযুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপিত।

অধর্ম্মও করিতেছে শক্তির সহায়
ধর্ম্মের সহিত হায় অনিবার্য্য রণ।
কি যত্ন না করিলাম! পঞ্চখানি গ্রাম
চাহিনু এ নরমেধ করিতে বারণ।
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী
শুনিলাম অধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
বাজিল সমর-ভেরী পুড়িয়া ভারত
শুনিলাম, দেখিলাম পঞ্চপাণ্ডব মত
ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,
বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসরত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ
করিলাম দ্বারকায় শোকেতে প্রস্থান।
হইলে আহূত যুদ্ধে ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের
পালিলাম করিলাম যুদ্ধে যোগদান
নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ : স্বধর্ম্ম-পালন
করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডব কৃপাণ।

পরবর্ত্তী ঘটনা অন্যত্র এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজসূয়ে বিনির্ম্মিত ধর্ম্মরাজ্য বাতায়ন
পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির সৃজন মত,
বুঝিলাম তব ইচ্ছা বিনা এই রক্তদান
এ অগ্নিপরীক্ষা বিনা হইবে না নিরমাণ
ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে; হইবে না কদাচিত।
খণ্ড এ ভারতে মহাভারত রাজ্য স্থাপিত
দিলাম অনলে ঝাঁপ হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্তধারা অষ্টাদশ দিন ধরি।

তাঁহার ফলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ভস্মীভূত হইল।

পড়িয়াছে কর্দ্দমিকা, জলিয়াছে কি শ্মশান,
কুরুক্ষেত্রে, নারায়ণ কর পূর্ণ মনস্কাম।

কুরুক্ষেত্রে যে মহাদাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল,

উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি, মাতা রাজরাজেশ্বরী।

এখন ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরি-উক্ত কোন ঘটনার মূল মহাভারতাদিতে নাই। অধিকন্তু মধ্যে এই যে, কবি প্রতিভার আলোকে

কৃষ্ণ-জীবনের * অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন, অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য ঘটনার অর্থ উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ভব-ধর্ম্মমন্দিরের, ধনঞ্জয় ভুজবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন,
বিষকর্ম্মা দ্বৈপায়ন কবিবেন জ্ঞানবলে
এই পরিখায় ভব মন্দির স্থাপন।

কবি বাসুকিকে অনার্য্যের নেতা ও ঈশ্বররূপে বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের প্রতিকূল ও দুর্ব্বাসার অনুকূল রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বাসুকিকে যদি অনার্য্য শক্তির মনঃসৃষ্ট-প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে আর ঐরূপ চিত্রণে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। আর্য্য ও অনার্য্য-শক্তির তদানীন্তন সংঘর্ষ এবং ব্রাহ্মণ ও অনার্য্যের সম্মিলন যে ইতিহাস-অবিরুদ্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি যে, বাসুকির চক্ষে

শত্রু মম আর্য্যজাতি-জাতি-নির্ব্বিশেষে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আসমুদ্র গিরি,
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য্য-শোণিতে।

আর দুর্ব্বাসার সহিত বাসুকির মহাসন্ধি ঐ অনার্য্য ও ব্রাহ্মণ্যের সম্মিলনের রূপক বলা যাইতে পারে। বাসুকির চেষ্টা নাগরাজ্য-উদ্ধার।

একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার।

দুর্ব্বাসার অভিপ্রায়—

আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্য মিলায়
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিসিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।

বাস্তবিক সে যুগের অনার্য্য জাতির অবস্থা অতি শোচনীয়ই ছিল।

এ ভারত ভূমি
যাহাদের পিতৃভূমি, সে অনার্য্য জাতি
আজি কোথা, দেখ-আহা কি-দশা তাদের।

---

* শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রত-উদ্যাপনে তাঁহার প্রধান সহায় ব্যাসার্জ্জুন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্য এইরূপ।

পঞ্চগ্রামভিক্ষা বিফল করিল। তাঁহারই অনুমতিতে কর্ণ দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিয়া দ্বারকায় পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারায়ণী সেনা সংগ্রহ করিল। তাঁহারই প্ররোচনায় কর্ণ, সংসপ্তক যুদ্ধে অর্জ্জুন স্থানান্তরিত হইলে, অন্যূন সমবেত অভিমন্যুর প্রাণবধ করিল। তাঁহারই আদেশে কর্ণ ভীষ্মের সহিত কপট কলহ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধে বিরত থাকিয়া ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের সহায়তা করিল। দুর্ব্বাসার রক্ত আশা ছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে

বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু যাগে বনাভল
কর্ণের সাম্রাজ্য-ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল।

কিন্তু অর্জ্জুনের তীব্র শরে ছিন্নমস্তক হইয়া কর্ণ দুর্ব্বাসার আশার সহিত রণভূমি হইতে অপসৃত হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই ইতিবৃত্ত, কর্ণ দুর্ব্বাসার এই সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা, দুর্ব্বাসা বাসুকির এই সন্ধি ও সম্পর্ক কি ঐতিহাসিক? একে একে দেখা যাউক। দুর্ব্বাসার ক্রুদ্ধদ্বেষ ও প্রতিহিংসার অনেক প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার বাসুকি-ভগিনীর সহিত পরিণয় ইতিহাসমূলক কি না? মহাভারতে দেখি যে, জরৎকারু ঋষি ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে লম্বমান পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য স্বনারী একটি পাত্রী খুঁজিয়া বেড়ান। বাসুকি এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া আপন ভগিনীকে (তাঁহারও নাম জরৎকারু) তাঁহার করে অর্পণ করেন। ঋষি পত্নীর সহিত কিছুদিন শ্বশুরঘর করিয়া অতি যৎসামান্য কারণে পত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া তপস্যার জন্য বন-গমন করেন। ইঁহারই ঔরসে বাসুকিভগিনীর গর্ভে আস্তিক ঋষির জন্ম হয়। এই আস্তিক ঋষিই নাগযজ্ঞে সর্পকুল রক্ষা করেন। এ উপাখ্যানের অর্থ কি? আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ এইরূপ;—'জরৎকারু ঋষির নামটা ছদ্ম নাম। তাঁহার প্রকৃতি ঠিক দুর্ব্বাসা ঠাকুরের মত। কথায় কথায় ক্রোধ। সন্ধ্যা হইয়াছে, আহ্নিকের সময় অতীত হইতেছে। গরিব পত্নী তাঁহাকে জাগাইলেন। তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন, কি সাধ্য, তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় সূর্য্য অস্ত যাইবেন। এই গুরুতর অপরাধে পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। এই কার্য্যের সঙ্গে শকুন্তলার প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্ব্বাসার ক্রোধ ও অভিশাপ তুলনীয়। অতএব জরৎকারু ঠাকুরকে দুর্ব্বাসা বলিয়া ধরিয়া লইলে

আমরা যুধিষ্ঠির হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস জলের মত বুঝিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ নববর্ণধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত করিতে গিয়া দুর্ব্বাসার পূর্ব্ব পুরুষদের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদের অবমাননা (মাথা-হেঁট) শিক্ষাবিপর্য্যয় ও সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন বলিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি ধারণা হয়। এই জন্য তিনি একদিকে বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করিয়া অনার্য্য জাতিকে সহায় করেন, (ইহার ফলে অনার্য্যসাহায্যে ক্ষত্রিয়াবশেষ বাদবদিগের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ এবং তাহাদিগের রমণীগণের পর্য্যন্ত অপহরণ।) অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিকূলতা করিবার জন্য কর্কশ এক শাপিত মহাস্ত্র সৃষ্টি করেন; (তাহার ফলে রাজসূয়ে স্থাপিত সাম্রাজ্যের পতন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়বিনাশ।)

জরৎকারু উপাখ্যানের এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস বালির ভিত্তির উপর গঠিত করা নিষ্ফল।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, নাগযজ্ঞে পরিক্ষিতের মৃত্যুর পর বাসুকি জনমেজয়ের প্রতিহিংসাভয়ে ভীত হইয়া ভগিনীকে জরৎকারু ঋষির হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য উৎসুক হয়েন। পরিক্ষিতের মৃত্যু হয় ৬০ বৎসর বয়সে। আর জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্ততঃ ৬০ বৎসর পরে জরৎকারুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় এ বিবাহ কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বেই ঘটাইতে হইয়াছে। আমরা আরও দেখি, বিবাহের অল্পদিন পরেই জরৎকারু পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ অল্প দিনের মধ্যে বাসুকিভগিনীর গর্ভসঞ্চার হইয়া পরে যে পুত্র প্রসূত হয়, সেই সর্পসত্রে নাগকুল রক্ষা করে। সেই সময়ে তাহাকে 'বালক' বলিয়া বর্ণিত দেখি। পরিক্ষিতের মৃত্যুর অনুমান ৩০ বৎসর পরে সর্পযজ্ঞ হইয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, জরৎকারুর বিবাহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল। আমার মতে, জরৎকারু নামে এক বিরাগী ঋষি পিতৃপিণ্ডের অনুরোধে বিবাহ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন জানিয়া, জনমেজয়ের ভয়ে ভীত বাসুকি ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া ছদ্মনামে আপন ভগিনীর তাঁহার সহিত পরিণয় সম্পন্ন করে।

যে সংসারে নিতান্ত বিরক্ত ছিলেন, কেবল পুত্রার্থে ভার্য্যা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সূচনা হইবামাত্র সামান্য অপরাধের অছিলা

করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আবার বনগামী হন। তাঁহার ঔরস পুত্র আর্য্যকে মাতুল্যাশ্রয়ে পালিত হইয়া মাতুলকুলের প্রাণরক্ষা করিয়া মাতুলের উপকারের প্রতিদান করে। যদি এ মত ঠিক হয়, তবে দুর্ব্বাসা ও জরৎকারু স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং দুর্ব্বাসা ও বাসুকিভগিনীর পরিণয় অনৈতিহাসিক।

কবি কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ মত সম্পূর্ণ নূতন, কিন্তু ইতিহাসের অবিরুদ্ধ বলিয়াই অনুমান হয়। মহাভারতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে। 'কুন্তী পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি দুর্ব্বাসাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেই মুনি সন্তানপ্রতিবন্ধকতারূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের অপেক্ষায় তাঁহাকে অভিচারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রপ্রভাবে যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্রভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্বিনী বালা কুন্তী কৌতূহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে কুন্তীর সমীপস্থ হইয়া কুন্তীর ভয় বিস্ময় ও ক্ষমা ভিক্ষা সত্ত্বে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাহাতেই কর্ণ নামক পুত্র উৎপন্ন হইল।

যাঁহারা ভাস্করের সৌররাজ্য পরিহার পূর্ব্বক মানবীতে উপগত হওয়ায় কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মেই কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হন, আর ঐ উৎপত্তির সহিত দুর্ব্বাসার কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; কারণ, দুর্ব্বাসাই কুন্তীর অভিচারমন্ত্রের গুরু। তৎকালে যে দুই এক জন এরূপ কানীন পুত্র উৎপন্ন হইত স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহার প্রমাণ। সত্যবতীর কন্যাবস্থায় তিনি পরাশর-ঔরসে উৎপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আমরা ঐরূপ পুত্রের উল্লেখ শুনিতে পাই। 'স্ত্রীলোকের কন্যাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে দুই প্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদিগের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।' (উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়)। অতএব কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া আখ্যাত করিয়া কবি ইতিহাসের কোনই অপলাপ করেন নাই।

মহাভারতে দেখিতে পাই, কর্ণ জন্মিবার পর কুন্তী বন্ধুকুলভয়ে সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে গোপন করিয়া জলে পরিত্যাগ করেন। রাধাভর্ত্তা অধিরথনামা একজন মহাযশাঃ রথকার জলে পরিত্যক্ত সেই সন্তানকে গ্রহণ করিয়া রাধার পুত্র করিয়া দেয়। পরে সূতকুলে থাকিয়াই কর্ণ বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হন। এক দিন বিস্তীর্ণ কৌরব-রঙ্গভূমিতে যখন কৌরব পাণ্ডবেরা অস্ত্রগুরু দ্রোণের সমক্ষে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা দিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা 'যুবাপুরুষ মহাবাহু কর্ণ বদ্ধখড়্গ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সগর্ব্বে অর্জ্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সখ্য প্রার্থনা করেন। দুর্য্যোধন তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তদবধি কর্ণ দুর্য্যোধনের সখারূপে পাণ্ডবদিগের চিরশত্রুতা আচরণে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী ঘটনার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটনের জন্য কর্ণই প্রধানতঃ দায়ী। আমরা উদ্‌যোগ পর্ব্বে ধর্ম্মবীর ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাই যে, 'কৌরবদিগের যে মহান্ অনর্থ আগত হইতেছে, সে কেবল এই দুর্ম্মতি সূতপুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে।' কর্ণও নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'ভূখণ্ডের এই যে সম্যক্ বিনাশ উপস্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্য্যোধন।' পরে আমরা দেখিতে পাই যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দশ দিন ভীষ্মের সহিত মনোবাদ বশতঃ কর্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। পরে ভীষ্মের শরশয্যার পর, চারি দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পঞ্চম দিবসে অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট হন।

কবি কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের এই অস্পষ্ট ছায়াকে প্রস্ফুট করিয়াছেন। তাহার মতে কুন্তী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দুর্ব্বাসা কর্ণকে কুড়াইয়া লইয়া শিষ্যা রাধা দ্বারা সযত্নে পালন করেন। পরে ক্ষত্রিয়-ক্ষয়ের সহায়তার জন্য পুত্রকে পরশুরামের নিকট ক্ষত্রিয়নন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষার্থে অর্পণ করেন। পুত্র সুশিক্ষিত হইলে তাহাকে কৌরবের ক্রীড়ারঙ্গভূমে 'ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অন্তর বিগ্রহে' বৈশ্বানররূপ প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় কর্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া ক্ষত্রিয়কুলের সহিত আপনি ভস্মীভূত হয়।

কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহাতে মনে হয় যে, দুর্ব্বাসাই কর্ণের দ্বারা ঐ যুদ্ধ ঘটাইয়াছিল। মহাভারতে এরূপ

---

* ভীষ্মপর্ব্বে ৪২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি (তিনি কর্ণকে বলিতেছেন) কর্ণ! আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের দ্বেষপ্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে রক্ষণ কর।

মতের কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না। অবশ্য, যুদ্ধঘটনায় কর্ণের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল; কিন্তু কর্ণ যে দুর্ব্বাসার বরধৃত জড়পুত্তলিকা, তাহার কোন প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কর্ণকে দুর্ব্বাসার পুত্র এবং দুর্ব্বাসাকে শ্রীকৃষ্ণের শত্রু বলিয়া স্বীকার করিলে, কবিপ্রচারিত মতের অনেকটা পোষকতা হয় বটে, কিন্তু পোষকতা ও প্রমাণ এক পদার্থ নহে। বরং মহাভারতের কৃতান্তই সমূলক বলিয়া বোধ হয়। কর্ণ মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অধিরথপত্নী রাধা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হয়। পরে তাহার ভুজবল ও অস্ত্রকৌশল দেখিয়া দুর্য্যোধন তাহাকে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া তাহার সহিত সখ্যস্থাপন করে। এই সখ্যস্থাপনের ত্রয়োদশবর্ষ পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কর্ণ কখনও কোনও বিষয়ে প্রভুদ্রোহ সাধন করে নাই। বরং ভীষ্ম ও কৃষ্ণের বার বার প্ররোচনা সত্ত্বেও দুর্য্যোধনের নিমিত্ত ধন শরীর পুত্র দ্বারা এ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। অনেকেরই ধারণা যে, কুরুক্ষেত্রেই ভারতের সৌরবরবি অস্তমিত হয়। আমার এক সময়ে ঐরূপ ধারণা ছিল। ভারতের বিজেতা জাতির অধীনতা দুরদৃষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমি অনেক সময়েই বলিতাম যে, ভারত যুদ্ধে সমগ্র ক্ষত্রিয়ক্ষয় সাধিত হইয়া দেশ নির্ব্বীর হইয়া পড়িলে, সহজেই বিদেশী আসিয়া এ দেশে আধিপত্য স্থাপন করে। এই মতে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে আমরা পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকি, তিনিই ভারতের চিরপরাজয়ের মূল হেতু। কুরুক্ষেত্রের কবি যেন তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে যে মত প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—

বিপুলা পৃথিবী, মহাকাল অন্তহীন,
অনন্ত মানব জাতি; মুষ্টিমেয় তায়
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মানব-মণ্ডল
রোধিতেছে—কুরুক্ষেত্র করুণা অপার।
মানবের ভবিষ্যৎ কি আনন্দময়!
দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি আত্মক্ষয়
অবশ্যের ঘনঘটা হিংসা বজ্রানল
নিভিল; উঠিল কিবা ধর্ম্মসূর্য্যোদয়!

পুণ্য-জ্যোৎস্নায় স্নাত অনন্ত মানব
লভিতেছে কিবা সুখ যুগযুগান্তর !
ভূতল আনন্দরাজ্য ; বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে এক মহা বেদীমূলে লয়।
ত্রিপথে ত্রিবেণীবন্যা উড়িছে সুন্দর
জ্ঞান কর্ম্ম-ভক্তি কিবা স্বর্গ-শোভাময়।
সুমধুর কৃষ্ণনাম ভূতল গগন
করিতেছে কি পবিত্র কি আনন্দময়।
গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম যুগযুগান্তর।
দেখিতেছি পাপতাপপূর্ণ ধরাতল
হইতেছে ক্রমে স্বর্গ স্বর্গ উচ্চতর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৃষ্ণলীলার অতিপ্রধান ঘটনা। অতএব জাতীয় জীবনে কৃষ্ণলীলার যাহা ফল, আংশিক রূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও সেই ফলই বলিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন ও নববর্ম্মপ্রচার, আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া মিশ্রিত জাতির উদ্ভব, বহুসহস্রবৎসরব্যাপী দীর্ঘ স্বাধীনতা ও শান্তিসুখ, কুরুক্ষেত্রের ফলেই ঘটিয়াছিল বলিতে হয়। রোম নাই, রোমকেরা নাই, গ্রীস নাই, গ্রীকেরা নাই ; আজিও যে এই প্রাচীনতম আর্য্যজাতি জীবিত রহিয়াছে, আজিও যে গৃহে গৃহে বনে বনে আশ্রমে আশ্রমে গীতাপাঠ ও কৃষ্ণপূজা হইতেছে, ইহাকেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবান্তর ফল বলিতে হইবে। কবি বিচিত্র ভাষায় এই সকল ভাবী ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তাহা আবৃত্তি করিলে কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া মানসপটে সেই কুরুক্ষেত্রের জনসঙ্ঘাধের মধ্যে শ্বেতহয়যুক্ত মহৎ স্যন্দনে স্থিত নরনারায়ণের বিশ্বমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

অগ্রবর্ত্তী আর্য্যগণ অনার্য্য-পশ্চাৎগামী
প্রীতির দক্ষিণ কর করি প্রসারিত,
আনন্দে লইয়া সঙ্গে কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
করি মনুষ্যত্ব-পথে হইবে ধাবিত।
বুঝিবে মানবগণ সর্ব্ব জীবে নারায়ণ
সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল,
এই নব ধর্ম্মে ভাসি হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল !

* * *

উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তি ধাত্রী রাজরাজেশ্বরী।
নব ধর্ম্ম-বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে; বেদিবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি, তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী অতুলা প্রতিভান্বিতা।
অনন্ত মানব ব্যাপী' ভবিষ্যত বর্ত্তমান
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম;

কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। সৎ কাব্যের অনুশীলনে প্রভূত লাভ আছে; কুরুক্ষেত্র সৎ-কাব্য, ইহার আলোচনায় আমার অবশ্যই যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। আমার সমালোচনা সৎও নহে, কাব্যও নহে; ইহার নিষ্ফলতা জানিয়াও যে পাঠক ইহার সমগ্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার ধৈর্য্যকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য আমার একটি কথা বলিবার আছে। এই সমালোচনাপাঠে তাঁহাকে বোধ হয় সহস্রাধিক কৃষ্ণনাম করিতে হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন যে, শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার কৃষ্ণ নাম করিলে অতি পাপীও তরিয়া যায়।—সহস্রাধিক কৃষ্ণনামের কত ফল, ভাবিয়া দেখুন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেই অমূল্য বাক্যটি উদ্ধার করিয়া অবসর গ্রহণ করি।

ভূওবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম
সধুরমধুরমেতন্ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।
সকলনিগমবল্লী চিৎফলং সৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দু' নৌকায় পা।

যে জাতি পরাধীন, সে জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পায়।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, স্বাধীন মুক্ত অবস্থায় যাহারা কেবল মাত্র আনিষাশী ছিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে দায়ে পড়িয়া ক্রমে

তাহারা নিরান্নিবাশী হইয়া পড়ে—এমন কি, জঠরজ্বালানিবারণের জন্য সময়ে সময়ে কাঁচা আলুটি মুলাটি-পর্য্যন্ত উদরস্থ করে।

মনুষ্যও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে। ফরাসীবিপ্লবকালে সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষমতা যখন দরিদ্র লুলুক্ষু প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল, যখন ছিন্ন কন্থা এবং শীর্ণ দেহ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে অখাদ্য ভোজন ও অসহন ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। করভরে প্রতিদিন যে কত প্রাণান্তপরিশ্রমসঞ্চিত শস্য-সম্পত্তি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত এবং কত নির্দ্দোষ সবল শিশুপ্রাণ উপবাসদৃশ্য-দর্শনাক্ষম পিতামাতা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই।

কিন্তু আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্য জাতির মত এরূপ বহুকালব্যাপী, এত গভীর অধঃপতন আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। অন্নচিন্তা যে কিরূপ চমৎকারী, তাহা আমরা যেরূপ চমৎকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, অন্য কেহ সেরূপ পারিয়াছে কি না সন্দেহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরজাতির পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া আমাদিগের অস্থিমজ্জা এবং সেই সঙ্গে যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেহে বল নাই, মনে সাহস নাই, ঘরে ভাত নাই, অথচ লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পতনশীল বস্তুর পতনবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই বৈজ্ঞানিক নিয়মটি জাতীয় অধঃপতন সম্বন্ধেও ঠিক্ খাটে। কোন্ বিস্মৃত কাল হইতে আমাদিগের পতন আরম্ভ হইয়া তাহার বেগ এক্ষণে এত প্রচণ্ড হইয়াছে যে, শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে কি না সন্দেহ।

যেমন সূক্ষ্ম বস্ত্রে মসীবিন্দু পড়িলে শীঘ্রই ব্যাপিয়া যায়, এবং যে স্থানে পড়ে, সে স্থানটি ক্রমে পচিয়া ধসিয়া যায়, দুর্ব্বল চরিত্রে তেমনই যদি একবার বিন্দুমাত্র কলঙ্ককালিমা পতিত হয়, দেখিতে দেখিতে তাহা সমস্ত চরিত্রকে ছারখার করিয়া ফেলে। এই জন্য যাহার মন দুর্ব্বল, সে যদি মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে, তাহার চরিত্র যদি একবার কলুষিত হয়, শত দিক্ হইতে সহস্র পাপরাশি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে;—তখন অভাগিনী স্ত্রীর সজল দীননেত্র এবং ক্ষুধাতুর উপবাসী শিশুসন্তানের কাতর ক্রন্দন সকলই ব্যর্থ হয়।

এই দুর্ব্বল জাতিরও অবস্থা ঠিক্ এইরূপ। যে অধীনতা হীনতার আমরা

আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছি, মনে হয়, ইহার উপর সাগরে বারিবিন্দু প্রায় সহস্র-ধারে হীনতা অপমান বর্ষিত হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই জন্য অনেক সময়ে সাধ করিয়া আমরা হীনতাকে ডাকিয়া আনি, শতবন্ধনের উপর আরও বন্ধন গড়িয়া তুলি। সামান্য অধিকার, সামান্য অভিলাষ পূরণের জন্য যখন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তখন মনে মনে অনিবার্য্য উপস্থিত হয় যে, ইচ্ছা করে, মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া পরপদপ্রান্তে কুকুরের মত পড়িয়া থাকি।

মনের অবস্থা যখন এইরূপ বিকৃত হয়, তখন আত্মসম্মান অপেক্ষা আপাত সুবিধাকে অধিকতর প্রিয় বলিয়া জ্ঞান হয়। জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলে রেলপথে যাত্রার সুবিধা হয়, জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিলে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হয়, জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিলে অধিকতর সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন এই দিকেই দৃষ্টি পড়ে, এবং যে মহাত্মা এই সুবিধা-প্রবাহকে পদদলিত করিয়া আত্মসুখ বলি দিয়া অহর্নিশ দৃঢ় নিষ্ঠায় কঠিন সংগ্রামে নীরবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া শরীরপাত করেন, তাঁহা অপেক্ষা এক জন উচ্চপদাধিরূঢ় ইংরাজ অধিক সম্মানার্হ মহৎ লোক বলিয়া বিবেচনা হয়।

তাহার দৃষ্টান্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় মোটা ধুতি, মোটা চাদর এবং চটি-জুতা পরিয়া এই বহুরূপী জাতির মধ্য দিয়া কোথাও পীড়িতের সেবা, কোথাও দরিদ্র দীন বিপন্নের সাহায্য, কোথাও শোকার্ত্তের নয়নাশ্রু মোচন করিয়া ক্ষিপ্রবেগে নির্ভীক চিত্তে কঠিন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, আর আমরা এত কৃতঘ্ন যে, তাঁহাকে যথার্থরূপে চিনিতে তাঁহার স্মরণচিহ্নমাত্রও স্থাপন করিতে সক্ষম হইলাম না। লাট সাহেবের প্রতি-মূর্ত্তিস্থাপন কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজকে সান্ধ্য ভোজন দিতে আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারি, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণচিহ্নস্থাপনের কথা উঠে, তখন সহসা কোথায় যে সে বদান্যতা অন্তর্হিত হয়, তাহা বলা যায় না। হায়, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় পাঠ করিয়া যাঁহারা মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে অন্ততঃ যদি এক পয়সা করিয়াও দেন, তাহা হইলে এই মহান্ তেজস্বী পুরুষের সোণার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা যায়।

বিদ্যাসাগর কি দায়ে পড়িয়াই মোটা ধুতি মোটা চাদর পরিতেন?

ব্রাহ্মণ কি নিতান্ত দরিদ্র অসমর্থ ছিলেন? না, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাহারা কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, তিনি যে ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া নিত্য নূতন কোট প্যাণ্টেলুন পরিয়া বাবুয়ানা এবং সাহেবিয়ানা দুইই করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে যে দুর্লভ হৃদয়রত্নটি লুক্কায়িত ছিল, তাহা এক দিকে এমনি কোমল যে, পরের সামান্য দুঃখে নিত্য বিগলিত হইত, এবং অন্য দিকে এমনি কঠোর এমনি কঠিন ছিল যে, হীনতা নীচতা অসত্য কপটতাকে কাছেও ঘেঁষিতে দিত না।

ইহা আমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমরা ইহা বুঝি না যে, শত অধীনতার মধ্যে বাস করিয়াও মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। মন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভিন্নজাতীয় পদার্থ। যে রাজ্যের রাজা, প্রজার এই মনকে সদা বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন, সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসীবিপ্লবই ইহার সাক্ষী। এই জন্য রাজা, প্রজার ধর্ম্মের উপর, দেশাচারের উপর, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না। আমাদেরও এই মনের স্বাধীনতা আছে। ইহাকে শতবন্ধনে জড়াইয়া হেলায় হারাইয়া লাভ কি? যাঁহার চরিত্র মহৎ, আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও, তাঁহার মনের স্বাধীনতা কেহ অপহরণ করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর জাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া বড় বড় সাহেব-ভবনে গমন পূর্ব্বক বীরদর্প দেখাইয়া স্বাধীনতার এই দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে রাখিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস হইতে প্রত্যাগত সুরেন্দ্র বাবুর সে দিন কলিকাতায় কি সাদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল! কি উচ্ছ্বাস, কি উৎসাহ, কি সমারোহ! দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। আনন্দ এই জন্য যে, সুরেন্দ্র বাবু যে পোলিটিক্যাল আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের মনে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, তাহার যোগ্য প্রতিদান তিনি পাইলেন, এবং দুঃখ এই যে, যাঁহারা নীরবে নিঃসহায়ে মহত্তর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারা যথোচিত পুরস্কার পান নাই। যাহা হউক, ভয় হয়, সেদিনকার এই উচ্ছ্বাস নদীবক্ষে মৃৎপ্রদীপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র না হয়।

কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে দেশের অসামান্য উপকার করিতে পারে। শুধু পলিটিক্সের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া সেই সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলের প্রতি যদি ইহা অধিকতর দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে অশেষ মঙ্গল সাধিত

হইতে পারে। কংগ্রেসে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা ভাগ করিয়া যদি দেশের অন্যান্য অসুবিধা অভাব দূর করিবার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে এই হতশ্রী দেশের শ্রী ফিরিয়া যায়। কিন্তু শুধু পলিটিক্সই এক্ষণে সর্ব্বেসর্ব্বা।

তাই বলিয়া কংগ্রেস্ দ্বারা দেশের যে একটি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা কেহই স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবর্ষে "জাতিভেদ, দেশভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ভুলিয়া, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এক মহাচক্রাতপে পঞ্চবিংশতি কোটি প্রাণের একত্র সম্মিলন দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি যে অবশ্য শুভফলদায়ী, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে পলিটিক্স মস্তিষ্কের উপর এত বেশী চাপ না দিয়া সামাজিক উন্নতির প্রতি সেই সঙ্গে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই সোণায় সোহাগা হয়।

আমাদের এই অধঃপতন, এই দারিদ্র্যদুঃখ, এই সর্ব্বনাশের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, স্বাভাবিক শক্তির বৃথা অপব্যয় করিতে আমাদের মত আর দ্বিতীয় নাই। আমরা সকলেই এক দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছি। বিধিদত্ত শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। এ যেন ছেলেখেলা। অষ্ট বর্ষীয় বালককে দৌড়াইতে দেখিয়া রুগ্ন শীর্ণ শিশু যেমন বলে "আমিও দৌড়াব" এবং দৌড়াইতে গিয়া মুহুর্মুহু পতনের পর শিক্ষা লাভ করিয়া তবে নিরস্ত হয়, আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। অন্যে যে কাজ করে, শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমাকেও সেই কাজ করিতে হইবে, এবং করিতে গিয়া কথামালার বৃক্ষের ন্যায় সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব সেও স্বীকার, তবুও অন্য কাজে শক্তিক্ষেপ করিব না। কয়লা পুড়িয়া এঞ্জিন্ চালায় দেখিয়া তুলাও যদি বলে "আমিও পুড়িয়া এঞ্জিন্ চালাইব", তাহা হইলে সে যেমন দশা প্রাপ্ত হয়, আমাদেরও দশা তদ্রূপ। যে স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে আমরা অহর্নিশ অনুধাবন করিতেছি, সর্ব্বনাশের অন্ধকূপে আমাদিগকে না ফেলিয়া সে নিরস্ত হইবে না।

তাহার উদাহরণ, আমরা সকলেই পাশ করিয়া বড় বড় কর্ম্ম করিতে চাহি—আমরা সকলেই মনে করি, উকীল হইয়া হাইকোর্টের জজ হইব। ইহার ফলে দেখা যায়, যাহারা অন্য দিকে গমন করিলে বেশ সকল হইতে পারিত, তাহারা শক্তি অভাবে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী কিম্বা অন্ততঃ এণ্ট্রান্স অবধি পড়িয়া কেহ দশ টাকা মাহিনায় কেরাণী, কেহ বা বহুকাল বি-

বেতনে এপ্রেন্টিস্ খাটিয়া জীবন নিঃশেষ করে। এ দিকে ঘরে বৃহৎ পরিবার অনাহারে মারা যায়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পুস্তক প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যদি একটি কাজ করেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে বিশেষ উপকার হইতে পারে। কাজটি কিছু কঠিন হইলেও সকলের সমবেত চেষ্টায় সুসাধ্য হইতে পারে। কাজটি এই ;—যাঁহারা উচ্চকর্ম্মের প্রার্থী এবং যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষায় যোগ দিন, কিন্তু যাহারা অসমর্থ, যাহারা অর্থাভাবে বা শক্তির অভাবে বা দুয়েরই অভাবে বহুকালসাধ্য এই প্রতিযোগী পরীক্ষায় সফল হইতে অক্ষম, যাহারা অতি নিম্ন-ক্লাশ হইতেই স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এই সকল লোকের জন্য একটি টেক্‌নিকাল্ স্কুল খোলা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এই স্কুলে জমিদারী সরকারী কৃষি শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য ব্যবসা চিত্র প্রভৃতি সকল রকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে মোটামুটি রকমের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক। এই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ভূগোল গণিত ইতিহাস প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে অল্পমাত্রায় ইংরাজি শিখিয়া প্রথমে একটি প্রাবেশিক পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে পাশ হইলে পরে যে যে বিষয় লইবে, সে সেই বিষয়ে একটি সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কর্ম্মপ্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া এই স্কুলে ঢুকিবে, তাহাদের কেবলমাত্র ইংরাজিতে সামান্য পরীক্ষা দিলেই প্রথমে চলিবে। যাহারা অন্য স্কুলের পরীক্ষায় পাশ হইয়া কিম্বা যে উপায়েই হউক, বাঙ্গালা এবং ইংরাজীতে অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিবে, তাহারা প্রথম পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সকল কাজ নিম্নশ্রেণী মূর্খলোকদিগের দ্বারা ভালরূপে হয় না, অভিজ্ঞ লোকদিগের দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন হইবে, এবং অর্থপ্রাপ্তিও সুগম হইবে।

নবপ্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য-পরিষদে" যে সকল ধনী এবং সাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, আশা করা যায়।

কিন্তু সাহেবের জুতা ছাড়িয়া লাঙ্গলে হাত দিতে আমরা কি সহজে স্বীকৃত হইব ?

আসলে আমরা দু' নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছি—কেবলই সুবিধা খুঁজিতেছি, ভাবিতেছি, এক নৌকা সরিলে অন্য নৌকায় উঠিব—কিন্তু তাহাতে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবিতেছি না। দু' কূল রক্ষা করিতে গেলে কোন কূলই রক্ষা পায় না। সুবিধা-বালুকার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অক্ষয় অবিনাশী চরিত্রমহত্ত্বের উপর যে জাতির প্রতিষ্ঠা, তাহারই শেষে জয় হয়, ইহা নিশ্চিত।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

শিক্ষক।

ডিসেম্বর সংখ্যা ফর্টেপোরারি রিভিউ পত্রে দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের আলোচনায় শিক্ষকের উৎপত্তিবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিগত কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য' সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা স্পেন্সার-সাহেবের দার্শনিক মতের কিছু সমালোচনা করিয়াছিলাম। স্পেন্সার যে বিরাট দার্শনিক সত্য প্রচারে গত বিংশ বৎসর নিযুক্ত আছেন, তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থাবলি তাহার ফল। স্পেন্সারের মূল প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তবাদ—জড়ের ন্যায় চেতনও ঐ নিয়মের ক্রীড়াক্ষেত্র। সাম্রাজ্যের ন্যায় নিরাকারও ঐ নিয়মের অধীন। জীবতত্ত্বের ন্যায় সমাজতত্ত্বও বিবর্ত্তনের দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। স্পেন্সার তাঁহার সমাজতত্ত্বে ঐরূপ আলোচনাই করিয়াছেন। সমাজের সকল প্রণালী পদ্ধতি তাহারা যে বিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ, তাহা প্রকটিত করিবার জন্য তিনি রাজনৈতিক বাজনিক প্রভৃতি প্রথার আলোচনা করিয়া সম্প্রতি ব্যবসায়িক (Professional) প্রণালীর অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ হইলে তাঁহার বিরাট বিবর্ত্ত গ্রন্থাবলী ইংরাজি দর্শনমন্দিরের এক অতি উচ্চ ও আবৃত কক্ষ অধিকার করিবে। ইহা দ্বারা যে ইংরাজি সাহিত্যের স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্পেন্সারের দার্শনিক গ্রন্থাবলী।

বিবর্ত্তবাদ।

Sociology; সমাজতত্ত্ব।

স্পেন্সারের গ্রন্থাবলীর মূল প্রতিপাদ্য সত্যানুযায়ী হইলেও, তাঁহার সকল মতই যে অভ্রান্ত, সে বিষয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার গ্রন্থে বেদান্ত মতের অবিস্পষ্ট ছায়া অজ্ঞাতে সঞ্চারিত থাকিলেও, তিনি প্রকাশ্যভাবে জড়বাদী। জড়বাদ যে বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যের অনুযায়ী নহে, তাহা দিন দিনই প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব, কালে স্পেন্সারের অনেক মতই লোকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও, বিবর্ত্তবাদের বিজ্ঞানসম্মততা কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না। এবং স্পেন্সারের গ্রন্থাবলিতে যে সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে,—তাহার প্রয়োজনীয়তারও কিছুতে লাঘব হইবে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্পেন্সার শিক্ষকসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিচার করিয়াছেন। অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃতের উদ্ভব, ইহাই বিবর্ত্তন। এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষা ও যাজন—পুরাকালে এই উভয়বিধ ব্যাপার এক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ে একীভূত রহিলেও, কালক্রমে শিক্ষক ও যাজকের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া পৃথক্ হয়। এই বিবর্ত্তনের প্রণালী। অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, এবং সুসভ্য জাতির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া স্পেন্সার উক্ত তত্ত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। আরাবাক, অষ্ট্রেলীয়, আফ্রিকিক, নিউজিলাণ্ডার প্রভৃতি অসভ্য জাতি; মেক্সিক, জাপানিক, ব্রহ্ম প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্য জাতি; এবং হিন্দু, গ্রীক, রোমক, মিশরি ও আসিরীয় প্রভৃতি সুসভ্য জাতির সাক্ষ্য একই তথ্যের সমর্থন করিতেছে। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মব্যবসায়ীরাই শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষকের উৎপত্তি।

কনগো প্রদেশের যুবকেরা যৌবনের প্রারম্ভে পুরোহিতসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে ছয় মাস কাল-অরণ্যবাসী হইয়া অবস্থান করে।

আরাবাক দেশে 'রহস্যবিদে'রা বয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগকে রহস্যে শিক্ষা দান করিয়া থাকে। মেক্সিকোর প্রথামতে দেবমন্দিরই বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল। চারি বৎসর বয়ন হইলেই বালকেরা শিক্ষার্থে তথায় প্রেরিত হইত। তাহাতে পুরোহিতসম্প্রদায়ই বিদ্যার শিক্ষক ও জ্ঞানের প্রচারক বলিয়া দৃষ্ট হইত।

যাজকই শিক্ষক।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-পরিষদ্ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানবিস্তারের কেন্দ্রস্থল ছিল। বালক উপনীত হইয়া গুরুগৃহে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইত। আসিরিয়ার বিবরণপাঠে জানা যায় যে, মন্দিরেই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইত, এবং তৎসংসৃষ্ট বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা সম্পন্ন হইত। প্রাচীন মিশরে দেবসেবক পুরোহিতেরাই জনগণকে দৈব ও মানুষ জ্ঞানে শিক্ষিত করিতেন। প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম্মমন্দিরের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েই বালকেরা প্রায়শঃ শিক্ষালাভ করিত।

য়ুরোপের মধ্যযুগে—খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের পরও যাজক শিক্ষকের একতা দৃষ্ট হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জা সকলেই মধ্য যুগের অন্ধকারে জ্ঞানালোক কথঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হইত। ইংলণ্ডের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, অধিকাংশ ইস্কুল, প্রাদেশিক গির্জ্জার অন্তর্গত ছিল। ওয়েলস্, স্কোটস্, ডানষ্টান, আয়র্লাণ্ড, নেদরলাণ্ড, রোমের প্রভৃতি বর্ত্তমান

যাজক ও শিক্ষকে অভেদ।

যাজক ইতিহাসে শিক্ষকের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাজন ও শিক্ষাকার্য্য যে একই সম্প্রদায় দ্বারা সম্পন্ন হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

কালক্রমে এক বহুতে ব্যাকৃত হইল। শনৈঃ শনৈঃ শিক্ষকসম্প্রদায় যাজকসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইতে লাগিল। জার্ম্মান দেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ১৪৮২ অব্দে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ বিতণ্ডার পর এক জন অযাজককে চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইতে দেওয়া হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গির্জ্জার বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য রহিত হওয়াতে, কুড়িটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে শুনা যায়। আদিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভূয়োমতে ধর্ম্মশাস্ত্রেই শিক্ষালাভ করিত। এখন সেই প্রাচীন প্রথার চিহ্ন কোথায় কোথায় বিদ্যমান থাকিলেও, ধর্ম্মশাস্ত্রই শিক্ষার প্রধান বিষয় নাই। ফলতঃ, বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ যাজক শিক্ষক সম্প্রদায় এক হইতে বহু হইয়া, যাজকে ও শিক্ষকে বিভিন্ন হইয়া, বিবর্ত্তবাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

যাজক হইতে শিক্ষক।

রাজনীতি।

সুলতান ও আর্ম্মাণী।

জগতের প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই, এ কথা যাঁহারা বলেন, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ করেন, তাঁহাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না। সিংহের হস্তে ব্যাঘ্রের চিত্র একরূপ; আবার ব্যাঘ্রের হস্তে সিংহের চিত্র অন্যরূপ। পক্ষান্তরে, যিনি শৃগালধর্ম্মী, সিংহ ব্যাঘ্র, উভয়েই সমদর্শী,—অর্থাৎ দুইয়েরই নিপাতকামনা করেন,—তিনি লেখনী ধারণ করিলে, চিত্রটা যে নিতান্ত বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মানুষের ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। যিনি দেবতা,—মানুষের স্রষ্টা, বিধাতা,—স্বয়ং তিনি কলম না ধরিলে আমাদের এই আশা আর কোথাও পূর্ণ হইবার নহে। অথবা তিনিও ত মানুষের পিতা; পিতৃপ্রদত্ত সন্তানের বিবরণ কি স্নেহরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে না?

ইতিহাস অসম্ভব।

সম্প্রতি তুরস্কের সুলতান ও তাঁহার খৃষ্টান প্রজা আর্ম্মাণীদিগকে লইয়া উপরি-উল্লিখিত কথাটার কতকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, সুলতানের ন্যায় অত্যাচারী রাজ-পিশাচ আজ পর্য্যন্ত জগতে দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। আবার কেহ বা পঁচিশ বর্ষব্যাপী তুরস্কবাসপ্রণীত অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া, সমস্ত দোষ আর্ম্মাণীদিগের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। আমরা এইরূপ দুই জন লেখকের দুইটা চিত্র প্রদান করিতেছি। পাঠক-মহাশয় যদি পারেন ত মাঝামাঝি একটা মীমাংসা করিয়া লইবেন।

সুলতান ও আর্ম্মাণী।

প্রথম চিত্র গত নবেম্বর মাসের "কণ্টেম্পোরারী" হইতে গৃহীত হইল। উহার লেখক পাদরী ম্যাক্কল-সাহেব, কোনও কোনও পত্রে আপন-মতের প্রতিবাদ দেখিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি দৃঢ়তাসহকারে তাহার উত্তর দিয়াছেন। পাদরী মহোদয় বলিতেছেন,—

তুর্ক রাজ্যে খৃষ্টানের দুর্দ্দশা।

"তুরস্ক-সম্বন্ধে প্রতিবাদিকাকীর্ত্তি আমার স্থায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইত যে, অটোমান সাম্রাজ্যে খৃষ্টান-প্রজার ধন ও প্রাণ কোথাও নিরাপদ নহে। কনষ্টান্টিনোপলে তাহার সুবিচার পাইবার আশা নাই। তাহার ধন, প্রাণ ও সম্মান-সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন। অতি নীচ শ্রেণীর নিকৃষ্ট মুসলমানও ইচ্ছা করিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারে। রাজদ্বারে মুসলমানের বিরুদ্ধে খৃষ্টানের প্রমাণ গ্রাহ্য হয় না। অপরাধ প্রমাণ করিলেও তাহাতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। খৃষ্টানকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলেও কোরাণ-ধর্ম্মের কোনও শাস্তির বিধান নাই। একজন ইংরাজদূত তুর্ক রাজ্য হইতে লিখিয়াছেন,—'আমি পঁচিশ বৎসর তুরস্কে অবস্থান করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কেবল খৃষ্টানের ক্রন্দনের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টান-হত্যাকারী কোনও মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইতে দেখি নাই।'

"যাহাদের ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে তাহাদেরও বুঝা উচিত যে, আমি তুর্ক রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার একটিও বুঝাইবার অতিরঞ্জিত নহে। তুর্করাজ্যে খৃষ্টান-প্রজার কোনওরূপ অস্ত্রাদি রাখা একেবারে নিষিদ্ধ। কোনও মুসলমান-কর্ম্মচারী বা পরিব্রাজক আতিথ্য প্রার্থনা করিলে, খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে তিন দিবসের জন্য বিনামূল্যে আশ্রয় দিতে বাধ্য। কর্ম্মচারী অর্থে সৈনিক, পুলিস, কর-সংগ্রাহক প্রভৃতি সকলকেই বুঝিতে হইবে। আর স্বয়ং পাশা হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ভিখারী পর্য্যন্ত পরিব্রাজক হইতে পারেন। এই সুযোগে অতিথির দল বাড়ীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘরগুলি চাহিয়া বসেন, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যের হুকুম করেন। অধিকন্তু কর্ম্মচারীগণের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বাড়ীর পুরুষবর্গ নিতান্ত অসহায়। তাহাদের কোনওরূপ অস্ত্র নাই; কিন্তু অত্যাচারীর দল সশস্ত্র। আদালতে নালিস করিলে কোনও প্রতীকার হয় না; হয় ত অভিযোক্তাকেই প্রহারিত ও কারারুদ্ধ হইতে হয়। চাষীদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা বার ভাগেরও অধিক খাজানা দিতে হয়। পুলিসের লোকেরাই টেক্স আদায় করিয়া থাকে। তুর্ক-পুলিসের মত পাষণ্ড জগতে দুর্ল্লভ। কাজের আদায়ের কর্ত্তৃত্ব নিলামে বিক্রয় হয়। সুতরাং তাহারা অতিরিক্ত চড়িয়া উঠে। ইহাতে প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচারের একশেষ হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা ভূস্বামী হুকুম করিলে খ্রীষ্টানগণকে বিনা বেতনে মজুর দিতে হয়। মুসলমান হইতে প্রভেদের জন্য খৃষ্টান প্রজার নির্দ্দিষ্ট পোষাক আছে। তাহাদের ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ,—তবে গাধার চড়া নিষিদ্ধ নহে বটে। কিন্তু গাধায় চড়িয়া যাইবার সময় পথে কোনও মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতে হইবে। খৃষ্টান জোরপতি, আর মুসলমান পথের ভিক্ষুক হইলেও এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নাই।

অত্যাচার।

"ইসলামের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে তুর্করাজ্যে য়িহুদী বা খ্রীষ্টানগণ কোনও ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে না। পুরাতন মন্দিরের সংস্কার প্রয়োজন হইলে কনষ্টা ন্টিনোপল হইতে হুকুম আনিতে হয়। ইহাতে অর্থ ও সময় দুই-ই অপব্যয়িত হয়। খৃষ্টানেরা গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারিবে না। উচ্চস্বরে গীত, এমন কি রোদন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, দীক্ষাদাতা ও দীক্ষিত, উভয়েরই মৃত্যুর ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, কোনও

হিন্দুরা বা খৃষ্টান ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজন যে তাহাকে দু কথা বুঝাইয়া বলিবে, তাহারও জো নাই। সরকারী কাগজপত্রে খ্রীষ্টানগণের উপর যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহার অপেক্ষা নৃশংস আর কিছু হইতে পারে না।"

পক্ষপাত।

খৃঃ ১৮৯২ অব্দে এক নিয়ম জারি হয় যে, সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলে কোনও লোক সরকারী চাকুরী পাইবে না। খৃষ্টান বিদ্যালয় যাহাতে লোপ পায়, ইহা প্রকারান্তরে তাহারই চেষ্টা মাত্র। ইস্‌লাম-সাহিত্য ব্যতীত অন্য সাহিত্যের প্রতিও সুলতানের বিষদৃষ্টি। এ বিষয়ে তিনি খলিফা ওমারের নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন,—"কোরাণের সহিত যাহা মিলে, তাহা অতিরিক্ত, আর কোরাণের সহিত যাহা মিলে না, তাহা অনিষ্টকর; সুতরাং উভয়কেই পোড়াইয়া ফেল।" কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম না হইলে এ সকল বিষয়ের কোনও পুস্তক ঘরে রাখা খৃষ্টানের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ বা স্কট, সুলতান এ সকল গ্রন্থও রাখিতে দেন না। খৃষ্টানেরা আপনাদের ধর্ম্ম-পত্রিকায় বাইবেলের বচন তুলিয়া কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে পারেন না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, পাছে অসাবধানতাবশে মুখ দিয়া আইন-বিরুদ্ধ কোনও কথা বাহির হইয়া পড়ে।

বিচার না বিদ্রূপ?

মূল প্রবন্ধের লেখক পাদরী সাহেব এক স্থলে তুর্ক-বিচারালয়ের একটি চমৎকার চিত্র প্রদান করিয়াছেন।—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মুসলমান বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিতে শুনিতে অভিযুক্তের মুখমণ্ডলে ঘন ঘন তীব্র মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন। তার পর স্বপক্ষসমর্থনার্থ বেচারীকে কোনও কথা বলিতে না দিয়াই তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কোনও কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।"

চূড়ান্ত অত্যাচার।

একজন বিদেশস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন,—"কোনও আর্ম্মানী পল্লীতে একবার কতকগুলি অশ্বারোহী পুলিসের লোক এক রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে চারি জন কোনও বিবাহিত আর্ম্মানী যুবকের বাটীতে বাস করে। যুবক গোপনে শুনিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবার পরামর্শ হইতেছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া যুবতীকে গোপনে এক প্রতিবেশীর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা জানিতে পারিয়া তাহাকে আনিয়া দিতে বলিল। যুবক সম্মত না হওয়াতে পিশাচেরা তাঁহাকে নির্দ্দয় প্রহার করিল। তিনি এক বন্ধুর বাটীতে পলায়ন করিলেন। দুই দিবস পরেই সেই প্রহারের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ-পরীক্ষার স্থলে তিন জন তুর্ক-ডাক্তার উপস্থিত ছিল; কিন্তু কেহই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিল না।

"অন্যান্য লোক যে সকল গৃহে বাসা লইয়াছিল, সেখানকার কুলকামিনীগণের কাহারও নারীধর্ম্ম রক্ষিত হইল না।"

প্রতীকার আবশ্যক।

লেখক এইরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকলের বিবরণ দিয়া আমরা আর পাঠকের হৃদয় ব্যথিত করিব না। পাদরী সাহেব বলেন, "সুলতান নানা উপায়ে আর্ম্মানীদিগকে কতকাংশে বিলুপ্ত এবং একেবারে অধঃপাতিত করিবার চেষ্টায় আছেন।" ইহার প্রতীকার হওয়া আবশ্যক। এ জন্য লেখক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিয়াছেন। আবেদন করিয়া, বা দূত পাঠাইয়া কোনও ফল পাওয়া যাইবে না। এ সকল উপায় পূর্ব্বেই বিফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি সুলতানকে একবার বাহুবলের ভয় দেখাইতে চান।

তাঁহার মতে ভয় দেখাইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে কিছু করিতে হইবে না। একপ ভয় দেখাইয়া ইতিপূর্ব্বে দুই একবার কাজও হইয়াছে। ভয়ে কাজ না হইলে লেখক যুদ্ধেও প্রস্তুত। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িয়া দিলে ইংরাজের সম্মানহানির সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে তিনি একটা বড় অদ্ভুত যুক্তি দিয়াছেন। তাহা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের ভাবিবার বিষয়। তাই আমরা সে কথাগুলি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"বর্ত্তমান বিষয়ে ইংরাজের জিদ বজায় না রাখিলে ভারতীয় মুসলমান-সমাজে একটা বড় অশুভকর ভাবের উৎপত্তির সম্ভাবনা। আমরা যে তাহাদের উপর নিরাপদে রাজত্ব করিতেছি, তাহার কারণ, মুসলমান ইংরাজের প্রতিজ্ঞা ও শক্তি সম্ভ্রমে গৌরব বুঝে। যদি মুসলমানের মনে এরূপ ধারণা একবার বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, ইংরাজের আর সে বল নাই, তুরস্কের সুলতান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তবে দ্বিতীয় একটা সিউটনি অনিবার্য্য। ফ্রান্স, সার্দ্দিনিয়া ও তুরস্ক, এই ত্রিশক্তির সাহায্য লইয়াও যে ইংরেজের রুষ জয় করিতে দুই বৎসর লাগিয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষে কদাপি দুর্দ্ধর্ষ নহে; এই বিশ্বাসেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। অপতেব মুসলমান সম্প্রদায় যে রুষ-জারকে এত ভয় করে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, জার পুনঃপুনঃ তুর্ক সুলতানকে পরাজিত করিয়াছেন। সুলতানকে সর্ত্ত অনুসারে চলিতে বাধ্য করিলে ভারতবর্ষে ইংরেজের বিপদ ঘটিবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। ভারতবাসীর যদি একপ ধারণা হয় যে, ইংরাজ সুলতানের ভয়ে ভীত, তাহা হইলেই প্রকৃত বিপদের সম্ভাবনা।"—পাদরী সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড় বিচিত্র, সন্দেহ নাই।

ইংরাজের প্রেষ্টিজ রাখা আবশ্যক।

পাঠক মহাশয় প্রথম চিত্রের পরিচয় পাইলেন। এইবার আমরা দ্বিতীয় চিত্রের অবতারণা করিতেছি। উহা একখানি ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, তিনি তুর্করাজ্যে পঁচিশ বৎসর বাস করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পাদরী সাহেব যে অভিজ্ঞতার বড়াই করেন, সে বিষয়ে ইনিও কম নন। ফরাসী পত্রের লেখক বলিতেছেন,—"ঐতিহাসিক হিসাবে আর্ম্মাণীদিগের স্বাধীনতা পাইবার কোনও অধিকার নাই। তুর্কগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেও আর্ম্মেনিয়া বৈদেশিক শাসনের অধীন ছিল। পারসীক ও রোমীয়দিগের শাসনকালে আর্ম্মাণীগণ ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তুর্কেরা তাহাদিগকে এই হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। আর্ম্মাণীগণ বহুকাল ধরিয়া সুলতানের প্রসাদলাভ করিয়া আসিতেছে। তাহারা যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজিও বড় বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহাতেও যদি আর্ম্মাণী বিদ্রোহাচরণ করে, তবে মুসলমানের মনে কি হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ফরাসীর সাক্ষ্য অনুরূপ।

"তুর্ক-শাসনে আর্ম্মাণীগণের যে কোনও অসুবিধা নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু সে অসুবিধা, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, উভয়কেই সমভাবে ভোগ করিতে হয়। পরন্তু, খৃষ্টানকে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিতে হয় না; মুসলমান তাহাও করিতে বাধ্য। আর্ম্মেণিয়ার গোলযোগের জন্য ইঁহ মার্কিন সভা সকল অনেকাংশে দায়ী। ইহারাই ইংরাজদিগের প্রকৃতিসুলভ মানবহিতৈষণা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতেছে। লোক সকলকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইতেছে। উদ্দেশ্য, আর্ম্মেণিয়া স্বাধীনতালাভ করিলে সরকারী চাকরীরূপ কলাটা-মুলোটা তাহাদের ভাগেও পড়িবে। মার্কিন পাদরীদিগের দ্বারাও বড় কম অনিষ্ট হইতেছে না। শিক্ষাদানের ছল করিয়া তাঁহারা

অসুবিধা আছে, কিন্তু তত নয়।

লোকের মনে বর্ত্তমান কালের উগ্র ভাব সকল প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। আমেরিকা তাহা পরিপাক করিতে পারিতেছে না। তুর্কেরা ত আমেরিকায় কোনও ইসলাম প্রচারক পাঠায় না তবে তাহারা মার্কিন পাদরীদিগকে প্রশ্রয় দিবে কেন, ইহা বুঝা যায় না। ইংরাজ ও মার্কিন পাদরী মহাশয়েরা যে সকল কথা বলেন, তাহাতে বড় গলাইবার চেষ্টা বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের হাঙ্গামাগুলাকে বড়ই বাড়াইয়া তুলা হইয়াছে। হাঙ্গামাটিকে অতিরঞ্জন কেন? তুর্ক পুলিস ও তুর্ক সৈনিকেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য। যে আর্ম্মানী আইন মানিয়া চলিয়াছে, তাহার কোনও ক্ষতি হয় নাই। পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা 'অরাজকতা, অরাজকতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু এদিকে যে সকল বিদেশী ভদ্রলোক বা মহিলা তুর্করাজ্যে ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণের ত কোনও ব্যাঘাত হইতেছে না।"

সীতারাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতারাম রাজ্যগঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাজ্যের কোনও ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই; সুতরাং লিখিত ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতি কত অলৌকিক বিবরণ পুঞ্জীকৃত করিয়া তাঁহার বাল্যজীবন অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। লোকে যাহা বলে, কৃষক হলচালনা করিতে করিতে সহসা কোন শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সীতারামকে লক্ষ্য করিয়া, যে সকল উপন্যাস রচনা করে, তাহাই ক্রমে লোকসমাজে প্রচলিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া সীতারামের কথা অনেক শাখা প্রশাখায় বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সে সকল জনশ্রুতির মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই,—মিল হইবার সম্ভাবনাও নাই। তথাপি কেহ যদি সীতারামের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাকে সে সকল জনশ্রুতির মূলানুসন্ধান করিতে হইবে;—সেই জন্য আমরা জনশ্রুতিগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম। সারনাথের ধূলিমুষ্টির মধ্যে বৌদ্ধবীর্য্যের ইতিহাস নাই, তথাপি তাহা পরিব্রাজকের বিস্ময়ের ও অনুসন্ধানের সামগ্রী। সীতারামের বাল্যজীবনের জনশ্রুতির মধ্যেও সীতারামের ইতিহাস নাই, তথাপি তাহা আলোচনার সামগ্রী।

চাকলা ভূষণার ভিতর দিয়া একটি শাখানদী প্রবাহিত হইত; উহা এখনও তেমনি বক্রগতিতে বহিয়া চলিতেছে; সেকালে তাহার নাম ছিল মধুমতী,—এখনও মধুমতী নদী অনেকের নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমান

যশোহর জেলার ভিতর দিয়া মধুমতী প্রবাহিত। নদীটি সুবিস্তৃত নহে, কিন্তু তথাপি স্রোতস্বতী; বর্ষাকালে তাহার খরস্রোত বড়ই প্রবল হইয়া থাকে।

মধুমতীতীরে হরিহরনগর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। গ্রামখানি বাঙ্গলার ইতিহাসে অপরিচিত; দেশে যেমন লক্ষ লক্ষ গণ্ডগ্রাম ছিল, ইহাও সেইরূপ; তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস নাই, অথবা থাকিলেও তাহা অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহাকবি কালিদাস মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার সময়ে বাঙ্গলা দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, এখনও বাঙ্গলা দেশের প্রায় সেইরূপ অবস্থা;—চারি দিকে নদ, নদী, খাল, বিল; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নগর, যেন বর্ষাসলিলপ্লাবিত জলাশয়ের মধ্যে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জ। কেবল তফাৎ এই যে, সেকালে নৌসেনার পরিচালনায় বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ছিল, এখন নৌকারোহণে নদীপার হইতে বলিলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই উইল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

অন্যান্য প্রদেশ যেমন নদীবহুল, ভূষণা চাকলাও সেইরূপ নদীবহুল স্থান। সকল নদীর নাম হয় ত ভূষণার লোকেও জানিত না। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও সাগরচুম্বিত সুন্দরবন, আর চারি দিকে কেবল গঙ্গা ও ভাগীরথীর শত শত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা; সুতরাং সে প্রদেশ যেমন উর্ব্বর, তেমনই শস্যশালী বলিয়া পরিচিত ছিল। সহসা সে দেশে শত্রুসেনা প্রবেশ করিত না। বহিঃশত্রুর পক্ষে সমতলক্ষেত্রে পদাতিক ও অশ্বারোহী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যেমন সহজ কথা, নদীবহুল স্থানে সহসা বহুশত সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করা সেরূপ সহজ কথা নহে। সুতরাং ভূষণা অঞ্চলে সহসা বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে সাহস পাইত না।

ভূষণা চাকলা যশোহরের ফৌজদারের অধীন ছিল। ফৌজদারের রাজধানীর ভগ্নকীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। যশোহরের ফৌজদার কথঞ্চিৎ নিরাপদেই বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। তাঁহার রাজধানী একটি ক্ষুদ্র নবাবের রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবী ধরণে নবাবী অনুকরণে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইত। সেইরূপ গড়, সেইরূপ প্রাচীর, সেইরূপ মসজিদ, সেইরূপ দেওয়ানখানা, সেইরূপ মতিঝিল, সেইরূপ সকলই; সেইরূপ সেনাবল এবং সেইরূপ শাসনকৌশল ছিল না। ভূষণার ফৌজদার অল্প কয়েক সহস্র সেনার সাহায্যে মোগলের রাজকর সংগ্রহ করিতেন; রাজকর দিল্লীতে

প্রেরিত হউক বা না হউক, ফৌজদারের নবাবী করিবার অভিলাষ পূর্ণমাত্রাতেই পরিপূর্ণ হইত। লোকেও তাঁহাকে ফৌজদার বলিয়া জানিত না,—সকলেই প্রকৃত নবাব, এখনও তাঁহার বাটী সে দেশে নবাববাড়ী বলিয়াই পরিচিত।

এই ভূষণা চাকলায় মধুমতীতীরে হরিহরনগরে কায়স্থকুলে বিশ্বাসবংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের জন্মস্থান কোথায়, তাহা লইয়াও একজন বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে, হরিহর নগরে সীতারামের জ্ঞাতি বন্ধুদিগের বসতি ছিল; কিন্তু হরিহর নগরেই যে তাঁহার জন্ম হয়, তাহার প্রমাণ কি? বাস্তবিক, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; তবে সীতারাম যে হরিহর নগরে বাস করিতেন, তাহা অদ্যাপিও শুনিতে পাওয়া যায়।

সীতারাম দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান। এখনকার সম্পন্ন ভদ্রবংশও প্রায় দীনদরিদ্র; কিন্তু সে কালের দরিদ্র গৃহস্থ একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন না। সীতারামের কতকগুলি জোত ও তালুক ছিল। হরিহরনগরে ও শ্যামনগরে সীতারামের কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল; তাহাই তাঁহার একমাত্র পৈতৃক সম্পদ। তদ্ভিন্ন অসীম সাহস ও অসাধারণ বাহুবল ভিন্ন সীতারামের আর কোন সম্বলই ছিল না। আর ছিল কেবল গঠনশীল প্রতিভা। যে প্রতিভাবলে অনেক বালক নদীসৈকতের বালুকারাশি সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র ধূলার ঘর, ধূলার সিংহদ্বার রচনা করে, তাহার ভিতরেও আশ্চর্য্য কৌশল বিন্যস্ত হইয়া থাকে। কেহ কেবল রন্ধনশালা, কেহ বা শয়নাগার রচনা করিয়াই নিরস্ত হয়; কেহ বা বালক নেপোলিয়নের মত দুর্গপ্রাচীর রচনা করে। ইহা তুচ্ছ কথা, অনেক সময়ে আমাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়াই মনে হয় না; কিন্তু ইহাতেই প্রতিভার বিকাশ। সীতারামের বাল্যজীবনে এইরূপ গঠনশীল প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু লোকচক্ষু তাহার ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পায় নাই।

আমরা একালের লোক। দেশে অন্ন বস্ত্রের এতই অনাটন যে, ভাল করিয়া দন্তোদ্গম না হইতেই আমাদিগকে অর্থকরী-বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে হয়। অর্থ অর্থ করিয়া সকলেই ব্যাকুল; সুতরাং শৈশবজীবনের সকল স্ফূর্ত্তি অর্থচিন্তায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ের কঠিন পীড়নে, পাঠ্যপুস্তকের অনাবশ্যক গুরুভারে

কায়মন এবং বাক্য সকলই জীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমরা দেহে দুর্ব্বল হইতেছি, মনে ভীরু হইতেছি; বাক্যে পরমুখাপেক্ষী হইতেছি; সুতরাং এ কালের বাঙ্গালী আর সেকালের বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

সে কালে অর্থের বহুল বিস্তার ছিল না; গৃহস্থের আবশ্যক দ্রব্য অধিকাংশই নিজে নিজে উৎপাদন করিয়া লইতে হইত; সুতরাং বাঙ্গালী বালকদিগকে কখন গোচারণ করিতে হইত, কখন ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, কখন শস্য বিক্রয় করিতে হইত, কখন বা স্বহস্তে হাটবাজার সমাধা করিতে হইত। ইহাতে শিক্ষা—অর্থাৎ পুস্তকপাঠে ব্যাপৃত পড়িত, কিন্তু শরীর সবল হইত, মন প্রফুল্ল থাকিত।

সীতারামের সম্পদের মধ্যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক; সুতরাং সর্ব্বদা তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। তিনি অশ্বারোহণে মাঠে মাঠে বেড়াইতেন, এবং বাল্যকাল হইতেই বাহুবলের জন্য সকলের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতারাম যখন মাঠে মাঠে অশ্বচালনা করিতেন, তখন বালক-হৃদয়ে কত কল্পনা জাগিয়া উঠিত, কত কল্পনা বিলীন হইত, তাহা কে বলিতে পারে? এই বাল্যভ্রমণে পথ ঘাট অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, লোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, সীতারামের বীরবাহু দেশরক্ষায় সক্ষম হইবে বলিয়া, অনেকেই তাঁহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাল্য-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সীতারাম হিন্দু; হিন্দুপরিবারে প্রতিপালিত হইয়া বাহুবল অপেক্ষা ভগবৎকৃপার উপর অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। সে বিশ্বাস তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস; পরবর্ত্তী ইতিহাসে সীতারাম তাহার অনেক প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মোগলপ্রতাপ নিস্তেজ হইলে দেশের মধ্যে মগ এবং ফিরিঙ্গির উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা স্থলপথে, জলপথে—যখন যে দিকে সুবিধা পাইত—গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিত। তাহাদের অত্যাচারে সমুদ্রকূলের সমৃদ্ধ জনপদ সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছিল।* মোগল যখন আর প্রজারক্ষায় মনোযোগ দিলেন না, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকে তখন আত্মরক্ষার জন্য লাঠি তরবারির আশ্রয় লইল। বাধ্য হইয়া লোকে সাহসে বুক বাঁধিল। যাহা কঠিন, তাহা অভ্যাসগুণে সহজ হইয়া যায়; দক্ষিণবঙ্গের লোকের পক্ষে

* Long's Selections from the Records of the Government of India, Vo. I.

কোমর বাঁধিয়া লাঠি ভরবারি চালনা করা সহজ হইয়া উঠিল। এই আত্মরক্ষার্থে সীতারাম অনেকগুলি যুবকদলের অধিপতি হইলেন। ইহা হইতেই কালে রাজ্যগঠনের সূত্রপাত হইল; কিন্তু নিদ্রাতুর ইব্রাহিম খাঁ তাহার সংবাদ লইলেন না; মহাবীর যশোহরের ফৌজদার তাহার গতিরোধ করিতে সাহস করিলেন না। সীতারামের দল ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

মলিন হাসি।

১

নয়, নয়, রবি বাঁকি, সকলি রহিল বাকি,
বিশ্বের গ্রন্থটি শেষ, যন্ত্রণার একশেষ, মর্ম্মে গাঁথা মরমের ব্যথা;
উপমায় হারে তোর কাছে। এক দিকে রোদ্র হাসি, অন্য দিকে অশ্রুরাশি
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্রুরাশি ইন্দুতে কি শোভা বিকাশে।
যত আছে, জগতে কি আছে? হায় রে মলিন হাসি, তোর কিন্তু অশ্রুরাশি,
আছে কি রে কুসুমেতে নিদাঘে লতার দেহে নেত্রপটে শ্মশান প্রকাশে।
কীটদষ্ট পুষ্পের বদনে?

২

আছে কি তমালশিরে, উদাসী কালিন্দীতীরে সুখের বাসর-ঘরে, সবে হুড়াহুড়ি করে,
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে? সধবা ও কুমারীর দল।
প্রান্তরের প্রান্তদেশে, আছে কি রে নিশিশেষে চুপে চুপে, ধীরে আসি, তুই রে মলিন হাসি,
পাণ্ডু চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরণে? আধা হাসি, আধা অশ্রুজল,
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্রুরাশি বিধবার পাণ্ডু মুখে তিলমাত্র রবি সুখে,
ওই তোর কাঙাল নয়নে? আঁধার করিস্ পলায়ন;

৩

হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়,
হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্রুরাশি সিক্ত করে কবির নয়ন।
কবির কি ভাব ভরা কথা?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ। সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ "নূতন ও পুরাতনে" লেখকের নাম নাই। লেখক বলেন,—"আমাদের পুরাতন চলিয়া গিয়াছে। যে সভ্যতাসূর্য্য দ্বিসহস্র বর্ষ ধরিয়া এসিয়াকে আলো দিয়াছিল, সে সূর্য্য ডুবিয়াছে। শুধু তাহার গোধূলিমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে; তাহাও চলিয়া যাইবে। সে সূর্য্যকে কে ফিরাইতে পারে?" লেখকের মতে, "পুরাতন বিলুপ্ত উদ্ধার হইলেও এবং তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইলেও অন্ততঃ তাহাকে নানেক আকারে রাখা আর শ্রেয়ঃ নহে। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন দরকার।" * * * নূতনের অনন্ত আলোকস্রোত সম্মুখে বহিয়া যাইতেছে। * * * উঠিতে হইলে আমাদের এই নূতনের আলোকস্রোতে ঝাঁপ দিতে হইবে।" "নূতন ও পুরাতনের" উপসংহার এই যে, "নূতনে প্রাণ আছে, পুরাতনে প্রাণ নাই;" অতএব পুরাতনে অন্ধ অনুরাগ বদ্ধমূল করিয়া রাখিলে চলিবে না; নূতনের পদেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। "লোরিকের গান," "শিখধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তৃতি" এবারও প্রকাশিত হইয়াছে। সারগর্ভ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "সিরাজদ্দৌলা" বেশ হইতেছে। "নীলগিরি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত—সুখপাঠ্য।

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "দুই পাস্তার" প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রবন্ধটি সুপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্., শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ., শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ., শ্রীজলধর সেন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়, এম্. এ., শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্., শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। হুসেনসাহী মহাভারত	৬৪১
২। উত্তরায়ণ মেলা	৬৫৬
৩। প্রতিশোধ (উপন্যাস)	৬৬১
৪। কাবুলীর জয় (কবিতা)	৬৮৩
৫। নবাবী আমলে হিন্দুকর্ম্মচারী	৬৮৫
৬। ছুটি কবিতা	৭০১
৭। ভিহবী (ভ্রমণবৃত্তান্ত)	৭০২
৮। সাহিত্যে প্রেম	৭০৮—৭৩৪
১। দেবত্ব	৭০৮
২। পশুত্ব	৭১৮
৯। বেগম সমরু	৭৩৫
১০। অনিতাভ (সমালোচনা)	৭৪৯
১১। সীতারাম	৭৫০
১২। সহযোগী সাহিত্য	৭৫৪—৭৬৮
১। সাহিত্য	৭৫৪
২। সমালোচনা	৭৬০
৩। নানাবিধ	৭৬২
৪। দর্শন	৭৬৭
১৩। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৭৬৮

কলিকাতা;

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য প্রতিকৌটা ॥০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

(একত্রে ১০ কৌটা পর্য্যন্ত ।০ মাশুলে যায়।)

১০০০০০ এক লক্ষ বড়ি বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই আজ "চৌদ্দবড়ির" অত্যাশ্চর্য্য গুণে চমৎকৃত—আজ দেশময় "চৌদ্দবড়ির" সুযশ। পুরাতন জ্বরের যে এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে, রোগ যত দিনের পুরাতন হউক না—ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ২।৪ দিনেই প্রকাশ পায়। প্লীহা, যকৃত প্রভৃতির পীড়ায় যেখানে কোন ঔষধে সুফল দেয় নাই, সেখানেও ইহার রোগনাশক ক্ষমতা খুব অল্প সময়ে প্রকাশ পাইবে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণজ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, নানারূপ চিকিৎসায় যাঁহারা সুফল পান নাই, তাঁহারা এই ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন,—ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

প্রশংসাপত্র।—প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমি আপনার প্রকাশিত চৌদ্দবড়ি লইয়া গিয়া আমার এক প্রতিবেশীকে দিয়াছিলাম তিনি ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় প্রতি দিন জ্বর হইত; এই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ প্রায় ৫ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "জীবন রক্ষক" পুস্তক বিতরিত হইতেছে। ৵১০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকি।

শর্ম্মা কোম্পানী।

১২ নং সেকরাপাড়া লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্‌ এ, বি, এস্‌ প্রণীত

অবসর।

(নবপ্রকাশিত গীতিকবিতা)

[উত্তম কাগজে উজ্জ্বল অক্ষরে সুচারুরূপে মুদ্রিত।]

ক্রাউন আট পেজী এক শত ষাট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অবসর সম্বন্ধে অভিমত;—

Babu Nabin Chandra Sen, poet :—

"I have gone through the poems spell-bound. There is a feeling and freshness in them which is really refreshing. I have long been on the look-out for a rising star, and I am sure I shall not prove a false prophet if I say that I have at last seen one. Your *Meghduta* first gave me its glimpses, while your present book confirms my prophetic vision. May God grant you life and leisure to enrich the literature of our motherland." 16th Nov. 95.

"আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে 'অবসর' যে অতি উচ্চস্থানীয়, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। * * * The meeting of the Witangemot অতি উৎকৃষ্ট কবিতা; বাঙ্গালীর দ্বারা ইংরাজিতে কবিতা রচনার আমি বিপক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালী এমন সরস কবিতা ইংরাজীতে লিখিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।" * * *

দেবগৃহ;
১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ম্যারেজ ও ফ্যামিলি রিলিফ ফণ্ড।

ঠিকানা, পোঃ অঃ বানিয়াপুরী; মহকুমা সাঁথিকগঞ্জ।

নূতন ধরণে ও নূতন প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ নিঃস্ব অবস্থাপন্ন লোকে উপযোগী করিয়া উপরোক্ত দুইটী ফণ্ড স্থাপন করা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই মেম্বর হইতে পারিবেন। অপর কোন ফণ্ডে মেম্বর হইবার পূর্ব্বে আমাদের ফণ্ডের নিয়মাবলী একবার পড়িয়া দেখিবেন। বারিষ্টার, হাকিম, জমীদার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ডিরেক্টর হইয়াছেন। এক আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে যে কোন ফণ্ডের নিয়মাবলী ও দরখাস্তের ফারম পাইতে পারিবেন; কেহ এজেণ্ট হইলে কমিসন পাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ, বি, এ, সেক্রেটারি।

বেঙ্গল কোমকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

৯১নং অপারসারকিউলার রোড, কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সি কালেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি, (এডিনবার্গ) এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এম, বি; মহোদয়ের সাহায্যে আমাদের এই এলোপ্যাথি ঔষধের কারখানায় প্রায় তিন শত রকম ঔষধ প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের কারখানায় যাবদীয় ঔষধ আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত হয়। হইয়া থাকে; ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে তালিকাপুস্তক পাঠান যায়।

সিরাপ অফ্ হাইপোফসফাইট অফ লাইম।

সর্দ্দি, কাশী, নিমকাশ, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুস রোগের অমোঘ ঔষধ। এই সিরাপ খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ইহার রং সুন্দর গোলাপী। প্রতি বোতল ১৲ টাকা; ডজন ১১৲ টাকা।

কলেরা ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের জন্য।

ক্লোরোডাইন অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।৵০ আনা; ডজন ৩৸০ ঔষধের সহিত প্রয়োগবিধি দেওয়া যায়।

ডাক্তার কবিনিস্ ক্যাম্ফর; অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।১০; ডজন ৩৲ টাকা।

একোয়া টাইকোটীন।

বা যমানী জল।

অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ ঔষধ। সেবনে পেট ফাঁপা, বুকজ্বালা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ তৎক্ষণাৎ দূর হয়; ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও সুনিদ্রা হয়। ২৪ আউন্স বোতল ।৵০ ডজন ৩৸০।

মফস্বলবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা যমানীজলসার প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার সহিত সাত গুণ জল মিশাইলে যমানীজল প্রস্তুত হয়।

৩ আউন্স শিশি ।৷০ ডজন ৫।০।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

এক্সট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কম্পাউণ্ড (গুলঞ্চ প্রভৃতি তরলসার)

পালাজ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর প্রভৃতি সকলপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে কুইনাইন বা সিনকোনা নাই।

৬ আউন্স শিশি—১৲ টাকা। ডজন—১১৲ টাকা।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—ম্যানেজার।

কলিকাতা, ২৮নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে ও অন্যান্য পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

রন্ধনবিষয়ক নূতন পুস্তক।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।

৬, নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

নূতন গীতি-গ্রন্থসন!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত

কল্কি-অবতার।

মূল্য ১ একটাকা মাত্র। ডাকমাসুল ২০ দুই পয়সা মাত্র।

২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে

অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

কবিরাজ অভয়-চরণ গুপ্ত কবিরত্নের

সুধাবটী।

১২০ বটীকার কৌটা—১ এক টাকা। প্রতি ১২ কৌটা—১০ দশ টাকা

ইহা পাচক, বিরেচক, রক্তপরিষ্কারক এবং বলকারক; সুতরাং শরীরের ব্যাধি সমস্ত দূরীকৃত করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লাবণ্য ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠপরিষ্কারক এবং অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহা আহার পরিপাক করিয়া মল নির্গত করে, অথচ জলবৎ ভেদ হয় না এবং শরীর বিকৃত করে না। আফিম ব্যবহারকারিদিগেরও বেগ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোন পীড়ার উপক্রমে ২।১ দিন সেবন করিলে আর পীড়া হয় না। যে প্রকার জ্বরই হউক না কেন, ইহা অল্পদিন সেবনেই সম্পূর্ণ স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতে কুইনাইন কিম্বা অন্য কোন দূষিত দ্রব্য নাই। অন্যান্য ঔষধের ন্যায় অল্প দিন পরেই পুনরায় জ্বর হয় না। অম্লপিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব একেবারেই দূর হইয়া যায় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ডাক্তার, কবিরাজ ও বহুতর রোগীর প্রশংসাপত্র ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন।

অনেক সময় লেখার দোষে ঔষধ প্রেরণ করা হয় না। অতএব লেখা যেন জড়ান না হইয়া স্পষ্ট হয়। বিদেশস্থ মহোদয়গণ ব্যবস্থা ও ঔষধের জন্য পত্র ও মনি অর্ডার আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র চরণ গুপ্ত—কবিরাজ,

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১নং নীলমাধব সেনের গলি, নানকীভাঙ্গা, কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন।

আমারা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি, "কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।" আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে অবিলম্বে আপনার স্ত্রীর জন্য এক বোতল ক্রয় করুন। তিনি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আপনি যদি বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত না হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের আফিসে আসিয়া কুন্তলীনের নমুনা দেখিয়া যাইবেন। মনোনীত না হইলে ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। ইহাই "আমাদের নিবেদন।"

এইচ, বসু।

ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার;

২৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়া বটিকা।

জ্বরাদির একমাত্র মহৌষধ।

লক্ষ লক্ষ লোক সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, জ্বর-প্লীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ রাজ্যেশ্বর রাজার অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে, বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানবাসী, কি পঞ্জাববাসী,—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজস্ত্রীর বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু। বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-রমণী বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া বটিকার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়। সুতরাং, যাঁহার জ্বরভাবের উপক্রম হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু জ্বালা, হাত-পা জ্বালা করিতেছে, যাঁহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, বা কোমর কামড়াইতেছে; যাঁহার ক্ষুধা হয় না, যাঁহার কোষ্ঠ খোলসা হয় না, যাঁহার কাসি-সর্দ্দি হইয়াছে,—এই বেলা বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করুন, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে না। বিজয়া বটিকার শক্তি প্রকৃতই মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।

অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি জ্বর-প্লীহা-যকৃতাদি রোগে ভুগিতেছেন, হাত-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, ২৪ ঘণ্টাই যাঁহার নাড়ীতে জ্বর আছে,—ডাক্তার কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরাম হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর প্রতিবেশিবৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, আসামের কালাজ্বর, অমাবস্যা-পূর্ণিমার জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, মজ্জাগত জ্বর,—সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগই ইহা দ্বারা আরাম হইয়া থাকে।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৷৵০	।০	৶০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়ুগ্রাম, পোষ্ট সাদিপুর, জেলা বর্দ্ধমান—স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—৭৯নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা; কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেণ্ট—বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

ডাক্তার-পি এসেম্ জির অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার

একশিরার অব্যর্থ মহৌষধ।

নং ৮৫ বেচু-চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একশিরা রোগ যেরূপেরই বা যত দিনেরই হউক, নিশ্চয় এই ঔষধ প্রয়োগে এককালীন আরোগ্য হইবে। ইহা বর্ত্তমান কালের এক অতি আশ্চর্য্য আবিষ্কার এবং এই পীড়ার পক্ষে অব্যর্থ মহৌষধ। যাঁহারা বহুদিন হইতে এই রোগের কষ্ট পাইতেছেন, এবং যাঁহারা নানারূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনেক বহুদিনের রোগী এই ঔষধ ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধে কোনরূপ দুষ্য দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রশংসাপত্র।

১। আমি আপনার ঔষধ দুই বোতল মাত্র ব্যবহার করিয়া এককালীন আরোগ্য লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের একশিরা রোগ আছে, তাঁহাদিগকে আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে স্বচ্ছন্দে অনুরোধ করিতে পারি।

এস্, পি, দাস, নং ৮-এসপ্লানেড রো; কলিকাতা।

২। পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডবলু, জি সাহেব লিখিয়াছেন :—আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার একশিরা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৩। আপনার একশিরার ঔষধে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ও আমার বন্ধুদিগকে ইহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছি। সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

জে, পি, গ্রিফিথ বি-এ, বি-এল, মোকাম পুরুলিয়া।

আব ইউরিনা।

বহুমূত্র রোগের একমাত্র অশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। বহু দিবসের পুরাতন রোগও ইহা সেবনে স্বল্প সময়ে আরোগ্য হয়। ঔষধের উপকারিতার সন্দিহান হইলে, ভাগলপুরের ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার জেমস্ রবিনসন্ সাহেবকে পত্র লিখিয়া জানুন, তিনি ঔষধের গুণে আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়াছেন। মূল্য ১ এক কৌটা ৫৲ টাকা, ৩ কৌটা ১৩৷৷০ টাকা।

অর্শ-নিসূদন বটিকা।

বিনা অস্ত্রে সকল প্রকার অর্শ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ১ এক দিবসের সেবনে রক্ত পড়া ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ছোট কৌটা ১৷৷০ টাকা, বড় কৌটা ৩ টাকা। কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু সহরের জজ শ্রীযুক্ত সাদাতুল্লা এম্ সাহেব উচ্চ দরের প্রশংসা করিয়াছেন।

১০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে অন্যান্য ঔষধের ক্যাটালগ পাঠান যায়।

গুপ্ত এণ্ড সন্‌স।

৪১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

মেডিকেল কলেজ হইতে ইংরেজিতে পরীক্ষোত্তীর্ণা
ধাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত।
৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চারিণী মহৌষধ।

যাঁহারা বহু দিনাবধি নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া হার মানিয়াছেন, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এবং জীবনে হতাশ ও বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন একবার মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টী তাচ্ছীল্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বাধক-বিজয়।

অনেকের বিশ্বাস বাধক রোগ জীবনের সঙ্গী, কোনও ক্রমেই আরোগ্য হয় না; কিন্তু আমার এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অবশ্যই তিরোহিত হইবে। বিষম বেদনা ও যন্ত্রণা এবং হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাধক রোগ এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য ভিন পুরিয়া ১।০, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

জরায়ু-কল্যাণ।

জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা ও বেদনা, নাড়ীর বিকৃততা, আভ্যন্তরিক প্রদাহ ইত্যাদি অসুস্থতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক এবং অপরিসীম যন্ত্রণাপ্রদ। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে জরায়ু ও নাড়ী ঘটিত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ও পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৩ঙ্গ শিশির মূল্য ৫৷৷০ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রদর-চিন্তামণি।

এই পরম উপকারী ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং দাহ, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট সকল প্রকার প্রদর-রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১।০, প্যাকিং ৵০, আনা ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ক্ষত-নিসূদন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে খোষ, পাঁচড়া, ফোড়া, কাউর, ঘুষ-ঘুরে, নালী ঘা, নারদী, পশ্চিমে ধসা, সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা এবং জন্তুর দংশনজাত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে। ঘা যত দিনের পুরাতন ও রক্ত পচা হউক না কেন এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে উপকার হইবে এবং কিছু দিনের মধ্যে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। মূল্য এক ঔন্স শিশি ১৲ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

মেঘদূত।

শ্রীধরদাচরণ মিত্র, এম্‌ এ, সি, এস্‌ কৃত

মহাকবি কালিদাসের অতুলসুন্দর বিরহ-কাব্যের সুললিত বঙ্গকাব্যানুবাদ।

মূল্য ৸০ বার আনা।

The late Rai Bankim Chandra Chatterjee Bahadoor, C.I.E.—
"I think very highly of your Meghdut. This saying includes every sort of detailed criticism of your work."

Babu Chandra Nath Basu :—
"... ..The power, the art, the skill and the insight seen in your verse is a glory all your own.."

The Honorable R. C. Dutt, C, S. C. I. E.—
".....The beauty and sweetness and skill of your style entrance the soul of the reader."

Prof. Krishna Kamal Bhattacharya :—
"..... A delightful work of poetry in Bengali."

Babu Rajendra Chandra Sastri :
"..... None.....can compare to yours in point of general accuracy and literary excellence."

Sir R. C. Mitter, Kt.:—
"..... It will have a lasting place in Bengali literature."

The Hon'ble Justice Gurudas Banerjee :—
"..... The work deserves a high place in our poetical literature."

কলিকাতার সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। আমার নিকট হইতে লইলে ডাকমাশুল লাগে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক।
২৮ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাশুল ৵০ এক আনা।

"উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন সুরের লেন। গোয়াবাগান, সিমলা পোঃ, কলিকাতা;—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

হুসেনসাহী মহাভারত।

বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস দিন দিন নূতন আলোকে আলোকিত হইতেছে দেখিয়া পরম পরিতোষ জন্মে। আমরা বাল্যকালে কাশীরাম দাসকেই ভারতের প্রথম অনুবাদক বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তদপেক্ষা পুরাতন কয়েকখানি বাঙ্গলা মহাভারতের আবিষ্কার হইয়াছে। অল্প দিন হইল, বগুড়া জেলায় আমি আর একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা মহাভারতের হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি; সাহিত্যরসিক পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বগুড়া জেলায় নবাবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের কয়েক মাইল পূর্ব্বে গোপীনাথপুর নামে একটি গ্রাম আছে;—তথায় 'সখীভাব' নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন গুরুবংশ বিদ্যমান আছেন। ইহাদের উপাধি 'প্রিয়া'। ইহাদের গৃহে হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অনেক আছে শুনিতে পাই, এবং তাহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা আমাকে কয়েকখানি পুঁথি পাঠাইয়া দেন। তাহারই মধ্যে দেখিলাম, একটি সমগ্র বাঙ্গলা মহাভারত রহিয়াছে।

দর্শনমাত্রেই গ্রন্থখানি প্রাচীন বলিয়া প্রতীতি হয়। কাগজ অতি পুরাতন—ধূসরবর্ণ, কীটদষ্ট, এক্ষণে জীর্ণ হইতে বসিয়াছে। স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়াছে। লেখাও স্পষ্টই পুরাতন,—তবে আজিও বেশ স্পষ্ট পড়া যায়। সমগ্র পুঁথির পত্রসংখ্যা এইরূপ :—

১। আদি পর্ব্ব	২১ পত্র।	১১। শক্তি পর্ব্ব	৫ „
২। সভা পর্ব্ব	৯ „	১২। স্ত্রীপর্ব্ব	৮ „
৩। বনপর্ব্ব	১৫ „	১৩। শান্তি পর্ব্ব	১১ „
৪। বিরাট পর্ব্ব	২০ „	১৪। অভিষেক পর্ব্ব	৩ „
৫। উদ্যোগ পর্ব্ব	১৭ „	১৫। মৌশলপর্ব্ব	৫ „
৬। ভীষ্ম পর্ব্ব	১৬ „	১৬। অশ্বমেধ পর্ব্ব	৭৮ „
৭। দ্রোণ পর্ব্ব	২৮ „	১৭। অর্চ্চর্য্য পর্ব্ব	৭ „
৮। কর্ণ পর্ব্ব	১৭ „	১৮। ব্যাসাশ্রম পর্ব্ব	৫ „
৯। শল্য পর্ব্ব	৫ „	১৯। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব	৮ „
১০। গদা পর্ব্ব	৮ „		২৮৬

গ্রন্থসমাপ্তির পর শেষ পত্রের লিপি এইরূপ :—

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো * * হস্তিবিচলিতপাদেন ভিড্ডভা বিচলিত সরস্বতি। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ সুটসমুদ্রতাবিক সোড়কা সত সকাব্দিয়ে সৌরফাল্গুনস্য প্রবিংসতি * সকে আদিতৌ বাশরে দিবাত্রিতয়প্রহরান্তরে এতত্কালানুসারে ইদং পুস্তকং সমাপ্তং॥ ইত্যাদি স্বাক্ষরমিদং শ্রীবামনারায়ণ দত্ত দাশ সাকীন রামপুর পরগনে আপোল সরকার পাউবা (পাঠিরা ?) সন ১১৬১ এগার সত একসট্টি শাল জমিদার শ্রীরাজা রামনাথ রায়॥ গোমস্তা শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরি॥ মোকাম দক্ষিণপুর্ব্বে পিড়াই।"

ইহাতে পুঁথিটি শকাব্দা ১৬৭৬ বাঙ্গলা সন ১১৬১ বৎসরে লিখিত হইয়াছিল, জানা যায়। তদনুসারে ইহার বর্ত্তমান বয়স ১৪১ বৎসর হইতেছে।

গ্রন্থের আদি এইরূপ,—

গণেশ রামকৃষ্ণঞ্চ দুর্গা দ্বিত্বো মহেশ্বরঃ। বৎসবেক ছিল তারা অজ্ঞাত বস *।
পিতা গুরু পবং ব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমস্তুতে॥ * * * ন বহুমতি॥
নমো দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকর * *। এত সব কথা কহ সঙ্খেপ করিয়া।
বিঘ্নং হবন্তু হেবম্বচরণাম্বুজরেনম॥ তাহাব আদেশ আমি মস্তকে ধরিয়া॥
অথ আদিপর্ব্ব লিখ্যতে॥ করিয়া পরম যত্নে ভারথ রচিল।
প্রণমহো নারাষণ পুরুস প্রধান। + * * *
প্রণোমহো ব্যাসমুনি * * নিধান॥ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—
অন্তে সাস্তে রিসাবদ্ মহিমা অপার। তিন লক্ষ ত্রিস সহস্র কৈল শ্লোক।
কলিজুগে হৈব জেন বিষ্ণু অবতার। কহিল নাবদ মুনি শুনে দেবলোক॥
প্রতাপে প্রসস্ব জেন পিপক্ষের জম। পঞ্চ লক্ষ শ্লোক সুনে দ্বিজগণে।
প্রথিপী ভরিল জসে অতি অনুপাম॥ পিতৃলোকে শ্লোক করেন দেবলোকে সুনে॥
সুলতান হুসেন পঞ্চম গৌড়নাথ। চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক পাতাল ভুবনে।
ত্রিপুরা রাজার নামে জবে পেল হাথ। বলির সভাতে পাট করেন মুনি সনাতন॥
রাঙ্গা টোপর সনে দিল লস্করি কাপড়া। সপ্তদশ লক্ষ শ্লোক হবিল বাক্ষসে।
সোনা রূপা লক্ষ দিল এক সত ঘোড়া॥ গৌত্রেয় পঠন্তি তাহা পরম হরিসে॥
শ্রীজুত লস্কবি খাঁ বড় মহামতি। জন্মেজয় রাজা দস সহস্র অবধান।
দরিদ্র ভঞ্জন রূপ অনাথের গতি॥ ব্যাস মুনি আইল তবে রাজা বিদ্যমান॥
কুতুহলে ভারথের সুনন্তি কাহি * *। যথাবিধি পুজা কবি কহিল নৃপত্তি।
* * মতে পাণ্ডবের হাবাইল রাজধাদি॥ তুমি বেদ ইতিহাস কহ মহামতি॥"
বনবাস বঞ্চিল দ্বাদশ বৎসব। ইত্যাদি।
কীমতে বঞ্চিল তাবা বনের ভিতব॥

দুঃখের বিষয়, এই বিবরণে গ্রন্থকারের আত্মবিবরণ কিছুই দেখা যায় না। "করিয়া পরম-যত্নে ভারত রচিল" এই চরণের পর যে চরণটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার নাম ছিল কি না, জানা যায় না। আমি যত দূর

দেখিতে পারিয়াছি, তাহাতে অন্য কুত্রাপিও গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তাঁহার নাম না পাইলেও দেখা যায়, তিনি গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন সাহার আমলে, অর্থাৎ শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হুসেনসাহার এক মুসলমান সেনাপতি এ স্থলে "শ্রীযুত লস্কর খাঁ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি—ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণে নিয়োজিত হইয়া কৃতকার্য্য হইলে—হুসেনসাহা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি মহাভারতের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন—এবং গ্রন্থকারকে সংক্ষেপে মহাভারতের বৃত্তান্ত বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আদেশ করেন। তাহাতেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

এই মহাভারতে উনবিংশ পর্ব্ব, এবং অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা অশ্বমেধ পর্ব্বই অতিবাহুল্যে লিখিত হইয়াছে, দেখা যায়। এই এক পর্ব্ব সমগ্র গ্রন্থের চতুর্থাংশেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। অধিকন্তু, শেষ চারি পর্ব্বে বক্তা বৈশম্পায়ন নহেন, জৈমিনি।

গ্রন্থের রচনা অপকৃষ্ট। ইহার পদ্যে লালিত্য বা কবিত্ব কিছু নাই। লিপি-প্রণালীও অতি অশুদ্ধ। একালের পাঠকগণের ইহাতে মনোরঞ্জন হওয়া অসম্ভব। তবে কাশীরাম দাসের উৎকৃষ্ট রচনার পূর্ব্বে বাঙ্গলাতে মহাভারত রচনার কিরূপ উত্তম হইয়াছিল,—তাহা যাঁহাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, গ্রন্থখানি তাঁহাদের পাঠের যোগ্য, সন্দেহ নাই। অপিচ, আলাউদ্দীন হুসেন-সাহার আমলে বাঙ্গলা-ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও এই গ্রন্থে জানা যায়, এবং তজ্জন্য ইহা আদরের যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে একটি অতি বিচিত্র কথা দেখিতে পাই। আলাউদ্দীন হুসেন-সাহাকে গ্রন্থকার "পঞ্চম গৌড়নাথ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আমি এই বিবরণ পাঠে চমকিত হইয়া উঠিয়াছি। তাহার কারণ কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলা উচিত।

প্রায় এক বৎসর হইল, আমি ধর্ম্মপালের একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছি—এবং তৎসঙ্গে তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া ইংরেজি ভাষায় তাহার মর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি এইরূপ নির্দ্দেশ করি যে, সাধারণ পাঠকে মালদহ জেলার অন্তর্গত মুসলমান রাজধানী গৌড়ের বিষয় অবগত থাকিয়াও—ধর্ম্ম-পালের সময়ের গৌড়ের বিষয় সম্যক অবগত নহে। উক্ত সময়ে প্রকৃতপক্ষে

গঙ্গার উত্তরে, কান্যকুব্জ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমান্ত পর্য্যন্ত 'গৌড়' এই সাধারণ নামে বিখ্যাত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ছিল। এবং তাহা পঞ্চগৌড়, এবং তাহার নরপতিগণ "পঞ্চগৌড়াধিপাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত শব্দে কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে, কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডেরই একদা 'গৌড়' এই নাম ছিল। যাহা আদি 'গৌড়', তাহা কোশল বা অযোধ্যা দেশের অন্তর্গত। এই আদি 'গৌড়ের' ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইয়া, পাঁচটি গৌড় রাজ্য স্থাপন করেন; এবং তাহাই অবশেষে পঞ্চ গৌড় নামে বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মপাল এই সমগ্র গৌড়ের সম্রাট বা একছত্র অধিপতি ছিলেন। পশ্চিম দিকে তিনি কান্যকুব্জ পরাজয় করিয়া সেই প্রদেশের প্রাচীন রাজবংশকে তাহাদের রাজসিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেন; এবং পূর্ব্ব দিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনও তাঁহার করতলগত হয়। উত্তরভারতে ধর্ম্মপালের মত প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট তৎকালে কেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে আপনাদের রাজত্ব হারাইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশের অধিপতিমাত্র হইয়া উঠেন। গৌড়ের পূর্ব্ব সীমায়, মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তাঁহাদের যে একটি রাজধানী ছিল, তাঁহাদের রাজত্বের শেষাশেষি কেবল তাহাই বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের কিয়দংশের সহিত তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

আমার এই মতের প্রামাণিকতার প্রতি কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ, আদি গৌড় যে বাঙ্গলা দেশে ছিল না, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ খুঁজিতে গেলে বাঙ্গলা দেশে এক জন পাওয়া যায় না, কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। তাহাতে ঐ প্রদেশকেই আদি গৌড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। আদিম গৌড় নগর কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ব্যাকরণ-কর্ত্তা পাণিনি মুনির সময়ে বিদ্যমান ছিল, দেখা যায়। পাণিনির একটি সূত্র এই;—"পুরে প্রাচাম্"। ৬।২।৯৯। অর্থাৎ, পূর্ব্ব দেশ বুঝাইলে সমাসে পুর শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্তোদাত্ত স্বর হয়। যথা, দেবদত্তপুরম্। নান্দী-পুরম্। পূর্ব্বদেশ না বুঝাইলে কি হইবে?—শিবপুরম্। ইহার পরের সূত্র এই,—"অরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বে চ। ৬।২।১০০। অর্থাৎ, পূর্ব্ব সূত্রের নিয়ম 'অরিষ্ট-পূর্ব্ব' 'গৌড়পুর' 'অরিষ্টাশ্রিতপুর' 'গৌড়ভৃত্যপুর' ইত্যাদি স্থলেও খাটিবে। এখন বিবেচনা কর, পাণিনির সময়ে গৌড় যদি পূর্ব্ব দেশের, অর্থাৎ মগধ বা

বাঙ্গলা দেশের নগরবিশেষ হইত, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় সূত্রে গৌড়ের উল্লেখ অনাবশ্যক হইত। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাণিনির সময়ে 'গৌড়' 'প্রাচ্যপুর' ছিল না। প্রমাণান্তরে জানা যায় যে, শ্রাবস্ত নামে সূর্য্যবংশীয় রাজা গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন। অতএব, আদি গৌড় যে উত্তর-কোশলের অন্তর্গত ছিল, তাহার আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

গৌড়দেশীয় সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্ব দিকে ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ বিস্তার করায়, পঞ্চগৌড়ের উৎপত্তি হয়; এবং যে গৌড় রাজধানী পালবংশের পর সেনবংশের হস্তগত হয়, এবং অবশেষে ব্যথ্তিয়র খিলজী যাহা লুণ্ঠন করেন, এবং যাহার ভগ্নাবশেষ আজিও মালদহ জেলায় দৃষ্টিগোচর হয়,—উহা পাঁচ গৌড়ের শেষ বা 'পঞ্চম গৌড়' মাত্র ছিল।

এক্ষণে আমরা নবাধিগত বাঙ্গলা মহাভারতের মধ্যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইলাম যে, সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহের সময়েও বাঙ্গলাদেশস্থ 'গৌড়' 'পঞ্চম গৌড়' বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বাঙ্গলার ইতিহাসে আলাউদ্দীন হুসেন সাহার গৌরব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি সৈয়দবংশীয় হইলেও, একজন দেশীয় মুসলমান ছিলেন। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলাই তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। তিনি কোনও সৈয়-দের ঔরসে কোনও বাঙ্গালী মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না, তিনি বাল্যে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখালি করিতেন বলিয়া আজিও মালদহ জেলায় প্রবাদ আছে। আজিও তিনি 'রাখাল বাদসা' নামে বিখ্যাত। রাখা-লির পর তিনি সুবুদ্ধিবর নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অধীনে কোনও এক সামান্য চাকুরি স্বীকার করেন। এই ব্রাহ্মণ তৎকালীন মুসলমান রাজার রাজস্ব বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; এবং এরূপ লিখিত আছে যে, হুসেন কোনও দোষে প্রভুর হস্তে বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এক কাজীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজসরকারে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং তৎ-কালীন অরাজকতার মধ্যে আপন শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, অব-শেষে গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি খাঁটি পাশ্চাত্য মুসল-মান হইলে, কদাচ ব্রাহ্মণের রাখাল হইতেন না। তিনি বাঙ্গালী মুসলমান হইয়া বাঙ্গলার রাজসিংহাসন অধিকার করিলে; তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। আমাদের এই পুরাতন মহাভারত তাহারই কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদান করিতেছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

উত্তরায়ণ মেলা।

১লা মাঘ সূর্য্যদেব উত্তরায়ণ পথে গতি-পরিবর্ত্তন করেন, সেই দিনের স্মরণার্থ ত্রিহট্টে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিহট্ট একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, আমাদের গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটি থানা এবং একটা ছোট ডাকঘর আছে; পল্লীগ্রামের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টারদের আর একটা ছোট রকমের চাকরী করিবার অধিকার আছে, তাঁহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরিও করিয়া থাকেন; ডাকঘর এবং পাঠশালা একই স্থলে সংস্থাপিত, সুতরাং গ্রাম্য ডাকমুন্সীর পক্ষে এই দুই কাজ এক সঙ্গে নির্ব্বাহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। ডাকমুন্সী এই পল্লীগ্রামের এক জন হাকিম, আর এক জন হাকিম এখানকার থানার দারোগা।

ত্রিহট্ট গ্রামখানি ছোট হইলেও সুন্দর। ইহার পশ্চিম ধারে খড়িয়া নদী প্রবাহিত, মাঘ মাসে নদীতে অধিক জল থাকে না, উপরে উচু পাড়, উভয় ধারে প্রকাণ্ড বালির চর। পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ, তিন দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র, নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ; যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু শস্যশীর্ষ ধরণীর বিচিত্র বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি। ধনীর অট্টালিকা একখানিও নাই, অধিকাংশই দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের চৌরী; আটচালা ঘরও দুই চারি খানি আছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটা গোলা-বাড়ী, আঙ্গিনাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক পাশে একখানা প্রকাণ্ড আট-চালা কাছারী, তাহারই দুই পাশে ছোট বড় সারি সারি গোলা বসান, গোলা-কার মৃত্তিকাস্তূপের উপর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর এই সকল গোলা সংস্থাপিত হইয়াছে। চাটাই এবং কাবারি দিয়া এই সকল গোলা দৃঢ়রূপে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত, ভিতরের দিকটা মাটী ও গোবর দিয়া ভাল করিয়া লেপা, উপরে খড়ের চাল, চালের সর্ব্বোপরি একটা উচু ঝুঁট, অনেকেই মাটীর পোড়ান গামলা উল্টাইয়া সেই ঝুঁট ঢাকিয়া রাখি-য়াছে—দেখিলে বোধ হয়, যেন গোলাগুলা টুপি মাথায় দিয়া উদরে শস্যরাশি সঞ্চয় পূর্ব্বক ঠিক মহাজনদের মতই মুরুব্বিয়ানাভাবে অতি গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে, এবং চারি দিকের উচ্ছ্বসিত দারিদ্র্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। গোলার ভিতরে ধান, গম, মসিনা, শর্ষপ প্রভৃতি শস্য বোঝাই করা; পাছে চোরে চুরী করে ভাবিয়া মহাজনদের গোমস্তারা তাহার অতিসংকীর্ণ কাঠের

দ্বারে চাবি লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছে; দরকার পড়িলে চাবি খুলিয়া শস্য বাহির করে, কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করা কঠিন, তাহারা চাল ছেঁদা করিয়া গোলার শস্য নষ্ট করে, এবং এক পাল বেজী নিঃশঙ্কচিত্তে গোলার নীচে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে আপনাদের বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া লয়।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীর চারি দিক মাটীর দেওয়ালে পরিবৃত, কিন্তু গোবরের চাপড়ীতে এই সকল দেওয়াল একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের চালে শিমগাছ লতাইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের সাদা ও বেগুণে রঙ্গের ফুল সবুজ-পাতার মধ্যে হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ; সেই রাস্তার এক পাশে বাঁশ-ঝাড়, জঙ্গলপরিবৃত গর্ত্ত, উনানের ছাই এবং বাঁশের পাতাতে গর্ত্ত পরিপূর্ণপ্রায়; সরু পথের অপর দিকে জামালকোটার গাছে বেরা বেড়, বেড়ের ধারে ধারে দুই পাঁচটা দীর্ঘ সজনে গাছ, পাতা প্রায় দেখা যায় না, সমস্ত শাখা সাদা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, এবং ফুলভারে ডালগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছে; এই ফুল পল্লীবাসীর অতি মনোরম তরকারী; ইলিশ মাছের সহযোগে ইহার চচ্চড়ি এমন সুস্বাদ যে, অরুচির পক্ষে তাহা পরম রুচিকর, কিন্তু কোন ডাক্তারই ভরসা করিয়া কোন অরুচিগ্রস্ত রোগীকে এই পথ্যের ব্যবস্থা দেন না। মটরের ডালের বড়ি দিয়া সজিনা ফুলের যে অম্বল হয়, তাহার আস্বাদন পল্লীবাসিগণ সারা বছর ভুলিতে পারে না; সজিনা ফুলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধু থাকে, এই মধু অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া অম্লমধুর আস্বাদন উৎপাদন করে; বিশেষতঃ, এই সময় গাছে গাছে তেঁতুল পাকিতে আরম্ভ হয়, এই পরিপুষ্ট পক্কপ্রায় তেঁতুলের অম্লরস তেমন দুঃসহ তীব্র নহে, তাহার মধ্যেও একটু মিষ্টতা আছে। কিন্তু আজ কয় বৎসর এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়া এই অম্বলের রাজ্যে অরাজক বাধাইয়া দিয়াছে; তেঁতুল পাড়াইয়া কেহ যে মনের মত করিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাইবে, সে যো নাই; এমন কি, টোপাকুলগুলি গাছে পাকিয়া পাকিয়া অভিমানে ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুচিগ্রস্তা গুর্ব্বিণীদের জিহ্বায় জল রক্ষা করা দুরূহ হইতেছে, কিন্তু হায়, নিরুপায়; সরকার বাহাদুর ডাক ঘরে এক পয়সায় আড়াই রতি কুইনাইন পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, মন্দ লোকে বলে, গয়ারাম ডাকমুন্সী কুইনাইন বিক্রয়ের কমিশনে বাড়ীতে দালান দিয়া ফেলিল, 'কাহারও পৌষ মাস কাহারও সর্ব্বনাশ'—লোকের

জ্বর কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। সেকালেও কাঁচা তেঁতুল ছিল, গাছ-ভরা কুল ছিল, ইলিশ মাছ এবং কলায়ের ডাল ছিল, কিন্তু কুইনাইন ছিল না, কেহ ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না; সেকালে কদাচিৎ কাহারও জ্বর হইলে 'ধাউত' গরম হইয়াছে বলিয়া রোগী বেশী করিয়া শরিষার তেল মাখিয়া নদীতে গোটাকত ডুব দিয়া আসিত, তাহার পর বাসি মাছের ঝোল এবং গোঁড়া লেবু দিয়া এক পেট পান্ত ভাত খাইয়া জ্বর তাড়াইত; কেহ বা মিছরীর সরবৎ এবং ডাব খাইয়া 'শৈত্যক' করিত, যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখিত ত কবিরাজ ডাকাইত, কবিরাজ মহাশয় নগদ আট গণ্ডা পয়সা দর্শনী লইয়া চাদরের খুঁট হইতে 'লৌহাস্তক' চূর্ণ বাহির করিয়া তাহাই সেবনের ব্যবস্থা দিতেন, এবং যতদিন রোগী আরাম না হইত, ততদিন তিনি দুই-বেলা আসিয়া নাড়ী টিপিয়া যাইতেন; আরাম সারিলে আর কিছু দিলেই চলিত। কিন্তু একালে সকলই আশ্চর্য্য; পাড়াগাঁয়ের দোকানে দোকানে সাবু ও বার্লি বিক্রয় হইতেছে; সকালে উঠিয়াই যে ব্যক্তি দু' রতি কুইনাইন না খাইল, তাহার সে দিনের মত জ্বরভীতি লাগিয়া থাকে। প্লীহার আবির্ভাবে উদরটি ঢক্কাকার, তাহার উপর খ্রিষ্টারের পদাঙ্কলেখা, শরীর ক্ষীণ, রক্তশূন্য, হাত পায়ের নলা সরু, এবং মস্তক কেশবিরল; গ্রামের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এই রকম।

কিন্তু গ্রামের এ রকম অবস্থা সত্ত্বেও উত্তরায়ণের মেলা বন্ধ থাকিবার যো নাই। এ বহুদিনের মেলা, অনেক দেশ বিদেশ হইতে দোকানী পসারী আসিয়া এ মেলায় খরিদ বিক্রয় করে। পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোক সম্বৎসর হইতে আশা করিয়া থাকে, 'উৎকুণির' মেলায় জুতা কিনিবে। এখানে মেলার সময় যে হাঁড়ি বিক্রয় করিতে আসে, তাহা খুব 'বয়' বলিয়া অনেক দূরবর্ত্তী গ্রামের পল্লী বৃদ্ধাগণও মেলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে; 'বার্ণিয়ার' হাঁড়ির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস! এ মেলা কি কখন বন্ধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, এ মেলা বন্ধ করিলে কৃষ্ণরায়ের অপমান করা হয়। কৃষ্ণরায় ত্রিহুটের গ্রাম্যদেবতা; এমন জাগ্রত দেবতা সচরাচর দেখা যায় না। মেলার সময় পূজা করিয়া তাঁহার পূজা হয়, কাহারও কাহারও মতে এই মেলা কৃষ্ণরায়ের জন্মোৎসব। সকলের বিশ্বাস, যতদিন কৃষ্ণরায় আছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এখানে মেলা বসিবে।

কৃষ্ণরায় শুধু যে একটি জাগ্রত দেবতা, তাহাই নহে; এ অঞ্চলের মধ্যে

তিনি প্রধান দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অঞ্চলে আট দশ ক্রোশের মধ্যে কাহারও কিছু কামনা থাকিলে কৃষ্ণরায়কে মানিলেই অবিলম্বে সে কামনা সফল হয়। কাহারও গরুর প্রথম বিয়েনে ভাল দুধ হইল না, গৃহকর্ত্তা মানিল, "দোহাই কৃষ্ণরায়, কিরে বিয়েনে যেন আমার গরুর বেশী দুধ হয়, আমি তোমাকে সেই দুধ দিয়ে পুজো দেব।" কাহারও বাড়ীতে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ হইয়াছে, কিন্তু ফলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, যে দুই পাঁচটা 'মুচি' পড়ে, তাহা পচিয়া যায়; গৃহস্থ মনে মনে মানিল, "এবার কাঁঠাল হ'লে সকলের বড় কাঁঠালটি কৃষ্ণরায়ের জন্য পাঠাব। হে ঠাকুর এবার আমাকে গাছভরা কাঁঠাল দেও।" এইরূপে আম কাঁঠাল ডাব হইতে আরম্ভ করিয়া আতা পেয়ারা ডালিম—এমন কি লাউ কুমড়ো পর্য্যন্ত কোন ফলই কৃষ্ণরায়ের মানত না হইয়া যায় না। যাহার যে জিনিস মানত থাকে, সাময়িক হইলে সে সেই সকল জিনিস লইয়া ১লা মাঘ কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হয়। যদিও মেলার দোকানপত্র কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আমদানী হয়, কিন্তু ১লা মাঘই প্রকৃতপক্ষে মেলা বসে। এই মেলা দশ বারো দিন পর্য্যন্ত থাকে; তাহার পর ভাঙ্গা মেলা, ভাঙ্গা মেলা দুই এক দিনের বেশী থাকে না, কিন্তু এই সময়ই লোকের ভিড় বেশী হয়; কারণ সাধারণের বিশ্বাস, দোকান পসারী দোকান পাট তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভাঙ্গা মেলায় কিছু সস্তা দরে জিনিস ছাড়িয়া দিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, উত্তরায়ণ মেলার সময় আমাদের পল্লী অঞ্চলে ভারি একটা আনন্দকল্লোল বাধিয়া যায়; অনেক স্কুল পাঠশালের ছেলে পড়া কামাই করিয়া দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে ছোটে, এবং গ্রাম্য যুবকেরা সারা বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জুতা কিনিবার জন্য ধোপদস্ত কাপড়, ইস্ত্রী-করা কামিজ, কোর্ট এবং তাহার উপর দোলাই কিম্বা র‍্যাপারে সজ্জিত হইয়া; কেহ ছাতি কেহ ছড়ি লইয়া, দলে দলে পারঘাটার খেয়া নৌকায় পার হইয়া যাইতেছে; বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত 'হাঁড়ি' কিনিতে যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না; এই সকল দেখিয়া আমরা কয় বন্ধুতে একবার ত্রিহট্টে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইতেছিলাম; অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করাই স্থির হইল; গৃহত্যাগের একটু সুবিধাও হইয়াছিল, বাড়ীর কর্ত্তাটি বাড়ীতে ছিলেন না।

তাই ৩০এ পৌষ সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া "জিরেন কাটের"

সুমিষ্ট খেজুর-রস পান করিতে করিতে স্থির করা গেল, আগামী কল্য রাত্রি থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। পৌষ পার্ব্বণের হর্ষকোলাহল তখন প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এবং খর্জ্জুররসের সঙ্গে পৌষের প্রবল শীত আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপুনি উপস্থিত করিয়াছিল। আমরা স্থূল শীতবস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া দেশভ্রমণের এক মোহকর স্বপ্নে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শুধু বোধ হইতেছিল, আমরা কয়টি বন্ধু যেন এই বিশ্বসংসারের রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র অভিনয়ের দর্শক, আর কিছু নাই; ঠাকুরমার গল্পের নায়ক সেকালের রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটোলের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র, এই চারি বন্ধুতে যেমন একত্র মিলিয়া কোনও এক স্বপ্নদৃষ্ট আকাশসম্ভব রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, প্রতি মুহূর্ত্তে অসম্ভব বিপদে পড়িত, এবং তাহা হইতে অসম্ভবতর উপায়ে উদ্ধার পাইত, আমাদেরও মনে হইতে লাগিল, আমরাও যেন রাত্রিপ্রভাতে সেইরূপ কোনও অনুদ্দিষ্ট কল্পনাসুন্দরীর আবিষ্কারের আশায় গৃহ ছাড়িয়া এক দূরবর্ত্তী প্রবাসে প্রস্থান করিব;—সেখানে সকলই অজানিত, বিচিত্র, রহস্যপূর্ণ; অথচ আমরা যেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, তাহা আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশের বেশী নয়!

বাল্যকালে ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত কখন গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করি নাই, এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কখন পরিচয় হয় নাই। চারি দিকের বন্ধন যেখানে যত নিবিড়, স্বাধীনতার আলোক এবং হিল্লোল সেখানে তত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং রাত্রে শুইয়া শুইয়া শুধু মনে হইতে লাগিল, উষাকালে আমাদের জীবনেও একটি অভিনব উষালোক ফুটিয়া উঠিবে; তাই নিদ্রাবস্থাতেও গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, নূতন নূতন শস্যক্ষেত্র, অগণ্য অপরিচিত লোকের মুখ,—সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মেলার আশ্চর্য্য দৃশ্যের অপরূপ কল্পনা, বুকের মধ্যে পুনঃপুনঃ একটা উৎসাহকম্পন জাগাইয়া তুলিতেছিল। অর্দ্ধ ঘুমে অর্দ্ধ জাগরণে শীতের প্রকাণ্ড রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে রাত্রিশেষে যখন বন্ধুত্রয় জানালার কাছে আসিয়া উৎসাহভরে আমার নাম ধরিয়া ডাক দিল, তখন আমি লাফাইয়া উঠিলাম। বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরমা বলিলেন, "শেষরাত্রে কে ডাক দিল কি না, অমনি চলেছিস্ কোথা?"—শীতে এবং উৎসাহে তখন আমার বুক কাঁপিতেছিল, সংক্ষেপে বলিলাম, "সঙ্গীরা এসেছে, আমরা তেহট্টে যাব।" "এত রাত্রে তেহট্টে যাবি কি, এখনও এক প্রহর রাত

আছে, পাখ পাকালি ডাকেনি, গাঁড়ার বাড়ী ঢেকি পড়ে না, এখন কি এক ডাক শুনে ঘরের বার হতে হয়?"—আমি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "এক ডাকে দুয়োর খুল্লে কি হয়?"—ঠাকুরমা ভারি 'ডিপ্লোমাটিষ্ট', আমাকে ভুলাইবার জন্য ভারি এক আসমানি গল্প জুড়িয়াছিলেন, তাহার ভাবখানা এই যে, শেষরাত্রে 'নিশিরা' দুই একটা ডাক দিয়া ছেলেদের ভুলাইয়া লইয়া যায়, ডাক শুনিয়া অনেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাদের অনুসরণ করে, শেষে নদীর ধারে লইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুই দই খাবি না দুধ খাবি?" যদি নিশিগ্রস্ত বালক বলে,—"আমি দই খাব"; তাহা হইলে তাহাকে পাঁকের মধ্যে ঠাসিয়া ধরে; দুধ খাইতে চাহিলে জলে ডুবাইয়া মারে। বিলম্বে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, বলিলাম "আমি দুধ দই কিছুই খাইতে চাই না।" ঠাকুরমা একটা আসন্ন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় ত্রস্তভাবে 'ঘাট ঘাট' বলিয়া উঠিলেন, তাহার পর কোন্ জমিদারের পুত্রকে কবে 'নিশিতে' তাহার বাপের কাছ হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা করিতে লাগিলেন; উপসংহারে বলিলেন, "রাত্রে তিন ডাক শুনিবার আগে দরজা খুলিয়া বাহিরে যাওয়া ভাল নয়, নিশিরা তিন বারের বেশী ডাকিতে পাবে না।" ঠাকুরমাদের ভৌতিক শাস্ত্রে ইহাই প্রেতলোকের বিধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঠাকুরমার এই গল্প এখনকার দিনে হইলে "a case of Somnambulism, pure and simple." বলিয়া অবজ্ঞাভরে খুব একদম হাসিয়া লইতাম, কিন্তু তখন ততটা বিজ্ঞতা জন্মে নাই। বিশেষতঃ, ঠাকুরমার ভূত, প্রেত, শাঁখিনী ও ডাকিনীদের গল্পগুলি তখন মনের মধ্যে সজীবভাবে অঙ্কিত ছিল, তখন বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের প্রচুরশাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ডালের ভিতর প্রসারিতমস্তক, বিকটদশন এবং সুদীর্ঘনাসূল 'লেজ-ঝোলার' বিভীষিকাপূর্ণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িতাম, এবং সেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারস্তূপের মধ্যে শত শত জোনাকি পোকা মিটমিট করিয়া জ্বলিয়া শান্ত-রশ্মি বিস্তার করিলে মনে হইত, তাহা উক্ত বিকটাকার প্রাণীরই শত-স্তিমিত-চক্ষু।

অতএব দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহির হই কি না ভাবিতেছি, এমন সময় ডাকের উপর ডাক পড়িয়া সন্দেহ মিটাইয়া দিল। চারি বন্ধুতে মিলিয়া ত্রস্তপদে যখন আমরা গ্রাম্যপথে বাহির হইলাম, তখন পূর্ব্ব দিক ঈষৎ লোহিতাভ হইয়াছে মাত্র। সেই লোহিতাভার নীচে বহু দূরে অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী

কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া দূরবর্ত্তী কদলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, পূর্ব্ব গগনের অনেক উচ্চে লক্ষ কোটী ক্রোশ দূর হইতে একটি অতি উজ্জ্বল বৃহৎ নক্ষত্র ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষিন্ন পাণ্ডুর চন্দ্রকলা পশ্চিম গগনপ্রান্ত হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। রাত্রি অবসানপ্রায়, সুতরাং নক্ষত্রবিরল আকাশে প্রচুর ব্যবধানে যদিও দুই চারিটি তারকা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাহারা ম্লান, দীপ্তিহীন; যেন তাহাদের দীর্ঘজাগরণক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, এবং আর একটু পরেই তাহারা উষার আলোকলেখালাঞ্ছিত নীল বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে।

পথের দুই দিকে খর্জ্জুরবন। ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য খেজুর গাছ সোজা দাঁড়াইয়া আছে, ক্বচিৎ দুই একটা হেলিয়া পড়িয়াছে, গলদেশে ঠিলি বাঁধা, যাহাতে ঠিলিগুলা নড়িয়া চড়িয়া না যায়, এ জন্য গাছিরা খেজুরের 'ডেগড়ো' টানিয়া তাহা দিয়া ঠিলিগুলি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গাছগুলির আগা গোড়া রসলিপ্ত, 'গাছি'দিগের বঙ্কিম তীক্ষ্ণাস্ত্রের ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ, ক্ষতস্থান শুকাইয়া বহুদিনের রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে; প্রত্যেক গাছে এই রকম বিশ পঁচিশটা ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে, বিশ পঁচিশ বৎসরের অতীত ইতিহাস তাহাদের সহিত সন্নিবদ্ধ; সে সকল স্থান শুকাইয়া কালো কাঠে পরিণত হইয়াছে, এবং শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিতে কখন যে সেখান হইতে অবিরলধারায় স্নিগ্ধ মধুর রস উৎসারিত হইত, প্রভাতকালে শালিক, বুলবুল, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর দল যে তাহাদের রসসিক্ত নলির মুখে বসিয়া আকণ্ঠ রসপান পূর্ব্বক তৃপ্তমনে গান করিতে করিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া যাইত, এবং রাখালেরা খোলা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশের লম্বা লম্বা চোঙ্গা টাঙ্গাইয়া সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত ফেনময় রস সংগ্রহ করিত, সে কথা এই সকল শুষ্ক চিহ্ন দেখিয়া একবারও বিশ্বাস করা যায় না। ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা পলিতকেশা জরাজীর্ণা বিবর্ণা বৃদ্ধাকে দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না যে, এক সময় তাহারই রূপ মনিবের আরাধনার বস্তু ছিল, তাহার ঐ শোণের নুড়ির মত কয়েক গাছি কেশ এক সময় মদনের সুদীর্ঘ নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলের মহিমাপূর্ণ শরাসন ছিল, এবং ঐ কোটরগত, শোভাহীন, নিষ্প্রভ চক্ষু একদা অপ্সরাদের কুহকমদিরায় পরিপূর্ণ থাকিত।

বৃক্ষরাজিবেষ্টিত গ্রাম্য পথ ছাড়িয়া আমরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করি-

লাম। তখন বাজারের সমস্ত দোকান ঝাঁপে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া সুষুপ্তি-মগ্ন ছিল। শুধু অদূরবর্ত্তী মস্‌জিদ-সমাগত মুসলমান উপাসকবর্গের সমবেত কণ্ঠস্বর হইতে আজানের যে গম্ভীর গাথা উত্থিত হইতেছিল, তাহাই চারি দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও সূর্য্য উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। নদীতীরে বহুকালের প্রাচীন এক শিবমন্দির, মন্দিরে প্রাত্যহিক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান, এক সময়ে তাহা জনৈক বিলাসী জমিদারের বিলাসকানন ছিল, এখন তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেখানে নানারকম ফুল ফুটিয়া থাকে। দেখিলাম, সেই প্রভাতে মুণ্ডিতমস্তক দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত নামাবলীতে আচ্ছাদিতদেহ বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় বামহস্তে একটি ফুলের সাজি এবং দক্ষিণহস্তে একখানি অনতিদীর্ঘ 'নগি' লইয়া পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। একটা বকফুলের গাছে একটু উঁচুতে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছিল, বাচস্পতি গম্ভীর স্বরে সুর করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে সাজিটি জাফ্রির বেড়ার উপর রাখিয়া, বকফুলের একটা থোকায় 'নগা'খানা বাধাইয়া দিলেন, আমাদের একটি বন্ধু কৌতুকভরে বলিল, "কি দাদাঠাকুর, গাছে উঠে না পাড়লে পড়া-ফুলে কি পূজা হয়?" দাদাঠাকুর এত সকালে আমাদিগকে এ রকম স্থানে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তাহার পর স্মিতমুখে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোদের এখন রক্তের জোর আছে, গাছে উঠতে পারিস, আমি বুড়ো মানুষ, সে ক্ষমতা নেই—তাই বলে কি মা সিদ্ধেশ্বরী আমার ফুলে পূজা নেবেন না; যা হোক্, তোরা এত সকালে যাচ্ছিস্ কোথা?"—আমরা উত্তর দিলাম, "ত্রিহট্টে মেলা দেখতে।"

আজ ১লা মাঘ; অনেকেই মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীর জন্য ভাবনা নাই। নফর মাঝি পয়সার লোভে এই দারুণ শীতের মধ্যে শেষরাত্রি হইতে সর্ব্বশরীরে কাঁথা জড়াইয়া নৌকা ঠেলিবার 'নগা' গাছটা হাতে লইয়া বসিয়া আছে; নিকটে একটা মোটা পোয়ালের মশালে আগুণ রাখা হইয়াছে, এবং তাহার সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তামাক খাওয়া হইতেছে। প্রত্যেক লোকের কাছে সে এক পয়সা হিসাবে পারাণী আদায় করিতেছে; আমাদের পয়সা দিতে হইল না; কারণ, গ্রামের লোককে পার হইবার সময় পারাণী দিতে হয় না, মাঝি প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে পূজার সময় বকশিস্ লয়; তাহা ভিন্ন বিবাহ কিংবা অন্য কোনও উৎসব উপলক্ষে পয়সা কড়ি, চাউল ডাল প্রভৃতি সিধা ও

জলপান পায়, এবং পূজার সময় ধুতি চাদর ও নারিকেলও অনেক বাড়ীতে বরাদ্দ আছে।

নদী পার হইয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলাম। শিবমন্দিরের উচ্চ চূড়া প্রভাতসূর্য্যের কনককান্তিতে উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; কত মাঠ, কত শিশির-সিক্ত আইরি বন, দীর্ঘশীর্ষ গোধূমের ক্ষেত্র, আম কাঁঠালের বাগান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া, বেলা আটটার পর ত্রিহট্টে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ত্রিহট্টের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, বালক বালিকা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সকলেই মূল্যবান রঙ্গ বেরঙ্গের বস্ত্রে সুসজ্জিত, অনেকে জানুর উপর কাপড় তুলিয়া কোমরে চাদর বাধিয়া কাঁধে লাঠি লইয়া চলিয়াছে; পথের ধূলিতে তাহাদিগের জানু পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রমণীগণ চিত্র বিচিত্র কাপড় পরিয়া কোন বর্ষীয়সী রমণীর অনুগমন করিতেছে;—তাহার পায়ে রাঁকমল, কপালে উল্‌কী, সিঁথিতে সিন্দুরের স্থূল রেখা, কেশরাশি মোটা দড়ির গোছা দিয়া মাথার উপরে উঁচু করিয়া বাঁধা; কাহারও নাকে প্রকাণ্ড এক নথ, কানে পাশা, কাহারও নাকে নাকছাবি, হাতে রূপার অতিবিস্তীর্ণ খাড়ু। চাষার ছেলেরা অসমানভাবে কখন দ্রুত, কখন অতি মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কেহ হুঁকা টানিতে টানিতে যাইতেছে, কেহ হুঁকার অভাবে নিকটবর্ত্তী কলা বাগান হইতে একটা কলার 'ডেগড়ো' কাটিয়া হুঁকার অভাব মোচন করিতেছে, মাথায় চেরা সিঁথি, দীর্ঘ চুলগুলি কাঁকুই দিয়া আঁচড়াইয়া ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়াছে, ভক্ত পদসঞ্চালনে 'বাবরিকাটা' কেশগুচ্ছ নাচিয়া উঠিতেছে।

মাঠের মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি অনেক কালের, তাহার চারি দিকে প্রশস্ত প্রাচীর, অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দ্বার প্রান্তে একটি অতি বৃহৎ তমালগাছ, যেন দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন বৃন্দাবনের মধুর প্রেমকাহিনী এখনও ভুলিতে না পারিয়া তমাল গাছটিকেও এখানে পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জানি না, এখানে এই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কোন প্রেমবিহ্বলা, অভিমানিনী গোপাঙ্গনা তাহার সহচরীবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল কি না—

"সখি, প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসা'ও না যমুনা-সলিলে,

তুলসীদাস বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিবে,
লিখিয়ে তাহায় হরিনাম,
বাঁধিয়ে রেখো, সখি, তমালের ডালে।"

তুলসীগাছও যথেষ্ট আছে, এবং নদীও দূরে নহে, কিন্তু রাধিকার এ আশা সফল হয় নাই; সে কথা আমরা পরে বলিব।

কৃষ্ণরায়ের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। প্রস্তরনির্ম্মিত দেহ অভিমসৃণ, এবং সুকৌশলে চিত্রিত। মস্তকে শিখিপুচ্ছ মোহনচূড়া এবং হাতের বাঁশি সোনা দিয়া বাঁধান; পরিধানে পীতাম্বর, করতল এবং পদারবিন্দ হিঙ্গুলরাগরঞ্জিত, প্রশান্ত চক্ষে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাঁকাভাবটুকু দূর হয় নাই; মুখের ভাব অতি সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ, দেখিলে এই প্রতিমার চিত্রকরকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না;—যে ব্যক্তি এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যানুভূতিকে একত্র সঞ্চিত করিয়া এই প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে একটা মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বৃদ্ধ পুরোহিত, তাহার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র—কৃষ্ণরায়ের প্রণামী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। প্রায় পনের দিন পর্য্যন্ত এই মেলা থাকিবে; এ কয়েক দিন পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যে যখন পূজা দিতে আসিতেছে, পুরোহিত তখনই পূজায় বসিতেছেন। পূজা শেষ হইলে উপাসকমণ্ডলী সাষ্টাঙ্গে দেবচরণে প্রণাম করিতেছে; পুরোহিত তাহাদিগের গলায় কলার 'ছোতড়ায়' গাঁথা স্থূলবিরল এক এক গাছি মালা পরাইয়া দিতেছেন, তাহারা দেবতার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে। উপহারদ্রব্যের সীমা নাই, শত শত লোক 'খাবরে' 'ভাঁড়' ঘটিতে করিয়া দুধ লইয়া গিয়াছে, সেই দুধে বড় বড় জালা ভরিয়া উঠিয়াছে। এক এক দিন কৃষ্ণরায় দুধ এবং গঙ্গাজলে স্নান করেন। নারিকেল, ইচড়, পেঁপে, বেল, পেয়ারা, ডালিম, এমন কি শিম, বেগুণ, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরকারীও পর্য্যাপ্তপরিমাণে জমা হইয়াছে—যাহার গাছের যে কলাটি ভাল ও বড়, যে যে জিনিসটি কৃষ্ণরায়ের নামে রাখিয়াছে, এখন সেইটিই তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে; এত সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট ফল কখনও বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায় না। বিভিন্নজাতীয় এত রকম ফলের আসদানী দেখিয়া এই উৎসবকে কাহারও কাহারও কৃষিপ্রদর্শনী বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। এই মেলার কয় দিন পুরোহিতেরা যে দক্ষিণা পায়, এবং ঠাকুরকে যে সকল জিনিস উপহার দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের সংবৎসরের খরচের পক্ষে যথেষ্ট।

কৃষ্ণরায় কত দিনের প্রতিমা, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সম্পত্তি; যাহাতে সংবৎসর বিগ্রহের সেবা চলিতে পারে, সে জন্য কৃষ্ণনগরের রাজসরকার হইতে দেবত্র সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণরায় সমস্ত বৎসর এখানেই বাস করিতেন, কেবল বৎসর বৎসর বারো দোলের সময় অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় তাঁহাকেও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে লইয়া যাওয়া হইত; সেখানে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া পুরোহিতরূপী বাহকদিগের স্কন্ধে তিনি আবার স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মহারাজের আমলে এই নিয়ম লোপ পাইয়াছে; এখন কৃষ্ণরায়ের উপর পুরোহিতবর্গের কোনও অধিকার নাই। কৃষ্ণরায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণনগরে থাকিতে বাধ্য হন; মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ হইলে তিনি উত্তরায়ণ মেলার সময় কৃষ্ণরায়কে কয়েক দিনের জন্য ত্রিহট্টে পাঠাইয়া থাকেন; কিন্তু শুনিয়াছি, সকল বৎসর পুরোহিতদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

কৃষ্ণরায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই, এবং সকলগুলিই সমান বিশ্বাসযোগ্য। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে এই অঞ্চলের এক জন লোক নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার ফলে সে নারায়ণের প্রস্তরমূর্ত্তি মাটীর নীচে প্রোথিত আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পায়; অনন্তর এই মূর্ত্তি তুলিয়া তাহা উপযুক্ত চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে কৃষ্ণরায় নিজের মহিমায় চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণের হৃদয় ও তাহাদিগের প্রদত্ত উপহার আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ কৃষ্ণনগররাজের পারিবারিক সম্পত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। হয় নদীয়া জেলার এই অংশ কৃষ্ণনগর রাজ-ষ্টেটের অংশ বলিয়া এরূপ হইয়াছে, না হয় কৃষ্ণরায় প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান মহারাজার কোনও ভক্তিমান্ পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরায় এখন ঠাকুরাণীহীন; সাধারণ কথায় যাহাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে, তাহাই; কিন্তু লক্ষ্মীহীন হইয়াও তিনি স্বমহিমায় নিত্যভাবে বিরাজিত; তাঁহার ঠাকুরাণীটি অনেক দিন হইল গত হইয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে একবার কৃষ্ণরায়ের মন্দিরদ্বার ভাঙ্গিয়া চোরেরা ঠাকুরাণীর অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি চুরী করিয়া লইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল তস্কর হিন্দু নহে, মুসল-

মান, সুতরাং প্রভুর এলাকার বাহিরে, তিনি তাহাদিগকে কোনও শাস্তি দিতে পারিলেন না। কিন্তু পুরুষের রাগ কোথায় যাইবে? 'চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া' শুধু হিন্দুর পক্ষে খাটে না, হিন্দুর দেবতার নিকটও এ কথাটা সঙ্গত; মুসলমানেরা ঠাকুরাণীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অপবিত্রজ্ঞানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, ঠাকুরাণী মনোদুঃখে তদবধি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী দিঘীতে আশ্রয় লইয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই; পাত্রীর অভাবে অথবা সেবাইতের অমনোযোগে, ঠিক বলা যায় না।

মন্দিরের সন্নিকটেই মেলা বসিয়াছে। দুই ধারে সারি সারি অনেক দোকান; মধ্যে সরু রাস্তা; ভিন্ন ভিন্ন দোকানের জিনিস বিভিন্ন দিকে। দোকানগুলি অস্থায়িভাবে নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাতে এমন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, যাহাতে মাঘের হিমে দোকানদারগণ কোনও কষ্ট না পায়। মনিহারী জিনিসের দোকানই বেশী, তাহাতে নূতন পঞ্জিকা হইতে রামরাজা-মার্কা তাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতির ছবি, নানারকম কাচের জিনিস, খেলেনা, কাঠের ও টিনের হাতবাক্স, ভোরঙ্গ, লোহার কড়াই, হাতা বেড়ি, খাঁচা, এমন কি, রঙ্গ বেরঙ্গের কম্ফর্টার, ছেলেদের উলের টুপি, মোজা, দেশলায়ের বাক্স, কিছুরই অভাব নাই। যাত্রীরা দোকানের সম্মুখে অনেকে এক্কা দাঁড়াইয়া নিজের পছন্দমত জিনিস পত্র করিতেছে, বৃদ্ধারা ছোট ছোট নাতি নাতিনীদিগের জন্য কাঠের ঘোড়া, মানুষ, মাটীর ছোট ছোট পুতুল কিনিতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

মনিহারী দোকানের পর নানারকমের দোকান। বাসনের দোকানে রাশি রাশি বাসন বিক্রয় হইতেছে, বড় বড় ঘড়ার উপরে পরাত থালা প্রভৃতি রাখিয়া তাহাতে নানারকম বাসন সাজান হইয়াছে; একটা দোকানে পুরাণো বাসন এবং ভাঙ্গা পোর্টম্যাণ্টো মেরামত হইতেছে, শুধু টিন এবং কাচের কারখানা। দোকানদার কিরূপ কৌশলে কাচ কাটিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য অনেকে আগ্রহের সহিত দোকানের চারি দিকে জমিয়া গিয়াছে।

একটা দোকানে শুধু বাঁশের বাঁশি; ছেলেরা বাঁশী পছন্দ করিতেছে; সেখান হইতে শুধু চোঁ-বোঁ পোঁ শব্দ উঠিতেছে, দোকানদার একটা লম্বা বাঁশি আড় করিয়া ধরিয়া তাহার নাতটা ছিদ্রে দ্রুত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া গ্রীবাভঙ্গীপূর্ব্বক ক্রমাগত বাজাইয়া যাইতেছে; তাহার গলার শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে, দম

আটকাইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু বিরাম নাই। বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হইয়া অনেক চাষকর্ম্মনিরত কৃষকযুবকও বাঁশি কিনিবার উমেদারিতে রাশীকৃত বাঁশি ওলট পালট করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি যুটিতেছে না। এদিকে দোকানদারও ছাড়িবার পাত্র নহে, ক্রেতার কোনটা পছন্দ না হইলেই সে নিজেই বাঁশিটা হাতে লইয়া তাহা বাজাইয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, এমন বাঁশি আর নাই, এত উৎকৃষ্ট আওয়াজ এই একটিতেই সম্ভবে। স্ত্রীলোকদের দল ঘোমটা টানিয়া তফাৎ দিয়া সরিয়া যাইতেছে; বৃন্দাবনে একটা বাঁশের বাঁশিতে অনেক দিন আগে একটা দারুণ অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাই এতগুলি বাঁশি একত্র দেখিলে মনে বড় আতঙ্ক হয়। ঠিক জানি না, এই অগণ্য যাত্রীদিগের মধ্যে বাঁশের বাঁশি শুনিয়া নূতন করিয়া কাহারও মনে উদয় হইয়াছিল কি না:—

"যে দেশে বাঁশির ঘর সে দেশে না যাব,
ঘাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসা'ব।"

ময়রাপটীতে সারি সারি সন্দেশের দোকানগুলাতেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নয়। জুতাপটী একটু তফাতে। সেখানে নানারকমের জুতা বিক্রয় হইতেছে, 'নাগরা' জুতার খদ্দেরই অধিক। দুই তিনখানা 'বটতলার' বহির দোকানে অনেক 'খুঁট-আখুরে' ক্রেতা জড় হইয়াছে; কেহ "এবার পূজায় বাঁচা ভার, বৌ চেয়েছে চন্দ্রহার," কেহ "হায়রে মজার শনিবার" প্রভৃতি চটি বহির রসিকতাপূর্ণ ছত্রগুলি বানান্ করিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বত্র ভাবগ্রহ হইতেছে না, কিন্তু তাহাতেই যে রস পাইতেছে, তাহা তাহাদের সন্তোষের পক্ষে অনেক অতিরিক্ত; তাহা পড়িয়াই মুখবিবরে হাস্য আবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এবং পুস্তকের সম্মুখ পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে ছয় আনা দাম লেখা থাকিলেও তাহা নগদ দুই পয়সা মূল্যে কিনিতে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাভবান্ মনে করিতেছে।

একটু তফাতে একটা যায়গায় ছোট ছোট টোঙ্গ তুলিয়া কয়েক জন বেদে খেলা দেখাইবার জন্য আড্ডা গাড়িয়াছে; তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট বড় ঝুড়িতে নানারকমের সাপ, দুইটি বৃহৎ ছাগল, দুইটি বানর এবং একটা ভালুক, ভালুকটির মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে জ্বর আসিতেছে, আর সে উবু হইয়া পড়িয়া কাঁপিতেছে; ছাগল দুটি কাঁঠালের পাতা খাইতেছে, এবং একটা বানর আর একটা বানরের হস্তে আপনার মস্তকটি সমর্পণ পূর্ব্বক অতি সুস্থিরভাবে ঘাড়

বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, দ্বিতীয় বানরটি তাহার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। চারি দিকের এই জনতা এবং কলরবের প্রতি তাহার কিছুমাত্র খেয়াল নাই। ইহার একটু দূরে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কুটীরের সম্মুখে একটা বৃহৎ নিশান উড়িতেছে; নিশানের নীচে একটা লাল-নীল রঙ্গের পর্দ্দার সম্মুখে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে,—"অতি অদ্ভুত ভেল্‌কি! ভানুমতীর হরেক রকম ভোজবাজি!! এক এক পয়সা!!!" এক জন লোক এই কুটীর-দ্বারে বসিয়া একটা খেলো হারমোনিয়ম্ বাজাইতেছে, আর একটা লোক—গায়ে একটা গল্পীফ্রক, গলায় নানা রঙ্গের বাহারে কম্ফর্টার জড়ান—যাঁড়ের মত মোটা গলায় বিদ্যাসুন্দরের একটা টপ্পা গাহিয়া রসপিপাসু কৌতূহলাক্রান্ত পল্লীযুবকদিগের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। দলে দলে লোক দ্বার-প্রান্তে জমা হইতেছে, এবং সেখানে একটি পয়সা দর্শনী দিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভেল্‌কী দেখিতেছে; কিন্তু ভেল্‌কী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভাবখানা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে বেশী কিছু প্রকাশ পাইতেছে না।

ক্রমে বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইল। যাত্রিদল কিছু ক্ষণের জন্য স্নানাহারের চেষ্টায় চলিল। মেলার কাছে যে দিঘী আছে, তাহাতে বেশী জল নাই। সেই জানুপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া অনেকে স্নান করিতেছে, এবং চিঁড়া-মোয়ের ফলার ভিজাইয়া সেই দিঘীর পাড়ে বসিয়াই তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেছে। অনেকে গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী মধ্যাহ্নের মত আশ্রয় গ্রহণ করিল। দলে দলে লোক ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের হোটেলে বসিয়া তেল মাখিয়া তাম্রাক টানিতে লাগিল। চন্ চন্ করিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্র পড়িতেছে। দূরে অনেকগুলি গরুর গাড়ী; সেই সকল গাড়ীতে যাত্রীরা বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে, গাড়োয়ানেরা অশ্বত্থ গাছের নীচে তিউড়ি কাটিয়া ভাত রাঁধিতেছে; বলদ ও মহিষগুলি ধূলার উপর শরীর ঢালিয়া দিয়া জাওর কাটিতে কাটিতে পথশ্রম দূর করিতেছে। কিন্তু এই গভীর মধ্যাহ্নেও মেলার কাছে জনতার হ্রাস হয় নাই। এখনও জোড়া জোড়া চাষার ছেলে নাগরদোলার উপর বসিয়া মহানন্দে দুলিতেছে, এবং কাঠের ঘোড়াবিশিষ্ট এক রকম দোলায় বসিয়া সাত আটটি ছেলে ঘুরপাক খাওয়া একটা মস্ত আমোদজনক কাজ বলিয়া মনে করিতেছে। তাহারা শক্ত হইয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আছে, আর এক জন লোক সেই ঘোড়াগুলিকে বন্ বন্ করিয়া

ঘুরাইতেছে। ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা কুমোরের দোকানে পাঁচ ছয়টা চাকা হাঁড়ি কিনিয়া সেগুলি লম্বা কাপড়ে সারি করিয়া বাঁধিয়া বেলা থাকিতেই গৃহমুখে চলিয়াছে, এবং চাষার ছেলেরা ও দূরগ্রামস্থ ভদ্রলোকের চাকরেরা চারি পাঁচ পয়সা মূল্যে এক এক আঁটি 'আখ' কিনিয়া কাঁধে তুলিয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ বা এক আধখানা 'আখ' লুব্ধদন্তে ছুলিয়া তাহার রস উপভোগ করিতে করিতে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবল হিন্দু দেবদেবীর নিন্দাবাদপূর্ব্বক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের অভিপ্রায়ে রতনপুরের পাদরী সাহেব, টমাস্ বিশ্বাস, ডানিয়েল রাহা এবং সলোমন দাস প্রভৃতি খিঁচুড়ী-ভাষাপন্ন নামবিশিষ্ট দেশীয় খৃষ্টানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সকাল হইতে অতি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আপাততঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এখন তাঁহারা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু নেড়ানেড়ির দলের গানের আর বিরাম নাই। তাহারা দলে দলে কাঁথা পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে, পাশে প্রকাণ্ড ঝুলি, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলী, গায়ে নানা রঙ্গের কাপড়ের বহুতালিবিশিষ্ট আলখেল্লা, সম্মুখে একখান কাপড় বিছান, গৌরপ্রেমে মগ্ন বাবাজিউদিগের প্রতি কৃপা করিয়া,—যাহার যাহা ইচ্ছা,—এই বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ডের উপর দান করিয়া যাইতেছে। পাঁচ সাত জন স্ত্রীপুরুষ চক্রাকারে বসিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গান গাহিতেছে, পুরুষদের হাতে ময়লা লাল এক রঙ্গাবেষ্টিত 'গাবগুবাগুব'। তাহারা মাথা নাড়িয়া সুদীর্ঘ দাড়ীর নানারকম ভঙ্গী করিয়া একটা ছোট কাটী দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছে, আর নাকে রসকলি কাটা, ভ্রূযুগলের মধ্যে বা অধরের নিম্নে উল্‌কী পরা, রৌপ্যবলয়বেষ্টিতপ্রকোষ্ঠা বৈষ্ণবীর দল খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ আঘাত দিয়া তীক্ষ্ণ বামকণ্ঠে চারি দিক ধ্বনিত করিয়া গাহিতেছে,—

"ব্রজের শ্যাম ব্রজে চল দিনেক দুদিন তরে,
বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে এসো তুমি ফিরে,
ধ'রে রাখবো না হে!—"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রতিশোধ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পূজার পর কার্ত্তিক মাসে গ্রামে গ্রামে উষাসংকীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। ঘনবর্ষার অবসানে কুমুদকহ্লারভূষিতা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি শারদ কৌমুদীতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রকৃতি মাতৃরূপা, তাহাই শরতে মা ব্রহ্মময়ীর উৎসব। তার পর সেই মাতৃভক্তি ধীরে ধীরে স্নেহ প্রেমে পরিণত হইতেছে। বঙ্গসন্তান বিশ্বকারণের শরৎসুন্দরী মাতৃমূর্ত্তি সসম্ভ্রমে দূরে রাখিয়া, ভক্তির আপেক্ষিক ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, আবার তাঁহাকে আবাহন করিতেছে—এস বৎস, এস সখে, এস হে প্রাণবল্লভ! এই যে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কালে পল্লীতে পল্লীতে প্রভাতবায়ু সংকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বাৎসল্য, সখ্য মধুররসে সুধাসিক্ত হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসন্তানের মানসিক ইতিহাসে যথার্থই কি ইহা অর্থহীন?

ইহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, কার্ত্তিকমাস প্রধানতঃ যে বৈষ্ণব-উৎসবময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান মধুকর সে জন্য সম্প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় ব্যস্ত। প্রত্যূষে উঠিয়া খঞ্জনী হস্তে গ্রামে গ্রামে উষাসংকীর্ত্তন তাহার প্রধান কাজ হইয়াছে।

বাগ্দেবীর খালের ধারে হোড়ঙ্গের নিবিড় বনের ভিতর, যেথায় বিশ্বনাথের আড্ডা, সহসা একদিন প্রভাতে সেথায় ভগবানের মধুরকণ্ঠ শুনা গেল। বালসূর্য্যের হেমাভ কিরণরাশি বহির্দ্বারসমীপস্থ প্রকাণ্ড বকুল গাছের ঘনপল্লবে সবে মাত্র আসিয়া পড়িয়াছে, অঙ্গনের কুসুমবর্ষী শেফালিকা তরু এখনও মূলদেশে বিস্তৃত শিশিরসিক্ত ফুলশয্যার উপর অতি সন্তর্পণে কখন একটি ফুল ফেলিতেছে। গৃহপশ্চাতে প্রকাণ্ড তিন্তিড়ীবৃক্ষশাখায় শাখামৃগের দল ভোজনে বসিয়া গিয়াছে—তাহাদের পূর্ণোদর শাবকগুলি শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে। ক্বচিৎ হরিয়াল ঘুঘুর দল লঘুপক্ষ শব্দিত করিয়া পাইকড় গাছ হইতে বট গাছের ঘনপত্রমধ্যে আত্মগোপন করিতেছে। বিশ্বনাথের সেই আরণ্যদুর্গ সহসা জনসমাগমশূন্য বলিয়া মনে হইতেছিল। বাস্তবিকও তথায় সম্প্রতি এক ব্রাহ্মণসন্তান ছাড়া আর কেহ ছিল না।

বিনোদবিহারী বন্দিভাবে এই নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছিলেন। গৃহের

সর্ব্বত্র তাঁহার অবারিত গতি; কিন্তু তাহার বাহিরে এক পদও যাইবার অনুমতি ছিল না। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বিনোদ গায়ত্রী জপিতে বসিয়া গিয়াছেন। বিপদের দিনে তন্ময় হইয়া বিপত্তিহারী শ্রীমধুসূদনের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছিলেন। আগে আর কখন জীবনে এমন একাগ্রচিত্ততা সংগ্রহ করিয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে জানিতেন না। ভগবান গায়িতেছিল,—

সুখের দিনে তোমারে ডাকি
পরাণ মন ভরে না।
দুখের দিনে আপনা ভুলে
করি তোমারে কামনা।
এ কি তুমানন্দ, এ কি অপরূপ,
দুঃখে হরি এ কি ছলনা।
দুখ পেয়ে যদি এই পরিণাম
সুখে কেন আর বাসনা?

উৎকর্ণ হইয়া বিনোদ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখনকার মনের অবস্থায় সেই সুরময়ী আত্ম-কথা দৈববাণীবৎ ধ্বনিত হইতেছিল। এমন মোহ জীবনে তিনি আর কখন অনুভব করেন নাই। আপন ভুলিয়া, স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া, বিনোদবিহারী গায়কের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

এতক্ষণে ভগবান দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। চেনামুখ দেখিয়া বিনোদ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, কিন্তু গায়ককে সহসা চিনিতে পারিলেন না। ভগবান তাহা বুঝিল। গান সমাপ্ত করিয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। হাসিয়া বলিল, "দেবতার এই আশ্রম? বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, হরিনাম করার জায়গা বটে! ঠাকুর! আমায় চিন্‌তে পার কি?"

তখন আর ভ্রম রহিল না। গোবরডাঙ্গার হাটের সেই উদার মিষ্টান্ন দাতাকে মুখোপাধ্যায় একটু একটু করিয়া চিনিয়া ফেলিলেন। নামটি মনে ছিল না, কিন্তু তাতে মদকপুত্রের সম্বোধন কখন যাবে না। মহাকৌতুহলী হইয়া বিনোদ হাঁকিলেন, "ময়রার পো, এ বেশে তুমি এখানে?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান কহিল, "ঠাকুর, আমার কেই বা আছে? একটা মেয়ে বই ত নয়। তাই দোকান তুলে দিয়ে হরিনাম করে বেড়াচ্চি। কিন্তু ঠাকুর, এ জঙ্গলে তুমি কেন? এখনও ত তোমার বনে যাওয়ার বয়স হয় নি।"

এই কথার সুরে ব্যঙ্গ যতটা মিশ্রিত ছিল, কৌতূহল ততটা ছিল না। কিন্তু বিনোদ ব্যঙ্গ বুঝিলেন না। আট দশ দিনের নির্জ্জন বন্দিজীবন ভোগের পর সহসা এক জন পরিচিত লোকের দেখা পাইয়াছেন, মনটা স্বতঃই সহানুভূতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি সংক্ষেপে আপনার বিপদের পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহার অনুমানে বিশ্বনাথই যে তাহার মূল, ইহাও নবাগত পুরাতন বন্ধুকে বিশ্বস্তভাবে জানাইতে ভুলিলেন না। কিন্তু গোড়ার কথা কিছু বড় বলিলেন না, বিশ্বনাথের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ভগবান্ মনে মনে হাসিল। গম্ভীর মুখে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া সুধাইল, টাকা কড়ি বেশী কিছু সঙ্গে ছিল কি না?

বিনোদ মাথা নাড়িলেন।—"না।"

ভগবান। তবে এ কি রকম হলো ঠাকুর? বিশে ডাকাত নিরীহ বামুনকে কষ্ট দেবার লোক ত নয়। ঠাকুর আপনি ভুল বুঝেচো। বিশে ডাকাতের এ কাজ নয়। আর সে তোমায় এমন বন্ধ করে রাখবে কেন? কারু সঙ্গে বুঝি তোমার শত্রুতা আছে ঠাকুর? শত্রুরের এ কাজ।

বিনোদ ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন, "এমন শত্রুতা আমার কখন কারু সঙ্গে নেই ময়রার পো। গরিব ব্রাহ্মণ আমি, ভিক্ষা করে সংসার চালাই, বিঘে কতক ব্রহ্মোত্তর মাত্তর পুঁজি। কার সঙ্গে বিবাদ করি নে—কেনই বা করব?"

ভগবান শূন্যে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "কখন কি কারু মনে কষ্ট দাও নি ঠাকুর? কটু কথা বলে হোক, গাল মন্দ দিয়ে হোক, কারু প্রাণে কখন কি ব্যাথা দাও নি?"

এবারে বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন। কেন না, সেই প্রত্যাখ্যানের রাত্রি হইতে মর্ম্মপীড়িতা বালিকার শেষ কথা শেলবৎ তাঁর হৃদয়ে বাজিতেছিল। যখন তখন মানস-নেত্রে তিনি সরলার সে অভিমানিনী সিংহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, দৈববাণীবৎ যখন তখন শ্রুতিপথে ধ্বনিত হইত—"এই স্বামী, এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা!" বিনোদ মুখ নত করিলেন; ভগবানের দিকে চাহিতে পারিলেন না। তাঁর মনে হইতেছিল, লোকটা তাঁহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছে।

ভগবান তাঁহার উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আবার বলিল, "ঠাকুর, আমার দোকানে বলেছিলে, তোমার ছোট স্ত্রীটি তোমার বাড়ী গেলে কাঁটা

মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে। তা ত করনি ঠাকুর? সতী সাধ্বীর ত কোন অপমান করনি?"

বিনোদ লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত যে দৈন্য, তার সঙ্গে খানিকটা সামাজিকতা জড়িত আছে। কিন্তু হৃদয়ের দৈন্য নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার, একবার অনুভূত হইলে মানুষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অনেক ক্ষণ বিনোদ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে সহসা ভগবানের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি মানুষ না কোন দেবতা আমায় ছলিতে এসেছো?"

ভগবান মৃদু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। তখন বিনোদ আপনা হইতে বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের আমূল বৃত্তান্ত বলিয়া গেল—কোন কথা লুকাইল না। শেষে বলিল, "ময়রার পো, আমার পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েচে, কিন্তু এখন ভাবি কি যে, যদি একবার কোন মতে তার দেখা পাই, সর্ব্বস্ব দিয়েও তার মনঃকষ্ট দূর করি। সত্যিই তুমি বলেচো, সতী সাধ্বীর অপমান করেই আমার এ দশা হয়েচে!"

ভগবান বুঝাইল, "ঠাকুর, এখানে তোমার কষ্টটা কি? কই, কয়েদের ত কিছুই দেখ্‌চি নে। বেশ নিরিবিলি একলা-একলা আছ। কষ্ট কি ঠাকুর? সেরার কোন ত্রুটি হয় কি?"

বিনোদ। না, সে কষ্ট কিছু নেই। সেরার কথা যদি বল্‌লে, সে সম্বন্ধে রাজার হালে আছি, ময়রার পো। কিন্তু সোণার খাঁচায় পাখীর মতন—বাইরে এক পা বেরুতে পাইনে, কারু মুখ দেখতে পাইনে। ঐখেনে একটা সুড়ঙ্গ আছে; প্রাতে উঠে দেখি, যা কিছুর দরকার, সব কে রেখে গেছে। পায়ের শব্দও যে না পাই, তা নয়। কিন্তু কারু কথা শুনতে পাই নে। সেই রাত্রে যারা এখানে আমায় রেখে গেল, তারা শাসিয়ে গেছে, এ বাড়ী ছাড়া এক পা গেলেই আমার মরণ নিশ্চয়। ভাই, কয়েদ আর কাকে বলে বল?"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সেই সুড়ঙ্গের দিকে একটা উচ্চ হাস্য শুনা গেল। অমানুষ কণ্ঠে কেহ বলিল, "ইচ্ছা হয় বৈরাগীর সঙ্গে যাও, কিন্তু খবরদার, তাকে না বলে পালিও না, তা হলে প্রাণে বাঁচবে না।"

বিনোদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। করযোড়ে বলিলেন, "যে হও বাবা তুমি, আশীর্ব্বাদ করচি। আমি এই ময়রার পোর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাব না—কোন কাজ করব না।"

ভগবান গাইতে গাইতে চলিল,

"তুয়া বধু পড়ে মনে, যাই বৃন্দাবন-পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।"

বিনোদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিতান্ত ভৌতিক রকমের বোধ হইতেছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে সামুয়েল ফেডি সাহেবের নীলকুঠী। তিনি বিবাহিত, এবং সস্ত্রীক সেখানে বাস করেন। বিস্তৃত নীল-ক্ষেত্র সকল নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া সাহেবের প্রবল প্রতাপ এবং ধনগৌরব সূচিত করিতেছে। মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট্ সাহেবের সঙ্গে ফেডি সাহেবের বড় সৌহার্দ্দ্য; কালীপূজার ছুটীতে দুই জনে শীকার খেলিতে বাহির হইয়াছেন। ফিরিয়া রাত্রে আজ্ রাজবাড়ীতে উভয়কে সস্ত্রীক ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে।

ফেডি সাহেব শীকারে গেলেন বটে, কিন্তু অন্য দিনের মত তেমন হৃষ্ট-চিত্তে পশু পক্ষীর শোণিতদর্শনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রভাতে কলিকাতা হইতে টাকার চালান আসার পরই তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে, দস্যুসঙ্কুল দেশে ধনরক্ষার উপযোগী কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ইলিয়ট্ মাঝে মাঝে ফেডির অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিলেন, এবং শেষে তাহার কারণ শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। "নন্‌সেন্‌স্ ফেডি, ইংরেজ রাজ্যের ভিত্তি কি এতটা দৃঢ় নয় যে, একজন ইংরেজের কুঠী নেটীভদের বুকে ভয় সঞ্চার করবে না? বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের কাছারীর এক মাইলের মধ্যে?" ফেডি সাহেব শুষ্ক হাস্য করিয়া লজ্জিত হইলেন।

অতএব কলিকাতা হইতে যে কয় জন তেলেগু সিপাহী টাকার চালান আনিয়াছিল, কুঠীর ধনাগার তাহাদের জিম্মায় রহিল। আর কোন ব্যবস্থা করা হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীতে কালীপূজার ভোজ খাইয়া সস্ত্রীক কুঠীতে ফিরিতে ফেডি সাহেবের রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল। কার্ত্তিকী অমাবস্যার ঘোর তিমির ভেদ করিয়া তদীয় আলোকচক্ষু বগী যখন তীরবেগে রাজপথ অতিক্রম করিতে

ছিল, সাহেব তখন মুহুর্মুহু চারি দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। দেখিয়া মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেডি কতকটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, এবং হৃদয়ভাগিনীকে মনের কথা খুলিয়া বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে ভাবিয়াই, তাহা করিলেন না। ইহার একটু কারণও ছিল। ভোজন-টেবিলে বসিয়া ইলিয়ট্ সাহেব দস্যুভীতির ইঙ্গিতে তাঁহাকে একবার বিদ্রূপ করিয়া সমবেত মহিলা কয় জনের কলকণ্ঠে মধুর হাস্যরব উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন।

কুঠীতে পৌঁছিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে ফেডি সাহেব খাজনাঘরের দিকে একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনিলেন। সহসা আস্তাবলে একটা গোলযোগ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার মুক্তবন্ধন অশ্বচতুষ্টয় খুরধ্বনে নদীতট কম্পিত করিয়া চকিতে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ফেডি বুঝিলেন, তাহারা সুদক্ষ অশ্বারোহীর হাতে পড়িয়াছে।

এদিকে খাজনারক্ষক তেলেগু সিপাহীকে পিস্তলের গুলিতে হত করিয়া ডাকাতেরা বাকী লোকগুলাকে শয়ানাবস্থাতেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। খাজানার ঘর নির্ব্বিবাদে লুণ্ঠিত হয় দেখিয়া, স্বয়ং ফেডি সাহেব অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, দ্বাররোধ করিয়া সশস্ত্র কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। নৈরাশ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া ফেডি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং শয়নাগারে ফিরিয়া গেলেন। ভরসা, একখানা কিরীচ সেখানে ঝুলিতেছিল।

মিসেস্ ফেডি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া স্নানাগার হইতে একটা কালো হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলোর অদূরে দীর্ঘিকার কাল-জলে নীহারিকা-ছায়া স্পন্দিত হইতেছিল। অকস্মাৎ দীর্ঘিকার সে সুষুপ্তিশান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে মিসেস্ ফেডি মাথায় কালো হাঁড়ি আবৃত করিয়া সরোবরজলে প্রবেশ করিলেন।

ফেডি সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতে ৫।৬ জন লাঠিয়াল তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সাহেব তরবারি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই দস্যুহস্তে বন্দী হইলেন। বাহিরের সেই সশস্ত্র পুরুষ তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল,—"সাহেবকে বেঁধে রাখ্, কিন্তু খবরদার! মেমসাহেবের ঘরে যাসনে।" ফেডি বন্ধনদশায়—ডাকাতেরা পেছমোড়া করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—ঘাড় ফিরাইয়া বক্তাকে দেখিলেন; বলিলেন, "thanks! কে-তুমি?"

বক্তা কহিল, "আমি ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু! গরিবদের মেবে সাহেব!

বিস্তর টাকা তোমরা উপার্জ্জন কর। কিন্তু গরিবেরও মা বাপ আছে সাহেব! আমার ভাগ আমি নিতে এসেচি।"

সাহেব বলিলেন, "আমরা দেশের রাজা। যদি রাজাকে ভয় থাকে, এখনও এ দুষ্কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হও। আমার হুকুমও যা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমও তা। এখনও বল্‌চি পালাও।"

হো হো করিয়া ডাকাতেরা হাসিয়া উঠিল। হাসিল না কেবল বিশ্বনাথ। সাহেব হাঁকিলেন, "চুপ রও শূয়ার কি বাচ্চা!" খানকতক লাঠি প্রত্যুত্তরে তাঁহার পিঠে পড়িপড়ি করিতেছিল। বিশ্বনাথ মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। "খবরদার! বাঁধা মানুষকে মারিস্ নে।" ফেডিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সাহেব গালিগালাজ করো না। আমি চল্লাম। প্রাণের যদি মায়া থাকে, লেঠেলগুলোকে কিছু বলো না। মেমসাহেবের জন্য তোমার কোনও ভাবনা নেই সাহেব।"

তখন মেঘাকে মাত্র সাহেবের পাহারায় রাখিয়া বিশ্বনাথ অন্য ডাকাতদের সে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষরাত্রে বাগ্দেবীর খালের জঙ্গলে সদলে বিশ্বনাথ অপেক্ষা করিতেছিল। চারি দিকে দূরে দূরে আরণ্য অন্ধকার মধ্যে "ঘাটি" বসিয়া গিয়াছে; বাছা বাছা সড়কিওয়ালা এবং লাঠিয়ালের দুর্জ্জয় দুর্গ। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে বসিয়া জন কয়েক কালীর পাইক সঙ্গে বিশ্বনাথ সোৎসুকে মেঘা ও তাহার সহচরদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বয়ং দলপতি লুণ্ঠিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া পূর্ব্বেই রওনা হইয়া আসিয়াছিল; বামাল নিরাপদ না জানিলে মেঘা নীলকুঠীর "রাটি" উঠাইবে না, ইহাই ভিতরের কথা। কিন্তু বিশ্বনাথ টাকাগুলোর কিনারা করিয়া সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলেও মেঘা আসিল না। এদিকে রাত্রিও বেশী ছিল না। উদ্বিগ্ন হইয়া দলপতি নীলকুঠীতে ফিরিবার সংকল্প করিতেছিল।

এমন সময়ে একখানা খাটুলি সঙ্গে সদলে মেঘা দেখা দিল। বিস্মিত বিশ্বনাথ আলোকসহায়ে দেখিল, বন্ধনদশায় ফেডি সাহেব তাহাতে শয়ান; নাগপাশবদ্ধের মত অঙ্গমাত্রসঞ্চালনে অশক্ত। মহা বিরক্ত হইয়া দলপতি মেঘার দিকে চাহিল। বুঝিয়া মেঘা কহিল, "তুমি স্পষ্ট করে ওকে ক

আগতে বলনি। আমিও ছেড়ে আসা ভাল মনে করিনি। এই কেউটের বাচ্চা ছেড়ে দিলে ক' দিন আমরা বাঁচব বল? আমার কাজ আমি করেচি, এখন তোমার যা ভাল মনে হয় কর।"

মেঘা এক পাশে গিয়া বসিল। তখন কালীর পাইকেরা একবাক্যে বলিল, "সাহেবটাকে মেরে ফেল। ওকে ছাড়লে একদিনও আমরা বাঁচব না।"

বিশ্বনাথ ধীরভাবে বলিল, "সাহেব মারিলে তোরা বাঁচবি, কি ছেড়ে দিলে বাঁচবি? একটু ভেবে কথা কোস্। সাহেব খাঁটিয়ে নবাব বাদসারা উচ্ছন্ন গেল—প্রাণে মেরে আমরা বাঁচব? কি ভুল! তা হবে না। ওর বাঁধনগুলো কেটে দে। তার পরে চোক বেঁধে দিয়ে সীমানা পার করে দিয়ে আয়।"

পাইকেরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দলপতির আদেশটা কাহারও ভাল লাগে নাই। মেঘা বলিল, "বিশু, আমার কথা শুনে যদি বদেকে মেরে ফেল্‌তে, এত বিপদ হতো না। সাহেবটাকে ছেড়ে দিলে যত বিপদ, মাবলে তার সিকিও নয়। নবাব বাদসাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। আজ আমরা ডাকাত, কাল গেরস্ত চাষী। কে মারলে ঠিকানা কি? তুমি দল নিয়ে চলে যাও, ও ভার আমার থাক্। এক ফোঁটা রক্তও আমি মাটীতে পড়তে দেব না।" মিতভাষী মেঘা দলের মধ্যে রক্তপিপাসুদের অগ্রগণ্য। কথা শেষ করিয়া সে কোষ হইতে তীক্ষ্ণধার তরবারি উন্মুক্ত করিল।

এই কথায় কালীর পাইকেরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "সাহেবটাকে না মার যদি, আমাদিগকে মার। তোমার হাতে মরি সে ভাল, নইলে ফিরিঙ্গীগুলো যে ধরে ধরে ফাঁসি লট্‌কে দেবে, তা হবে না। তুমি মা-কালীর বরপুত্তুর, তোমার কে কি করবে? মরতে কুকুর বিড়েলের মত আমরাই মরব। শেয়াল কুকুরেও এর পরে আমাদের দুঃখে কাঁদবে।" লোষ্ট্রাহত মধুক্রমবৎ দস্যুদের অস্ফুট অসন্তোষবাক্যে বন শব্দিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ ইহাতে কিছু উদ্বিগ্ন হইল। সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। মেঘা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—বুঝিল, দলপতি ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মেঘা মুক্ত অসি হস্তে বন্দী ফেডি সাহেবের প্রতি ধাবিত হইল—আলোকনপাতে তীক্ষ্ণধার ফলক প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। ফেডি ডাকাতদের কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন—কুটিল দৃষ্টিতে তাহাদের গতিবিধি এক এক বার দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উদ্যত-অসি ঘাতককে দেখিয়া সহসা তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘার এই হঠকারিতার জন্য বিশ্বনাথ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং দার্ঢ্যবলে অনুদিন মা ভবানীর বরপুত্র বলিয়া দস্যুমহলে সে পরিচিত ছিল, এই মুহূর্ত্তে সহসা তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। কেডি সাহেবের আর্ত্তস্বর কর্ণগোচর হইতে না হইতে দস্যুপতি পার্শ্ববর্ত্তী দীর্ঘ যষ্টিখণ্ড সংগ্রহ করিল, এবং তাহাতে ভর দিয়া এক লাফে খাটুলির পার্শ্বে উপস্থিত হইল। মেঘার উদ্যত অসি সবেগে আসিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল বটে, কিন্তু তাহা ঘূর্ণ্যমান লাঠিতে প্রহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে বিশ্বনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্যর্থলক্ষ্য মেঘা অধোবদনে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

বিশ্বনাথ কোনও রাগ প্রকাশ করিল না। প্রশান্ত স্মিতমুখে কালীর পাইকদের ডাকিয়া বলিল, "সাধ থাকে আয়, এই শেষ দিন আমার তরওয়ালের বল পরীক্ষা কর্। আজ আমি এক দিকে, আর তোরা এই জঙ্গলে জমায়েৎ আছিস্ পাঁচ শ জওয়ান এক দিকে। আমি এই সাহেবটার বাঁধন কেটে দিচ্চি, সাহস থাকে ত আয়, দেখি কে কি করতে পারিস একবার!" তখন বিশ্বনাথ ক্ষিপ্তহস্তে দৃঢ়সংকল্পে কেডিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বসাইল।

নীরবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দস্যুসেনা দলপতির আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। মশালের আলোকে বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথের প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে অমানুষী নির্ভীকতা এবং দৈববল সূচিত করিতেছিল। সে মোহ,—যার মহিমায় মানুষ যথার্থ মহত্বে দেবত্ব আরোপিত করিয়া প্রতিভার পদে আত্মসমর্পণ করে,—তাহাই আসিয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহোন্মুখ রোষচঞ্চল দস্যুদলে কুহক বিস্তার করিল। বিশ্বনাথ গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলিল,

"চুপ করলি কেন রে? এতক্ষণ ত ভারি গজ্ গজ্ লাগিয়েছিলি! আমার হুকুমে এখুই যদি হতশ্রদ্ধা, তোরা এক সঙ্গে সবাই আমায় ছেড়ে যা। আমার 'যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন'। কথায় বলে,—'মরণের বাড়া গাল নেই', সেই মরণকে কখন ডরাই দেখেছিস্? যতক্ষণ মা কালী প্রসন্ন আছেন, বিশে এ দুনিয়ার কর্ত্তাকে গেরাহি করে না। তাঁর অকৃপা যদি হয়ে থাকে, আমি ডুবলাম বলে। তোরা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বিনে।"

বিশ্বনাথ প্রতি কথায় শ্রোতাদের হৃদয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিতেছিল। কালীনাম শুনিবামাত্র বনস্থল কম্পিত করিয়া ডাকাতেরা একবাক্যে গাহিয়া উঠিল, "কালী মায়ী কি জয়! বিশ্বনাথ কি জয়!"

মেথা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বিশু, তুমি এত অভিমান করবে, তা জান্‌তাম না। যা হোক্, আমার কসুর মাফ্ করো। তোমার নিমকে আমাদের শরীর, যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমায় আমরা ছেড়ে যাব, এমন সন্দেহ করো না। সাহেবটাকে তোমার অজান্তে কেটে কুটে আমি আপদ চুকিয়ে দেবার ফিকিরে ছিলাম। এখনও তোমায় মিনতি করচি, আমার কথা ভেবে দেখ। এই ফিরিঙ্গী-বাচ্চা ছাড়া পেলে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে!"

বিশ্বনাথ একটু চিন্তিত হইল—কিন্তু সে নিমেষের জন্য। মেথার কথার উত্তর না দিয়া ফেডিকে কহিল, "সাহেব, ভাগ্যে ভাগ্যে তুমি বেঁচে গেছো। পরমেশ্বর রাখ্‌লে মারে কে?" সাহেব কলের পুত্তলীর মত বিশ্বনাথকে ধন্যবাদ দিলেন।

দলপতি আবার বলিল, "সাহেব, দলের লোকেরা তোমায় ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমি যখন বলেচি ছাড়ব, আমার কথা খেলাফ হবে না। আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু একটি কথার রুবতে হচ্চে সাহেব। তোমায় পরমেশ্বর সাক্ষী কসম নিতে হবে, বাপ মা, ভাই বন্ধু, যে কেউ তোমার পেয়ারের জিনিস আছে, সব্বাইর কসম নিয়ে বল্‌তে হবে, আজকের এই ডাকাতি নিয়ে তুমি কোনও গোল করবে না, কখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট কি তার চেষ্টা করবে না।"

বিশ্বনাথের মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং সেই যমদূতের মত ডাকাতগুলোর উপর তাহার প্রভাব দেখিয়া ফেডি সাহেব বুঝিয়াছিলেন, তাহার আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মুক্তির আশায় কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া তিনি মিশ্রিত হিন্দী বাঙ্গলায় বলিলেন, "কসম্ লইতে আমি প্রস্তুত আছি!"

মেথা পরিষ্কার হিন্দীতে বলিল, "দলপতি, তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি, ফিরিঙ্গীর কসমে ইৎমাদ্ করো না। কোন্ ফিরিঙ্গী আজ্ পর্য্যন্ত কথা ঠিক্ রাখ্‌তে পেরেছে? পলাসীর লড়াইয়ের কথা কি ভুলে গেলে? শোননি কি রে, ক্লাইব সাহেব জাল করতেও পিছপাও হয় নি?"

বিশ্বনাথ মেথার কথায় কর্ণপাত করিল না। ফেডিকে কহিল, "সাহেবদের

উপর বরাবর আমার বিশ্বাস আছে; বীরজাতি তোমরা, মিছে ঠকানি পেজোমি তোমাদের ভেতর নেই। কোথায় কোন একটা সাহেব কি মন্দ কাজ করেচে, তার জন্য ইংরেজ জেতের দোষ হ'তে পারে না। তাই জন্যে আজ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তোমাদের শত্রুতা করি নি। তোমরা নীল-কুঠিয়ালরা কিন্তু গরিবের উপর বড় দৌরাত্ম্যি আরম্ভ করেচো, তোমার টাকায় আজ ভাগ বসালাম সাহেব। সে যা হোক্, বেশ ভেবে চিন্তে দেখ, প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারবে কি না। আমি যখন তোমায় অভয় দিয়েছি, ছেড়ে দেবই দেব, কসম নাও, আর না নাও।"

ফেডি নির্ভাবনায় বলিলেন, "কসম নিতে আমি এখুনি প্রস্তুত! বল কি বল্‌তে হবে।"

বিশ্বনাথ একবার মেঘার দিকে কোমল কটাক্ষ করিল। প্রভুভক্ত কুকুরের মত সে মহা উদ্বেগে উন্মুখ হইয়া দলপতির প্রত্যেক বাক্য শুনিতেছিল। বিশ্বনাথ হিন্দীতে বলিল, "বল সাহেব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে পরমেশ্বর, তাঁর কসম, তোমার পিতা মাতার কসম, আমাদের আজ্‌কের কাজের জন্যে তুমি কোনও মামলা মোকদ্দমা করবে না, কখনও আমাদের কোনও অনিষ্ট কি তার কামনা করবে না।"

ফেডি সাহেব একটি একটি করিয়া এই শপথের প্রত্যেক কথা পুনরুক্ত করিলেন। বিশ্বনাথ বলিল, "সাহেব তুমি মুক্ত হলে, কিন্তু একাকী এখন তোমায় যেতে দেওয়া ঠিক্ নয়। চল, আমি তোমায় বন পার করে দিয়ে আসি।"

মেঘা যুক্ত করে বলিল, "কিন্তু একটা কথা রাখ। সাহেবকে ছেড়েই যদি দিলে, ওর চোক বেঁধে দাও, আমি ওকে পৌঁছে দিই। আল্লার কসম! ওর গায়ে কাঁটার ছড়ও লাগতে দেব না। তুমি চোক খুলে ওকে পথ দেখিয়ে নেও না।"

বিশ্বনাথ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। স্নেহকোমলস্বরে বলিল, "মেঘু, মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই। সাহেব জাতটেকে তুই চিনিস্‌নে মেঘু। কিছু মনে করিস্ নে!"

তখন দলপতির সঙ্কেতবাক্যে বিচ্ছিন্ন ডাকাইত-দল চকিতে সারি দিয়া দাঁড়াইল, এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া সহসা সেই নৈশান্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ডাকাতির কয় দিন আগে ভগবান মাঠাকুরাণীদিগকে গঙ্গাতীরের নূতন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। মীরার ইচ্ছা ছিল, যথাবিধি গৃহপ্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাস করেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন ভগবান দ্রব্যাদি নূতন গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া বসিল। মীরা ও সরলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিল, "মা, গঙ্গাতীরে আবার দিন ক্ষণ দেখা কি? এ ডাকাতের বাড়ী; বিশ্বনাথের শত্তুর বিস্তর, আমি সব সময় থাকিনে। কি জানি, কোম্পানির লোক কখন থানাতল্লাসী করতেই যদি এলো!" কাজেই মাঠাকুরাণীরা দ্বিরুক্তি করিলেন না। নূতন বাড়ীতে মীরা ও সরলা যোগাম্বর সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। ভগবান স্বরূপগঞ্জের আড্ডাতেই রহিল—সব দিন মাঠাকুরাণীদের দেখা দিতে পারিত না। পীতাম্বর ২।৪ দিন অন্তর দিদিকে দেখিয়া যাইত।

নীলকুঠির ডাকাতির দিন সন্ধ্যাকালে ভগবান আসিয়া মীরা ও সরলার সঙ্গে দেখা করিল। সরলা বড় লাজুক, ভগবানের মধুর চরিত্রগুণে তাহাকে ভক্তি ও স্নেহ যথেষ্ট করিত বটে, কিন্তু বুড়ো মানুষটা যেমা মা করিয়া অস্থির করে, সেটা ভারি জুলুমের কথা। "ভাল আছ মা?" বলিয়া ভগবান যখন প্রণাম করে, তখন মুখ নত করিয়া কোনরূপে সরলা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, "তুমি কেমন আছ?" তার পর ভগবান আরম্ভ করে, "দুরে পড়েছি বলে ভুলিস্‌নে মা, কই ছেলেকে কখন হাতে করে কিছু ত খেতে দিলিনে।" লজ্জায় সরলা কথা কহিতে পারে না, দিদির কাণে কাণে বলে, "ছেলেকে আজ না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না দিদি!"

সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারে বড় মা এবং ছোট মাকে প্রণাম করার পর শেষোক্তাকে গৃহান্তরে পাঠান ভগবানের অভিপ্রেত। সে জন্য যোগাম্বরকে বহির্বাটী হইতে সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছে। আজ খাওয়ার জন্য ভারি আবদার করায় মীরা ভগবানকে বলিল, "সরলা বলে, ছেলের খাওয়ার খোঁটটা মিছিমিছি, কেবল লজ্জা দিতে। কই একদিও ত খান না। কারু হাতে বুঝি খান না?" সরলা মীরাকে টিপিল—"আজ কিছু না খাইয়ে কিছুতে ছেড়ো না দিদি!" ভগবান হাসিল। "কারু হাতে খাইনে বটে, কিন্তু তাই বলে কি মার হাতেও খাব না? আচ্ছা ছোট মা তুমি রাঁধ, খেয়ে আমি যাই।" অতএব সরলা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেল।

এইখানে বলা আবশ্যক, বিনোদবিহারীর সংবাদ ভগবান সকলই জানিত বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মীরাকেও সে কথা কিছু বলা হয় নাই। বিশ্বনাথের মতলব ছিল, দীর্ঘকাল বিনোদকে বন্দিভাবে রাখিয়া প্রত্যাখ্যাতা নিরপরাধা পত্নীর সহিত মিলিত করিবে। কিন্তু চারি দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সাধ বুঝি পূর্ণ হয় না। সেই জন্য বিশ্বনাথ "খুড়োর" হাতে সে ভার ন্যস্ত করিল। ভগবান আহ্লাদের সহিত ব্রতটি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বিশুকে বলিল, "তুই কি ভাবচিস্, আমি নিরাপদে থাকব? আমি মনঃস্থির করে বসে আছি। ভোর কি দলের আর কারুর খবর আমি প্রাণান্তে বলব না বটে, কিন্তু নিজের কথা কিছুই লুকোব না বিশু। আমায় যদি ধরে, পাপ লুকিয়ে রেখে এই বুড়ো বয়সে আমি বাঁচবার কোনও দরকার দেখ্‌চিনে।

এই সন্ধ্যাকালে মীরা ও যোগাম্বরের সঙ্গে ভগবানের যে কথোপকথন হইল, তাহা আমরা আপাততঃ গোপন রাখিব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শয়ন করিয়া মীরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে দিন সরলার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। দেখা হইলে সরলা মীরার প্রশ্নমতে স্বামীর প্রত্যাখ্যানের গল্প করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে এত সংক্ষেপে যে, বিনোদের প্রকৃত দুর্ব্যবহারের কোনও কথা তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। সরলা মীরাকে দিদি বলিত, কিন্তু মাতার সমবয়স্কা বলিয়া সকল বিষয়ে জননীর মত তাঁহাকে সমীহ করিত। কাজেই তাহার স্বামিগৃহের সবিশেষ সংবাদ এতদিন মীরার জানা ছিল না।

সন্ধ্যায় ভগবানের কাছে আসল কথা শুনিতে পাইয়া মীরা বড় মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিলেন। বালিকার নিতান্ত শিশুর মত সরলতা, লজ্জাবতী লতার মত তার সদাই সঙ্কোচভাব, অথচ স্নেহমাত্রায় পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র তাহার হৃদয়টুকুতে ইহারই ভিতর পিতৃহীনা শোকবিহ্বলা মীরা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। স্বামিনিন্দাভয়ে সাধ্বী যে তাঁর কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার চরিত্রসৌন্দর্য্যে অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথায় কথায় সরলাকে বলিলেন, "বোন, বিনোদ তোমার উপর অমন দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তা আমি এতদিন জানতাম না। আমি বুড়ি হয় ত বলতো, কিন্তু আমি বাড়ী থেকে আসার দু' দিন পরেই সে মনোহরপুর গেল। সব কথা আজ ভগবানের কাছে শুনলাম।" সরলা কোনও উত্তর দিল না, লজ্জাতেও

বটে, মনঃকষ্টেও বটে, উপাধানে মুখ লুকাইল। দেখিয়া মীরা চক্ষু মুছিলেন। করুণকণ্ঠে কহিলেন, "না সরলা, তোমার কাছে আমি কিছু শুনতে চাইনি! আমি জানি, লজ্জায় আমায় সব কথা তুমি বলতে পারিনে—কেমন?"

বিবশা বিচ্ছেদা হইয়া সরলা উপাধানে অশ্রুপাত করিতেছিল। কিন্তু মীরা অপ্রতিভ হইবেন ভাবিয়া সহসা আত্মসংবরণ করিল। বলিল, "দিদি, মা বলতেন, সরলা, যদি কখন শ্বশুরবাড়ী যাস্, দুটো কথা মনে রাখিস্ মা!—সোয়ামীকে আপনা থেকে কখন কিছু চাসনে, হাজার কষ্টেও সোয়ামীর নিন্দে করিসনে!" অনেক চেষ্টা করিয়াও সরলা এবার চোখের জল থামাইতে পারিল না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া গাঢ় স্বরে আবার বলিল, "দিদি, আমি জানতাম, সোয়ামী স্ত্রীলোকের দেবতা! কুক্ষণে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম দিদি, এখন আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিনে।"

এই কথা কয়টিতে মীরা সতীহৃদয়ের দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ছি বোন্, ও কথা ভাবতে নেই। সোয়ামি সুখে দুঃখে চিরদিনই মেয়েমানুষের দেবতা। তুমি কি শোননি, সতী ভগবতী বাপের মুখেও পতিনিন্দা সইতে পারেন নি? দুঃখু কি বোন, সোয়ামি স্ত্রীতে অমন মনান্তর সব ঘরেই হয়! তুমি যদি অত ছেলেমানুষী করে তখনই চলে না আসতে, বরকনেতে সেই রাতেই ভাব হয়ে যেত।"

শেষের কথায় কিঞ্চিৎ হাস্যরস যোগ করিয়া মীরা সরলার মনটা একটু ভিজাইতে চেষ্টা করিলেন;—কেন না, আসল কথাটা তখনও বলা হয় নাই। সরলাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার তিনি বলিলেন, "দেখ সরলা, তোমার যে বয়স, আমার মতন গঞ্জোবাস চিরদিন তোমার পোষাবে না বোন্। বিশেষ, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বরাবর থাকতে পারব না। সোয়ামীর দোষ ভুলে যাও। আমি খবর পেয়েছি, বিনোদ এই অঞ্চলে এখন আছেন। তোমার সম্মতি পেলেই কল কৌশল করে আমি এখানে তাঁকে আনাতে পারি।"

সরলার মনে প্রত্যাখ্যানের সেই কালসন্ধ্যা জাগিয়া গিয়া উঠিতেছিল। স্বামী যে প্রথম সম্ভাষণেই তাহার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত করিয়াছিলেন, সে অপমান বালিকা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সে সব কথা মনে পড়িবামাত্র সরলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল; স্থির কণ্ঠে বলিল, "না দিদি, আমার সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল! তুমি আশা না দাও, আবার

সেই মনোহরপুরের ভিটায় ফিরে যাব। না পারি, মা গঙ্গার কোলে শুয়ে চোক বুজব! ও সব কথা আমায় আর বলো না দিদি!"

মীরা করুণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"বাবুজী বল্‌তেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ লালা!' কে এক পশ্চিমে বাই—আমার নামে নাম,—তারি নাকি এ গান! মীরা নাম মনে পড়্‌লে সর্ব্বদা নন্দলালকে মনে থাক্‌বে বলে, তিনি এ হতভাগীর এ নাম রেখেছিলেন। যখন তখন বল্‌তেন, 'মীরা কহে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!' ভাই, বিনা প্রেমে জগতের যিনি পতি, তাঁকে পাওয়া যায় না; তুমি কখন দেখ্‌লে না শুন্‌লে না, একেবারে স্বামিপ্রেম পাবে! আমার অনুরোধ রাখ দিদি! সত্বগুণে পৃথিবী বশ। ঢিল খেয়ে পাঠকেল মারা পুরুষের শোভা পায়। মেয়েমানুষের প্রতিশোধ ও পথে নয় বোন্! প্রেম ছাড়া আমাদের পথ নেই।"

বালিকা সরলা অত কথা বুঝিল না। দলিতফণিনীবৎ প্রত্যাখ্যানের নিশিতে বিনোদকে শুনাইয়া বলিয়াছিল, "এই স্বামী? আমার দেবতা!" আজও মনে মনে সেই কথা বলিল। প্রকাশ্যে বলিল,—"না দিদি, কোথাও তুমি লোক পাঠিও না। আমার সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল দিদি।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই নিশাপ্রভাতে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ হোড়ঙ্গের বনে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে বিশ্বনাথ ফেডি সাহেব সঙ্গে আড্ডার অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলা বন্ধনের দরুণ ফেডির সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তাহাতে উপলকণ্টকময় সঙ্কীর্ণ পথ; কষ্টে তিনি পথপ্রদর্শকের অনুগমন করিতেছিলেন। কষ্ট যত হোক্, ইহাতে তিনি বেশ ভাল করিয়া পথ ঘাট গুলি দেখিয়া লইবার সুবিধা পাইতেছিলেন। বিশ্বনাথ ভয় এবং সন্দেহমাত্রশূন্য, সাহেবকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; দুই এক বার অনুরোধ করিল, একবেলা তাহার অদূরবর্ত্তী কুটীরে বিশ্রাম করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না? ফেডি ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদের মাত্রা চড়াইয়া এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইতেছিলেন, সেই বিপজ্জনক তস্করটার বাসগৃহ দেখিয়া লইবার প্রলোভন অতি সহজেই তিনি জয় করিলেন। কেন না, রাত্রে যে দস্যুপ্রতি এতটা ঔদার্য্য দেখাইয়াছিল, তাঁহার মতে সম্ভবতঃ তাহা ঝোঁক এবং জেদের মাথায়। প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত হিংসাবৃত্তি যে ফিরিয়া আসে

নাই এবং গৃহে পাইলে এখন সহজে ফেডিকে সে ছাড়িবে, কে বলিতে পারে? শপথ করিবার পূর্ব্বে বা পরে কখনই সাহেব আপনাকে তজ্জন্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য মনে করেন নাই। তদীয় অসঙ্গত ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছাকৃত নহে, বলে অপহৃত মাত্র; তাহার কোন "নৈতিক মূল্য" নাই। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ ভাবিতেছিল, সাহেব মেমের জন্য বড় ভাবিতেছে, এবং সেই জন্যই নিজের ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেছে না।

উভয়ের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ভগবানের নূপুর কণ্ঠ তখন পঞ্চমে উঠিতেছিল। বিশ্বনাথ সাহেবকে বলিল, "সদর রাস্তা এখান থেকে বেশী দূর নয়, সাহেব, বরাবর তুমি চলে যাও। আর কোন ভয় নেই!" সামুয়েল ফেডি ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়া বিশ্বনাথের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সেই নর্ত্তীতধ্বনির অনুসরণ করিয়া ফেডি সাহেব আড্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে। অগত্যা তিনি বিশ্বনাথের প্রদর্শিত পথে ফিরিয়া আসিলেন।

সে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম, এবং একবারে মনুষ্যসমাগমচিহ্নবিরহিত নহে। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন। ইচ্ছা, গায়কটা সে পথে আসিলে কৌশলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। এ দিকে কিন্তু বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করিতেও সাহস হইতেছিল না। দস্যুপতি হয় ত লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, এবং সহসা আবির্ভূত হইয়া আবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইবে। ফেডি সাহেব দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না, অথচ গতিবেগ প্রায় সমান রাখিলেন।

ওদিকে প্রত্যূষে নীলকুঠীর ডাকাইতির খবর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর হইবামাত্র, অবিলম্বে তিনি সদলে বাহির হইয়া পড়িলেন। মিসেস্ ফেডির মুখে রাত্রির দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ইলিয়ট সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং ফেডির উদ্ধারের জন্য দিকে দিকে সওয়ার রওনা করিলেন; নিজে চারি জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সিপাহী সঙ্গে তিনি স্বরূপগঞ্জের পথে ছুটিয়া চলিলেন।

হোড়ঙ্গের বন হইতে বাহির হইয়া ফেডি সাহেব সরকারী পথের ধারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক কণ্ঠীধারী বাবাজী একটি ব্রাহ্মণতনয় সঙ্গে আসিয়া জুটিল। সাহেব যে পথে চাহিয়াছিলেন, সেই পথে তাহারা দেখা দিল। ফেডিকে দেখিলেই বিষণ্ণ মনে হইতেছিল। তখনকার

দিনে সামান্য পান্থবেশে ইংরেজ-দর্শন একটা অভাবনীয় ঘটনা। বিশেষ, সাহেবটির কতকটা দীন মলিন বেশ। রাত্রিজাগরণ এবং দুশ্চিন্তাবশতঃ তাঁর মুখে একটা কালিমা পড়িয়াছিল, বস্ত্রাদিও ধূলি-কর্দ্দমে কণ্টকে যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ভগবান অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। ততক্ষণে সামুয়েল ফেডি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘমূর্ত্তি বৈষ্ণবটার আপাদমস্তক দেখিয়া লইতেছিলেন। দেখিয়া গরিব ব্রাহ্মণ বিনোদবিহারী একটু সরিয়া বসিলেন।

ভগবান দয়ার্দ্র হইয়া সাহেবকে প্রশ্ন করিল, কোথা হইতে তিনি আসিতেছেন; ফেডি ভাবিতেছিলেন, আপনা হইতে কোন কথা কহিবেন না। কিন্তু ভগবান যদি কথা তুলিল, তবে আর তিনি অনুসন্ধানের এমন একটা সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তাহার প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন যে, সে কোথা হইতে আসিতেছে। ভগবান বলিল, সে ভিক্ষুক বৈষ্ণব, ভিক্ষায় গিয়াছিল।

তখন ফেডি সাহেব ভগবানের উপর অজস্র কূটপ্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়া চলিলেন। একটুতে ভগবান বুঝিল, বিশ্বনাথের সংবাদে সাহেবের প্রয়োজন। মনে পড়িল, গত রাত্রিতে বিশ্বনাথের নীলকুঠি লুটিবার কথা ছিল। যদু পুত্র উত্তরে প্রশ্নগুলির গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা দ্রুতগামী অশ্বপদশব্দে চারি দিক যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে ঘোড়সওয়ার চারি জন সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট্ ইলিয়ট্ আসিয়া পৌঁছিলেন। ফেডিকে দেখিয়া তিনি উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেন না, তাঁহাকে জীবিত দেখিবার আশা করেন নাই।

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইলিয়ট্ ফেডিকে একটু একান্তে লইয়া গেলেন। এতক্ষণে বিনোদ ভগবানকে ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন, চল, আমরা প্রস্থান করি। এ হাঙ্গামায় আমরা থাকি কেন? ভগবান কিছু বলিল না।

সাহেব দুই জনের পরামর্শ কি হইল, তাহা বলিয়া বলার স্থান এ নহে। ফেডি সদর্পে ভগবানের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "তুম লোক ভি ডাকু হ্যায়!" ভগবান মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে অভিবাদন করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। স্বরূপগঞ্জের সেদিনকার পরিচয় ইলিয়টের মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "ফেডি সাহেব জঙ্গলে, বিশেষ ডাকাতের আড্ডায়, তোমায় গান করতে শুনেচেন।

তুমি নিজে ডাকাত না হতে পার; কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে তোমার জানা শুনা আছে, সন্দেহ নাই। তোমায় ছাড়িতে পারি না।" ভগবান করযোড়ে বলিল, "আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু আমার সঙ্গীটিকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হউক। উনি কোনও দোষে দোষী নন।" স্বয়ং বিনোদ কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, সাহেব দেখিয়া তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ইলিয়ট্ কহিলেন, বিচারে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন দেখা যাবে।"

তখন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় ভগবান ও বিনোদ বন্দী হইয়া কৃষ্ণনগরে চলিলেন। ভগবান গাইতে গাইতে গেল, "সুখের দিনে তোমারে ডাকি পরাণ নন ভরে না।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। ফেডি সাহেব স্বকৃত শপথের কোনও মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না। জাতক্রোধ হইয়া বরঞ্চ তিনি দস্যুদের উপর প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নিলেস্ ফেডিকে কলিকাতায় রাখিতে গিয়া সস্ত্রীক তিনি লাটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়ট তৎপূর্ব্বেই কোম্পানির গভর্মেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দস্যুদমন জন্য সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারী এক জন এবং কিছু ফৌজ নদীয়ায় পাঠান হউক। সামুয়েল ফেডির মনিব সরকার আফিস হইতেও রাজপ্রতিনিধিসভায় আবেদন গেল যে, তাঁহাদের ধন এবং কার্য্যকারকদের প্রাণ যেরূপ আপদসঙ্কুল হইতেছে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান একটা সাধন যে নীলের আবাদ, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হয়। ইহার ফলে কলিকাতার তখনকার একজন মাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার সি. ব্লাকুয়ার* নদীয়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিলেন; তাঁর সঙ্গে জন কতক ইউরোপীয় "সেলার" ও কিছু সৈন্য প্রেরিত হইল।

শান্তিপুরের উপরগস্তিদলে মিশিয়া কৃষ্ণ সর্দ্দার এ সকল শুনিতে পাইল। তাহার মনিব আসাননগরের নীলকুঠির সাহেব সামুয়েল ফেডির এক জন বন্ধু। সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া সর্দ্দার মনিবের দ্বারা ফেডিকে জানাইল, একটু বেশী বেতনে উপরগস্তিদের রাখিতে পারিলে, বিশ্বনাথ অতি সহজে ধরা পড়িবে। ফেডি সাহেব উপরগস্তিদের ডাকাইয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তায় বুঝি-

* Mr. C. Blacquire.

লেন, বিশ্বনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বাস্তবিক তাহাদের মত স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকের দরকার। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ সর্দ্দার আবার কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বিশ্বাসভাজন হইয়া চিরপোষিত প্রতিশোধপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত হইল। তাহার প্রার্থনায় বৈদ্যনাথকে কারামুক্ত করিয়া উপরগস্তিদের সহায়তায় নিযুক্ত করা হইল। কেন না, তাহার ন্যায় দস্যুপতির ভিতর-বাহিরের খবর আর কেহ জানিত না।

উপরগস্তি দল অতঃপর কোম্পানির বেতনভোগী হইল বটে, কিন্তু সাধারণে সে কথা জানিল না। পূর্ব্ববৎ তাহারা শান্তিপুরে থাকিয়া অতিগোপনে বিশ্বনাথ ও তাহার দলবলের গতিবিধির অনুসন্ধান করিতেছিল। স্বয়ং বিশ্বনাথ গা-ঢাকা দিয়াছিল, মাতৃআজ্ঞায় ডাকাইতি হইতে একেবারে বিরত হইয়াছিল, এ সকলের কোন খবর সে পাইল না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ অতি-অল্পসংখ্যক সঙ্গী ছাড়া আর কেহ তাহার অজ্ঞাতবাসের সংবাদ জানিত না। এ দিকে তাহার দলের অন্য ডাকাইতেরা বেশ একটা দাঁও পাইয়া গেল। তাহারা নিজেদের ভিতর দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে ডাকাইতি করিতে লাগিল। উপরগস্তি দলের ভিতর এক জন একদিন খবর আনিল, বিশ্বনাথের দল পরদিন কৃষ্ণনগর হইতে কিছু দূরে পল্লীগ্রামে ডাকাইতি করিবে। ব্লাকুয়ার সাহেব পরদিন সন্ধ্যার পর নিজের দলবল ও উপরগস্তি দল সঙ্গে যথাস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। গভীর রাত্রে সত্য সত্যই ডাকাইত পড়িল। অধিকাংশ ডাকাইত গৃহস্থের উচ্চ ইষ্টকরচিত প্রাচীরবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন সুরু করিয়াছে, এ দিকে ঘাঁটিতে কালীর পাইকরা উন্মুক্ত অস্ত্রহস্তে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। এমন সময় "জইণ্ট" সাহেব সহসা বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিলেন। তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ব্লাকুয়ার সিপাহীদিগকে আদেশ করিলেন, দলের সর্দ্দারগুলাকে জীবিতমানে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কিছুতে তাহারা ইহা পারিয়া উঠিল না। শেষে সিপাহীরা গুলি চালাইবার হুকুম প্রার্থনা করিল। ব্লাকুয়ার তখন "সেলার"দের উপর ডাকাত ধরিবার ভার দিলেন। হণ্টার সাহেব বলেন, ইহারা দীর্ঘযষ্টি সহায়ে ডাকাইতদের হাত হইতে তরবারি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই রাত্রে অনেক ডাকাইত ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশ্বনাথ বা তাহার প্রধান সহচরদের কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, জইণ্ট সাহেবের এই উদ্যমে দলগুলি ছোড়ভঙ্গ হইল; নদীয়া জেলার ডাকাইতি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বনাথ ধরা না পড়িলে দস্যুদল

নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফেড্রি সাহেব তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়াছিলেন। উপরগুস্তিরা তাঁহার কাছে বিস্তর টাকা খাইয়াছিল। বিশ্বনাথের অজ্ঞাতবাসের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি তাহারা নিযুক্ত রহিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান মণ্ডল স্বরূপগঞ্জে অল্প দিন ছিল বটে, কিন্তু ইহারই ভিতর সে অঞ্চলে তাহার বিস্তর আত্মীয় বন্ধু জুটিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তার কারণ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহার সরল অমায়িক ব্যবহার। বিশ্বনাথের মত তাহার অর্থবল ছিল না, দীন দুঃখীকে নিয়ত অন্ন বস্ত্র দিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিবার আন্তরিকতা ছিল। অতএব জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন শুনিয়া, লোকের আপসোসের সীমা রহিল না।

মীরা ও সরলা প্রথম দুই দিন ইহার কিছুই জানিল না। সহসা পীতাম্বরের কাছে শুনিয়া উভয়ে বজ্রাহত হইল। দিদিকে পীতাম্বর গোপনে বলিল, ভগবানের সঙ্গে বিনোদবিহারীও গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া শোকে মীরা ম্রিয়মাণ হইল। প্রথমতঃ সরলাকে কিছু না বলিয়া ভ্রাতাকে সঠিক সংবাদ লইবার জন্য কৃষ্ণনগর পাঠাইল। পীতাম্বর অনুসন্ধানে জানিয়া আসিল, ডাকাইত দলের লোকগুলাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্তৃপক্ষীয়দের অভিপ্রেত। দিগ্‌নগর অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক ভগবানকে সাধু ভক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও পীতাম্বর শুনিয়া আসিয়াছিল। বিনোদকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। এক জন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইবে শুনিয়া লোকে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে যে নির্দোষী, তার কোনও প্রমাণ নাই। মোক্তার মহাশয়েরা পীতাম্বরকে টাকার মায়া না করিয়া মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

এ সর্ব্বনেশে খবর সরলাকে বলাই মীরা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল। পীতাম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতাকে আহারাদি করাইয়া যথাসময়ে মীরা সরলার সঙ্গে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

কথাটা এত কঠিন যে, চিত্ত স্থির করিয়াও মীরা সহসা দুঃখিনী বালিকাকে

কিছু বলিতে পারিল না। তাহার অসামান্য মুখশ্রীতে, কথা কহিবার ভঙ্গীতে, এমন একটা কারুণ্য জড়িত ছিল, সংসারিকতা এবং কঠোরতা যাহার প্রতি নির্ম্মম দৃষ্টিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইত। অন্যান্য দিনের মত মীরা রাতে কিছু "ফল" খাইল না দেখিয়া সরলা ভারি ব্যস্ত হইল—এতক্ষণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, দিদি বড় অন্যমনস্ক। অতএব দিদির বিছানায় বসিয়া আদর করিয়া সরলা তাহার চুলের গোছ লইয়া পড়িল। অতি কোমল কণ্ঠে আগ্রহাতিশয়ে সরলা থাকিয়া থাকিয়া মীরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"জামার মাথা খাও, কি হয়েছে বল না দিদি?"

তখন প্রথমতঃ একটি একটি করিয়া মীরা ভগবান সম্বন্ধে ভাইয়ের কাছে যাহা শুনিয়াছে, সরলাকে সকলই বলিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সরলা তাহার প্রত্যেক কথা তন্ময়চিত্তে শুনিতেছিল। ভাবিতেছিল, সে কি দুর্ভাগিনী, যে কেহ তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা করে, জগদীশ্বর তাহাকেই বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। এমন সময়ে মীরা প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে বিনোদবিহারীর কথাও বলিল।

শুনিয়া সরলা দিদির মাথা হইতে হাত তুলিয়া লইল। তার পর চক্ষু বুজিল। মীরা ফিরিয়া বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি অতি যত্নে আপনার কোলে তুলিয়া লইল। তাহার ফোঁটা ফোঁটা চোকের জলে সরলার কপোল ভাসিয়া যাইতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় যন্ত্রণায় প্রায় অনিদ্রায়, দুই জনের সে রাত্রি কাটিতেছিল। সরলা নীরবে মাতাকে মনে করিয়া কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিল, মীরা নানা কথায় প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—"ভয় কি, বিনোদ কোন দোষে দোষী নন, কোম্পানি অবিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড করবেন, এমনও কি হয়?" আবার কখন বা সরলার পুণ্যজ্যোতিঃপূর্ণ, অনিন্দিত আননশোভা দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিতেছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া সরলা একবার বাষ্পগদগদ-স্বরে বলিল, "দিদি, সে জন্যে কখন ত আমি তাঁর মন্দ কামনা করি নি। রোজ ভেবেচি, দুঃখিনী আমি, আমার অদৃষ্টই এই। তিনি সুখে থাকুন!" মীরা তাহাতে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "সতী সাধ্বী তুমি বোন্, তোমার পুণ্যে স্বামী তোমার নিরাপদ হবেন। ভয় কি?"

শেষরাত্রে ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বর মীরাকে ডাকিল,—"দিদি এবার দুয়ার খোল!" নূতন কোনও বিপদ আশঙ্কা করিয়া মীরা দ্বারের অর্গল মুক্ত করিল। ভাই বলিল, "বিশ্বনাথ এয়েচেন দিদি, তোমাদের একবার প্রণাম করে যাবেন। বল ত অন্দরে তাঁকে আনি। বাইরে কথাবার্ত্তা কওয়া নিরাপদ নয়।" মীরা সরলাকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া বসিল, পীতাম্বর বিশ্বনাথকে লইয়া আসিল।

বিশ্বনাথ চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল। বলিল, "এ জীবনে মা তোমাদের চরণ আর দেখতে পাব, সে ভরসা ছিল না; এই শেষ। এও ঘটত না, কেবল ব্রহ্মহত্যানিবারণের জন্যে, প্রাণের যারা বন্ধু, আজও যারা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফিরচে, তাদের কথা অগ্রাহ্য করে এসেচি!" এখন বিশ্বনাথ বিনোদবিহারীর কথা তুলিল। ভগবানের কথা কহিতে গিয়া বালকের মত অধীর হইয়া বলিল, "সে বাঁচতে পারত, কিন্তু মিছে কথা বলে প্রাণ বাঁচাবার লোক সে নয়। কিন্তু এ আমার জানা আছে, সাহেবেরা দগ্ধে দগ্ধে মারলেও ভগবান আমার অনিষ্টের একটি কথাও বলবে না। তার সাক্ষীতে ঠাকুরের ভাল হতে পারত, কিন্তু তা কি কোম্পানি মানবে?"

তখন বিশ্বনাথ বিনোদের জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দিল। বলিল, "আমার বিশ্বাস, মাঠাকুরাণীরা নিজে মাজিষ্টার সাহেবকে বললে ঠাকুর নিশ্চয় বাঁচবেন। সাহেব জাত, ভদ্দর বংশের মেয়ে ছেলের কথায় অবিশ্বাস করবে না।" পীতাম্বর ইহাতে আপত্তি করিল। "দিদি যদি হলফ নিয়ে মাজিষ্টর সাহেবের এজলাসে সাক্ষী দিতে যান, তবে মান-ইজ্জত কি রইল? প্রাণ থাকতে আমি তা করতে দেব না।" বিশ্বনাথ পীতাম্বরের নিতান্ত কাছে বসিয়াছিল, তাহার পিঠে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। "ভাই, তোমার মান ইজ্জতের হানি হতে পারে, এমন শলা আমি দিতে আসি নি। মাঠাকুরাণীরা সাক্ষী দিতে যাবেন, এ তো হতেই পারে না। কিন্তু তুমি কি শোন নি, পূজোর সময় সাহেব যখন এসেছিলো, মাঠাকুরাণীদের বলে যায়, বিপদের সময় মনে করতে। আমি বলি কি, তুমি নিজে একবার কৃষ্ণনগর গিয়ে মা ঠাকুরাণীদের তরফে সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে এসো। বরঞ্চ একখানা চিঠি লিখে নিয়ে যাও। এঁরা কি লিখতে পড়তে জানেন না?"

মীরা ও সরলা, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। পীতাম্বর বলিল, "দিদি একটু একটু হিন্দী জানেন, বাবা শিখিয়েছিলেন। দিদির মুখে রামায়ণ পড়া শুনতে তিনি বড় ভাল বাসতেন।" মীরা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিল। বিশ্বনাথ বলিল, "তবে বেশ হয়েচে। দিদির দস্তখত করা চিঠি নিয়ে ভাই কালই তুমি সাহেবের কাছে চলে যাও। চিঠি হাতে দেবার সময় মুখে মুখে তাঁকে তাঁর শেষ কথাটা মনে করে দিও। সাহেব জাত, প্রতিজ্ঞা ভুলবে না। নিশ্চয় দেখো, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসবে।"

পীতাম্বর মোক্তারদের পরামর্শ বিশ্বনাথকে বলিল। বিশ্বনাথ ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। "ছি ছি! ও দিক দিয়ে যেও না। ইংরেজ যদি মিছে বুঝতে পারে, হিতে বিপরীত হবে।" পীতাম্বর পুনশ্চ বলিল, "শুনতে পাই, নীল-কুঠীর ফেডি সাহেবকে ছেড়ে দিয়েই তোমার এত বিপদ। কৃষ্ণনগরে রাষ্ট্র যে, সে বাইবেল হাতে দিব্বি করেছিল, তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। মাজিষ্টর সাহেবও ত সেই সাহেব, তাকেই বা কি বিশ্বাস। শেষে আমরা শুদ্ধ বিপদে পড়বো না ত?" বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। ক্ষীণ ঈষৎ হাসি, কিন্তু তখনও তাহা আশার উৎসাহে সরস। "ভাই, ভাল মন্দ লোক সব জেতেই আছে। আজ ইংরেজ আমার ভয়ানক শত্রু বলে কি আমি তাদের অশেষ গুণ ভুলে যাব! আমি চললাম, আমার শেষ অনুরোধ ভুলো না। নিশ্চয়ই ঠাকুর রক্ষা পাবেন।"

তার পর বিশ্বনাথ ভক্তিভরে ঠাকুরাণীদের প্রণাম করিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আগামীবারে সমাপ্য।

কাবুলীর জয়।

দুপুরের মেলে যেতে হ'বে রেলে হরষের ভরে গাড়ীর ভিতরে
আপন করম-ঠাঁই, বসিনু গদীতে গিয়া।
বেশবাস পরি' স্মরিয়া শ্রীহরি জীবন-অমিয়, পরাণের প্রিয়,
হাবড়ার পানে ধাই। জগতে যে সার ধন,
কড়ি গুণি' দিয়া টিকিট কিনিয়া খুলিয়া তখন গ্রন্থ-রতন,
বড়িতে ফিরা'নু আঁখি; কবিতায় দিনু মন।
দেখিনু সময় বড় কম নয় কে আগে কে যায়, কে ভাবে কে চায়
তখনও রয়েছে বাকী। কে করে গিছার গোল,
কত লোক জনা করে আনাগোনা, মানসে না পশে; কবিতার রসে
কা'রও পানে না চাহিয়া, প্রাণ মোর উতরোল।

সহসা চমকি' চকিতে নিরখি
খুলিল-গাড়ীর দ্বার ;
দেখিনু ভয়াল কাবুলী করাল,—
ম্লেচ্ছের অবতার।
খুন মূর্ত্তিমান, পাষণ্ড পাঠান,
দারুণ যমের দূত।
অসভ্য মূরতি, বর্ব্বর অতি,—
ছি ছি! মানুষের ভূত।
কাঁধে ঝোলে চুল,—কিবা দিব তুল?
কেতকীর কাঁদি প্রায়,
টুপিটি খুলিতে ঝাঁঝাটি নাড়িতে,
কত ধূলা উড়ে তায়।
পা দু'টো তুলিয়া বসিল জাঁকিয়া
চাবি-হাত-জমী-চাপি ;
পেয়ে তার ভর, অচল পাথর,
গাড়ীখানা উঠে কাঁপি।
ধূসর ধূলায়, গন্ধ ছুটে যায় ;
পরিধেয় মোটা থান,
কটিতে কসিত চরণে জড়িত
হ'বে দুই তিন খান।
প্রাণ জ্ব'লে যায়, মরি যে ঘৃণায়,
উঠিছে পেটের ভাত,
সে স্বভাব নয়, নহে মনে হয়
তখনি ছুটিত লাথি।
কোথা এ সময় বীরত্ব-নিলয়
কিরিঙ্গীর দলবল?
ঝাড়েতে ধরিয়া, দক্ষিণা দিয়া,
দি'ক্ এরে রসাতল।

হেন কালে এক আইল বালক,
নয়নে সলিল-ধার ;
বলে,—"মহাশয়! কৃপা যদি হয়,
বিপদে কলহ পার।
বাস-রাখি' তীরে গঙ্গার নীরে
আনমনে করি স্নান :
চোর-কোথা ছিল, সুযোগ পাইল,
হরিল টিকিট-খান।
বিপদে এমন কে তারে এখন?
কে বুঝিবে ব্যথা মোর?
যার কাছে যাই, তাড়ায় সবাই,—
বলে,—'বেটা জুয়াচোর!'
নাহি নিজ-জন, সুদূর ভবন,
কড়ি যে নাহিক আর ;
কি করিব হায়! কে বা ফিরে-চায়?
করুণা মাগিব কা'র?—"
পরিচয় দিতে লাগিল কাঁদিতে ;
ভারে যে থামানো দায়।
সে নয়ন-লোর নিরখিয়া মোর
পরাণ ভাসিয়া যায়।

অকস্মাৎ একি! চমৎকার দেখি
কাবুলীর ব্যবহার ;—
ছিল সে শুইয়া, বসিল উঠিয়া,
মুছি আঁখি বারবার।
কপোলে তাহার ওকি বহে ধার?
মুখে ওকি ক্রোধ ঢালা!—
বলে,—"রাম রাম! ধারাবি এ কাম
ক'রেছে সে কোন্ শালা!"
এত বলি তবে, যে হাতে আহবে
নাশে সে নরের প্রাণ,
সেই হাতে খুলি মুদ্রার থলি,
দিল সে করুণা-দান।

নিজ আচরণ ভাবিয়া তখন
পাইনু বিষম লাজ ;—
বাহির নেহারি' ভিতর বিচারি
করেছি দোষের কাজ।
সংশয় ইথে না রহিল চিতে
স্মরি খেলা প্রকৃতির ;—
মোর ভগবান ভেদিয়া পাষাণ
বহান স্নেহের নীর।
হিন্দু খৃষ্টান, মোগল পাঠান,
এক সুরে গাঁথা সব ;
যেথা তার টুটে, অমনি সে উঠে
বসুধা ব্যাপিয়া রব।
পাঠানে তখন ডাকি মনে মন
কহি মার্জ্জনা চাই,—
"বৃথা এই সব বিলাস-বিভব,
তুমিই জিতিলে, ভাই!"

নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী।

বাণিজ্যব্যবসায়ী ইংরেজ কোম্পানীর কতিপয় স্বার্থপর ভৃত্যের হস্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাস অযথা কলঙ্কিত হইয়াছে। ক্বচিৎ কোনও ধর্ম্মান্ধ সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকও কোনও কোনও স্থলে সামান্য ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আবার কোথাও কোনও প্রভুমুখপ্রত্যাশী ভৃতিভুক্, অনুকূল পবনে পূর্ব্বপ্রধূমিত ঐতিহাসিক দাবানলের সহকারিতা করিয়া, আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ইংরেজ লেখকগণের অনেকেই পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে লেখনী সঞ্চালন করিয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্যের সমধিক অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। স্থলবিশেষে পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জনে সত্যনির্দ্ধারণের পথও পরিষ্কার রাখিয়াছেন। এই হিসাবে এ শ্রেণীর মহাত্মারাও রন্তবাদার্হ! ফলতঃ, দুই এক জন মহানুভব ঐতিহাসিকের কথা ছাড়িয়া দিলে, সত্যনিষ্ঠা এখানে নিতান্ত দুর্লভ। চতুরচূড়ামণি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বমতপরিপোষক কারণবিন্যাসে বিশেষ পটু; সুতরাং কোথাও অলঙ্কারযোগে, কোথাও বা কেবল লালিত্যের অনুরোধে, প্রকৃত বিষয়ের বর্ণন অত্যধিক সুরঞ্জিত ও অপ্রকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ বা ওজস্বিনী ভাষার স্রোতে পথভ্রষ্ট হইয়া প্রলাপ বকিয়াছেন। কেহ বা গ্রন্থরচনাকণ্ডূয়নের প্রকোপে লজ্জার আবরণ পরিহার করিয়া, ঊনবিংশবর্ষবয়স্ক, ঘোর অত্যাচারী, সিরাজউদ্দৌলার দাড়ি-গোঁফ-বিশিষ্ট দশ পুত্র সহ প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিরও অবতারণা করিয়াছেন।(১) দুঃখের বিষয়, এই সুচিরকালমধ্যেও আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রস্তাবিত

(১) Macfarlane's Indian Empire. এখানে সিরাজউদ্দৌলা ও অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলার পার্থক্যজ্ঞানের অভাব।—এই শ্রেণীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই; অথচ ইহাঁরাই আমাদের authority। কেবল এই জাতীয় ভ্রমও কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয়; কিন্তু অন্যভাবের জ্ঞানকৃত ভ্রমের সময় কি বলা যাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক—ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাঙ্গালার ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের অগ্রণী;—ভূমিকায় নানা পারসী-গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। নিজমতসমর্থনে মুসলমান শাসনের উপর কটাক্ষ করিবার অবসর কোথাও ত্যাগ করেন নাই। গ্রন্থের শেষে লিখিতেছেন, "ক্লাইবের স্মরণার্থ বলা উচিত, কোনও দেশীয় গ্রন্থকারই তাঁহাকে সিরাজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।" অথচ যে 'বিয়াণ্ উস্ সালাতিন্' গ্রন্থ ষ্টুয়ার্ট মহোদয়ের প্রধান অবলম্বন, তাহাতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,—"জগৎশেঠ ও ইংরেজ-কর্ত্তাদের পরামর্শ অনুসারে ঐ লোমহর্ষণ ব্যাপার সাধিত হয়।" হইতে পারে, এটি জনপ্রবাদমাত্র। কিন্তু উহার সদ্ব্যবহার করা ঐতিহাসিকের

বিশেষ আবশ্যক কালের একখানিও প্রামাণিক ইতিহাস সংগৃহীত হইল না! অথবা কোন্ কালেরই বা ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে? আমাদের এ অপবাদ কি চিরদিনই রহিয়া যাইবে? সত্য বটে, আজি কালি একটু সুবাতাস উঠিয়াছে, সাময়িক পত্রিকায় কখন কখন ক্বচিৎ চেতনাসঞ্চারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপেক্ষার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, এই সময়েই একটু কার্য্য-তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন। বার্ক, বেণ্টিঙ্কের ত কথাই নাই, আমরা এক্ষণে মিল, মেকলেও হারাইয়া, ষ্টিফেন ষ্ট্র্যাচি প্রভৃতির অত্যুজ্জ্বল রত্নোদ্ধার প্রত্যক্ষ করিতেছি।

খদ্যোতের আলোক নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই আলোকপদবাচ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোম্পানীর আমলের অতীত ইতিহাস অসিতবর্ণে রঞ্জিত দেখাইবার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। অধুনা সে আবশ্যকতা নাই। শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট বহুলপরিমাণে প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে দাঁড়াইবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, পূর্ব্বাপর তুলনায় শঙ্কিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার আর প্রয়োজন নাই। সত্যানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিবার এই প্রকৃত অবসর। কিন্তু কই, এ পর্য্যন্ত কয় জনে সত্যনির্দ্ধারণার্থ এ পথে অগ্রসর হইয়াছেন? ভারতের ইতিহাসে কয় জন টরেন্স মিলে? আমরা কি চিরকালই অনুবাদে কাটাইব? দুঃখের বিষয়, আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকেও এ পক্ষে বড়ই উদাসীন দেখিতে পাই। ইহাঁদের মৃতবৎ নিশ্চলতা বহুলপরিমাণে প্রচলিত মতের সাহায্য করিতেছে।

মুসলমান নরপতিগণের যথেচ্ছাচারমূলক শাসনে দেশে অরাজকতার আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রজার সুখশান্তি কিছুই ছিল না; ইত্যাদি কথা সাধারণের এবং তথাকথিত শিক্ষিত মহোদয়গণের মুখেও শুনিতে পাই। প্রথম কথা, রাজকীয় দেশশাসন বাঙ্গলা অনুবাদে 'যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী' সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। এইখানেই বিস্‌মিল্লায় গলৎ। পূর্ব্বতন প্রণালীর সহিত আধুনিক কর্ম্মচারিবহুল শাসনের তুলনা করা বা মুসলমানের অধীনে দেশের অবস্থাবর্ণন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। তবে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক না হইতেও পারে,—দোষগুণ সকল স্থানেই মিলে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি

উচিত ছিল। সম্ভবতঃ, ষ্টুয়ার্ট মহোদয়ের সংগৃহীত হস্তলিপির পারসী গ্রন্থে ঐ অংশটুকু ছিল না। স্মরণ রাখা উচিত, ষ্টুয়ার্টই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক-সংগ্রহকার।

সব অনেকেরই নাই, আর ইংরাজী গ্রন্থে যখন তৈয়ারী সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান, তখন প্রয়োজনই বা কোথায়? আমরা এখন 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দমাত্রেই উল্লসিত হই; স্বায়ত্তশাসন বস্তুটা কি, এই এবং কথিত স্বায়ত্তশাসনে তাহার কতটুকু অংশ বর্ত্তমান, এবং মুসলমান অধিকারে দেশীয় জমিদার ও গ্রাম্য-সমিতির কল্যাণে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন কতদূর লব্ধপ্রসর ছিল, এ কথা মনেই আনি না। যাহা হউক, এ কথার এ সময় নহে। অদ্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত পাত্রে রাজকার্য্যপ্রদানবিষয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয়। সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে এ সম্বন্ধে ইহাঁদের নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হইবে। অসভ্য মুসলমান নবাবগণের ব্যবহারে বর্ত্তমান সুসভ্য প্রজারঞ্জকবর্গেরও কিছু শিক্ষার বিষয় আছে।

ভারতের মুসলমান ইতিহাসগুলি, সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে লোকে যেরূপ বুঝে, তদনুসারে ঘটনা ও সময়ের যথাযথ বিবরণী সম্বন্ধে যথেষ্ট হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের ও প্রজাসাধারণের অবস্থা ইত্যাদি ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রায় কিছুই সাহায্য করে না। প্রায় প্রত্যেক মুসলমান ঐতিহাসিক, বাদসাহ ও তৎসংসৃষ্ট প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ এবং দরবারের বিবরণী দিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, মনে করিতেন। তজ্জন্যই আকবর বাদসাহের সময়ের ইতিহাস ভিন্ন প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস ইহাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল। অনেকেই হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকে ইতিহাস কথার প্রকৃত অর্থ কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করেন, বুঝা যায় না। দেশের ও দেশীয়গণের অবস্থাবর্ণনই যদি ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে হিন্দুকালের ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। আধুনিক মনীষিগণ এই উপাদানের উপরেই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কাব্যাদিতে মুসলমানেরা কোনও কালেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই। নাটকাদির ত কথাই নাই—ঔপন্যাসিক মুসলমান ধর্ম্মে বিহিত নহে। স্থপতিবিদ্যাতেও তাঁহারা অনেকাংশে হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। মোগল অধিকারের পূর্ব্বে পূর্ব্বকথিত ইতিহাসের সাহায্যে আমরা দেশের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না—তজ্জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বকোপকল্পিত মতে ঐ সময়ের সমালোচনা করিয়াছেন। স্থায়িভাবে দেশের অধিবাসী হওয়ায় ক্রমশঃই জেতা ও বিজেতার স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল; ক্রমশঃ পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাবিস্তার

হইয়াছিল। মোগল অধিকার হইতে, অন্ততঃ মহাত্মা আকবরের সময় যে এরূপ ঘটিয়াছিল, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সমগ্র হিন্দুগণ রাজভাষায় সম্যক্ প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে পূর্ব্বাবধিই তাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সামরিক বিভাগেও তাঁহাদের অব্যাহত অধিকার ছিল। (আইন্-আকবরীর অনুবাদক পণ্ডিতবর ব্লক্‌মান্ সাহেবের পদানুসরণ করিয়া ইদানীং কেহ কেহ আদর্শ নৃপতি মহাত্মা আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।) গত শতাব্দীতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গীয় নবাবগণের কর্ম্মচারিস্বরূপে কিরূপ ব্যবহৃত হইতেন, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

মুরশিদাবাদের নবাবগণের শাসনসময়ে যে সমস্ত প্রধান রাজপদের প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) দেওয়ান ই আলি বা মোদার উল্ মোহান্ (প্রধান মন্ত্রী)।

(২) দেওয়ান খাল্‌সা শরিফা বা উজীরমালী (Finance minister)

(৩) দেওয়ান ই তন্ (তন্‌খার দেওয়ান) Pay-master.

(৪) দেওয়ান ই বেউতাৎ (Minister of domestic affairs or private Secretary.)

(৫) দেওয়ান খান্‌সামান্ (Steward) আসবাব্, কারখানাজাত প্রভৃতির অধ্যক্ষ।

(৬) দেওয়ান ই সুবাজাৎ (প্রাদেশিক রাজস্বসচিব)।

(৭) নায়েব সুবাদার বা নায়েব নাজিম (Deputy Governor)।

(৮) মীর্ বক্‌সী কুল্ বা সেপাসালার অজম—প্রধান সেনাপতি।

(৯) বক্‌সী আহাদিয়ান্ (Court martialএর ক্ষমতাপ্রাপ্ত)।

(১০) বক্‌সী সুবাজাৎ (প্রাদেশিক সেনাপতিবর্গ)।

(১১) প্রধান সেনাপতির অধীনে, বকসী হুয়েম, সুয়েম ও চাহারাম্।

(১২) বক্‌সী সাগের্দ্দপেসা (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)।

(১৩) হাজারিয়ান্—পঞ্চ শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সেনানায়ক।

(১৪) জমাদার (পদাতিক সেনানায়ক)।

(১৫) মুস্তোফী, দেওয়ানী সেরেস্তার সেরেস্তাদার ও মুসরেফ্।

(১৬) ফৌজদার (মফঃস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেট্)।

এই ষোড়শটি প্রধান পদ ব্যতীত, হুজুরনবীস্ (সনদ্-লেখক) খাস্‌নবীস্, বেকায়া

নবীস্ (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্তলেখক) দারোগাই আদালত (আদালত ষ্টেট্ আফিয়াই নিজামত ও দেওয়ানী এই দুই প্রধান বিচারালয়ে বিচারকার্য্য জন্য) দারোগা কায়থানাজাৎ, মীর তোজক (দরবারের বন্দোবস্তকারক) ের এমাবৎ, সদরস্ সদুর (রাজধানীর প্রধান বিচারপতি) কাজীউল কোজাৎ, মুফতী, মোহতমীব্ (কুপথগামীদিগের বিচারক) রাজস্ববিভাগে, আমিন কাছারী, আমিন্ সুবজাৎ, কাননগুয়ান্ করোবিয়ান্, পেস্কারান্ আহাদিয়ান্, খাজাঞ্চী, তহবিলদার কোতাদার (পোদ্দার) বা মুদ্রাপরীক্ষক, কতোয়াল্ (Police Superintendent) এল্চিয়ান্ (দূত Ambassador) সওয়ানে নেগার্ (Newspaper Editor) ও মুন্সী প্রভৃতি পদ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে বক্সী, মুন্সী, শিক্দার, মজুমদার প্রভৃতি পদবীর বহুল প্রচার থাকায়, হিন্দুগণ ঐ সমস্ত কার্য্যে কি পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। মুস্তোফী ও খাস্নবীস পদবীও হিন্দুদের মধ্যে বিরল নহে, বরং মুসলমানের মধ্যে দেখা যায় না। যাহা হউক, নিম্নতন পদে হিন্দুদের নিয়োগ কতদূর লব্ধপ্রসর হইয়াছিল, তাহা দেখান বাহুল্যমাত্র। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন—ইহার প্রমাণ পাইলেই, অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অপরটিও অনুমিত হইবে। দেওয়ান্ ই আলি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্বপদে এবং প্রাইভেট্ সেক্রেটরীর কার্য্যে, সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়েরাই নিযুক্ত হইতেন। কেবল আধুনিক ইতিহাসে যিনি পাষণ্ড বলিয়া বর্ণিত, একমাত্র সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাই সর্ব্বোচ্চ পদেও হিন্দু রাজা মোহনলালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (২) রাজস্ববিভাগে হিন্দুরাই ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রবেশলাভ করিতেন। তাই বলিয়া মুসলমান কর্ম্মচারী এ বিভাগে একবারেই ছিলেন না, এমন নহে। প্রাদেশিক দেওয়ানী কার্য্যে অনেক মুসলমানও নিয়োজিত হইতেন। ফল কথা, এখানে অধিকাংশ স্থলে গুণানুসারে রাজকার্য্য নিয়োগ দেখা যায়, জাতি বা ধর্ম্মানুসারে নহে।

ইংরেজী ইতিহাসে স্বনামখ্যাত মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা মুর্শিদকুলী খাঁর যে [illegible] হইয়াছে, এবং যাহা এতদিন বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইয়া [illegible] তাহা ভ্রান্তিমূলক। এক জন অজ্ঞাতনামা লেখকের পারসী গ্রন্থ

(২) মহাত্মারা বীরপ্রবর মোহনলালের যে অপবাদ রটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—[illegible] আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

হইতেই ইহার উৎপত্তি। লেখক ইংরেজ গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশানুসারে এই গ্রন্থ রচনা করেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিরুদ্ধ প্রমাণ ইহার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসে আলোচিত হয় নাই। অবশ্য দুই এক জন বিজ্ঞ লোক লেখকের প্রবাদবাক্য আহা আপন করেন নাই। বিখ্যাত সার জন শোর মহোদয় ইহাকে এক আশ্চর্য্য ধরণের ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে এ বিষয়ে একটি কথা মাত্র বলিতে চাই; যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান (মুর্শিদকুলী) বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসস্বরূপে জীবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, স্বীয় অতুল প্রতিভাবলে সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছেন, যাঁহার ন্যায়পরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি চারিত্র্যগুণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার প্রতিকূলে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে সমধিক চিন্তা করার প্রয়োজন।

যত দূর জানা যায়, মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতেই বঙ্গের সুবাদারগণের অধীনে হিন্দুকর্ম্মচারিনিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হউক, বদ্ধপ্রসর হয়।

আমরা এক্ষণে ক্রমশঃ প্রধান হিন্দুকর্ম্মচারিগণের উল্লেখ করিব।

(১) দেওয়ান ভূপতি রায়—বাদসাহ সরকারে রাজস্ববিভাগে সুদক্ষতার সহিত কার্য্য করার জন্য ইনি আরঙ্গজেবের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন, এবং তাঁহার পার্শ্বচর কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী কায়স্থ। কুলী খাঁ ইহার স্থানীয় অভিজ্ঞতায় বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়, ইহাঁকে আপন সহকারী মনোনীত করেন। কুলী খাঁর সুবিখ্যাত জমিদারী বন্দোবস্তের এক জন প্রধান সহায় বলিয়া জীবদ্দশায় তিনি খালসা দেওয়ান বা রাজস্বসচিব ছিলেন। জমিদারী বন্দোবস্তে সুশৃঙ্খলাবিধানের জন্য বঙ্গদেশ ইহার নিকট বিশেষ ঋণী। মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ানীর প্রথম বর্ষে নিকাশ দিতে গিয়া দাক্ষিণাত্যে ঊর্দ্দু রীমল্লো (বাদসাহশিবির) হইতে ইহাকে সঙ্গে আনেন বলিয়া, ষ্টুয়ার্ট সাহেব ইহাকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

(২) কিশোর রায় অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। ইনি পূর্ব্বে এলাহাবাদে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পরে কুলীখাঁর দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ (Private Secretary) হন। এখানে দেখা যায়, যে কার্য্যে পরবর্ত্তী নবাবেরা সাধারণতঃ স্বদেশীয় মুসলমান কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করিতেন, সে কার্য্যের ভার মুর্শিদকুলী খাঁ নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বস্ত হিন্দুর প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ ভর্ক

ষ্টুয়ার্ট মহোদয় বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অনুমান করিয়া—ভূপতি রায় ও কিশোর রায় মুর্শিদের পূর্ব্ব জ্ঞাতি ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণমধ্যে রায় উপাধি তৎকালে প্রচলিত ছিল কি না, আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান মুর্শিদের তিন কুলে কেহ থাকিলে তিনি মুসলমান বণিকের নিকট বিক্রীত হইতেন না, এবং প্রস্তাবিত সময়ে দুই জন ভিন্ন হিন্দুকর্ম্মচারী প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত না দেখিলে বরং ঐতিহাসিক মহোদয়ের উক্তরূপ অনুমানের কারণ থাকিত।

(৩) দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়। ইনি মুর্শিদাবাদ নগরের অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ ডাহাপাড়ার সুবিখ্যাত প্রধান কানুনগো বঙ্গাধিকারী মহাশয় বংশের বংশধর। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী খাজুরডিহী গ্রামে ইহাদের প্রাচীন বাস। ইহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ,—খাজুরডিহীর মিত্রবংশীয়। বাদসাহ সরকার হইতে প্রধান কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইহারা যথাক্রমে মালদহ ও ঢাকায় বাস করেন। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলে দর্পনারায়ণই প্রথমে ডাহাপাড়ায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন (ঢাকা হইতে আগত হিন্দুদের বাস ছিল, এই জন্য এই পল্লীর নাম ডাহাপাড়া হয়;—ডাহা =ঢাকা)। ভূপতি রায়ের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দনারায়ণ দেওয়ানী কার্য্যে সম্পূর্ণ পারগ হইবেন ভরসা না করিয়া, মনীষী মুর্শিদকুলী সমসাময়িক বাঙ্গালীগণের মধ্যে রাজস্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ দর্পনারায়ণকে দেওয়ানীর ভার দেন। ইনি একে প্রবীণ, তাহাতে কানুনগো ও খালসা দেওয়ানী একাধারে ন্যস্ত হওয়ায়, ইনি বৎসরের মধ্যে বিংশতি লক্ষ টাকা আয় বেশী দেখান। প্রথিত আছে, কুলী খাঁ দেওয়ানীর প্রথম বর্ষে বাদসাহের নিকট দাখিল করিবার জন্য কাগজ প্রস্তুত করিয়া দর্পনারায়ণকে সহি করিতে অনুরোধ করেন। কানুনগো বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত, রাজস্ব ও ভূসম্পত্তির রেজিষ্ট্রার; তাঁহার দস্তখত ভিন্ন বাদসাহ দরবারে প্রাদেশিক হিসাব গ্রাহ্য হইত না। দর্পনারায়ণ বলিয়া বসেন, কানুনগো রসুম বাবদে তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দস্তখত করিব না। দেওয়ান কুলী খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেও তিনি দস্তখত করেন না। দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দস্তখত করেন—কেবল ঐ দস্তখতে আরঙ্গজেবের দরবারে কার্য্যোদ্ধার কঠিন ভাবিয়া, কুলী খাঁ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছিলেন; এমন সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁহার এক সুবিধা জুটিয়া

গেল। পুঁটিয়ারাজ দর্পনারায়ণ তদীয় প্রিয়পাত্র খ্যাতনামা নাটোরে নন্দনকে উকীলস্বরূপ নবাব-দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি কালক্রমে স্বনামা মৈত্রপ্রধান কানুনগোর সুনয়নে পতিত হইয়া সহকারী কানুনগোরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নবাব সরকারে সুপরিচিত হওয়ায়, মুর্শিদকুলী খাঁ নানা কৌশলে ও প্রলোভনে তাঁহার দ্বারা কাগজে কানুনগো মোহর দেওয়াইয়া কার্য্যোদ্ধার করেন। এই অবধি রঘুনন্দনের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। (৩)

(৪) রঘুনন্দন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা উক্ত রাজা রঘুনন্দন দেওয়ানী কার্য্যে নিয়োজিত হন। প্রথিত আছে, তিনিই বঙ্গে প্রথম রায় রায়ান উপাধি পান। রঘুনন্দনের কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ পূর্ব্ব জমিদারগণের নিঃসন্তান লোকান্তরপ্রাপ্তি অথবা বিদ্রোহজন্য উচ্ছেদসাধনের পর, ভাটুরিয়া, রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ক্রমশঃ তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

(৫) যশোবন্ত সিংহ—মুরশিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র অন্যতম রাজস্বসচিব। ইনি মুরশিদকুলীর স্বহস্তশিক্ষিত; সুতরাং অনেকপরিমাণে তাঁহার সদ্‌গুণ-সমূহের অধিকারী হইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন, যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রভুর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতপরিমাণে অনুকরণ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের পক্ষে সুবিধাজনক যে কোনও বন্দোবস্ত করিতেন,

---

(৩) একমাত্র ষ্টুয়ার্ট যাঁহাদের সম্বল, এই বিষয়ে তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই। এ স্থলে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিস্তৃত গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বকথিত পারসী গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তী হইয়া পরবর্ত্তী দুই এক জন ঐতিহাসিক বলেন,—"দর্পনারায়ণ কাগজে দস্তখত করিতে অসম্মত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি মুর্শী খাঁ অত্যন্তক্রোধ হন। কোনও উপায়ে প্রতিশোধ লইবার কল্পনা তিনি কিছু কাল হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন—সুতরাং বাহিরে সদ্ভাব ও শিষ্টাচার প্রদর্শনে অসতর্ক করিয়া তাঁহাকে খালসা দেওয়ানের পদগ্রহণে সম্মত করা হয়। এবং এক বৎসর কার্য্য করিবার পর হিসাব লইবার ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল—ঐ কারাবাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।" কেহ কেহ আবার আর একটু বেশী দূর অগ্রসর—দর্পনারায়ণের মৃত্যুঘটনার পরে বাদসাহের ভয়ে তাঁহার পুত্রকে কানুনগো রসুলের অংশের দশ আনা দিয়া শান্ত করিবার কথাও আছে। আমরা উক্ত বিনামা গ্রন্থকারের প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। সার জন শোর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় লেখকগণের সংগৃহীত নাটোর রাজবংশের ইতিহাস ও স্থানীয় চিরাগত প্রবাদ আমাদের পক্ষে। দর্পনারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুঘটনা তাহাগাড়ার কানুনগো বংশের কেহ কখনও শুনেন নাই। কোম্পানীর রাজস্বসচিব (সেরেস্তাদার) গ্রাণ্ট সাহেবও নিজ রাজস্ববিষয়ক প্রস্তাবে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই—এটিও উক্ত প্রবাদের অলীকতার সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ। নবাবী আমলে এই কানুনগো বংশের প্রতিপত্তির কথা যাঁহারা একটু জানেন, তাঁহারাই ঐ প্রবাদ অগ্রাহ্য করিবেন। কানুনগো কার্য্যের অংশের তারতম্যের কারণ স্থানান্তরে বক্তব্য।

তাহাতেও তিনি প্রভুর ন্যায় প্রজাবর্গের সুখসচ্ছন্দতাবৃদ্ধির সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন, এবং সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। ইনি সরফরাজ্ খাঁর শিক্ষক ছিলেন। বিধর্ম্মী রাজপুত্রের শিক্ষকতাকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগ বড় সুলভ দৃষ্টান্ত নহে। ইহাঁকেও যদি কেহ জাতিত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চাহেন, তবেই নাচার! নবাব সুজাউদ্দৌলার পুত্র সরফরাজকে ঢাকার নায়েব নাজিম করিয়া, প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যশোবন্তকে দেওয়ান স্বরূপে প্রেরণ করেন। ভাবী রাজা রাজবল্লভ এই সময় হইতেই রাজস্ববিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন। যশোবন্তের সুশাসনে ও প্রজাবর্গের প্রতি সদয় ব্যবহারে পূর্ব্ববঙ্গ শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-সচ্ছন্দতার সীমা ছিল না। অপক্ষপাত বিচারে দেশে সর্ব্বথা শান্তিপ্রচার হইয়াছিল। শস্যের মাশুল উঠাইয়া দিয়া ও বাণিজ্যবিষয়ে কৈবল্য রহিত করিয়া যশোবন্ত শস্যের দর বিলক্ষণ সস্তা করিয়া গেলেন। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায়, তিনি ঢাকার পশ্চিম তোরণ বন্ধ করিয়া উপরে একটি দিব্য দিয়া লিখিয়া যান, যিনি শস্যের দর ঐ প্রকার সস্তা না করিতে পারিবেন, তিনি যেন ঐ দ্বার উদ্ঘাটন না করেন। যশোবন্ত মহাসমারোহে দ্বারোদ্ঘাটন করান। এই সমস্ত কারণে সরফরাজ খাঁর নায়েবী আমল ঢাকার ইতিহাসে রামরাজ্যস্বরূপ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী নায়েব সুবাদার মুরাদ আলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের সূত্রপাত হইতে লাগিল দেখিয়া, যশোবন্ত পদত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিশ্চেষ্টভাবে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

মুরশিদকুলী খাঁর সময়ে সামরিক বিভাগেও হিন্দুসেনানীনিয়োগের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। ইনি সুব্যবস্থায় রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, পাশববলের উপর নির্ভর করিতেন না। সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক মাত্র রাখিয়াছিলেন। এই সামান্য সৈন্যেরও অধিকাংশই হিন্দু-সেনানীর অধীনে কার্য্য করিত।

(৬) লাহরী মল্ল রাজা রঘুরাম। রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্যে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যের মধ্যে লাহরীমাল নামক এক সেনানীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সমভিব্যাহারী কৃষ্ণনগররাজ বীরশ্রেষ্ঠ রঘুরামের হস্তে বিপক্ষ পক্ষের সেনাপতি জমাদার গোলাম মহম্মদ নিহত হন বলিয়া, নবাব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া নূতন জমি-

দারী প্রদান করেন,—ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। আবার রাজসাহী রাজবংশের ইতিহাসে রঘুনন্দন এই যুদ্ধে বিশেষ কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করেন, এরূপ বর্ণিত আছে; এ দুই স্থানে প্রবাদের মিশ্রণ সম্ভব।

(৭) দলিপ সিংহ হাজারী। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ আলিবেগ্ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, ভূতপূর্ব্ব বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ফৌজদার জেয়াদিন সহজে কার্য্যত্যাগ না করিয়া, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণের সাহায্যে বিদ্রোহী হন। নবাব, বিদ্রোহদমন জন্য ও আলিবেগের সাহায্যার্থ, দলিপ সিংহ হাজারীকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। ছলপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাবে অতর্কিত করিয়া একজন গোলন্দাজ দ্বারা ইহাকে হত্যা করিবার কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে। এখানে দেখা গেল, দলিপ সিংহ একজন হাজারী সেনানী। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছয় হাজারের অধিক ছিল না। এই দলিপ সিংহ যে হিন্দুস্থানী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। "হাজারী" উপাধি এখনও অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। মুরশিদাবাদের সাধকবাগে এক সম্ভ্রান্ত হাজারী বংশ আছে। রায় রায়নে আলমচাঁদ নবাব সুজাউদ্দীনের প্রধান রাজস্বসচিব। ইনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও প্রভুপরায়ণতায় কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। নবাব ইহার পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্যই করিতেন না, এবং মৃত্যুর সময় পুত্রকেও ইহার উপদেশ-অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষরূপে বলিয়া যান। ইনি যুদ্ধকার্য্যেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সরফরাজ্ ও আলিবর্দ্দী খাঁর মধ্যে 'সুতী' অথবা 'গিরীয়া' ক্ষেত্রে যে প্রবল যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি প্রভুকার্য্যে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। এই গিরীয়া যুদ্ধে বিজয় সিংহ নামক জনৈক সৈনিক ও তাঁহার নবমবর্ষীয় বালক জালিমের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী রিয়াজগ্রন্থে বর্ণিত আছে। দেখিতে পাই, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হিন্দুসেনাপতি ও সৈনিকের অভাব ছিল না। হিন্দুসৈনিকেরা কখনও এই বিশ্বাসের অপব্যবহার করেন নাই। এই বিষয় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজ্যকালে হিন্দুকর্ম্মচারিগণের ব্যবহারে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। মুসলমান ইতিহাসে ইহারই প্রথমে রায় রায়ান্ উপাধিপ্রাপ্তির কথা আছে।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সমদর্শিতা ও প্রজারঞ্জন প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছে। এই মহাত্মাও আকবর বাদসাহের প্রদর্শিত পদবীর অনুসরণ করিয়া সর্ব্বথা প্রকৃতিবৃন্দের ইষ্টসাধনে সুচেষ্টিত ছিলেন। যোগ্যতা অনুসারে, জাতিধর্ম্ম-

নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে বিনিয়োগে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাঁর তুল্য দৃষ্টান্ত অতি অল্পই পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বতন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এই সমদর্শিতার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। মুসলমানরাজ সমদর্শী, ইহা বড়ই অসম্ভব। অতএব প্রমাণ হইল যে, ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় অর্থ আছে! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কৃত হইল! 'পলিসী'-কুশল এই ব্যবহারের মধ্যে কূট পলিসী দেখিলেন। স্থির হইল যে, উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে সজ্জিত করিয়া নবাব স্বীয় আসন অটল রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অনেকে আকবর বাদসাহসম্বন্ধেও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব ধীশক্তি ও কুটতর্ককুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

(৯) নন্দলাল (নন্দুলাল)। আলিবর্দ্দী খাঁর একজন একান্ত বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি। সরফরাজ্ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আলিবর্দ্দী খাঁ ইহাকে সমগ্র হিন্দুসৈন্যের অধিনায়ক করিয়া বঙ্গে লইয়া আসেন। সুতীর বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে আলিবর্দ্দী খাঁ যাবদীয় সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নন্দলালের অধীনে স্থাপন করিয়া, আপন ছত্র ও পতাকা রক্ষার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। আফগান্ সেনাপতিগণের উপর এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। নন্দলাল যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া, সরফরাজ খাঁর সেনাপতি প্রসিদ্ধ বীর গয়েস্ খাঁর প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অদৃষ্টক্রমে সম্মুখসমরে ধরাশায়ী হন। মুতাক্ষরীণে দেখা যায়, প্রকৃত যুদ্ধ পশ্চিমপারেই হইয়াছিল; পূর্ব্ব পার্শ্বে স্বয়ং আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক নীত সৈন্যদল অতর্কিতভাবে শত্রুশিবির আক্রমণ করে ও অল্পক্ষণমধ্যে সরফরাজ খাঁ নিহত হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এখানকার যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হয়।

(১০) রাজা জানকীরাম। বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। ইনি বাঙ্গালা হইতে দেওয়ান হইয়া আলিবর্দ্দীখাঁর নায়েবী আমলে পাটনায় গমন করেন। নাজিম হইয়া আলিবর্দ্দীখাঁ ইহাকে প্রথমতঃ দেওয়ান ই তন্ ও সামরিক বিভাগের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র কটকের আক্রমণে বিতাড়িত আলিবর্দ্দীর কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, ইনি নবাবের সমভিব্যাহারে ছিলেন। পরে স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ দ্বারা নবাবের সৈন্যসংগ্রহাদি কার্য্যের সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইনিই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের

কল্পনা প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ভিন্ন কেবল ইহারই নিকট পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল এই এক কার্য্যে প্রভু ও ভৃত্যকে পাপে লিপ্ত দেখা যায়। তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবারও অনেক কথা আছে। যাহা হউক, অতঃপর রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এত অধিক হইয়াছিল যে, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও কোনও বিষয়ে দরবার করিতে হইলে মন্ত্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। পাটনার ডেপুটী সুবাদর, সিরাজের পিতা জৈনউদ্দীনের মৃত্যুর পর, ঐ পদে সিরাজকে নামমাত্র নিযুক্ত করিয়া, প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা জানকীরামকেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজা সসম্মানে এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। পাঠকগণ দেখিবেন, পাটনার নায়েব সুবাদারী নবাবের অধীনে সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য। অন্যান্য প্রাদেশিক নৃপতি ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ ব্যস্ত বেহার বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। সুতরাং একভাবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণে পাটনার শাসনকর্ত্তার উপরেই বঙ্গদেশরক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত। সহৃদয় পাঠক অসভ্য মুসলমানের অধীনে বাঙ্গালীর হস্তে এই গুরুভার ন্যস্ত দেখিয়া, এবং আধুনিক সুসভ্য প্রজাবৎসলতার দিনে সামান্য সহকারী পুলিস অধ্যক্ষতার পদও দেশীয়দের পক্ষে অবারিত নহে ভাবিয়া, দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

(১১) রাজা দুর্লভরাম। ইনিই ইতিহাসে খ্যাত ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের বঙ্গীয় বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়ক রায়দুর্লভ। ইনি রাজা জানকীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণকে দূরীভূত করিবার পর, আলিবর্দ্দী খাঁ সেনাপতি মুস্তাফাখাঁর অনুরোধে, তদীয় পিতৃব্য আবদুল নবী খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করেন। চির-সৈনিক নবী রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া,নবাব, দুর্লভরামকে তাঁহার পেস্কার বা দেওয়ানরূপে প্রেরণ করেন। এইখানে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে দুর্লভরামের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, এবং এই প্রথম অবস্থাতেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অভাববশতঃ তাঁহার নিয়োগ স্পষ্টই দেখা যায়। এরূপ সাবধান হইবার কারণেরও অভাব ছিল না। অতঃ কালের মধ্যেই সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইলেন; আবদুল নবী সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর দুর্লভরামকেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা করিয়া স্থায়িভাবে কটকে রাখা হয়। দুর্লভরাম বাল্যাবধিই ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন—দণ্ডী সন্ন্যাসিগণের সহিত ধর্ম্মালাপে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময়ে রঘুজী ভোঁসলার গুপ্তচর জনৈক ভক্ত সন্ন্যাসীর কৌশলে

পড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। এক বৎসর এই-রূপে বন্দী থাকিয়া, দাক্ষিণাত্যের মহাজনগণের সাহায্যে তিন লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়া, মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। নবাব তাঁহার পিতার প্রভুভক্তির পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ হইতে ঐ তিন লক্ষ মুদ্রাপ্রদানের আদেশ দেন।

অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে আমরা বারংবার মিরজাফর প্রভৃতির ন্যায় দুর্লভরামকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত দেখিতে পাই। ১১৬৫ হিঃ অব্দে (১৭৫২ খৃঃ) রাজা জানকীরামের মৃত্যু হয়। নবাব দুর্লভরাম প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে শোকের খেলাত দেন। ইতিপূর্ব্বেই দুর্লভরাম সৈন্যবিভাগের প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ দেওয়ানী কার্য্যে স্থায়ী হইলেন। কালক্রমে তিনিই প্রধান দেওয়ান হন, ইহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। প্রথম অবধিই তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হয়।

(১২) মহারাজা রাজবল্লভ, দুর্লভরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। সিরাজের রাজত্ব-কালেই পিতৃসাহায্যে ইনি খালসার রায় রায়ান্ অর্থাৎ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন বলিয়া কথিত আছে। পিতা পুত্র উভয়েই ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ক্লাইবও তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। দুর্লভরামের কলিকাতায় পলায়নের পর, ক্লাইব মুরশিদাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস সাহেবকে উপযুক্ত অনুচরাদি সহ রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইবার আদেশ দিয়া লিখি-য়াছিলেন,—'রায়দুর্লভ ও ইংরেজগণের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বোধ হয়, তোমার বিদিত নাই। আমরা কেবল তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার পরিবারবর্গেরও রক্ষার জন্য লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিশেষ বাধ্য।' কোম্পানীর আমলেও রাজ-বল্লভ আজীবন খালসার রাঁই রায়ান্ পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ৭০১৭ নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায়, নূতন রাণী (তাঁহার স্ত্রী) মৃত-পতির কার্য্য উল্লেখ করিয়া পেন্সন প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার পোষ্যপুত্র-বংশীয়েরা এক্ষণে কলিকাতা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস করেন।

(১৩) রায় রায়ান্ চিন্ময় রায়। অতি সামান্য কার্য্য হইতে ক্রমশঃ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতায় গুণে রাজস্ববিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া-ছিলেন। রাজা জানকীরাম নায়েব নাজিম হইয়া পাটনায় গমন করিলে, ইনিই প্রধান মন্ত্রী হন। মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম মহম্মদ ইহার কার্য্যদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সহস্র উপরোধ সত্ত্বেও প্রভুর

কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারে, এমন কর্ম্মে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না। নবাব তাঁহার এত দূর সম্মান করিতেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও অনেক সময়ে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মন্ত্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এক সময়ে মুর্শিদকুলীণ-লেখক নবাবের খাস্‌কামরায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রাদি স্বজন সহ বিশ্রম্ভালাপের সময় উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ কথাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান দেওয়ানের (চিন্ময় রায়ের) সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ান ও নিজ দেওয়ানের তুলনা করায়, নবাব উত্তর করেন, 'না বৎস, তুমি যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলে, তাঁহারা আমার ভৃত্যমাত্র; বর্ত্তমান মন্ত্রী আমারই প্রভু।'

(১৪) বীরেশ্বর দত্ত (বীক দত্ত—সিয়ার)। খালসার সহকারী দেওয়ান চিন্ময় রায়ের মৃত্যুর পর দেওয়ানী পদে অস্থায়িভাবে উন্নীত হন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কিছু দিন ইঁহার কার্য্যসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, মাহারাষ্ট্রীয় কটকের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযানের পর প্রত্যাগত হইয়া, মতিঝিলে অবস্থানকালে ইঁহাকে খেলাত প্রভৃতি দিয়া, ঐ কার্য্যে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া, ইনি অধিক দিন কার্য্য করিতে পারেন নাই। শোথ রোগে অচিরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনিও একজন সামান্য লোক;—কার্য্য-দক্ষতা গুণেই উচ্চপদে সমাসীন হন, সুপারিসে নহে।

(১৫) রাজা কীর্ত্তিচাঁদ। বীরুদত্তের পরলোকগমনের পর, তাঁহার সহকারী অমৃতরায় কিছু দিন কার্য্য করেন। পরে, রায় রায়ান্ আলমচাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদ দেওয়ান হইলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বিহারের মন্ত্রিত্বপদে ব্রতী থাকিয়া সিরাজের পিতা জৈন্ উদ্দীনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। আফগান সর্দ্দারগণের বিদ্রোহসময়ে ইঁহার প্রভুপরায়ণতার খ্যাতি প্রচারিত হয়। ইদানীং কাশীতে বাস করিতেছিলেন। রাজস্বসম্বন্ধে অনেকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, ইনি নবাবের অনুরাগ আকর্ষণ করেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া যথোপযুক্ত খেলাত সহ দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হয়েন। কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতা আলমচাঁদ বহুকাল হইতে রাজস্ববিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকায়, ইঁহার নিকট অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল। সুতরাং অত্যল্পকালের মধ্যেই কয়েক জন প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক ও জমিদারের নিকট প্রচুর পূর্ব্ব বাকী উদ্ধার করিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমানের রাজার নিকট পাওনা বেশী ছিল। এই বাকীর এরূপ অকাট্য প্রমাণ দেখান হইল যে, কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় থাকিল না। সকলেই নিজ দেয় স্বীকার করিলেন। এইরূপে এক কোটীর উপর টাকা রাজ-

কোষে আদায় হইল। আবিষ্কর্ত্তার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। সেই অবধি নবাবের ইহার প্রতি অটল বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। পূর্ণ দুই বৎসর কাল সসম্মানে ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ইহার কালপ্রাপ্তি হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরকারী অমৃত রায়কে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(১৬) অমৃতরায়। বহুদিন রাজস্ববিভাগে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং কীর্ত্তিচন্দ্রের পরলোকান্তে রায়রাইয়াঁ উপাধি ও খেলাত সহ তিনিই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

(১৭) রায় চিন্তামন্ দাস। পাটনায় আলিবর্দ্দী খাঁর অধীনে দেওয়ানির সময় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এজন্য সিরাজের পিতা জৈনউদ্দীন নায়েব নাজিম হইয়া নবাবের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহাকেই দেওয়ান করিয়া লইয়া যান। মুতাক্ষরীণকার বলেন, জৈনউদ্দীন গুণের পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি উপযুক্ত লোককেই কার্য্যে নিয়োগ করিতেন।

(১৮) রায় গোকুলচাঁদ্ (গোকুলচন্দ্র রায়—বাঙ্গালী)। আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বহুদিন ঢাকায় প্রশংসার সহিত দেওয়ানী করেন। ইনি যশোবন্ত রায়ের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নোয়াজিম্ মহম্মদও তাঁহার প্রতিনিধি হোসেন কুলী খাঁ, প্রায়ই নবাব-দরবারে থাকিতেন। তজ্জন্য সমস্ত ভার ইহার হস্তেই ন্যস্ত হয়। ইহার কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণ সুপ্রসিদ্ধ।

(১৯) রায় গোকুলচাঁদের পরে, ঢাকার দেওয়ানী কার্য্য, ইতিহাসখ্যাত বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের হস্তে পড়ে। ইহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ সিরাজের রাজ্যকালে ঘেসিটী বেগমের পক্ষসমর্থন, শঠতাপূর্ব্বক সরকারী কাগজপত্র ও তহবিল গোপন, তজ্জন্য তদীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতায় পলায়ন, লোভপরবশ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের তাঁহাকে আশ্রয়দান ও নবাবের সহিত সংঘর্ষণ, আধুনিক ইতিহাসে যথাযথ বিবৃত না থাকিলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে। গিরকাসিমের সময়ে ইহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু অর্ম্মি সাহেবের আরোপিত "চরিত্রদোষ" অমূলক অপবাদমাত্র।

(২০) রাজা রামসিংহ। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে গুপ্তদূতবিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ভিন্ন এ পদ অন্যে পাইত না। মারহাট্টা হাঙ্গামার পরে ইনি মেদিনীপুরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন। ফৌজদারের পদে হিন্দু কর্ম্মচারীর নিয়োগ ইতিপূর্ব্বে বড় দেখা যায় না।

(২১) রাজা রামসিংহের পরে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণসিংহ তৎপদে প্রতি-

স্থিত হন। কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা পলায়নের পর, ইনিই দূতস্বরূপে কলিকাতায় যান। কৃষ্ণবল্লভপ্রদত্ত অর্থের সিংহযোগ্য অংশগ্রাহী, তদানীন্তন কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল মহোদয়, ইনি ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাড়াইয়া দেওয়া অপরাধ হইতে স্বপক্ষকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়াট্‌স, বিয়ার প্রভৃতির মন্তব্যে সত্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

(২২) রাজা মহেন্দ্র। ইনিই দ্বিতীয় কাননগু মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। সিরাজের সময়ে মন্ত্রিত্বও করিতেন। বিপ্লবের অবস্থায় ইনি মন্ত্রণাসভার একজন প্রধান নায়ক ছিলেন।

(২৩) দেওয়ান মাণিকচাঁদ। প্রথমে বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ইনি নবাবদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং ক্রমশঃ প্রধান কার্য্যে উন্নীত হন। সিরাজ কলিকাতা-রক্ষার ভার ইহারই হস্তে অর্পণ করেন। বীরত্বের জন্য যে কস্মিন্ কালে ইহার কোনও খ্যাতি ছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ, আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মারহাট্টাগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে এক সময়ে 'উভলেজ' করার উল্লেখ আছে। তবে বজ্‌রজ্ ক্ষেত্রে মাণার কাছ দিয়া গুলি যাওয়াতেই যে ইনি পলায়ন করেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ভিতরে গূঢ় কথা আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহার প্রমাণ দিব।

(২৪) রাজা মোহনলাল—সিরাজের প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধু। ইহার বীরত্বকাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে, ইহার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের হৃদয়পটে মুদ্রিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে। শেষে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়া অদ্য আমরা 'মধুরেণ সমাপন' করিতে চাই। এই প্রবন্ধের সঙ্গে মহামতি বেণ্টিঙ্ক সাহেবের' নিম্নলিখিত উক্তি পাঠ করিয়া, পাঠক মহোদয়েরা 'সেকাল ও একালের বিষয় একটু চিন্তা করেন, এই আমাদের প্রার্থনা।

"In many respects the Mahomedans surpassed our rule ... ... They admitted the natives to all previleges, the interests and sympathies of the conquerors and the conquered became identified. Our policy, on the contrary has been the reverse of this—cold, selfisn and unfeeling, the iron hand of power on the one side, monopoly and exclusion on the other."—*Lord Wm. Bentink before a Committee of the House of Commons. 1837.*

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুটি কবিতা।

পাখাকুলি।

দূরে বাজিল দুইটা চঙ্ চঙ্ করি'।

গ্রীষ্মরাত্রি; উষ্ণশ্বাসে তনু দগ্ধ করি'
তপ্ত বায়ু বহে' যায় ধরণীর বুকে।
আরাম-পালঙ্কে শুয়ে প্রভু দিব্যসুখে
নিদ্রা যা'ন তৃপ্ত হ'য়ে পাখার বাতাসে।—
অভাগা সে সারা দিন খেটে অর্দ্ধগ্রাসে
ক্ষুধা ল'য়ে পাখা টানে, নিদ্রা নাহি চোখে;—
আর্দ্রবস্ত্র থাকি' থাকি' বুলাইছে মুখে।
কভু উঠে কভু বসে, তাম্বুল চিবায়,—
নিদ্রাসাথে যুদ্ধ করি' তাড়াবারে চায়।

অভাগার চক্ষে হায়, তবু তন্দ্রা আসে
দুঃখ-জীবনের পর মরণ-আভাসে।
দীর্ঘ রজনীর শেষে মাথা পড়ে ঝুঁকে,
শিথিল হাত থামিয়া পড়ে শ্রমদুখে।
ক্ষণিক তন্দ্রায় আধ-নিদ্রা-জাগরণে
স্বপন দেখে সে গৃহে গেছে; গৃহাঙ্গনে
ক্ষুধাক্লিষ্ট শীর্ণকায় শিশুরা দাঁড়ায়ে
"বাবা" বলে' ডাকি' হরষেতে নাবা হ'য়ে
কেহ কোলে ওঠে, কেহ ধরে হাতখানি,
বসন ধরিয়া কেহ করে টানাটানি।—
দুটি বিন্দু অশ্রুজল পড়িল গড়ায়ে—
স্বপনের মাঝে দুখী পড়িল ঘুমায়ে।

ভাঙিল নিয়া, শ্বেতাঙ্গ উঠিলেন রুখে;—
আশ্রিতের স্পর্দ্ধা দেখে' রক্ত ছোটে বুকে।
ভিক্ষায় ঘুমাবে সে এ ত নহে প্রথা।
তাড়াতাড়ি বুট পরে' নাহি কোন কথা
সবুট মারিল লাথি বুকের উপরে—
গহন্নে নিঃশব্দে যেন জড়ের উপরে।—
অভাগা পড়িল ভূমে করুণ ক্রন্দনে,—
রক্ত ছুটে পড়ে শত উৎস-প্লাবনে।
বক্ষে হাত চাপি' ধরি' অতি ক্ষীণস্বরে
বারেক বলিল, গৃহে ল'য়ে যাও মোরে।—
কোথায় রহিল স্বপ্ন কোথা গৃহখান্।—
দেখিতে দেখিতে তার বাহিরিল প্রাণ।

তার পর তুলিয়া ফেলি' দিয়া শব,
পূর্ণ দুটি পাত্র টানি' ভুলি' গিয়া সব,
আবার তুলিল প্রভু নাসিকার রব
শয়ন-মন্দিরে গিয়া।

বহু দিন পরে
পড়িল ধরা;—বিচারে আনিল তাহারে।
"গ্রীষ্মের কারণে মৃত্যু" ধরিল এ যুক্তি;—
সবাই বুঝিল তাহা, পাইল সে মুক্তি।

নরঘাতী।

নিষ্ঠুর নির্ম্মম ওরে। আশ্রিত যে জন
আসিল দুয়ারে তোর, গৃহে অনশন
মাতৃহারা শিশুমুখ স্মরণে করিয়া,—
স্বল্প প্রত্যাশায় সারা রজনী জাগিয়া
করিল রে সেবা তোর, রক্ত জল করি,—
অকারণে অকাতরে পদাঘাত করি'
তাহারে বধিলি তুই! এক বিন্দু জল
চোখে নাহি দিল দেখা! হায়, সে দুর্ব্বল
কি করিয়াছিল দোষ? সারা রাত্রি বসে
অবিশ্রাম পাখা টানি' অসহ আলস্যে
পড়িল ঘুমায়ে;—এই অপরাধ তার।
এরি তরে প্রাণ তার করিলি সংহার!
এ যে শোণিত-পিপাসা পশুর অধিক;
ধিক্ তোর জন্ম, ধিক্ তোরে শত ধিক্!

তিহরী।

গত দুই বারে তিহরীর বিবরণ লিখিয়াছি; এবারেও সেই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব। এই রাজ্যের বর্ত্তমান ইতিহাস যাহা পাইয়াছি, তাহা সমস্তই লিখিয়াছি; পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যেরূপ উৎসাহ থাকা আবশ্যক, যতখানি অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য, আমার আপাততঃ তাহা নাই। নেপাল ও গড়োয়াল রাজ্যের কোনও বিস্তৃত ইতিহাস আমি আজ পর্য্যন্তও পাঠ করিতে পাইলাম না। হুইলার সাহেব বা সেই রকমের দুই চারি জন দায়িত্ববোধশূন্য ইতিহাসলেখকের সংগৃহীত বা কল্পিত ইতিহাস পড়িয়া কতকগুলি ভ্রমাত্মক বিবরণ জানিয়া রাখা আমার ভাল বোধ হয় না। এই সমস্ত কারণে আমি তিহরীর পূর্ব্ব ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না।

তিহরী সহর দেখিলেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ গড়োয়াল রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান নগর শ্রীনগরের কথা আমার মনে পড়ে। অনেক দিন পূর্ব্বে এই শ্রীনগরসম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই স্থানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তিহরীর সঙ্গে শ্রীনগরের কি সম্বন্ধ, এবং তিহরীর এই সমস্ত সুরম্য রাজপ্রাসাদ দর্শন করিলে কেন শ্রীনগরের কথা মনে হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"অনেক দিন আগে একবার নেপালের রাজা গড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। গড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন; এই সময় হইতে গড়োয়াল নেপালের অধিকারভুক্ত হয়। গড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং তাঁদের সাহায্যে গড়োয়াল স্বাধীন হলো, কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্ত্তে ক্রীত হোয়েছিল। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ গড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরেজ গ্রহণ করেন—এই অংশের নাম "বৃটীশ গড়োয়াল" আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গড়োয়াল, তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয়। যাঁরা অনুগ্রহ করে পরের হাত থেকে রাজ্য জয় করে দিলেন—আবশ্যক হোলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন, একথা বলাই বাহুল্য, তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা, গড়োয়ালের তা যথেষ্ট আছে; আর স্বাধীন গড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে তাতে

প্রলোভনের এমন কিছুই নাই যে জন্য এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপী ও ছড়ির আমদানী হোতে পারে; বরং প্রলোভনের যেটুকু ছিল সেটুকুর আপদ অনেক আগেই চুকে গেছে; নেপালের কবল হোতে গড়োয়াল উদ্ধার কোরে ইংরেজ গড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশ টুকুই অধিকার কোরেছেন—এই স্বাধীন গড়োয়ালই তিহরী রাজ্য।

"নেপালরাজ গড়োয়াল আক্রমণ করার পর, গড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ কোরে পলায়ন করিলে নেপালীরা অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট কোরে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গড়োয়াল পুনর্বিজিত হলো তখন গড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না, তিনি শ্রীনগর হইতে ৩২ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম কোণে অলকনন্দার অপর পারে তিহরীতে পলায়ন করেছিলেন সেইখানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তিহরী রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি জানি না।

"আজ তিহরীতে অবস্থান; স্বামীজি তাহাতে প্রথমে সম্মত ছিলেন না, তিনি এখন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলই বেশী ভাল বাসেন; আমিও যদি তাঁরই মতে মত দিয়া বলি বন জঙ্গল লোকালয় অপেক্ষা ভাল তবে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা বলা হয়। হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্য অবশ্যই ভালবাসি; যখন পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের চিরতুষাররাশির উপরে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে তখন হৃদয় সে দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু আর সে দিক হইতে ফিরিতে চাহে না, কিন্তু তাহারই পাশে পাশে হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে আমার সেই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্রতম বাসভবনের একটা স্নিগ্ধ শ্যামছায়ার সুশীতল দৃশ্য আমাকে যে অন্যদিকে ফিরাইয়া লয় সে কথা অস্বীকার করি কি করিয়া; এই জীর্ণ কম্বলের মধ্য হইতে যে একটা মমতার গন্ধ ছুটিয়া বাহির হয় তাহা ঢাকি কি দিয়া? লোকালয়ের উপরে যে একটা আজন্ম টান তাহা যে আমরণের সঙ্গী তাহা গোপন করিবার উপায় কি? তাই লোকালয় দেখিলেই সেখানে দুই দিন বাস করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীর পুণ্য দৃশ্য অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ অবস্থায় তিহরীতে একদিন বাসের ইচ্ছা হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। আমার আগ্রহাতিশয়দর্শনে স্বামীজিও তাহাতেই মত দিলেন; তবে তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন সহরের মধ্যে তিনি বাহির হইবেন না। সমস্ত দিনটা এই ঘরের মধ্যেই কাটাইবেন। তিনি তাঁর সেই

ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে চাপিয়া বসিলেন, আমি সহর দর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম।

"পূর্ব্বদিন এখানে আসিবার সময়েই সহরের সমস্তটা একরকম দেখা হইয়াছিল, তবুও আজ আবার বাহির হইলাম। প্রথমেই রাজবাড়ীর দিকে গেলাম, সহরের মধ্যে একটা উচ্চস্থানে রাজবাড়ী; সিপাহী-সান্ত্রী অনেক দেখিলাম, পাছে অধিক অগ্রসর হইলে দুই চারিটি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ভয়ে একটু দূরে দাঁড়াইয়াই রাজবাড়ী দেখিতে লাগিলাম। রাজার বাড়ী বলিলে সহজেই মনে যে একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়, তাহার কিছুই এ বাড়ীতে নাই; এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসগৃহ শ্রীনগরের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের কথা মনে হইল। কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীনগরে গিয়াছিলাম, যাহা দেখিয়াছিলাম, সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার! রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়িয়া আছে—দুই চারি বৎসর পরে কোন পর্য্যটক সেখানে গেলে ঐ স্তূপাকার ইঁট পাথরকে সুশ্যামল শৈবালসজ্জিত দেখি একটা ছোট রকমের গিরিশৃঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার বহুকাল হোতে একই অবস্থায় ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর যাঁদের জন্য তাহারা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ এই গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া দিন কাটাইতেছেন; একবারও হয়ত সে দৃশ্যের কথা সেই পরিত্যক্ত রাজ-অট্টালিকার কথা তাঁদের মনে হয় না। কিন্তু কত পরিব্রাজক, কত সন্ন্যাসী সেই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং কল্পনানেত্রে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের একটা

'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা———'

দৃশ্য দেখিতে থাকে। এই তিহরী রাজভবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্য সত্যই এ রাজবংশের অতীত গৌরবের দৃশ্যে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

অপর দিকে কুমার সাহেবের বাড়ী; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা কেহ কেহ বলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এতদিন বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেজাজটা কেমন রূঢ় হইয়া গিয়াছিল, রাজারাজড়ার দিকে যাইতে

কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব মনে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাই সে দিকে গেলাম না। একবার মনে হইল, এই দূর পর্ব্বতের মধ্যে আমার স্বদেশবাসী একজন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি; কিন্তু কেমন বাধ-বাধ বোধ হইল। নিকটেই গঙ্গা, গঙ্গার ধারে গিয়া বসিলাম। আমাদের দেশে যেমন গঙ্গায় স্নানের ঘটা, শত শত নরনারী কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গার স্তব গান করিতেছে, এখানে সে দৃশ্য দেখিবার যো নাই; শীতপ্রধান দেশের লোক স্নানকার্য্যটি সংক্ষেপেই শেষ করে; কেহ বা মাসান্তে, কেহ বা দুই দশ দিন অন্তে, স্নান করে। স্নানের ঘাটের উপরেই একটা দেবালয়; আমি সেই দেবালয়ের সিঁড়িতেই বসিয়াছিলাম। বিদেশী লোক একাকী বসিয়া আছে দেখিয়া মন্দিরের পূজকমহাশয় আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং নানাপ্রকার কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাড়ী সহর হইতে অনেক দূরে; আজ ১৫ বৎসর এই মন্দিরের পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী আছেন। স্বর্গীয় মহারাজ প্রতাপ সা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহারই আগ্রহে পুরোহিত মহাশয় তাঁহার নির্জ্জন শৈলকুটীর ও তিন বিঘা জমি ছোট ভাইয়ের হস্তে দিয়া এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু সে কাল আর নাই। বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সো দিন চলা গেয়া!" সেকালের জন্য এই প্রকার আক্ষেপ, কাতরোক্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শুনি, তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে অনেকেই সেকালের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন। এমন একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা, যাহা কিছু সেকেলে, যাহা কিছু পুরাতন, সে সকলকেই কেমন একটা অতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। যাহা চলিয়া গিয়াছে, যাহা আর ফিরিবে না, তাহার উপর বোধ হয়, মানুষের মমতা হয়, এবং তাহারই জন্য সেগুলিকে অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অতীত কার্য্যের স্মৃতি থাকে, কৃত-কর্ম্মের সাফল্যমাত্র নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়, তার ঝঞ্ঝাটগুলি ত আর থাকে না; তাই সে এত মনোরম, তাই বর্ত্তমানের সহস্র সুবিধার উপরেও তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরোহিত মহাশয় সে কালের অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন; তখন পর্ব্বতে সোনা ফলিত, তখন গাভীগণ অকাতরে দুগ্ধদান করিত, মেঘ বারি বর্ষণ করিত; এই কলিযুগের শেষভাগে দেবগণ নিদ্রিত, পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, দেশের ঘোর দুর্দ্দশা। বিনা বা প্রতিবাদে এই সব কথা বহুদিন

হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কাজেই ইহার মধ্যে আর নূতনত্ব কিছুই দেখিলাম না। স্বাধীনরাজ্য, বাতাসেও সংবাদ বহন করে, এই ভয়েই হয় ত পুরোহিত একটি কথা গোপন করিলেন; নতুবা তিনি যদি বলিতেন যে, স্বর্গীয় রাজা প্রতাপ সার মত রাজা আর নাই, তাঁর সময়ের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময় হীনপ্রভ হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই সে কথার প্রতিবাদ ছিল না। বিদেশী লোকের সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে এ সব কথা বলা ভাল নহে, তাই পুরোহিত মহাশয় অন্য কথা পাড়িলেন। পুরোহিত পণ্ডিতব্রাহ্মণ, দুই চারিটি শাস্ত্রকথা, দশটি অনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক না আওড়াইলে তাঁর প্রতিপত্তি থাকে কৈ? তাই তিনি শাস্ত্রালোচনার ভূমিকা আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রালোচনা বেশ কথা, কিন্তু তারও সময় অসময় আছে। শনিবারের দিন দেড়টার সময়ে আফিস বন্ধ হইলে কেরাণীগণ যখন ঊর্দ্ধমুখে রেলগাড়ী ধরিবার জন্য ছোটে, তখন দুই পয়সা দিয়া প্রকাণ্ড একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া তাহার মধ্যের পাঁচ কলম বোঝাই অনিত্যতার বক্তৃতাপাঠ যেমন অসাময়িক, এই বেলা প্রায় দশটার সময়ে অস্নানে অনাহারে শাস্ত্রগ্রন্থ খুলিয়া বসাও তেমনি সময়োপযোগী নহে। সুতরাং দুই এক কথায় পুরোহিত মহাশয়কে নিরুত্তর করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি, প্রকাণ্ড একটা সিধা আসিয়াছে; দ্রব্য নানাপ্রকার, এবং তাহাদের পরিমাণও বেশী, আমরা দুইটি মানুষে এক মাসেও তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারি না। বুঝিলাম, এ প্রকাণ্ড সিধা রাজগৌরবপ্রকাশের জন্য, নতুবা আমাদের মত দুইটি মানুষের দুই বেলার আহারের জন্য এত জিনিসের দরকার হয় না।

তিহরীতে সদাব্রত নাই; সাধু সন্ন্যাসী অতিথি সকলেই প্রতি দিন অপরাহ্নে রাজবাড়ীতে সিধা পায়, এবং সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু গাঁজার পয়সাও পায়। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে; তবে শুনিলাম, পূর্ব্বে অতিথিসেবার যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল এখন তাহা নাই। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীতে এ প্রকার হওয়াই সম্ভব; কুমারগণ যখন রাজ্য নিজহস্তে পাইবেন, তখন আবার সমস্তই পূর্ব্ববৎ হইবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সে দিন শুনিলাম, বর্ত্তমান রাজা পিতার ন্যায়ই দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ।

অপরাহ্নে আবার বাহির হইব, এমন সময়ে হাইকোর্টের বাড়ীর নিকট বিগল বাজিয়া উঠিল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য, সদর দিকের বারান্দায়

আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, এক জন অশ্বারোহী বিগল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে আসিতেছে; তাহার পশ্চাতে আরও দুই জন অশ্বারোহী; অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তাহাদের সুবর্ণখচিত উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে; তাহার পশ্চাতে একখানি জুড়িগাড়ী, শেষে আরও কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক। শুনিলাম, প্রতিদিন অপরাহ্নে রাজকুমারগণ মাতৃচরণে প্রণাম করিতে আগমন করেন, এবং এক ঘণ্টা থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান। রাজকুমারেরা আসিতেছেন শুনিয়া, বাজারের লোক সমস্তই রাজপথে কাতার দিয়া দাঁড়াইল, এবং রাজার গাড়ী যখন দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তখন সকলেই "জয় জয়, মহারাজা" বলিয়া নতশিরে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাই এখানকার প্রথা। এ দৃশ্য আমার অতি সুন্দর বোধ হইল। আমিও যথারীতি অভিবাদন করিলাম।

রাজকুমারগণ চলিয়া গেলে, আমি তিহরী জেল দেখিতে গেলাম। এখানকার জেলের বন্দিগণ যথেচ্ছ বাহিরে বেড়াইতে পারে, তবে ভয়ানক অপরাধিগণের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা। এই জেলের মধ্যে নরহত্যাকারী নাথু উইলসনকে দেখিলাম। এই ভদ্রলোকের পরিচয় আবশ্যক। আমার মনে পড়ে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মিরারের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই নাথু উইলসন সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধের কোনও কথাই আমার মনে নাই।

পর্ব্বতের মধ্যে দেরাদুন মসুরী প্রভৃতি সহর বসিলে, উইলসন নামে এক জন সাহেব দেরাদুনে বাস করেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠের কারবার আরম্ভ করেন, শেষে শিকারী রাখিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম, পার্ব্বতীয় পালক প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অগাধ ধন সঞ্চয় করেন, এবং সেই জন্যই ঐ দেশে Wilson money একটা প্রবাদবচন হইয়া গিয়াছে। এই উইলসন সাহেব একটি পাহাড়ী রমণীকে বিবাহ করেন; সেই রমণীর গর্ভে দুইটি পুত্র হয়; এক জনের নাম John কি Henry Wilson, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাথু উইলসন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেহারাও সাহেবের মত, এবং চালচলনও তাই, তিনি বিবি বিবাহ করিয়া দেরাদুনে পৃথক বাড়ীতে বাস করেন। নাথু উইলসন অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু টাকার জোরেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, মুক্তি পান। অবশেষে কয়েকটি খুন করার অভিযোগে তিহরীতে অভিযুক্ত হন। অনেক চেষ্টা ও

অনেক অর্থব্যয়ে প্রাণদণ্ড হয় না, দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। লোকটা ১২।১৩ জন লোককে হত্যা করিয়াও অনায়াসে অব্যাহতি পাইল। যে দিন তিহরীর কারাগারে তাহাকে দেখি, সত্য সত্যই আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সে দিন পশ্চিমদেশবাসী এক জন বন্ধুর নিকটে শুনিলাম, নাথ উইলসন কারামুক্ত হইয়া দেরাদুনে আসিয়াছেন; তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে; এখন বিষয়ের উত্তরাধিকার লইয়া দুই ভ্রাতায় মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছেন।

রাত্রে জিতসিং মিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তিনি রাজসরকার হইতে এক পরওয়ানা বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং একজন পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পেয়াদা পরওয়ানা লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে; তিহরীরাজ্যের মধ্যে আমরা যত দিন থাকিব, সেই পেয়াদা আমাদের সঙ্গে থাকিবে, এবং আমরা যে বেলা যেখানে থাকিব, সেই স্থানের লম্বরদার (আমাদের দেশের তহসিলদার) আমাদের খানাপিনার সরবরাহ করিবে। আমরা কিছুতেই সম্মত হইব না, মিয়াজি কিছুতেই ছাড়িবেন না; তাঁহার স্নেহের আবদার ছাড়াইতে পারিলাম না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা ষোড়শোপচারে আহারাদি করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে নহবতের সুন্দর টোড়ী আলাপে জাগ্রত হইয়া হিন্দু রাজার রাজধানী ত্যাগ করিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

সাহিত্যে প্রেম।

দেবত্ব।

সাহিত্যে যদি প্রেম দেখিতে চাও, তবে একবার সীতার পানে চাহিয়া দেখ। রাজর্ষির শান্তিময় সংসারে সীতা সুশিক্ষিতা ও প্রতিপালিতা। প্রেমময় রামের সহিত সীতা বিবাহিতা। তাই সীতা প্রেমের মোহিনী প্রতিমা। যে সীতা, রামের সহিত রাজকিরীটিনী হইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পতির বনবাস হওয়াতে তিনি কি পতির সঙ্গে বনবাসে যাইতে কুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন? রাম ত তাঁহাকে বনবাসে লইয়া যাইতে চাহেন নাই, তবু সীতা প্রেমাবেগে অধীরা হইয়া তখনই তাঁহার সহিত বনে যাইতে অগ্র-

সারিণী হইলেন। রাম যে তাঁহাকে এত বনকষ্ট ও ভয় দেখাইয়াছিলেন, সকলই বিফল হইল। সীতা অকুতোভয়ে পতির অনুসারিণী হইলেন। বনভ্রমণকালে কেবল রামের মুখপানে চাহিয়া সীতা কোনও কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করেন নাই, কোন ভয়ে ভীতা হয়েন নাই। প্রত্যুত, কাননবাসী ঋষিগণের আশ্রম দেখিতে রামের যত সুখবোধ হইত, সীতারও ততই আনন্দ জন্মিত। পতির যাহাতে সুখ, আর্য্যনারীর তাহাতে সুখ—আর্য্যনারী পতির ছায়া। রাম যেমন আশ্রম-পীড়ানিবারণ করিয়া কাননে শান্তিবিধান করিতেন, তদাশ্রিতা প্রেমলতা তেমনি সেই দেশে প্রেমপুষ্প বিকীর্ণ করিতেন। প্রেমালাপে ও প্রেমব্যবহারে সীতা মুনিপত্নী ও বনবালিকাগণকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। বনবাসে রামের সম্মুখে শান্তি যাইত, সীতার সম্মুখে প্রেম যাইত। তিনি প্রেমদূতীরূপে সর্ব্বত্র উদিতা হইতেন। তাঁহার প্রেম বিশ্ববিসারী ছিল। তিনি রামের প্রেমরূপ—যেমন কৃষ্ণের প্রেমরূপ রাধা। অশোকবনেও তাঁহার প্রেমরূপে চেড়ীগণ বাধ্য। প্রেমরূপে তিনি শত্রুকেও মিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার জগৎ-বিসারী প্রেমরূপের যদি সম্যক ছবি দেখিতে চাও, তবে তাঁহার সহিত একবার গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে চল। সেই নদীতীরে কর্ণিকাবনবেষ্টিত রামের পর্ণকুটীরে সীতা নন্দনকানন বিরচন করিয়াছিলেন। ইতর প্রাণিগণও সীতাকে ভালবাসিত। বনহরিণীগণ সীতার হস্তে কুশাঙ্কুর গ্রহণ করিত। ময়ূর ময়ূরী সীতার সম্মুখে পুচ্ছবিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত। কপোতকপোতী বিশ্রব্ধমনে প্রেমালাপ করিত। বনমৃগগণ হিংসাপরিহার করিয়া সীতার কুসুমকাননে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। প্রেমের কাননে শান্তিপুষ্প বিকশিত হইত। সীতার প্রেমসুখ বুঝি ধরিত না, তাই অমৃতধারায় গোদাবরী নৃত্য করিতে করিতে, সীতার প্রেমের পরিচয় দিতে দিতে, সুমধুরস্বরে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। কাননতরুগণ সীতার পূজোপকরণ পুষ্প সকল বর্ষণ করিত। সীতা সুখমনে পতিসেবা ও বনদেবীর পূজা করিতেন। রামের সুখ অযোধ্যার সিংহাসনে, কি এই পঞ্চবটীর কুসুমকাননে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সীতা সেই কুসুমকাননে স্বর্গসুখ আনিয়াছিলেন। সীতার পঞ্চবটী প্রেমময় রাজ্য। কিন্তু সীতা দারুণ কষ্টে পড়িবেন বলিয়াই বুঝি এত সুখভোগ করিয়া লইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি প্রেমের এই অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন। কালিদাসের ঋষি-আশ্রমস্থিত শকুন্তলা বুঝি এই সীতার ছায়ায় সৃষ্ট। মিল্টনের প্যারাডাইসের

এড্যাম এবং ইভের প্রেমময় চিত্র কি বাল্মীকির প্রেমচিত্রের সমতুল্য হইতে পারে? এড্যাম এবং ইভ সদ্যঃ সৃষ্ট হইয়া শান্তিময় প্যারাডাইসের সুন্দরবনে অবস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, প্রেমহিংসা প্রভৃতি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রেম, প্রেমই নহে; সুখ, সুখই নহে। যাহাদের কিছুই জ্ঞান নাই, তাহাদের অজ্ঞানতায় প্রেমরসের সুখবোধ হইত না। তাই তাহাদের প্রেমচিত্র ও রামসীতার প্রেমচিত্রে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। সীতা দুঃখময় কাননকে প্রেমময় সুখধামে পরিণত করিয়াছিলেন। ইভ সুখময় কাননের অযোগ্যা বলিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন। একজন পাপসংসারকে প্রেমময় পবিত্র করিয়াছিলেন; অন্য জন পুণ্যময় সংসারে পাপকণ্টক আনিয়া তাহা দ্বেষহিংসায় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

অন্য এক আদর্শের প্রেম আর্য্য ভক্তিশাস্ত্রে। তথায় সাত্বিক প্রেম স্থূল মানুষচিত্রে প্রদর্শিত। সেই প্রেমময়ী প্রতিমা রাধাসুন্দরী—গোপীগণ যে প্রেমের সহচরী। রাধিকা মধুর গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। পতিপত্নীর প্রেম যত উচ্চতায় উঠিতে পারে, রাধিকা সেই উচ্চতায় উঠিয়া কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। তাই সেই ভক্তির নাম প্রেমভক্তি—মানুষ দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণতা ভগবানে সমর্পিত—ভগবান প্রাণবল্লভ। রাধিকা ও গোপী ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে নাই, ভগবান আমার প্রাণবল্লভ। আর বলিয়াছিলেন সত্যভামা, কিন্তু যে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম দেখিয়াছেন, তিনি সত্যভামার দর্পিত বাক্যে হাসিতেন—সে দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। সত্যভামার প্রেম দর্পিত ভক্তি—রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত তুলনায় তাহা অতি দীন। রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত দাম্পত্য প্রেমের মধুরতা মিশিয়া, গোপীপ্রধানার ভক্তি পূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকা সেই প্রেমভক্তিতে উল্লাসিনী, কৃষ্ণলীলাময়ী, কৃষ্ণপ্রেমে সংসারিণী, শ্যামপ্রেমানুরাগে পাগলিনী, শ্যামপ্রেমে অভিসারিণী, অভিমানিনী, বিহারিণী ও বিলাসিনী। কৃষ্ণই রাধার সর্ব্বস্ব ধন, সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বচিন্তা। তিনি সেই শ্যামপ্রেমে মোহিতা। নিত্য শ্যামসহবাসসম্ভোগিনী হইবার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন। কে বলে রাধিকা কৃষ্ণবিরহিণী? তিনি শত বৎসর কৃষ্ণধ্যানে ও স্বপ্নে কৃষ্ণকেই দেখিতেছিলেন। যে প্রেম এক পলের নিমিত্তও কৃষ্ণকে হারাইতে পারে না, সেই প্রেমের সাধনাই কৃষ্ণবিরহ—বিরহেই প্রেমের পরিপুষ্টি। বাসন্তী কৃষ্ণরূপময় বৃন্দাবন ধামে, গোপীগণের নিয়ত ব্রজবুলীময় মধুর ভাষে ও কৃষ্ণ-

কথায় রাধিকা কৃষ্ণস্বপ্নে ভোর হইয়াছিলেন। বিরহে তাঁহার তন্ময়তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকা দেখাইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণবিরহ অসম্ভব কথা; রাধাকৃষ্ণ চিরদিন সংসারের কদম্বমূলে বিরাজিত। তাই উন্মত্তা রাধিকা সর্ব্বদাই দেখিতেন,—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

সীতার বিরহ অন্যরূপ। সীতার বিরহ সুখের বৃন্দাবনধামে নয়; সে বিরহ রাক্ষসপুরীর চেড়ীদলপূর্ণ অশোকবনের যন্ত্রণাগারে। কিন্তু সেই যন্ত্রণাগারে সীতা অশোকবনকে রামময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সেই রামময় স্মরণে জীবিতা ছিলেন। তিনি রাক্ষসকুলের ভয়ে ভীতা হইয়া আরও একান্ত মনে সেই শ্রীরামকে স্মরণ করিতেন। আতঙ্ক তাঁহার ভক্তি ও পতি-প্রেমকে আরও পরিপুষ্ট করিত। তিনি অহরহঃ ভাবিতেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি। তাঁহার পতিধ্যান আরও তীব্রতর হইয়াছিল। বিশ্রব্ধ নে রামের কথা কহিতেন কেবল সরমার সঙ্গে—ততই মধুর ভাবে, বড় মধুর ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন। অগ্নিপরীক্ষাকালে এই প্রেমপ্রগাঢ়তার পরীক্ষা হইয়াছিল। রামের প্রেমাঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া অশোকবনে রক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশা ছিল, রামের পুনর্লাভে আবার সেই প্রেমাঙ্কে পুনঃস্থাপিতা হইবেন। তিনি সেই প্রেমাশাতেই জীবিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে যখন বনবাসে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কোন আশা ছিল? তবু সীতা নিজ আর্য্যপুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। ছিন্না লতার ন্যায় তিনি রামাশ্রম হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তাপসাশ্রম অশোকবন নহে সত্য, কিন্তু এ বন যে অশোকবন হইতেও ভয়ঙ্কর—আশাহীন দেশ! তাপসবনে সীতা নিরাশ প্রেমের চিত্র। রাম নিজে তাঁহাকে প্রেমাঙ্ক হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সীতার আর অভিমানের স্থান নাই—হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! তথাপি সীতা কেবল রামপ্রেমে সকলের আদরিণী হইয়াছিলেন। রামপ্রেমে তিনি দিবানিশি বিষণ্ণমনে ও অধোবদনে অশ্রুবর্জ্জন করিতেন। এক একবার সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রামকে স্মরণ করিয়া সেই রূপের পূজা করিতেন। সন্তানের মুখে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিতেন, আর দর দর অশ্রুধারায় নির্জ্জনবাস ভাসাইয়া দিতেন। সীতা কেবল রামপ্রেমজীবিতা হইয়া সেই আশ্রমে ছিলেন। এই ঘোর প্রেমস

তাঁহার প্রেম কত প্রগাঢ় হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পাতালপ্রবেশকালে প্রতীত হইয়াছিল। রামের মুখ হইতে আবার পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার বুক ফাটিয়া গেল। পিতৃসম বাল্মীকি, অন্যান্য গুরুজন, দেবগণ, মুনিগণ এবং সভার সর্ব্বজনসমক্ষে তত হতমান হইয়া সাধ্বী আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া প্রেমপ্রতিমা সতী কেবল রামের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। সতীর প্রেম পবিত্র নিকেতনে বিসর্জ্জিত হইল।

সতীর পতি-অনুরাগ কত অমানুষ সীমায় যাইতে পারে, তাহা এই সীতার দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়। প্রেমময়ী সীতা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সীতা সতীত্বের এবং পতিপরায়ণতার চরম সীমা। আর্য্যসাহিত্য এই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর্য্য নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সেই জন্য এক মহাবল হইয়াছে। সতীর নামমাত্রে গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সতী একধ্যানে একমনে কেবল নিজ পতিকেই জানেন। পতিনিন্দায় ভবানী প্রাণত্যাগিনী হইয়াছিলেন। সতী পতির গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া যমও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সতী গলিতকুষ্ঠ পতিকে তপ্তকাঞ্চনশোভাময় দেহবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সাবিত্রী যমালয় হইতে পতিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। যত দিন সতীর গৌরব আর্য্যনারীকে পরিপূর্ণ করিবে, ততদিন আর্য্যনারী এক মহাশক্তি। সতীই যথার্থ পতিব্রতা। সতী যেমন আপনি দেবী, তিনি নিজ পতিকেও দেবতুল্য ভাবেন। দেবতুল্য ভাবিয়া নিজ পতির দেবসেবা করেন। আর্য্যশাস্ত্র আর্য্যদেশকে সতীত্বগৌরবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্যধাম তাই আজও সতীর অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এই গৌরবে আমাদের শিশু কন্যাগণ বালিকাবস্থা হইতে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। গান্ধারী তাই বিবাহকালেই পতির অন্ধতা শুনিবামাত্র নিজ চক্ষু চিরদিনের নিমিত্ত বসনে ঢাকিয়াছিলেন। সাধ্বী সাবিত্রী বিবাহ হইবার পরই মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া পরিশেষে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। আর্য্যবালা তরুণবয়সেও পতিহীন হইলে অমনি হাহাকার করিয়া উঠেন। এই গৌরবপূর্ণ ভারতে সীতা সর্ব্বজনপূজনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। কেবল সীতা কেন? সকল সতীই এখানে পূজনীয়া—সতী ভবানী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, তারা, দময়ন্তী প্রভৃতি সবাই ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া আছেন। তাঁহাদের

নাম করিবামাত্র মনে পবিত্র ভাব সঞ্চারিত হয়। আমরা তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া সীতার কথা উল্লেখ করিয়াছি।

যে সতীত্ব পাতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব আমাদিগের পৌরাণিক কাব্যে, নাটকে এবং উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে, যে গৌরবে পূর্ণ হইয়া ভারতীয় আর্য্যললনা ধৈর্য্য, তিতীক্ষা, অধ্যবসায়, কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানাগুণে ভূষিতা হইয়া রমণীরত্ন—যদ্দ্বারা তিনি পরিপূতা হইয়া দেবোপমা হইয়াছেন, সেই সতীত্ব ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব ভারতে নানা উপায়ে রক্ষিত হইয়া থাকে।

(১) কথকতা ও গান। আমাদের বাক্‌চতুর ও বুদ্ধিমান কথকগণ স্ত্রী-জাতীয় শ্রোতৃবর্গের মনে এই দুই ধর্ম্ম চিরদিন বদ্ধমূল করিয়া দিয়া আসিতেছেন। পৌরাণিক রামায়ণ এবং মহাভারত গানেও সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। আজিও এই দুই উপায় বঙ্গধামে বিদ্যমান আছে। তদ্দ্বারা আমাদের পুরাণোক্ত পতিভক্তি ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত এবং কীর্ত্তিত হইতেছে। গায়ক এবং কথকেরা নানালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সেই দুই ধর্ম্মের গৌরব মনোহর গানে এবং সুন্দর বাক্‌কৌশলে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

(২) গল্প কথায় আমাদের বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষগণ রামায়ণ মহাভারতের গল্পাদি মুখে মুখে গল্প করিয়া, এবং যাঁহারা পড়িতে জানেন, তাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া, গৃহধামে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব বিলক্ষণ প্রচার করিয়া থাকেন।

(৩) ব্রতানুষ্ঠান। শুধু কাণে শুনিয়া সেই গৌরবে আর্য্যকন্যাগণ পূর্ণ হয়েন, এমত নহে; অনুষ্ঠানেও তাহাতে শিক্ষিতা হইবেন বলিয়া, আমাদের সমাজে ঋষিগণ রমণীকুলের জন্য নানা ব্রতপদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে সত্যভামা ও সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আমাদিগের বৃদ্ধাগণ আজিও তাহা মুখে গল্প করিয়া বলিয়া থাকেন। শুধু গল্পে নহে, সেই ব্রতাদির নিজে অনুষ্ঠান করেন, এবং বধূ ও কন্যাগণকে তাহাতে প্রবৃত্ত করান। প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠান, ব্রতাদি ও পূজার শেষে যে সকল কথা শ্রবণ করিতে হয়, তাহাতেও সেই দুই ধর্ম্মের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(৪) দৃষ্টান্ত। আমাদের গৃহধামে বর্ষীয়সী ও গৃহিণীগণ প্রত্যহ নিজ আচ-

রণে ঐ দুই ধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিয়া, বালিকা ও নববধূগণকে তাহার গৌরবে পূর্ণ করেন। আমাদের কন্যা ও বধূগণের সমক্ষে নিত্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা তাহারা দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে থাকে, এবং তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি স্বতঃই ধাবিত হয়। এ শিক্ষা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া দিতে হয় না।

এই সমস্ত উপায়ই আমাদিগের গৃহধর্ম্মের নারীশিক্ষা। এইরূপ নারী-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী। এই শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের আর্য্যনারী নানা গুণে ভূষিতা হইতেন, এবং আজিও যেখানে বিলাতী নারীশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেখানে উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ শিক্ষা ভক্তিপূর্ণ পৌরাণিক সাহিত্যপাঠ—যে সাহিত্যে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সাহিত্যপাঠ। তাহা বিলাতীরুচি-সম্পন্ন উপন্যাস-পাঠ নহে॥ কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালীতে গ্রন্থপাঠ বড় না থাকুক, মৌখিক গল্প কথায় আচারে অনুষ্ঠানে ও দৃষ্টান্তে শিক্ষার প্রভাব ততোধিক। তাহাতে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের সংস্কার দৃঢ়রূপে আমাদের তরুণবয়স্কা তরল-মতি কামিনীকুলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয়। তাহারা সেই গৌরবে পূর্ণ হইয়া নিজ আচরণ ও দৃষ্টান্তে ঐ দুই ধর্ম্মকে কুলক্রমাগত করিয়া আনিতেছেন।

কিন্তু এই নারীশিক্ষাপ্রণালীর আজি অনেকাংশে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। এমন সুন্দর ও পরিপাটী শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তে এখন বিলাতী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিলাতী সাহিত্যে আমাদিগের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব ঘোষিত হওয়া দূরে যাউক, তাহাতে বরং বিপরীত কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, ভারতললনার সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের। একমাত্র পতি-অনুরাগে পূর্ণ হইয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ থাকা ভারতললনার সতীত্ব। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সতীত্ব তাহা নহে। সে সমাজের সতীত্ব এইরূপ :—

প্রথমতঃ, সেই সমাজে রমণীকুল অনেকবার পতি গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং পত্যন্তর-গ্রহণরীতি প্রচলিত থাকাতে, আর্য্যসমাজে যেরূপ একনিষ্ঠতার গৌরব, পাশ্চাত্য সতীত্বে তাহা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সমাজে রমণীরা ইচ্ছাচরা; তাঁহারা নিজ ইচ্ছায় পতি গ্রহণ করিতেছেন, এবং এক পতি ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং সেখানে রমণীকুলের ইচ্ছাই প্রবলা। তাঁহারা আপনার

মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন; তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত অধিক। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত হিন্দু রমণীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সমঞ্জসীভূত নহে। কাজে কাজেই এই দুই আদর্শে বিরোধ উপস্থিত হয়।

ভারতীয় সমাজ স্বেচ্ছাচার হইতে উন্নীত * হইয়া, মনুষ্যোচিত ব্যবহার সংস্থাপন পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার সতীত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেই আদর্শস্থানীয় সতীত্বগৌরব তাঁহাদের সাহিত্যে ঘোষিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের সত্ত্বাতে আর্য্যসতীত্বের বিশেষ প্রকার এবং অসামান্য গৌরব না থাকাতে সে সতীত্ব ইউরোপীয় সাহিত্যে কীর্ত্তিত হয় নাই। সামাজিক আচার ব্যবহারেই তাহার পরিচয় ও কীর্ত্তন। এই আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তে ইউরোপীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ হওয়াতে, তৎপাঠে যে ফলোদয় হয়, সেই ফল আমাদের সতীত্বের গৌরব ক্রমশঃ ধ্বংস করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আমাদের নারীশিক্ষাপ্রণালী একপ্রকার তরিবদ মাত্র। লেখাপড়া জানিলে, পুরাণাদি পাঠে নিজে সমর্থা হইয়া, আর্য্যনারী সেই শিক্ষাপ্রণালীর কেমন অধিকতর গৌরব বাড়াইতে পারেন, তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে। কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলেও অধিক ক্ষতি নাই। কারণ, প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আচরণে ও ব্যবহারে, শ্রবণে ও দৃষ্টান্তে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিশেষতঃ সমস্তই সতীর আচরণে নির্ভর করে। যে ইউরোপীয় সমাজে ভারতীয় সতীত্বের অভাব, সেখানে সুতরাং ভারতীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সমধিক অভাব হইবে। কারণ, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আর্য্যসতীত্ব হইতেই সমুদ্ভূত। এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হেতু ভারতীয় ললনা যে সমস্ত অসামান্য গুণের আধার হইয়াছেন, সেই সমস্ত গুণ ইউরোপীয় ললনায় অল্পপরিমাণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে যে ললনার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, সে ললনাচরিত্রে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের তেমন জলন্ত দৃষ্টান্ত নাই। ফল এই, সে সাহিত্যপাঠে আমাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া যায়। সেই সাহিত্যের যতই অনুশীলন হইবে, ততই হিন্দুললনার গুণাংশও ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। বাস্তবিকই এক্ষণে আমরা এই কুফল প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ইউরোপীয় সমাজে যে সতীত্ব প্রচলিত আছে, সভ্যতার আদিম অবস্থায় সেইরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন ভারতের স্থানে

---

* মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত শ্বেতকেতুর বিবরণ কে না জানে?

স্থানে তাহা যে বিদ্যমান ছিল, এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়-কালে সহদেব যে প্রাচীন মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়াছিলেন, তথায় স্ত্রীলোকেরা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিত। পাণ্ডুরাজ কুন্তীকে বলিতেছেন :—

"পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনভাব কালক্ষেপ করিতে হইত না। তির্য্যগ্‌যোনিগত কামদোষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি যে ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুসারে চলিত। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।"

তৎপরে শ্বেতকেতুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাণ্ডুও বলিয়াছিলেন, মহিলা-গণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহার। সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ভারতে এ ব্যবহার পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। এই ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিয়া ভারত একদা দেবত্বে উঠিয়াছিল। সেই দেবত্ব ছাড়িয়া আবার কি আমরা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহারে ফিরিয়া যাইব?

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য; আর্য্য সাহিত্যে প্রেম, মানবপ্রকৃতিকে উচ্চে তুলিয়া পবিত্র করিয়াছে। মহা-শ্বেতার প্রেম পবিত্র হইয়া দেবারাধনায় পরিণত হইয়াছিল। মহাশ্বেতা কি দেবারাধনার মূর্ত্তি, না প্রেমের পবিত্র ছবি! অচ্ছোদসরোবরতীরে কাননাভ্য-ন্তরস্থ দেবমন্দিরে মহাশ্বেতা দেবী না মানবী! দেবপূজাচ্ছলে তিনি একচিত্তে সেই নির্জ্জন গহনে কাহার পূজায় নিরতা আছেন? পতিপ্রেমে ও পতির আরাধনায় বাণভট্টের মহাশ্বেতায় যেরূপ পবিত্রতা, তদ্রূপ পবিত্রতা কালি-দাসের উমাচরিত্রে। অপ্সরোধামে শকুন্তলা ততই পবিত্রতায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র প্রেমস্পর্শে মানবপ্রকৃতি পবিত্র হইয়া গিয়াছে!

সতীতে পতি অনুরাগ এত প্রগাঢ় যে, সেই অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া সতী আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। প্রেমে আত্মহারা সতী পতির সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে মিশিয়া যান। পতির ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা এবং পতির সুখে নিজ সুখ মিশাইয়া দিয়া, সতী দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। আর্য্য-ধামে পতির সহিত পত্নীর স্বার্থ এক, সুখ এক, স্বর্গ এক। এরূপ একতা না থাকিলে দম্পতী একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে কি প্রকারে? ইউ-রোপে স্বার্থের বিভিন্নতা ও রুচির বিভিন্নতা এবং পারলৌকিক ইষ্টের

বিভিন্নতা থাকাতে, ভারতীয় দাম্পত্য প্রেমে যেরূপ আত্মোৎসর্গ, একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা দেখা যায়, পাশ্চাত্য সমাজের দাম্পত্য প্রেমে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে দম্পতীমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় ললনা একাগ্রচিত্তে সর্ব্ববিধায়ে পতির অনুগামিনী হইয়া পতির সহধর্ম্মিণী হন। সর্ব্বপ্রকারে পতির এইরূপ সহধর্ম্মিণীর পদে ইউরোপীয় ললনার উঠিবার যো নাই। ইষ্টের বিভিন্নতা, তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেয়। সেই জন্য আমরা সতীর প্রেমপ্রগাঢ়তার ছবি ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই না। সহধর্ম্মিণীর দেবতুল্য সতীর চিত্র কেবল আর্য্য সাহিত্যে লক্ষিত হয়। সেই প্রেমচিত্রে দেখা যায়, সতী শুধু ইহজীবনে পতির সহিত মিলিয়া এক হয়েন নাই, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, পরলোকেও এক হইয়া দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করেন।

সতী পতিভক্তিতে যে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তির নিদান। ভগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায় না। যে ভগবৎপ্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবানের পদে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, তাঁহার আনন্দে আপনার সুখ মিশাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ভগবৎপ্রেমের ছায়া সতীর পতিভক্তিতে লক্ষিত হয়। তাই সতী দেবীরূপে প্রতীয়মান। সীতা ও রাধিকা এই বিবিধ প্রেমের আদর্শ, অথচ দুই জনেই পরস্পরের প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই, সীতার পতিপ্রেম অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত—এত উজ্জ্বল বর্ণে যে, তাহাতে দেবভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রাধিকায় ভগবৎপ্রেম এত উজ্জ্বল যে, তাহাতে পার্থিব পতিপ্রেম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আরোহণ করিয়া রাধিকাসুন্দরীর প্রেমভক্তি। প্রেমের এই ক্রম আর্য্য সাহিত্যে। আর্য্য সমাজেও এই ক্রম। আর্য্য সমাজে যে নারী বিধবা, জগৎপতিই তাঁহার স্বামী। তাঁহার দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তি সহজে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়। যেরূপে সহজে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপে সমাজগঠন, সমাজের রীতিনীতিতে আবদ্ধ হইয়া আর্য্যনারী পতিভক্তিতে দেবভক্তি অভ্যাস করেন। স্বামীকে একদা গুণের পরমবস্তুরূপে যত্ন, আদর, সেবা ও পূজা করেন। স্বামীর প্রতিমাপূজা হইতে তাঁহার পক্ষে দেবপ্রতিমাপূজায় সমুত্থিত হওয়া সহজ হইয়া আইসে। আবার যে আর্য্যনারী দেবপ্রতিমাপূজায় মহা

অনুরক্ত, সেই দেবভক্তিপূর্ণা সতীর স্বামিপূজা সহজ কথা। তাই, সেই স্বামীকে পূজা করিয়া সতী দেবতার পূজা করেন। এই পতিব্রতা সতীর প্রেমে আর্য্য সাহিত্যে দেবত্বের সৌন্দর্য্য।

পশুত্ব।

আর্য্যকবিগণ অনেক আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আর্য্যসতী-চরিত্রে যে প্রেমাদর্শের সৃষ্টি, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, সতীর প্রেম গোপীপ্রেমের অনুরূপ—ততই নিঃস্বার্থ, ততই একনিষ্ঠ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও স্বামিগৌরবে পরিপূর্ণ। এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া তাহা দেবভক্তিতে পরিণত হয়। তখন সেই প্রেম দেবতায় উৎসর্গীকৃত হইয়া মানবকে দেবত্বে লইয়া যায়। আমরা এই সতীপ্রেমের ধর্ম্মালোচনা করিলে প্রেমতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি,—

(১) প্রেম, কামানুরাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। পতিকে সুখী করিয়া পতিব্রতা সতী আপনি সুখিনী হইতে চান। বাৎসল্য প্রেমের যে উচ্চ ধর্ম্ম, সতীপ্রেমেরও সেই লক্ষণ। সন্তান-সন্ততিকে সুখে রাখিতে পারিলে যেমন জনকজননীর সন্তোষ, পতি সম্বন্ধে সতীরও অনুরাগ তদ্রূপ। সুতরাং প্রকৃত প্রেম চাহে না, আপনি সুখী হই; প্রেম প্রণয়ভাজনকে সুখী করিতে চায়। সেই সুখে প্রেমের পরিতৃপ্তি। কিন্তু কাম এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অন্যদ্বারা কামানুরাগ সুখসম্ভোগ করিতে চায়। ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া কামরিপু চরিতার্থ হইতে চাহে। প্রেম পরার্থপর, কামানুরাগ স্বার্থপর।

(২) প্রেম পরার্থপর বলিয়া সতী পতির দোষগুণে নিরপেক্ষ। গুণে যাহার অনুরাগ, দোষে তাহার বীতরাগ। গুণ দেখিলে যে ভালবাসিবে, দোষ দেখিলে সে ঘৃণা করিবে। দোষ সকল পুরুষেরই আছে, সুতরাং রূপজ কি গুণজ অনুরাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম দোষগুণের পক্ষপাতী নহে। জনকজননী যেমন সন্তান সন্ততির দোষ গুণের নিরপেক্ষ হইয়া তাহাদিগকে অতি যত্নে ও আদরে স্নেহমমতা করেন, তাঁহাদের প্রেম যেমন সন্তানের দোষগুণনিরপেক্ষ, প্রকৃত সতীর প্রেম তেমনি পতির দোষ-গুণনিরপেক্ষ। জনকজনকীর স্বাভাবিক প্রেমের এই অপক্ষপাতিতা, সতী-প্রেমের আদর্শস্থানীয়। তাই মনু বলিয়া গিয়াছেন, পতি হাজার দোষী হইলেও

সতীর পরম পূজনীয়। সুধু মনু কেন? মহাভারত প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্র এই উপদেশ। কামানুরাগ, প্রেমের এই উচ্চতায় উঠিতে পারে না। কামানুরাগ রূপ ও গুণের বশীভূত। রূপ চিরস্থায়ী নহে, এবং গুণ কখন একাধারে দোষবিহীন হইতে পারে না; এজন্য, তাহার পাত্রাপাত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজি যাহাকে রূপে বা গুণে ভাল বোধ হইল, কামনা তাহাকে বরণ করিল। কালে, অন্য এক জন তদপেক্ষা অধিকতর রূপবান্ বা গুণবান দেখা গেল, কামনা অমনি সেই দিকে নিজ প্রবৃত্তি পরিচালিত করিল। সুতরাং কামনা কখন স্থির নহে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম স্থিরতা। প্রেম নিশ্চল ও একনিষ্ঠ হইয়া থাকে; কারণ, তাহা দোষে বিচলিত হয় না, এবং গুণের পক্ষপাতী নহে। আর্য্যসতীর প্রেম তাই একান্ত অনুরাগপূর্ণ, স্থির, অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ। কিন্তু কামান্ধ জনগণের অনুরাগ সর্ব্বদাই অস্থির এবং বিচলিত হইয়া থাকে।

(৩) প্রকৃত প্রেম নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ বলিয়া তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ। যাহা দোষগুণের নিরপেক্ষ, অন্য দ্বারা যাহা সুখী হইতে চাহে না, তাহার আকাঙ্ক্ষা কি? সতীর প্রেম বিনিময় ও ব্যবসা নহে। সতী বলিবে না, আগে তুমি ভাল বাস, তবে আমি ভাল বাসিব;—আগে দাও, তবে গ্রহণ কর। প্রকৃত প্রেম এরূপ বিনিময়ব্যাপার নহে। শকুন্তলা তরুলতা ও মৃগকে ভালবাসিয়া কি সে ভালবাসার বিনিময় চাহিতেন? পতিপ্রেম স্পৃহনীয় বটে; কিন্তু তাহা না হইলে যে সতী পতিকে ভাল বাসিবেন না, এমন কিছু কথা নাই। তবে সতী-প্রেমের সহিত পতিপ্রেম সংযুক্ত থাকিলে সে মিলন 'সোনায় সোহাগা হয়'; তাহাতে যেরূপ সুখোদয় হয়, গানে তাহা বলিতেছে,—

"কিংশুক শোভিত ভ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।"

তথাপি সতী পতিপ্রেমের নিরাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পতিকে ভালবাসেন। সেই দৃষ্টান্তে নিধু গাইয়া গিয়াছেন,—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

বাৎসল্য প্রেম যেমন নিরাকাঙ্ক্ষ, দাম্পত্যপ্রেম তেমনি হওয়া চাই। সন্তান সন্ততি ভালবাসিবে বলিয়া কি জনক জননী অপত্যস্নেহের বশীভূত হন? কই, তাঁহারা ত অপত্যের প্রেমাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন না,—কবে

আমাদের সন্তানেরা ভালবাসিতে শিখিবে, তবে আমরা তাহাদিগকে ভালবাসিব ও যত্ন করিব? তাঁহারা সে ভালবাসার নিরপেক্ষ হইয়া নিজ অপত্যকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন। আর্য্যসতীও তদ্রূপ পিতা কর্ত্তৃক উপযুক্ত বরে প্রদত্তা হইয়া পতিগৃহে আসিয়া পতিপ্রেমলাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না—কবে পতি ভালবাসিবেন, তবে তাঁহাকে ভালবাসিব। তিনি বিবাহের পর হইতেই পতিসেবায় নিযুক্ত হয়েন, এবং তাঁহাকে জীবনসর্ব্বস্বধনজ্ঞানে যত্ন ও আদর করিতে থাকেন। পতিরও অনুরাগ তাঁহাতে ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতে থাকে। পতিও পত্নীর ভালবাসা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না। বৈবাহিক যজ্ঞসূত্র-ধারণাবধি পতি, পত্নীর প্রতি সস্নেহনয়নে দেখিতে থাকেন। কারণ, তিনি যেমন নিজ পত্নীকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিতে পারেন, এক জন ইংরাজ পতি নিজ পত্নীকে সেরূপ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন না। সে হেতু, ইংরাজ পতিপত্নীর সম্বন্ধ চিরকালের জন্য না হইতে পারে, এবং এ দেশে স্ত্রীজাতির বহুবার বিবাহ প্রচলিত থাকিলে সেইরূপই ঘটিত। আর্য্য দাম্পত্যপ্রেম সুতরাং বিনিময়-নিরপেক্ষ এবং প্রেমাকাঙ্ক্ষাহীন। কিন্তু কামানুরাগ ঠিক বিপরীত। সে অনুরাগ পরমুখাপেক্ষী। অপরের অনুরাগ না পাইলে কামানুরাগ উদ্দীপিত হয় না; তাহা পরস্পর-বিনিময়ব্যাপার। এই বিনিময়ব্যাপার সম্পন্ন না হইলে, পশুপক্ষীর দাম্পত্য-প্রেম সংঘটিত হয় না বলিয়া, এই অনুরাগ মনুষ্যলোকে পশুত্ব নামে কলঙ্কিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের ন্যায় কামানুরাগ নিরাকাঙ্ক্ষ নহে।

প্রেম আর এক কারণেও কামানুরাগ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। সতী পতিগৌরবে পরিপূর্ণা। ব্রজগোপীগণ যেমন জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মহান্ আর কিছুই নাই, পতির গৌরব সতীর নিকট ততোধিক। সন্তান জননীর নিকট প্রিয়তম পদার্থ, এবং জননীও সন্তানের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। সুতরাং প্রকৃত প্রেম "মাহাত্ম্যজ্ঞানে" পরিপূর্ণ। কে বলে, সমানে সমানে নহিলে প্রেম হয় না? প্রভু দাসকে ভালবাসেন, দাসও প্রভুকে ভালবাসে; তদ্রূপ গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে। সম্পর্কের উচ্চনীচতা থাকিলেও প্রেমের বাধা নাই। প্রেমভাজন প্রেমিকের নিকট অতি ব্যথার সামগ্রী। তাহাকে ছোট করিতে গেলে প্রেমিক অমনি বেদনা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠেন, কি, আমার অমুক কেহ নয়? অমুকের চেয়ে বড় কে? তিনি সেই প্রেমভাজনকে সোনার চক্ষে দেখেন। তাঁহার প্রেম-

ভাজন তাঁহার চক্ষে স্বর্ণময়। স্পর্শমণির ন্যায় প্রেমনিধি যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে স্বর্ণময় করিয়া তোলে; কিন্তু কামানুরাগের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। যেখানে বাস্তবিক উচ্চনীচতা আছে, কামানুরাগ সেখানে নিজ বিষয়কে সমান করিয়া ভুলে; সাম্যভাবে আনিয়া অনুরাগের বিনিময় চাহে। কাম, নীচকে উচ্চে তুলে, এবং উচ্চকে নীচ করে; ছোট লোক বড় হইয়া এবং বড় লোক ছোট হইয়া যখন সমান হয়, তখন কামানুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

প্রকৃত প্রেমের সহিত কামানুরাগের এইরূপ বিভিন্নতা। প্রেম মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে, কিন্তু কামানুরাগ তাহাকে পশুর সহিত সমতুল্য করে। নিজে প্রেমময় হরি মানবে প্রেমরূপে দেখা দেন। মানব এই দেবাংশকে যত বিস্তৃত করেন, ততই তিনি প্রেমময়ের নিকটবর্ত্তী হয়েন, এবং ততই তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতে যান। কিন্তু যত কামরিপুপরতন্ত্র হয়েন, ততই তিনি নিজ প্রকৃতিকে পশুভাবে পরিণত করিতে যান।

আর্য্যসাহিত্যে সতীপ্রেমের ধর্ম্ম কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। সেই প্রেমের সহিত কামানুরাগের বিভিন্নতা দেখাইবার কারণ এই যে, সেই সাহিত্যেই উক্ত দ্বিবিধ অনুরাগেরই চিত্র আছে। আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, আর্য্যসাহিত্যে মূলেই ইন্দ্রিয়লালসার ছবি নাই। আমরা বলি, সে ছবির যে কলঙ্ক এবং প্রেমের যে উচ্চ গৌরব, তাহা সেই সাহিত্যে তদ্রূপেই দেখান হইয়াছে। যাহা নিশ্চয় পাপচিত্র এবং পশুত্ব, তাহা সেই কলঙ্করেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্র দেবতা হইয়াও শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং অহল্যার পাপস্পর্শও শাপে বিশোধিত হইয়াছিল। চন্দ্র ও তারার প্রণয় তদ্রূপ ঘৃণার্হ, এবং পাপরূপেই কলঙ্কিত। দেবতাতেও বিভিন্নতা নাই। দেবতারাও কখনও কখনও পাপকলঙ্কিত হন। যেখানে কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, সেইখানেই কেবল আর্য্য-সাহিত্যে কামানুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাম, রিপুরূপে কোনখানে দেখা দেয় নাই। তাহা অপত্যোৎপাদনের উপায়স্বরূপ দেখা দিয়াছে। কোনও মহাজনের জন্মদান আবশ্যক হওয়াতে কামের উদ্ভব হইয়াছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্তই তাহার স্থিতি, এবং তৎপরেই তাহার তিরোভাব। যেখানে আসক্তি ও লালসা, সেইখানেই পাপ। আসক্তিবিরহিত কাম পাপস্পৃষ্ট নহে।

গীতা শিক্ষা দিয়াছেন, আসক্তিবিরহিত কার্য্যের কোনও কর্ম্মফল নাই—

পাপ নাই, পুণ্যও নাই। কারণ, কোন স্বাভাবিক কার্য্য স্বতঃ দৈহিক কার্য্য-মাত্র; মনুষ্যের আসক্তি এবং অনুরাগস্পৃষ্ট হইয়া তাহা পাপপুণ্যের ফলপ্রসূ হয়। পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্মতা আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার জন্য দেবতা ও মানুষের দৃষ্টান্তে আমাদের আর্য্য কবিগণ কামের অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত গীতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের স্থূল অবয়বী দৃষ্টান্ত। স্বভাবজাত, আসক্তিরহিত এবং পাপপুণ্যহীন দৈহিক কার্য্য হেতু ব্যাসের জন্ম। ব্যাসের মত এক জন মহাজনের সমুদ্ভব জন্য মৎস্য-গন্ধার সহিত পরাশরের ক্ষণেকের নিমিত্ত মিলন। তদ্রূপ ভরতের জন্ম জন্য শকুন্তলার জন্ম, এবং কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব হেতু মহেশের শরীরে ক্ষণেকের নিমিত্ত মদনাবির্ভাব। পাণ্ডুরাজ পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব কুন্তীকে উপদেশ দিয়া দেবতার সহায় পঞ্চ পাণ্ডবের উদ্ভব করাইয়া লইয়াছিলেন। বলিরাজ অন্ধ মুনির ঔরসে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রোৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। যে অন্ধ মুনি কিছুই দেখিতে পান না, রূপের প্রতি আসক্তি তাঁহার সম্ভব নহে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পাপস্পৃষ্ট কামের দৃষ্টান্ত নহে।

যদি বল, আমাদের সাহিত্যে গান্ধর্ব্ববিবাহের চিত্র কি? পূর্ব্বকালে আর্য্যনারী কি স্বয়ম্বরা হইয়া নিজ মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন না? এই স্বয়ম্বরচিত্র কি আর্য্য সাহিত্যে নাই? আছে, অনেক স্থলে আছে। কিন্তু স্বয়ম্বরপ্রথা কেবল রাজকুলেই ছিল। সাধারণ জনসমাজে ছিল কি না, জানি না; কিন্তু যে চিত্র আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহারই কথা ধর্ত্তব্য। সে চিত্রে দেখা যায় যে, রাজকন্যারাই ইচ্ছাবরা হইতেন। তাও সকলে নহে। রাজকুলে এরূপ প্রথা প্রচলিত করাতে প্রাচীন বীরসমাজে এক মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। তাহা এক প্রকার রাজনীতি ছিল—যে নীতিপ্রভাবে রাজগণের মধ্যে যেন ড্রাইডেনের (Dryden) এই গীত সর্ব্বদা উদাত্ত স্বরে সঙ্গীত হইত,—

"None but the brave deserve the fair."

"বীরেরি কেবল সুন্দরী রতন।"

স্বয়ম্বরসভায় যখন নৃপতিগণ কোনও সুন্দরীরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত একত্রিত হইতেন, তখন তাঁহাদের কেবল গুণেরই পরিচয় হইত। সুনন্দা ইন্দুমতীকে সমাগত ভূপতিবর্গের সেইরূপ গুণের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে অজরাজ-গ্রহণে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। হরধনুর্ভঙ্গ ও লক্ষ্যভেদ না করিয়া—তদ্রূপ

মহাবীরত্বের পরিচয় না দিয়া—কেহ সীতা ও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল স্বয়ম্বরসভায় এই রূপগুণ ও বীরত্বের পরিচয় হইয়াই পরিশেষ হইত না। যিনি সুন্দরীরত্ন লাভ করিতেন, তাঁহার সেই সুন্দরীকে লইয়া গৃহে যাওয়া দুঃসাধ্য হইত। সুন্দরী যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, সেই সমস্ত ভূপতি, ভাগ্যবান বরমাল্যধারীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিত। তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তবে সেই সুন্দরীকে গৃহে লইয়া যাওয়া যাইত। এ বড় কম কথা নহে। বিবাহের এইরূপ মহা ব্যাপারের ঘোর গৌরবে সেই সুন্দরী ললনার পাত্রনির্ব্বাচন। স্বয়ম্বরসভায় যে সমস্ত ভূপতি একত্রিত হইতেন, তাঁহাদের গুণাগুণের পরিচয় হওয়াতে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণধর, কেবল যে তাহাই প্রতীত হইত, এমত নহে; যাঁহারা গুণাধিক্যে হীনগৌরব হইতেন, তাঁহাদের মুখ কেমন সভামধ্যে ম্লান হইয়া যাইত, এবং সুন্দরীলাভে নিষ্ফল হইয়া তাঁহারা কেমন লজ্জিত হইতেন, তাহারও চিত্র আর্য্য সাহিত্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সে ত বিবাহ নহে, তাহা নৃপতিগণের এক প্রকার পরীক্ষা-রীতি। বীরসমাজে এই বীরজনোচিত রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্য্য সাহিত্যে যে যে স্থানে এই প্রকার বিবাহের বিরাট বর্ণনা আছে, তথায় বীর প্রভৃতি উচ্চ রসের এত সঞ্চার হয় যে, তাহাতেই মন প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়লালসা বা কামানুরাগ তথায় কুত্রাপি অনুভূত হয় না।

আর্য্যেরা কামকে প্রকৃত প্রেম হইতে বিভিন্ন বলিয়া বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়া তাই প্রেম ও কামের যেরূপ ধর্ম্মনৈতিক কলঙ্ক ও গৌরব, তাহা সাহিত্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কাম কিরূপে পাপস্পৃষ্ট হয়, কিরূপে না হয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; বুঝিয়া সেই অনুরাগের সেই সেই মূর্ত্তি পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য কবিগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়া এতদূর সূক্ষ্মতা দেখাইতে পারিয়াছেন এবং সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার নিমিত্তই কামের বিভিন্ন মূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে সেরূপ অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে যে কাম বাস্তবিক পাপস্পৃষ্ট, তাহাকে সেইরূপেই কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে পাপছবির ঈষৎ স্পর্শে সাহিত্যের গৌরবহানি হইয়াছে, সেখানে আবার উচ্চরসের সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই গৌরব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন চিত্র। সে সাহিত্যে যে প্রেমের চিত্র নাই, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু সে প্রেমের বিভিন্ন মূর্ত্তি। আমরা আর্য্য

সাহিত্যের সতীপ্রেমের যে সকল ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, সে ধর্ম্মাক্রান্ত দাম্পত্য প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতি দুর্ল্লভ। এ সাহিত্যে যে প্রেমচিত্র, তাহা সখ্যপ্রেম—সখার সহিত সখার যে প্রেম, সমানের সহিত সমানের যে প্রেম, সেই প্রেমচিত্র। এই সখ্যপ্রেম অতি মধুর বটে। এই মধুর সখ্যভাব আর্য্যসতীতেও আছে, কিন্তু তাহা কান্তাভাবের অধীন। স্বামী সতীর পরম সখা, সতীও স্বামীর পরম সখী; সেই সখ্যপ্রেমে তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন। সতী স্বামীর আদরের আদরিণী; স্বামীও সতীর শত আদরের সামগ্রী। কত বিশ্রব্ধ আলাপনে, কত প্রিয়সম্ভাষণে তাঁহাদের দিন রাত কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই মধুর প্রেমের মধুরতার সহিত সতীর অধীনতা এবং স্বামীর দেবসম্ভ্রমও মিশ্রিত আছে। সখ্যভাবের সহিত ভক্তির মিলনেই আর্য্য প্রেমের সৌন্দর্য্য। সখ্যভাবে তাহার মধুরতা, এবং ভক্তিতে তাহার পবিত্র কান্তি। মধুরতার সহিত এই সম্ভ্রমের মিলনে আর্য্যনারী এক অদ্ভুত রমণীয় সামগ্রী। শুশ্রূষাকালে স্বামী পরমপূজ্য দেবতা, কিন্তু আলাপনসময়ে তিনি পরম সখা। আর্য্যনারীর দম্ভ, অহঙ্কার ও অভিমান সকলই স্বামীর উপর। মানিনী স্বামীর শত আদরের ধন। মানিনীর জন্য রাজগৃহে মর্ম্মরনির্ম্মিত স্বতন্ত্র মানাগার প্রস্তুত থাকিত। কথায় কথায় আর্য্যনারীর অভিমান ও দর্প—প্রাণপতি স্বামীর উপর দর্প ও মান। সমস্ত রাজ্য দিয়াও যদি মানভঙ্গ হয়, তাহাতেও আর্য্যপুত্র কুণ্ঠিত নহেন। দশরথ কত শত পরিতোষবাক্যে কৈকেয়ীর মানভঞ্জন করিতেছেন, বাল্মীকি তাহার উজ্জ্বল চিত্র দিয়াছেন। "চিত্রদর্শন" অঙ্কে সীতা কত মধুর আলাপে প্রিয়তথা রামচন্দ্রের সহিত স্বামিসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, ভবভূতি উত্তরচরিতের প্রারম্ভেই তাহার সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামচন্দ্র বিমানোপরি সীতাকে কত সুখালাপনে তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তিস্থল দেখাইয়া দিয়া যাইতেছেন, কালিদাস কেমন অতুলনীয় চিত্রে বর্ণনে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। এই সমস্ত দাম্পত্য প্রেমের সখ্য মধুরতার পরিচয়ে যে অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সেই সখ্যমধুরতাসম্ভোগকালে সীতা রামচন্দ্রকে এমনি সসম্ভ্রমে কথা কহিতেছেন যেন, এখনি আবশ্যক হইলে, সেই রামচন্দ্রের তিনি পূজা করিতে পারেন। যে মানিনী কৈকেয়ী একদা সগর্ব্ব বচনে দশরথকে দারুণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তিনিই তৎপূর্ব্বে সেবাশুশ্রূষায় দশরথের পরম প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া বরলাভের যোগ্যা হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিয়া রাধিকার মান ভাঙ্গিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতেন। ভক্তির সহিত সখ্য প্রেম মিলাইয়া আর্য্যনারী যেরূপে বিশ্রব্ধমনে স্বামিসম্ভোগ করেন, তাহারই প্রেমচিত্র আমাদের আর্য্যসাহিত্যে। তিনি আর্য্যসাহিত্যের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্যে একদা স্বর্গের পবিত্রতা, নন্দনকাননের শোভা এবং বসন্তের মধুরতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিরূপ দাম্পত্য প্রেমকান্তি? সেখানে সুধুই সখ্যপ্রেম। সে সখ্যপ্রেমে আর্য্যনারীর ভক্তি নাই—সতীর সেই নিঃস্বার্থ, সেই একনিষ্ঠ, সেই নিরাকাঙ্ক্ষ, সেই পতিগৌরবপরিপূর্ণ প্রেম নাই। সে প্রেমে সখ্যভাবের সেই বিশ্রব্ধ সম্ভাষণ আছে; সেই মধুরতা আছে; দর্প, অভিমান, আদর, সকলই আছে; কিন্তু তাহাতে আর্য্যসতীর সেই ভক্তিময় একনিষ্ঠ পুণ্যের প্রতিবিম্ব নাই, যাহাতে প্রেমকে পবিত্র ও দেবোচিত করে। তাহাতে মানবপ্রকৃতির আনন্দ আছে, কিন্তু দেবপ্রকৃতির সুষমা নাই। এই আনন্দময় নৃত্যের সহিত বিমল শোভার বিকাশ হইলে তবে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা ঘটে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম-সৌন্দর্য্যের এই অসম্পূর্ণতা। এই প্রেম-সৌন্দর্য্য অনেক স্থলেই আবার ইন্দ্রিয়লালসার বিলাস-ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত। এইরূপ বিলাস-ক্ষেত্র সেই সাহিত্যের অনেক দেশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সে সাহিত্যে প্রেমনদী বিলাসিতায় আবিল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আসক্তিপরিপূর্ণ চঞ্চল কাম, প্রেমনদীর বিশুদ্ধ স্রোতকে গৈরিকে কলুষিত করিয়াছে। রিপুর প্রাবল্যে প্রকৃতিস্রোত ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে প্রকৃতি রিপুরই দাসী হইয়াছে। মানবপ্রকৃতির পশুত্ব এত প্রবল যে, তথায় সেই প্রকৃতির দেবত্ব হীনপ্রভ হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই কথারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সীতাকে আমরা আর্য্যসাহিত্যে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য সাহিত্যে সে সীতা কই? বাল্মীকির সীতার স্থানে পাশ্চাত্য সাহিত্যে হোমরের হেলেন, উদয় হন। অমনি ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়—স্বর্গের স্থানে নরকের চিত্র! সেক্সপিয়ার খুলিলে, তুমি পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহা অসংযতরূপে প্রেম বলিয়া উক্ত, সেই প্রেমছবি বিশিষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। রোমিও প্রথমে রোসালিনের রূপে এত দূর মুগ্ধ যে, সেই হেতু তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তের শান্তি ছিল না। তিনি দিবানিশি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন ও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু যেইমাত্র জুলিয়েট সুন্দরী তাঁহার নয়ন-পথের পথিক

হইল, অমনি তিনি একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। একরাত্রির মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আবার জুলিয়েটের জন্য হৃদয়ের সেই অশান্তি। তিনি রিপুবলে তাড়িত হইয়া আবার জুলিয়েটের মন্দিরের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে গোপনে তাঁহার গবাক্ষসমুখে উপনীত। ডেমিট্রিয়স হার্মিয়াকে দেখিয়াও তদ্রূপ; অমনি তাঁহার মন হইতে হেলেনা উপিয়া গেল। সেক্সপিয়ারের মত এমন উপিয়া-যাওয়া প্রেমচিত্র কেহ দিতে পারিবে না।

বাল্মীকি অগ্রে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে সাজাইয়াছেন, সাজাইয়া মানবের মনে এমন ধর্ম্মবীরত্বের অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন যে, সেই সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ। তখন আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয়লালসার প্রতিমূর্ত্তি রাবণকে বাল্মীকি দেখাইলেন। ধর্ম্মবীরত্বে মোহিত মানব সেই রাবণের প্রতি স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত চাহিয়া দেখিলেন। তদ্রূপ, রামায়ণে অগ্রে সীতার পবিত্র এবং সুন্দর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যে মন আগে সীতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সে মন ইন্দ্রিয়পরায়ণা, কামানুমুগ্ধা ও নির্লজ্জা সূর্পনখাকে স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত অবলোকন করিবে। সুতরাং সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদনের সহিত সকলেরই স্বভাবতঃ সহানুভূতি ঘটে। এই চিত্র আর্য্যসাহিত্যে। কিন্তু সেক্সপিয়ারের নাটক মধ্যে এরূপ ফল ফলে না। অগ্রে তাঁহার বড় বড় রিপুপ্রাবল্যের চিত্র। অগ্রে দিগ্‌গজ রাবণের চিত্র। সেই রাবণের উচ্চতায় আগে মন উঠে। তাঁহার স্বর্ণলঙ্কা ও মনোহর রাজ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। ক্লিয়োপেট্রার বর্ণরাগে ও রাজসৌন্দর্য্যে মন মোহিত হয়। লেডি ম্যাকবেথে লোভের উচ্চতায় মন ভয়ানকে উন্নীত হয়। ইয়াগোর চাতুরীতে মন চমৎকৃত হয়। রিপুপ্রচণ্ডতার ঘোর চিত্রে মন এইরূপ স্তম্ভিত হইলে, সে মনে কি সেক্সপিয়ারের কমেডির সামান্য রিপুপ্রবল চিত্র রুচিবিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে। তখন সবই এক বর্ণরাগে সমান বোধ হয়। প্রভেদ এই, এক দিকে বড় বড় চিত্রের প্রকাণ্ডতায় মন মুগ্ধ, অন্য দিকে তাহারই ক্ষুদ্র ছবি সকল ফটোগ্রাফরাগে সুন্দর বোধ হইতে থাকে। এক ভূমিতেই এই বিবিধ চিত্র অঙ্কিত। সেই ভূমির নাম রিপুপ্রবলা মানবপ্রকৃতি। ঘোর রিপুর প্রকাণ্ড চিত্রে অগ্রে যে রুচি সমঞ্জসীভূত হইয়াছে, সে রুচি কেন আর তাহারই ক্ষুদ্র চিত্রে বিরোধী হইবে? সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমূহ হইতে একবার তাঁহার Tragi-comedy এবং Comedyতে অবতরণ কর।

সেখানেও সেই রিপুর প্রাবল্য ও ইন্দ্রিয়লালসা। তবে সেখানে মাত্রায়

কিছু কম। সেখানে রোমিও জুলিয়েটের মত সাংঘাতিক রিপুর উচ্ছ্বাস নাই বটে, কিন্তু সেই রিপুর কিছু মন্দীভূত বেগ। সেখানেও যৌবনের উন্মত্ত নৃত্য ও অধীরতা, এবং ইন্দ্রিয়লালসার ঘোর প্রমত্ততা ও আবেগ। বেনিডিকের মনে যখন প্রেমতরঙ্গ উঠিল, তখন তাহার আবেগ দেখে কে? বিয়েট্রিস অপেক্ষাও তিনি অধীর হইলেন। রোস্যালিণ্ড যৌবনরাগে এত উন্মত্তা যে, অরল্যাণ্ডোর দুই ঘণ্টার অদর্শনে একেবারে অধীরা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, সেক্সপিয়ারের কমেডিতে প্রেমের চিত্র, যৌবনের উন্মত্ততা এবং ইন্দ্রিয়লালসায় এত কলঙ্কিত দেখায় যে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রেমচিত্র বলিব, কি ইন্দ্রিয়লালসার চিত্র বলিব, এরূপ সন্দেহ জন্মে। সেই ইন্দ্রিয়লালসা ও যৌবনমদে মাতিয়া নায়কনায়িকাগণ সামাজিক ও পারিবারিক শাসনের নৈতিক বাঁধ ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। ডেসডিমোনা পিতৃশাসন অবজ্ঞা করিয়া, যৌবনমদে উন্মত্তা হইয়া, প্রকাশ্য আদালতে যেরূপ লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, জুলিয়েট এবং আইমজিনও তদ্রূপ পিতৃশাসনের অবজ্ঞাচিত্র। হার্মিয়া লাইসেণ্ডারকে লইয়া বনে পালাইয়া গিয়া তবে পিতৃশাসন ও রাজ্যশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এক স্থানে সেক্সপিয়ার এই উন্মত্ততা ও যৌবনলালসার চিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

লোরেন্সো। গগনে উজ্জ্বল শশী—এমনি নিশায়,
বায়ু যবে বহে ধীরে গাছের পাতায়;
কিন্তু নাহি কোন রব—হেন নিশাকালে,
ট্রলয় উঠিয়া বলে, ট্রয়ের দে'য়ালে,
ফেলেছিল কত শ্বাস, যবন শিবিরে,
যথায় শায়িত তার ক্রেসিডা সুস্থিরে।

জেসিকা। এমতি নিশায় আর দলিয়া শিশিরে,
সভয়ে থিসিবি আগে গিয়া ধীরে ধীরে;
দেখেছিল সিংহাকার কি যেন সম্মুখে,
অমনি সে পিছু ধায় ভয়ে কাঁপি বুকে।

লো। হেন নিশাকালে—ভীম সাগরের তীরে,
উ'লো ছড়ি হাতে ডিডো দাঁড়ায়ে অধীরে,
সঙ্কেতিয়া ডেকেছিল, প্রাণপ্রেয়সীরে,
একবার কার্থেজের পারে এস ফিরে।

যে। এমতি নিশায় আর সুন্দরী মিডিয়া,
নিজ হাতে ধনী কত ওষধি বাছিয়া,
তুলেছিল ঈশনেরে প্রাণদান দিয়া।
লো। হেন নিশাকালে আর জেসিকা সুন্দরী,
ইহুদীর তত ধন সব তুচ্ছ করি,
পালা'য়ে এসেছে ত্যজি ভেনিস নগরী,
অতৃপ্ত যৌবনরাগে বেল্‌মণ্টে আদরি।
জে। এমতি নিশায় আর লোরেন্স সুন্দর,
আদরেতে ধরি সেই প্রিয়ার অধর,
দিব্য করি বলেছিল কত ভালবাসে ;
মনোচোর করে চুরি মিথ্যা সুধাভাষে। ইত্যাদি।

এই প্রেমসম্ভাষণ দৃশ্যটি সকল তরুণবয়স্কের নিকট অতি মিষ্ট লাগিবে, তাহা আমরা জানি ; কিন্তু তন্মধ্যে যে যৌবনের উন্মত্ততার ছবি আছে—যে উন্মত্ততা সেক্সপিয়ারের সর্ব্বত্র—যে উন্মত্ততা কোনও গুরুজনের শাসন মানে না—যাহা সকল নৈতিক শাসনের অতীত—সেই দুর্দ্দম্য পাপছবি দিবার জন্য আমরা উক্ত সম্ভাষণটি অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। এইরূপ দুর্দ্দান্ত প্রেমের বশীভূত হইয়া জেসিকা সুন্দরী ধনবান ইহুদী পিতার গৃহ হইতে লোরেন্সের কাছে বেল্‌মণ্টে পলাইয়া গিয়াছিল। এরূপ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় বটে বলিয়া, সেক্সপিয়ারের নাটকে তাহার এত ছড়াছড়ি দেখা যায়। হোমারের মহাকাব্যেও প্যারিসের সহিত হেলেনের ব্যভিচার ও পলায়ন। আমাদের তরুণবয়স্ক ছাত্রগণের সম্মুখে এরূপ চিত্র সর্ব্বদা ধরাতে তাহাদের কল্পনা নিশ্চয় দূষিত হইবারই সম্ভাবনা। তবে আর বিদ্যাসুন্দর পড়ায় এত দোষ কি ? সেক্সপিয়ার ইউরোপীয় প্রেমছবি তুলিতে গিয়া এইরূপ অনেক গুলি পাপচিত্র দিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জনসমাজে "যার শেষ ভাল, তার সব ভাল" নামক নাটকের হেলেনার মত যে প্রেমের ভাল ছবি নাই, এমত নহে। কিন্তু তিনি সেরূপ চিত্র বড় অধিক ধরেন নাই। সেক্সপিয়ারপ্রমুখ কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সমস্ত এই দোষে কলঙ্কিত। বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ চিত্রাঙ্কণ করিলেই কি মানব-প্রকৃতি এত উজ্জ্বল হইয়া উঠে, না জনসমাজের প্রকৃত ফটোগ্রাফ দেওয়া হয় ?

পাশ্চাত্য জনসমাজে মানবপ্রকৃতির যেরূপ পাশব রীতি নীতি প্রচলিত

আছে, সেক্সপিয়ার তাহারই যথাযথ চিত্র দিয়াছেন। সুধু সেক্সপিয়ার কেন, পাশ্চাত্য কাব্য ও উপন্যাসেও সেই একই চিত্র। সেক্সপিয়ার সর্ব্বশীর্ষস্থানীয় বলিয়াই তাঁহার নাটকাবলি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। রূপ গুণের মোহ হেতু যে অনুরাগ জন্মে, সেই অনুরাগ যৌবনে কত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমরা তাহারই ছবি অঙ্কিত দেখি। কালিদাসে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম অনুরাগ তদ্রূপ রূপজ বটে, কিন্তু দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিয়া পাশব প্রবৃত্তির অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন। শকুন্তলার রূপজ অনুরাগেও এমত একটি লজ্জাশীলতার আবরণ দেওয়া আছে, যে জন্য সেই চিত্রকে অতি মধুর করিয়াছে। সেরূপ মধুরতা আমরা পাশ্চাত্য প্রেমচিত্রে দেখিতে পাই না। সুধু যে মধুর করিয়াছে, এমন নহে, সেই চিত্র হইতে পাপের মলিনতা অপনীত হইয়াছে। কারণ, রূপজ অনুরাগ সেই স্থলেই পাপকলঙ্কিত, যে স্থলে তাহা অবৈধ রিপুরূপে পরিণত হয়। শকুন্তলার অনুরাগ প্রবল আসক্তিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ববিবাহে রাজাদিগের বাধা নাই, এ জন্য দুষ্মন্তের বিবাহে তত দোষ স্পর্শে নাই।

কালিদাসের এই প্রেমচিত্রের কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমচিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"শকুন্তলা" নাটকখানি খুলিবামাত্র তোমার নয়নসমক্ষে এক অপূর্ব্ব প্রেমচিত্র উদিত হয়। শকুন্তলা কত প্রেম-পরিপূর্ণা হইয়া আশ্রমতরুগণের সেবায় নিয়োজিতা আছেন; কত স্নেহভরে আলবালে জলসেচন করিতেছেন! সখীগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে অথচ সলজ্জভাবে কেমন পরস্পর প্রেমালাপ করিয়া আশ্রমদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহাদের মনে যে পূর্ব্বানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারা যে প্রণয়োন্মুখী হইয়া সহকারের সহিত মাধবীলতার বিবাহ দিয়া বসন্তে মুকুলোদ্গমের প্রতীক্ষায় উল্লাস করিতেছিলেন, এই চিত্র তাহারই সুন্দর পরিচয়। এমন সময় দুষ্মন্ত দেখা দিলেন। দুষ্মন্তের সমক্ষে শকুন্তলার সলজ্জভাব ও মৌনাবলম্বন কালিদাস কেমন প্রকৃতিসঙ্গত চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন! সেখানে ইউরোপীয় যুবতীর ধৃষ্টতা ও বাচালতা নাই, অথচ শকুন্তলার সেই সলাজ নীরবতা বুঝি শতবাক্যে দুষ্মন্তের নিকট পূর্ব্বানুরাগের পরিচয় দিতেছে। এরূপ ভাববিকাশক নীরবতা কি কেহ কখন

দেখিয়াছে? অথচ তাহা প্রকৃত আর্য্য যুবতীর ধর্ম্ম। তাহা জুলিয়েট বা আইমজিনের প্রগল্‌ভতা নহে। ক্রেসিডার জাল প্রেমবিকাশক বাক্যাবলি ও ক্রিয়াকলাপ, জুলিয়েট, আইমজিন, হেলেনা বা হার্মিয়ার সহিত সমান নহে বটে, কিন্তু এই প্রকৃত প্রেমিকাগণ যে নানা প্রগল্‌ভ বাক্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাদের হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে অতি নির্লজ্জতারই পরিচায়ক। আর্য্য কুলাঙ্গনার তত দূর ধৃষ্টতা নাই। ইউরোপে সকলি সম্ভব; কারণ, সেখানে প্রেম ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়। প্রেমশিকার (Courtship) করা রীতি ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত থাকাতে, সেখানে পরের মন ভুলাইয়া রাজি করিতে হয়। সেখানে পতিলাভ নাই, পতিপত্নী শিকার করা আছে। সুন্দরী পত্নী লাভ করিতে হইলে, অর্লেণ্ডোর মত রোসালিণ্ডের মন ভুলাইয়া তাহাকে শিকার করিতে হয়। সুতরাং অন্তরে যত দূর না থাকে, মুখে এবং বাহ্য ব্যবহারে তদপেক্ষা অধিকতর ভালবাসার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য অনেকাংশে ভালবাসার ভাণ করিতেও হয়। ভালবাসি, ভালবাসি, প্রাণ যায়, ক্ষণেক অদর্শনও অসহ্য বলিয়া শত শত বার ভালবাসা জানাইতে হয়। অতৃপ্ত যৌবনের নেশা যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন ভালবাসার ভাষা অমৃতবচনে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সুধাময় বাক্যের মধ্যে কতটা মৌখিক, কতটা আন্তরিক, কতটা নেশার ঝোঁক, তাহা বুঝিবার যো নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, এক সুন্দরীর পর অন্য সুন্দরীকে দেখিয়া পূর্ব্বনেশা ও ভালবাসা রাতারাতি কাটিয়া গিয়াছে। যদি বল, স্বাধীনভাবে পছন্দ ও পাত্রাপাত্রনির্ব্বাচন করিয়া ত বিবাহ হয়। আমরা বলি, তেমন পূর্ণ ও অতৃপ্ত যৌবনকালে নির্ব্বাচনের কথা আসিতেই পারে না। যৌবনে নির্ব্বাচন হয় না, তখন কেবল রিপুর জোর ও চক্ষের নেশা। যাহাকে নির্ব্বাচন বল, তাহা নেশা, বা রিপুরই প্রতিবাক্যমাত্র। নিজে সেক্সপিয়ার সেই কথাই বলিয়াছেন। Friar রোমিওকে উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছিলেন,—

———Young men's love then lies
not truly in their heart, but in their eyes."

হার্মিয়ার বিবাহের জন্য তাহার পিতা ডেমিট্রিয়সকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু হার্মিয়া চান লাইসেণ্ডারকে। রাজার নিকট আবেদন হইল। হার্মিয়া বলিলেন যে, পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন, তবে অবশ্য লাইসেণ্ডারকেই মনোনীত করিতেন।

"Hermia—I would my father look'd but with my eyes"

এ কথার উত্তরে রাজা বলিতেছেন,—তোমার চক্ষু কোথায়? তুমি ত অন্ধ। তোমার উচিত, তোমার পিতার চক্ষে দেখা।

"Theseus—Rather your eyes must with his Judgment look."

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেখানে নির্ব্বাচনের শক্তি নাই, যেখানে রিপুর অন্ধতাই প্রবল, সেখানে পিতা মাতার নির্ব্বাচনেই সম্মত হওয়া উচিত। এই কারণে, আর্য্যজাতির মধ্যে যে বিবাহসূত্রে পাত্র ও পাত্রীকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থাকিতে হয়, সে কার্য্যে বরকন্যার নির্ব্বাচন পিতামাতা বা অন্য সুবিজ্ঞ অভিভাবকের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। আপনার বিবাহের জন্য যখন লালায়িত হইতে হয় না, তখন আর দোকানদারি করিয়া প্রেমশিকার করিবার আবশ্যকতা কি? আর্য্যসমাজে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা এজন্য স্বাভাবিক অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সেই লজ্জাশীলতা কেমন মধুর, তাহা শকুন্তলায় প্রতীয়মান।

শকুন্তলা যেমন সংসার হইতে দূরস্থিতা হইয়া বনমাঝে ঋষির আশ্রমে পালিতা হইয়াছিলেন, তিনি সেই আশ্রমবাসিগণ ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না; সেক্সপিয়ারের মিরাণ্ডাও তেমনি এক নির্জ্জন দেশে একাকিনী পিতার নিকট পালিতা হইয়াছিলেন। শকুন্তলার যৌবনরাগে যখন প্রেমোদ্রেক হইয়াছিল, সেই সময়ে দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহার যে স্বাভাবিক নীরব সলজ্জ ব্যবহার, তাহার বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু সেক্সপিয়ার তদনুরূপ স্থানে মিরাণ্ডার কিরূপ ব্যবহার দেখাইতেছেন? তিনি তাঁহার পিতা ভিন্ন জনসমাজের মুখ দর্শন করেন নাই, কিন্তু যখন Ferdinand তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তিনি যেন ঘোর সংসারিণীর ন্যায় তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। শকুন্তলার সাক্ষাতে দুষ্মন্তই গান্ধর্ব্ব-বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে কি হইতেছে, দেখুন;—

মি—তুমি কি আমাকে ভালবাস?

ফার্ডিন্যাণ্ড।—আমি সর্ব্ব দেবদেবী ও পৃথিবী, সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি, শপথ ও সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি যে শুধু তোমায় ভালবাসি, এমন নহে; তোমাকে অতি সভ্রান্ত কন্যারূপে সম্মান করি, তোমার গৌরব কত, তাহা জানি না।

মি—তবে, যাহাতে আমি হাসিব, তাহাতে কাঁদি কেন?

ফা—কেন তুমি কাঁদ?

মি—আমি কাঁদি আমার হীনতা ও দীনতা বুঝিয়া। আমি তোমাকে যাহা দিব, তাহা তুমি যে গ্রহণ করিবে, এমন ভরসা আমার নাই, কিম্বা তোমার যাহা না পাইলে আমি মৃতপ্রায় হইব, তাহা যে তুমি দিবে, এমন আশাও করি না, সেই জন্য কাঁদি। কিন্তু এ সব তুচ্ছ কথা! যাহা আমি ঢাকিতে চাহিতেছি, তাহা যেন সুস্পষ্ট বাহির হইয়া পড়িতেছে। লজ্জা ও চাতুরীতে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া সরলভাবে বলি, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি তোমার পত্নী হইব। যদি না কর, আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।

ফা।—তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা। আমি কি তোমার যোগ্য!

মি। তবে তুমি আমার প্রাণবল্লভ পতি।

এত কথা, বাক্‌চাতুরী ও মনোমোহন বাক্য মিরাণ্ডা কোথা হইতে শিখিলেন? তিনি না বলিয়াছিলেন, আমি কখন নরলোকের মুখদর্শন করি নাই। তিনি না জনহীন দ্বীপে তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে আনীত হয়েন? সেখানে তাঁহার পিতা ব্যতীত আর কাহারও মুখ বার বৎসর দেখেন নাই। তবে সেই বনবাসিনী ষোড়শীর মুখে এত বাক্‌ছলা কোথা হইতে আসিল? শকুন্তলার ঋষিআশ্রমে তবু ত একপ্রকার জনসমাজ ছিল। সেখানে সেই ঋষির শিষ্যগণ ও গৌতমী ছিলেন; অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় ছিল, আর প্রাচীন কালে মুনিগণের আশ্রমে কে না আসিত? তথাপি শকুন্তলারও মুখে এত কৌশলের বাগ্‌ভঙ্গী শোভা পাইত না। সেই শকুন্তলা সাহসিনী হইয়া অগ্রে দুষ্মন্তের কাছে কোনও কথা কহেন নাই। দুষ্মন্তই অগ্রে বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। তুলিলেও শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট তত কৌশলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। শকুন্তলা বরাবর লজ্জাশীলা ও নতমুখী হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতি ত সর্ব্ব স্থানেই সমান। মিরাণ্ডা ত পাশ্চাত্য জনসমাজে শিক্ষিতা হয়েন নাই যে, তিনি সেই সমাজের ধরণ-ধারণ অনায়াসে অনুকরণ করিবেন, বা সেই সমাজস্থা বয়স্কা কুমারীগণের ন্যায় বাগ্‌নিপুণা হইবেন। সেক্সপিয়ার বোধ হয় নিজ অভ্যাসবশতঃ যাহা জুলিয়েটে, রোসালিণ্ডে, বিয়াট্রিসে, আইমজিনে, ডেসডিমোনায়, হার্মিয়া প্রভৃতি চতুরাগণে দিয়াছিলেন, তাহা মিরাণ্ডায় আরোপ করিতে

সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শকুন্তলার ব্যবহারের মত সরলতা, লজ্জাশীলতা, অথচ স্বাভাবিক যৌবনসুলভ প্রেমপরিচয়ের চিত্র, সেক্সপিয়ারের পাশ্চাত্য সমাজে অত্যন্ত বিরল। সুতরাং তাহা কল্পনায় আনাও বড় সহজ কথা নহে। মানব প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য কেবল আর্য্য সাহিত্যেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মিরাণ্ডা সরলতায় সাহসিনী। লজ্জা কি, লজ্জার ব্যবহার কিরূপ, মিরাণ্ডা কখন দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যখন যাহা উদিত হইত, তখন তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। মনের আবেগ তিনি ঢাকিতে জানিতেন না। এই সরলতায় সুতরাং তাহার মনের ভাব দর্পণের মত দেখা দিত। তাই যদি হয়, তবে ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মিরাণ্ডার সম্ভাষণকে অবশ্য সরলতার পরিচয় ও স্বাভাবিক বলিতে হইবে। হৃদয়াবেগে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা অবশ্য অকৃত্রিম ও সরল ভাষা। ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মিরাণ্ডার কথাবার্ত্তা যদি স্বভাবোক্তি হয়, তবে কথা এই, মিরাণ্ডার সেরূপ স্বভাব সম্ভব কি না? মিরাণ্ডার মুখে এত ভালবাসার কথা, বিবাহের নিমিত্ত তাহার চরিত্রের এত অধীরতা, এবং মনের আবেগ গোপন করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিতে যাইতেছিলেন, বলিয়াছিলেন, এই লুকাচুরি ভাব তাহার মত জনসমাজবিদূরিতা সরলা যুবতীর চরিত্রে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Hence bashful cunning."

সেই "সলজ্জ চাতুরী" তিনি কিরূপে জানিলেন? সলজ্জ চাতুরী দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার তিনি বলিতেছেন,—

"And prompt me plain and holy innocence."

তিনি চাতুরীর সহিত "সরলতার" প্রভেদ শিখিলেন কোথা হইতে? সেই সরলতার পবিত্রতা বুঝিলেন কিরূপে? আবার ফার্ডিন্যাণ্ডকে কিরূপ ধরিয়া বসিয়াছেন দেখুন,—

"I am your wife, if you will marry me.
If not, I 'll die your maid: to be your fellow
You may deny me; I 'll be your servant,
Whether you will or no."

মিরাণ্ডার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগপ্রকাশে এত বাক্‌চাতুরী, তাঁহার মত নির্জ্জনপ্রস্থিতা সরলা ললনায় শোভা পায় না,—সম্ভাবিতও নহে। সেই সম্ভা-

যণে তাঁহার যৌবনসুলভ হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়লালসা কেমন বিশদরূপে প্রকটিত! মিয়্যাণ্ডা বিবাহের নিমিত্ত তেমনি অধীরা, যেমন ফার্ডিন্যাণ্ড। সূর্পনখার অধীরতা ও জিদের সহিত মিয়্যাণ্ডার প্রভেদ কি? যৌবনমদের এই উন্মত্ততা ও অধীরতার চিত্র সেক্‌স্‌পিয়ারে। মিয়্যাণ্ডা ইন্দ্রিয়লালসার প্রাবল্য ও অধীরতা দেখাইবার অতি স্বচ্ছ দর্পণ।

সেক্‌সপিয়ার যেমন মানবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক এবং পাশব রিপুগণের পরাকাষ্ঠা ও অসামান্য প্রাবল্য চিত্রিত করিয়াছেন, † আর্য্যকবিগণ তেমনি প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগণের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সচরাচর সংসারক্ষেত্রে তত দূর রিপুবৎ স্ফূর্ত্তি অতি দুর্লভ। লেডি ম্যাকবেথ যেমন দুর্লভ, সীতা সাবিত্রীও তেমনি দুর্লভ। কিন্তু কবির সৃষ্টি দুর্লভ নহে। কবি কল্পনা-রাজ্যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানবের চরমোৎকর্ষ দেখাইতে পারেন। মানবের কল্পনাসমক্ষে সেই আদর্শ ধরিবার জন্যই কাব্যের সৃষ্টি। নহিলে সচরাচর পৃথিবীতে যাহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য আবার কাব্যসৃষ্টির আবশ্যকতা কি? তাহা ত মানবের সমক্ষে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কবি তদুপরি উঠিয়া অসামান্য আদর্শের সৃষ্টি করেন। সেই আদর্শ মানবমনে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, এবং প্রবৃত্তিগণকে সৎপথে নিয়োজিত করে। এইরূপ আদর্শের সৃষ্টি আর্য্যসাহিত্যের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ।

সেক্‌সপিয়র জুলিয়েটে দেখাইলেন যে, এ সংসারে সামাজিক, পারিবারিক ও বিবাহের বন্ধন ছেদন করিতে না পারিলে, নিজ রিপু চরিতার্থ করা যায় না। আর্য্যকবিগণ দেখান যে, সংসারের সমস্ত বন্ধন ও শাসনের অধীন হইয়া যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই প্রেমের নৈতিক সৌন্দর্য্য ও চরম উৎকর্ষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু সর্ব্বলোকসাধারণ। সেই রিপুগণকে প্রবল হইতে না দেওয়াই মনুষ্যত্ব। আর্য্যসমাজ ও সাহিত্যে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

† সেক্সপিয়ারকে উল্লেখ করিয়া যাহা বলা হইল, তাহা সেক্সপিয়ারের আদর্শাবলম্বিত সমস্ত কাব্য ও উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য। সেক্সপিয়ার এই কাব্য ও ঔপন্যাসিক সাহিত্যের অধিনায়কমাত্র।

বেগম সমরু।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে অদ্ভুত রমণীর নাম সংযোজিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের কাহিনী বড়ই বৈচিত্র্যময়ী। ইউরোপে হইলে বেগম সমরুর ন্যায় চিত্র ইতিহাসের পত্রে বিশেষ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইত; হয় ত তাহাতে জোয়ান অফ আর্ক, পপ্ জোয়ান, বা অন্য কোনও ঐতিহাসিক রমণীর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত; কিন্তু হিন্দুস্থানের সেই সময়ের ইতিহাস ইংরাজের লেখা বলিয়া, বেগম সমরুর ছবি তাহাতে অল্পপরিসর পরিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাগ্যপরিবর্ত্তনের বিপর্য্যয়মুখে না পড়িলে এই স্ত্রীশক্তির গতি কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক! এই প্রবন্ধের যতই অভ্যন্তরস্তরে প্রবিষ্ট হইবেন, ততই আমাদের এই উক্তির সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন।

লর্ড ক্লাইব যে সময়ে পলাশীর আম্রকাননে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বাঙ্গলায় মুসলমান-শাসন ভস্মসাৎ করেন, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে, অনেক ইউরোপীয়, এই ফলজলপূর্ণা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, দেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জর্জ্জ টমাস ও ওয়ালটার রেন্‌হাড, এই দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জর্জ টমাস আইরিশ, রেন্‌হার্ড ফরাসী। দুই জনেই প্রায় এক সময়ে বাঙ্গলার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং দুই জনেই যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার কালে সম্পূর্ণ অলৌকিক ও অদ্ভুত। জর্জ্জ টমাসের সমস্ত কার্য্যের পরিচয় প্রদান বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্যভুক্ত নহে। রেন্‌হার্ড যাহা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ইহার ন্যায় অদ্ভুতক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি কার্য্যক্ষেত্রে বসিয়া গ্রহনক্ষত্রের সুদৃষ্টি পাইত, বা সুবাতাসের জোরে ভাগ্যতরণী ভাসাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার জীবনের কার্য্যকলাপ অত কলঙ্কিত এবং সামান্য ভাবে পরিকীর্ত্তিত— হইত না।

ওয়ালটার রেন্‌হার্ডের সহিত বেগম সমরুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রেন্‌হার্ড যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, বেগম তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সমরু

না থাকিলে বেগমের আদৌ অস্তিত্বই থাকিত না। এই অদ্ভুত বেগমের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, বেগমের স্বামী সমরুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলা আবশ্যক।

রেন্‌হার্ড ও সমরু একই ব্যক্তি। বেগম সমরুর স্ত্রী। বেগমের খ্যাতি সমরুর জন্য। রেন্‌হার্ড হইতে "সমরু" এই রহস্যময় নাম কেমন করিয়া হইল; রেন্‌হার্ড ইউরোপীয়,—তাহার আবার বেগম কেন; এ সকল কথার মীমাংসা করা যাক্।

রেন্‌হার্ড ফ্রান্সদেশের ট্রিভস্ প্রদেশের অধিবাসী। সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূত বলিয়া তাঁহার গৌরব করিবার কিছুই ছিল না। অবস্থা অবশ্য দরিদ্রতার ও নিম্নস্তরের। তখন ভারতবর্ষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যাঁহারা দৌড়িয়া আসিতেন, নিতান্ত নিরাশা, অতৃপ্ত জঠর জ্বালা ও অনিবার্য্য কারণ না ঘটিলে, তাঁহাদের শুভাগমন ঘটিত না। রেণহার্ড এই শ্রেণীর; সামান্য ছুতারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, একখানি ফরাসি জাহাজে তিনি বাঙ্গলায় পদার্পণ করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তখন সবে সৌভাগ্য-তারকা দেখা দিয়াছে। ক্লাইব পলাশীর রণাভিনয়ে সে তারকার জ্যোতি আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজের সেনার তখন একটা বিশেষ কদর দাঁড়াইয়াছে। রেন্‌হার্ড প্রথমে তাহাতে সৈনিকরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ফরাসী হইয়া ইংরাজের অধীনতা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি চন্দননগরে স্বজাতীয় সেনাদলে প্রবেশ করিলেন।

ইহাতেও রেনহার্ডের মন উঠিল না। ফরাসীর প্রতিপত্তি পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সেখানে ভবিষ্যৎ আশা খুব কম। তিনি সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন; দলস্থ কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না। তাঁহার এই বিষণ্ণ ভাব ও মলিন মুখ দেখিয়া, তাঁহার সমকর্ম্মী সৈনি-

---

* এই প্রবন্ধের সংকলনকল্পে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সহায়তা লইয়াছি। আমাদের সংগৃহীত বিবরণ যত দূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, মাসিক পত্রিকার পরিসরের দিকে দৃষ্টি থাকায়, তত দূর হয় নাই। তথাপি যদি পাঠকবর্গ এ বিষয়ে অধিক কিছু জানিতে চাহেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির দ্বারা সে তৃষ্ণার পূর্ণ নিবৃত্তি করিতে পারেন। (1) Seoh's History of Dekkan, (2) Sier Mutakherin, (3) Franklin's Shah Alum, (4) Franklin's History of George Thomas, (5) Major Paolie's letter in the Annual Register for 1800, (6) Military Memoir of Leut. Col. James Skinner. C. B., (7) Rambles of an Indian official 1828.

কেরা তাঁহাকে Sombre বলিয়া ঠাট্টা তামাসা করিত, (১) তথাপি রেনহার্ডের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল না। আমরা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের অনুরোধে, এখন হইতে রেনহার্ড নাম পরিত্যাগ করিলাম। "সমরু" লইয়াই আমাদের প্রয়োজন। ফরাসীর চাকরী ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃতিস্থচিত্ত সমরু অযোধ্যার নবাব সফ্‌দার জঙ্গের (২) সেনাদলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার বনিয়া উঠিল না।

পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মীরজাফরী আমলের শেষাশেষি, আবার বাঙ্গলা দেশে সমরুর নাম শোনা যায়। পূর্ণিয়ার ফৌজদার কদম হোসেন খাঁ নবাব-সরকারের বিদ্রোহী হন। সমরু কদম হোসেনের দলে গিয়া জুটিলেন। কদম হোসেনকে নবাবের ফৌজ বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলে, সমরু অগত্যা তাঁহার দল ত্যাগ করিলেন।

আরমাণি গুরগণ খাঁ (Gregory) বাঙ্গালার নবাব মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি। মীর কাশেম তখন ইংরাজদিগের সহিত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষণের আশঙ্কায়, ভূতপূর্ব্ব নবাবী আমলের উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি সেনাদিগের সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। গুরগণ খাঁ এই কাজ অনেকটা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি এক জন ইউরোপীয় তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ইংরাজ অপেক্ষা এক জন ফরাসীর উপযোগিতাই অধিক বলিয়া বোধ হইল। সমরু, গুরগণ খাঁর সহায়তায় নবাবের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সমরুর সামরিক প্রতিভা ছিল, কিন্তু তাহা সংযত ও সুশৃঙ্খল বা কোন বিশেষ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত ছিল না। তথাপি সমরু অনেক কার্য্যের উপযোগী ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধসাহসই তাঁহার সৈনিকবৃত্তির অধিক সহায়তা করিত।

সেরাজউদ্দৌলার পর হইতে বাঙ্গলার নবাবের সেনাদল অতি উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত হইয়া উঠিয়াছিল। না ছিল তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, না ছিল

(১) Sombre শব্দ—বিষণ্ণার্থজ্ঞাপক। এই শব্দ হইতেই ক্রমশঃ "সমরু" এই অপভ্রংশে দাঁড়াইয়াছিল। শেষ তাহাই রহিয়া গেল। "সমরু" মুসলমানী ধরণের নাম। মুসলমানেরা নামপরিবর্ত্তনের বিষয়ে বড় সিদ্ধহস্ত; বিশেষতঃ, ফরাসী জাতির প্রতি এ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ অনুগ্রহ। তাজমহলের নক্সাকারী বিখ্যাত ফরাসী Austin de Bordeux এই সংঘর্ষণে পড়িয়া ক্রমে "উস্তাদ ইহু" হইয়া পড়েন। তাঁহার পুত্র সাহজাহানের আমলে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে নৃপতির কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নামের পরিবর্ত্তন বড়ই দ্রুত। ইনি একবারে "মহম্মদ সরিফে" নামিয়া পড়েন।

(২) সুজাউদ্দৌলার পিতা।

ভাল অস্ত্র শস্ত্র, না ছিল বেতনের বন্দোবস্ত, না ছিল উপযুক্ত নায়ক। জাফর আলি অহিফেন ও সুখস্বপ্ন, লোহিতমথমলাবৃত মসনদের কোমল শয্যা ও আলস্য, রমণীর কলকণ্ঠ ও অপাঙ্গদৃষ্টি লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহার এব বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গলার প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাহিলে, এবং ইংরাজের সেনা তাঁহার "মতিঝিলের" আশে পাশে লাল রঙ্গের কূর্ত্তি পরিয়া সঙ্গিন খাড়া করিয়া ঘুরিলেই, রাজ্যশাসনের ও ক্ষমতাবিস্তারের যথেষ্ট উপায় থাকিবে।

কিন্তু কাশেম আলি খাঁ যখন বাঙ্গলার গদি দখল করিলেন, তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইল। তিনি নিজে দুঃসাহসিক ও দৃঢ়সংকল্প—সেনাপতি ও সহায় জুটিয়াছিল তদ্রূপ। গুরগণ খাঁ নবাবের এই দুরাকাঙ্ক্ষার—বা যাহাই বলুন না কেন,—তাঁহার প্রধান সহায়। গুরগণ আর এক জন সঙ্গী খুঁজিতে-ছিলেন; সমরুর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

গুরগণ খাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সমরুর সেনাচালনাভিজ্ঞতা, উভয় মিলিয়া অভূতপূর্ব্ব ফলের উৎপাদন করিল। সকলে দেখিল, চেষ্টা করিলে, বসিয়া বসিয়া ডালরুটী-হজমকারী, যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পরায়ণ সেনার পরিবর্ত্তে, সতেজ, কার্য্যক্ষম, নিমকের মর্য্যাদা-রক্ষাকারী সেনাদল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কি কারণে ইংরাজের সহিত মীরকাশীমের বিবাদ বাধে, ইতিপূর্ব্বে আমি, সাহিত্যে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মুঙ্গেরে নবাব সাহেবের সঞ্চিত ধনরত্ন ছিল। স্বল্পবুদ্ধি ইলিষ সাহেব, নিজের ঔদ্ধত্যের দোষে যে বিবাদ বাধাইয়া মুঙ্গের অবরোধ করিলেন, তাহাতে নবাবের বিশেষ বোধোদয় হইল। ক্রমশঃ যখন তাঁহার পড়তা কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন তিনি জিঘাংসাপরায়ণ ও ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া, পাটনায় অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে হত্যা করিবার সংকল্প করিলেন।

নবাব গুরগণ খাঁর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে, সেই সুচতুর আর-মাণি কৌশলক্রমে এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নবাব তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। সংকল্প ছাড়িলেন না, লোক খুঁজিতে লাগিলেন। সমরুর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন। কি গূঢ় কারণে বলিতে পারি না, বাচার অবিবেকী সমরু এই নৃশংশ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল।

অতি সত্বরই ভিন্নমূর্ত্তিতে দ্বিতীয় অন্ধকূপহত্যার অভিনয় আরম্ভ হইল

সঙ্গীনের খোঁচায়, বন্দুকের গুলিতে, তরবারির ধারে, ফাঁসের মুখে অনেকেরই জীবনলীলা শেষ হইল। দুর্গপ্রাকার হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কেহ কেহ প্রাণ হারাইল। এই হতভাগ্য বন্দীদের মধ্যে মুরশিদাবাদের ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ স্বরূপ চাঁদ ও সীতাব রায়ও ছিলেন। "পাটনার হত্যা-কাণ্ডে" সমরুর নাম, শোণিতাক্ষরে কলঙ্কিত ভাবে ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় বিবরিত থাকিবে।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্বে সমরুর উত্তেজনায় নবাব আর একটি দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এটি সাধারণ ইতিহাসে তত প্রকাশ নাই। ইংরাজের সহিত প্রকাশ্যভাবে লড়িবার জন্য কাশেম আলি মুঙ্গেরেই দুর্গ দৃঢ় ও অন্যান্য আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও একটা দুঃসাহসিক আয়োজনের কল্পনা হইতেছিল। গুরগণ খাঁ ও সমরুর প্রবর্ত্তনায় মীরকাশেম নেপালাধিপতিকে কৌশলে বিনষ্ট করিয়া নেপালের স্বাভাবিক পার্ব্বত্যক্ষেত্র নিজ আশ্রয়ের ও আত্মরক্ষার জন্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আশার সীমা নাই। কিন্তু যখন ইহা দুরাশায় পরিণত হয়, তখন কোনও বিষয়ে জ্ঞানগোচর থাকে না; তার পর সেই দুরাশা যখন নিরাশার যন্ত্রণায় পর্য্যবসিত হয়, তখন আত্মগ্লানি ও তাহার পরিণাম এত বেশী হইয়া পড়ে যে, কার্য্যলিপ্ত সকলেরই বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। নবাব, গুরগণ খাঁ ও সমরুর সেই দশা হইয়াছিল।

মতলব স্থির হইল, বাছা বাছা ৪০০ শত লোক নেপাল যাত্রা করিবে। তাহাদের সঙ্গে চারি শত বাক্সে বন্দুক, বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম থাকিবে। বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে নেপালাধিপের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন যাইতেছে, এই কথাই বাহিরে প্রকাশ থাকিবে। ভিতরের কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু তখন কিছু আজকালের আমল নহে। বাঙ্গলার সীমার বাহিরে, —বিশেষতঃ নেপালের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিতে হইলে, বিশেষ ছাড় ও সনন্দের প্রয়োজন। চেষ্টা করিয়া তাহারও জোগাড় করা হইল। বাহিরে প্রকাশ রহিল, বাঙ্গলার নবাবের লোক নেপালাধিপতির জন্য নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া যাইতেছে।

নবাব ইতিপূর্ব্বে নেপালের রাজপ্রাসাদে দুই এক জন ষড়যন্ত্রকারীর সহায়তা পাইয়াছিলেন। নচেৎ অত সহজে ৪০০ শত লোকের ছাড় জোগাড়

হইত না। নবাবের লোকের উপর আদেশ ছিল, তাহারা পথিমধ্যে কোনও বাক্স কোনও কারণেই বাধ্য হইলেও খুলিবে না। কাটামুণ্ডের প্রাসাদে উপনীত হইয়া রাজেশ্বরের সমক্ষে সেই সমস্ত খোলা হইবে। আসল বন্দোবস্ত এই রহিল, প্রাসাদে ঢুকিয়াই সুযোগ পাইলেই সেই সমস্ত বাক্স হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া সেনাদল সহসা রাজাকে বন্দী ও পুরবাসীদিগকে নিহত করিবে। এ দিকে তাহাদের সহায়তার জন্য মুঙ্গের হইতে ১২০০ শত সৈন্য বেথিয়ার অদূরে পর্ব্বতের নিম্নে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে, তাহাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবে।

কিন্তু হায়! ঘটনাবশে এই দুরাশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইল। এটা কেবল ঘটিল, নবাবের নিজের লোকের বুদ্ধির দোষে। ইহাদের সঙ্গে যদি গুরগণ বা সমরুর ন্যায় কোনও স্থিরবুদ্ধি সেনাপতি থাকিতেন, তাহা হইলে এ অনর্থপাত হইত না। নেপালের নীচে, মাখনপুরে মহারাজের এক কেল্লা ছিল। নবাবের লোকেরা কেল্লায় উপস্থিত হইয়া ছাড় দেখাইল। নেপালেশ্বরের লোক, নবাবের লোকের যথেষ্ট খাতির অভ্যর্থনা করিল। রাত্রিকালে নবাবের পক্ষের দুই চারি জন মদ্যপান করাতে, তাহাদের সহিত রাজার দুই এক জন সিপাহীর কোনও কারণে বচসা উপস্থিত হয়। তাহার উত্তেজনায় নবাবের লোকের এক জন বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা দেখা যাইবে, কাল এই দুর্গ কাহাদের হাতে আইসে।" এই কথায় নেপালি সেনারা সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাদের সেনাপতির নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিল। তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাক্স খোলা হইল। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পাইলে নেপালীরা উত্তেজিত হইয়া ৩।৪ জন ব্যতীত নবাবের সমস্ত সেনাকে দুর্গমধ্যে হত্যা করিল। পাটনার হত্যাকাণ্ডে অকারণে যে শোণিতপাত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

যে চারি জন লোক ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, তাহারা প্রাণ লইয়া অতি কষ্টে বেথিয়ায় পঁহুছিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ নবাবশিবিরে প্রচার করিল। সমস্ত সেনা অগত্যা মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাসেম আলি যে প্রকার মতলব আঁটিয়াছিলেন, যদি সুসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে নেপাল নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইত।

উদয়নালার যুদ্ধের পর মীরকাশেমের অবস্থা যখন ক্রমশঃ নিরাশার গভীর স্তরে নামিতে আরম্ভ করিল, ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন, তখন সমরু মীরকাশেমের সহিত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিলেন। এ

সাক্ষাৎ বিদায়াভিবাদন বা সহানুভূতিসংকল্পে নহে। মীরকাশেম সমরুর অধীনে যে সেনাদল সংন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েক মাসের বেতন বাকী ছিল। বেগতিক দেখিয়া এবং উপায়হীন হইয়া পড়াতে, মীরকাশেম তাহাদের বেতন বাকি ফেলিয়াছিলেন। সমরু অবসর বুঝিয়া উদ্ধতভাবে নবাবের নিকট প্রাপ্য অর্থ দাবী করিলেন। মীরকাশেম সমরুর এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার আদেশ দিলেন। অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি তোপখানার প্রধান কর্ম্মচারীকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে? তখন আর তিনি বঙ্গেশ্বর "মীরকাশেম" নহেন। সমরু আদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। সেনাদল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীনস্থ ছিল; তাহাদের লইয়া তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এই সময় হইতে সমরুর নিজের সেনাদলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

সমরু বক্সারে অযোধ্যার নবাবের কার্য্যে নিজের সেনা নিয়োজিত করিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, সমরু নবাবের মহিলাশিবিরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ইংরাজের সহিত নবাবের সন্ধি হইল; সন্ধির অন্যান্য স্বত্বগুলির মধ্যে একটা প্রধান স্বত্ব এই যে, মীরকাশেম ও সমরুকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

নবাব এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। মীরকাশেম যদিও নবাব হইতে দুর্দ্দৈববশে ফকির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি রাজবংশীয়। এ প্রকার অসহায় অবস্থায় সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, "মীরকাশেম আমার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছেন; ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে পথিমধ্যে আটক করিতে পারেন। তবে সমরুর সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর আপত্তি আছে। সমরুর অধীনে এক দল শিক্ষিত সেনা আছে; তাহাকে সহসা ধৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে ইংরাজদের যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি সমরুকে একাকী এক নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়া গোপনে হত্যা করিতে পারেন। সাক্ষ্যস্বরূপ, ইংরাজ পক্ষ হইতে যে কোন ইংরাজ সেই স্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজ পক্ষ সুজার এই নীচ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

যাহা হউক, এই ঘটনার পর, সমরু অযোধ্যার নবাবের অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। নবাবের নিকট বেতন বাবদ তাঁহার অনেক টাকা পাওনা

ছিল। নবাব সহজে তাহা পরিশোধ করিয়া দিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, তিনি রোহিলখণ্ডে নবাবের বেগমদিগকে অবরোধ করিয়া টাকা আদায় করেন।

পাঠক! আমরা প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন পলাশী, উদয়নালা ও বক্সারের কয়েকটি যুদ্ধে, ইংরাজের প্রতিপত্তি ও বাহুবলের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে খুব বিস্তৃত হইয়াছিল। ওয়ালটার রেণহার্ড ওরফে সমরু, ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক—তাহার ধমনীতে ফরাসী-শোণিত প্রবাহিত; ফরাসীর তখন প্রতিপত্তি কম, কিন্তু সমরুর সৈনিকপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ উত্তেজিত; সুতরাং নিরুপায় হইয়া সমরু আর এক নূতন পথে অগ্রসর হইলেন।

এই নূতন পথের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি আর একবার রোহিল্লা সর্দ্দার হাফিজ রহমতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ইংরাজের সহিত সংঘর্ষণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায়, তিনি নিজের প্রচ্ছন্ন কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতবর্ষ তখন অরাজক। দেশে কাহারও একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। এক এক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্ব স্ব অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বত্রই অধিকার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত। তখন "জোর যার মুল্লুক তার," এই নীতির ঘোর প্রাদুর্ভাব। কাহারও বা সেনাদল সম্পূর্ণ শিক্ষিত, কিন্তু সংখ্যায় অল্প; কাহারও বা অশিক্ষিত, এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও কোনও কাজের উপযুক্ত নহে। সমরু অবস্থা ও দেশকাল দেখিয়া শিক্ষিত সেনাদলের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। নিজে নূতন সৈন্যদলের গঠন করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির শিক্ষাপ্রসূত নিয়মে শিক্ষিত করিয়া, চড়া দামে সেনাদল ভাড়া দিতে লাগিলেন।

সমরুর নবসংগঠিত ভাড়াটিয়া সৈন্যদল লইয়া যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভরতপুরের জাঠ সর্দ্দারগণ, জয়পুরাধিপতি, দিল্লীর অধঃপতিত মন্ত্রী নজফখাঁ ও মরাঠাগণ প্রসিদ্ধ।

এই নবসংগঠিত সৈন্যদলের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহারা প্রতি মাসে নিয়মিত বেতন পাইত না। লুঠের মালে তাহাদের পেট ভরিয়া যাইত; সুতরাং মাহিনার জন্য বড় একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। সমরু অবস্থাভিজ্ঞ লোক; তিনি যে পক্ষে থাকিতেন, সে পক্ষের জয়লাভ হইলে, নিজের সৈন্যদলকে লুঠতরাজে উত্তেজিত করিয়া, আশাধিক অংশ দেওয়াইতেন।

ভরতপুরাধিপতি সূর্য্যমল্লের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করিয়া, সমরু পুনরায় জয়পুরের মহারাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করেন। ইংরাজেরা সমরুর উপর আগাগোড়াই বিরক্ত ছিলেন। ইংরাজের চেষ্টায় ও প্রতিযোগিতায় জয়পুরে সমরুর চাকরী গেল। তিনি দিল্লীতে চলিয়া আসিলেন।

আবদুল্লা খাঁ তখন দিল্লীর প্রধান মন্ত্রী। তিনি সমরুর সেনাদলের আবশ্যকতা বুঝিয়া, চারি মাসের জন্য তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাদসাহমন্ত্রীও ইংরাজদের ভয়ে সমরুকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে সমরু উজীর নজফখাঁর সহায়তাকল্পে আহূত হন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া যান। (১)

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মে আগরায় সমরুর মৃত্যু হয়। তিনি ধর্ম্ম বিশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। প্রথমতঃ আগরায় নিজ উদ্যানেই তাঁহার সমাধি হয়। তিন বৎসর পরে, বেগম মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারই যত্নে আগরার গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে সমরুর দেহাবশেষ সমাহিত হয়।

সমরু একজন বীরপুরুষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে, সৎবৃত্তি অপেক্ষা অসৎবৃত্তির অধিক আধিপত্য ছিল বলিয়া, তিনি প্রকৃতরূপে ফুটিতে পারেন নাই। যে সামরিক প্রতিভায় তাঁহার মস্তিষ্ক উজ্জ্বল ছিল, যদি তাহা যুক্তি, ভূয়োদর্শন ও ন্যায়পরতার সহিত পরিচালিত হইত, তাহা হইলে হয় ত তিনি ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় হইয়া থাকিতেন। চরিত্রের কঠোরতা ও রক্তপিপাসুতায় তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। যে প্রকার সুযোগ ও অবসরের সময়ে তিনি ভারতবর্ষের উচ্ছৃঙ্খল, শাসনশক্তিহীন অধিকারে সামান্য পণ্যমূল্যে স্বীয় শিক্ষিত সৈন্য চালিত করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া, যদি তাঁহার সমসাময়িক সমধর্ম্মী জর্জ্জ টমাসের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সার্দ্ধানার পরিবর্ত্তে সমস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ তাঁহার করতলস্থ হইত।

সমরু যদিও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তথাপি কখনও ঐশ্বর্য্যের জমক দেখান নাই। অনেক পাপও করিয়াছিলেন, ধনের সদ্ব্যয়ে তাহার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই। এই প্রবৃত্তির অভাব তাঁহার স্ত্রী বেগমের

(১) নজফখাঁ "সারধানা" পরগণা (দিল্লীপ্রদেশভুক্ত) সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমরুকে প্রদান করেন। ইহার বার্ষিক আয় প্রথমে ছয় লক্ষ টাকা ছিল। সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া বেগম ইহার আয় দশ লক্ষে তুলিয়াছিলেন।

চিত্তবৃত্তিতে সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল; পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

সমরু খাস্ ফরাসি হইয়াও এদেশে অনেক দিন বাস করার জন্য ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সামান্য মোগলাই পরিচ্ছদই তাঁহার বেশভূষা ছিল। তিনি যে নীচবংশোদ্ভূত, তাহাও তিনি কখনও গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন না।

সমরুর জীবন আগাগোড়া বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত, পাঠক পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক কি বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Sumroo appears to have been a man, whose evil propensities far outweighed the good. He was stern and bloody minded in no degree remarkable for fidelity or devotion to his employers. * * * * His military talents were well vindicated in the bloody actions in which he had taken leading part, and good laurels would have crowned his head, had there be any prudence and regulated will in his whole career." Vide Fraser's Military Memoirs, P. 284.

অমিতাভ। *

সিদ্ধার্থের পবিত্র ধর্ম্ম যখন পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়, হিন্দু স্বর্গের অনুকরণে যখন বৌদ্ধ সুখাবতী কল্পিত হয়, তখন উত্তরদেশের বৌদ্ধগণ ইন্দ্রের আসনে অমিতাভকে বসাইয়াছিলেন। অমিতাভ নাম হইতেই বুঝা যায়, বাবু নবীনচন্দ্র সেন বুদ্ধকে অবতার করিয়া 'মহাবস্তু-অবদান' ও 'ললিতবিস্তরে'র মতে বুদ্ধের জীবলীলা রচনা করিয়াছেন। এডুইন আর্ণল্ডের "লাইট্ অব্ এসিয়া" নামক গ্রন্থ তাঁহাকে মত সাহায্য করিয়াছে, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তিনি তত সাহায্য লন নাই। কবির আনন্দ স্থূলতায়, কুয়াসায়, মোহে। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে স্থূল ধর্ম্মরূপে, বুদ্ধকে ভাবপ্রণোদিত কল্পনাচলিত মনুষ্যরূপে বর্ণনা করিতে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রজের গোপাল

* শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

কপিলনগরের সিদ্ধার্থ, শুদ্ধোদন সেই নন্দরাজা, প্রজ্ঞাবতী যশোদা, এবং গোপা সেই শ্রীমতী রাধিকা। প্রভেদ দেখিলাম, বিরহে রাধিকা দিব্যোন্মাদিনী নহে, মহাশ্বেতার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণের আসনে মুণ্ডিতশির শ্রমণ উপবেশন করেন, যাগ যজ্ঞের রক্তস্রোত শুষ্ক হয়, সেই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার রচনা হয়। গীতার ধর্ম্ম না হিন্দু, না বৌদ্ধ; অথচ, এমন ভাবে রচিত যে, গীতামুখে বৌদ্ধস্রোত হিন্দু-সাগরে সম্মিলিত হইয়া যায়। সিদ্ধার্থের ধর্ম্ম গীতার পূর্ব্বতন। নবীন বাবু গীতাকে আদর্শ করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে কোনও প্রভেদ নাই। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বৌদ্ধ ও হিন্দুর অভিমত, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম এক। এইরূপ যুক্তিতে ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরক, হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মের অভিমত, সুতরাং হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম এক বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিতে পারেন।

বস্তুতঃ, কোন কোন দার্শনিক মত এক হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপনিষদের ধর্ম্ম ও পুরাণের ধর্ম্মে যত প্রভেদ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা অধিক। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা সিদ্ধার্থের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। কুহেলিকার ন্যায় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের মস্তিষ্কে যে চিন্তা আন্দোলিত হইতেছিল, সিদ্ধার্থ সাধারণে তাহা প্রচার করিয়া, তদনুসারে পবিত্রতার নিষ্কামতার পথে জীবন চালিত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। একটি মত সাধারণ সম্পত্তি হইয়া জীবনকে প্রভাবিত করিবার পূর্ব্বে, অনেক দিন কুয়াসার ন্যায় আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। সিদ্ধার্থের এইমাত্র কারিকরী যে, তিনি তাহাকে ধরিয়া নাম রূপ দিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। কঠোপনিষদের এই কয়টি কথায় বুঝা যাইবে, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল ভারতের কত প্রাচীন সামগ্রী।

অনুপশ্য যথাপূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥
* * * * * *
হন্ত ত ইদমব্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্। ইহচেদশকদ্ বোদ্ধুম্ প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় ক

ভারতবর্ষ হইতে এই মত মিসর দেশে প্রচারিত হইয়াছিল

হইতে ভারতবর্ষে আইসে, এ কথার এখনও সম্যক মীমাংসা হয় নাই। মিসর হইতে এই মত গ্রীস ও রোমদেশে প্রচারিত হয়।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র, সকলই ভারতের সম্পত্তি। এই সকলই হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতের সম্পত্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদের নিকট ঋণী ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উত্তমর্ণ। এ অর্থে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতে চান, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। কিন্তু গীতার পর হইতে কলঙ্কিত হইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন নেপাল ও তিব্বতে প্রচারিত রহিয়াছে, সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মকে ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ধরিয়া যাঁহারা বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ। নবীন বাবু এই শ্রেণীস্থ। এই শ্রেণীর অগ্রণী আমার সম্মাননীয় বন্ধু পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত বাদপ্রতিবাদ উপলক্ষে আমার মত বিস্তারক্রমে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

গোষ্পদকে সমুদ্র করিবার, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইয়া দিবার ও ছয় মাসের পথ ছয় দিনে অশ্বমনোরথ দ্বারা অতিক্রম করিয়া দিবার অধিকার, কবির সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু মহম্মদকে খৃষ্টের পূর্ব্বতন এবং রামমোহন রায়কে বেদব্যাসের প্রপিতামহ করিয়া বর্ণনা করিবার অধিকার, বোধ হয়, এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। দেখিলাম, নবীন বাবু এইরূপ ঐতিহাসিক ক্রমবিপর্য্যয় অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

গৌতম তৎকালপ্রচলিত কৃচ্ছ্রসাধনে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। আলাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রক তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। আলাড় কালামের পাঁচ জন শিষ্য গৌতমের সঙ্গ লয়। ইহারা বৌদ্ধ ইতিহাসে পঞ্চবর্গীয় বা পঞ্চ ছ-বর্গীয় নামে বিখ্যাত। গৌতম উপদেশ মত অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ও পঞ্চতপা করিলেন। শরীর এত শীর্ণ হইল যে, মন ধ্যান করিবার শক্তি হারাইল। তখন গৌতম বুঝিলেন, কৃচ্ছ্রসাধনে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ করিলেন। স্নান ও আহার করিয়া শরীর সুস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চ ছ বর্গীয়েরা তাঁহাকে মহাজনপথবিচ্যুত দেখিয়া পতিত স্থির করিয়া, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গলাভের আশায় বারাণসিয়া যাইলেন। এ কথাটি অতি স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। বাবু লিখিতেছেন ;—

"মাংসহীন কলেবর হইল দুর্ব্বল কৃশ।
নাসিকার পথে তৃণ করালে প্রবেশ।
হইত বাহির কর্ণে; নয়ন কোটরে মগ্ন।
সে কাঞ্চনকান্তি এবে অস্থিমাত্রশেষ।

পিশাচ ভাবিয়া মনে গোপাল রাখালগণ
করিত বিকৃত অঙ্গে ধূলিবরিষণ;
কেহ মৃত ভাবি মনে, ঘৃণায় যাইত দূরে,
পলাইল নিরাশায় শিষ্য পঞ্চজন।

বৌদ্ধ ইতিহাসে উল্লেখ আছে, তথাগত প্রজ্ঞা লাভ করিয়া যখন দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন বৈশালী নগরে মহামারী উপস্থিত হয়। তথাগত তথায় উপস্থিত হইলে মহামারী বৈশালী নগর পরিত্যাগ করে। নবীন বাবু এ ঘটনা গৌতমের প্রজ্ঞালাভের, কৃচ্ছ্রসাধনের, রামপুত্র রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, আরোপিত করিয়াছেন।

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপিত হইবার অনেক দিন পরেও মহিলাদিগের জন্য ভিক্ষুণী-সঙ্ঘস্থাপনে সিদ্ধার্থের প্রবৃত্তি ছিল না। ভাবপরায়ণ মহিলাগণ বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক নিষ্কাম সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। আনন্দের অনুরোধে ও মহাপ্রজাবতীর আগ্রহে, সিদ্ধার্থ ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের আদেশ দেন। এবং ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপিত হইলে সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের জীবনকালের অর্দ্ধেক হ্রাস হইল। সম্ভবতঃ, ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের রহস্য নবীন বাবু জ্ঞাত নহেন। তাই শুদ্ধোদনের অনুরোধে যে বৎসর সিদ্ধার্থ প্রথম কপিলাবস্তু গমন করেন, সেই বৎসর গোপাকে ভিক্ষুণীমন্ত্রে দীক্ষিতা করিবার কথা আরোপ করিয়াছেন।

"রাহুলে লইয়া বুকে বসিলেন জানু পাতি
পতিপদতলে গোপা, মূর্ত্তি করুণার।
রাহুল কাঁদিয়া কহে, 'দেও পিতঃ পিতৃধন।'
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় আর।
ছুটিয়া আসিয়া কক্ষে রাজপরিবারগণ,
বুদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি হাহাকার,

আবার আবার শিশু, 'দেও পিতঃ, পিতৃধন'
কহিছে কাঁদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার।
'দিব পিতৃধন বৎস, পালিব পিতার ধর্ম্ম
দিন সপ্তরত্ন,' বুদ্ধ কহিল গম্ভীরে,
'সারিপুত্র, ভিক্ষাপাত্র,' আজ্ঞামাত্র দিল শিষ্য
পত্নীপুত্র-করে পাত্র ভাসি অশ্রুনীরে।"

আর এক স্থানে কবি বলিয়াছেন;—

চাহিয়া গোপার প্রতি কহিলেন তথাগত
বৃদ্ধ পিতামাতা নাহি লভেন নির্ব্বাণ—

যতদিন রবে তুমি সেবিতে চরণ গোপা।
হবে, গৃহ তব পুণ্য তপস্যার স্থান।

আমরা জানি না, নন্দযশোদার পদসেবা করিবার জন্য নবীন বাবুর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ব্রজপুরে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন কি না।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘস্থাপনের কারণ নবীন বাবু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"লইয়াছে সবে নবধর্ম্মের আশ্রয়
অনাথা-রমণী পূর্ণ হইয়াছে শাক্যপুরী
হয়েছে কপিলবস্তু অনাথা-আলয়।
নাহি রাজা, কে করিবে ইহাদের ধর্ম্মরক্ষা?

বুদ্ধদেব শুনিলেন ভিক্ষা করুণার।
সৃজিলেন সুপবিত্র শুদ্ধ সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ
হইলেন গোপাদেবী অধিষ্ঠাত্রী তার।"

* * *

গ্রন্থখানির আকার সুন্দর। কয়েকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ না থাকিলে অতি সুন্দর হইত। কিন্তু ত্রপুর স্থানে এপুর, মৃগদাব স্থানে মৃগদায় এবং অনোমার স্থানে অনামা বোধ হয় মুদ্রাকরপ্রমাদ নহে। চণ্ড চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া গৌতমের যে রোগ হয়, তাহা আর আরোগ্য হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, চণ্ড গৌতমকে শূকরমাংস খাইতে দিয়াছিল। এ ভ্রম এখন অপনোদিত হইয়াছে। বীড়ঙ্গ ছত্রে উত্তম ভোজ্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু এক-জাতীয় ছত্র বিষাক্ত। চণ্ড ভ্রমক্রমে এইরূপ ছত্র গৌতমকে আহার করিতে দিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, নবীন বাবু এ সংবাদ না রাখিয়া লিখিয়াছেন ;—

"পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা,-ভিক্ষা-প্রত্যাখ্যান
নহে ধর্ম্ম শ্রমণের, করিয়া গ্রহণ
হইয়া পীড়িত, কুশী নগরে আসিয়া
শুইলেন শালবনে অন্তিম শয়নে।"
* * *

মূল গ্রন্থে "শূকরমার্দ্দব" শব্দ আছে; ইহার অর্থ শূকর যাহা ভালবাসে, বা শূকর যাহা পদমর্দ্দিত করে। কেহ ইহাকে বাঁশের কলা বুঝিয়াছেন। শূকর-মার্দ্দবের অর্থ শূকরমাংস হইতে পারে না।

নবীন বাবুর লেখার মধুরতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাঁশরীর মিষ্ট আলাপনে হৃদয় উন্মাদিত করে।

"মধুর বসন্তকাল, মলয় অনিল ধীরে
বহিছে মধুরে মধু ঢালিয়া ধরায়,
সে মধুর পরশনে ফুটিয়াছে ফুলরাশি,
ছুটিয়াছে সুধাস্রোত বিহঙ্গগলায়।
আকাশের নীলিমায় ভাসিতেছে কি মাধুরী,
ভাসিতেছে কি মাধুরী বসুধা শ্যামায়।
কি মাধুরী চন্দ্রকরে, কি মাধুরী সরোবরে,
বহিতেছে কি মাধুরী তটিনীধারায়।
বসন্তপরশে বিশ্বে ভাসিতেছে কি পুলক,
সাধকের দেহে যেন দেবপরশনে।
বিশ্বের হৃদয়ে যেন হইয়াছে সঞ্চারিত
নির্ব্বাণের মহাসুখ বসন্তের সনে।"
"পথে নির্ব্বাণের স্রোতে ভাসাইয়া বহুরাজ্য
আসিলেন বুদ্ধদেব কপিল নগরে,
নগর-বাহিরে বনে রহিলেন শিষ্যসহ,
ছুটিল নগরবাসী আকুল অন্তরে।
নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
গৈরিকে আবৃত হেম-বপু জ্যোতির্ম্ময়,
জটার কিরীট শিরে; কাঞ্চন শেখরে যেন
হইয়াছে শরতের মেঘের উদয়।"

বোধ হয় কিছু ব্যস্ততার সহিত নবীন বাবু গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দু' একটি পদ শ্রুতিকঠোর হইয়াছে।

"মৃগের পশ্চাতে ছুটি, আকর্ণ টানিয়া শর,
সে মুহূর্ত্তে প্রতিহার করিতে কখন
যাইতেছে অশ্ব ছুট, শুনি অশ্ব কষ্ট শ্বাস
থামিত, হইত কভু স্বপ্নে নিমগন।"
* * * *
"রাজপুত্র এতদিন ছিলেন জীবনপথে
পথিক একাকী অসহায়,
সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী মিলিল, পাইল তনু
শক্তি, সমপ্রাণতায়, লতায়।"

"গোপার সৌন্দর্য্যে প্রেমে সিদ্ধার্থ মুগ্ধ, মোহিত,
বুঝিলেন বন হস্তী হইয়াছে শৃঙ্খলিত।"

* * * *

"এ বাঁশীর স্বর, মানবজীবন
সুধামর্ম্ম অনিল নিস্বন।
অনিল লহরী মত, জীবন বহে সতত,
ঝটিকা-নিশ্বাস-কুস্বপন।"

* * * *

"উঠ, উঠ, মাবাহত, কাঁদিছে দুখে জগত
কি কাতর করুণ রোদন।"

* * * *

"হইল দীক্ষিত দুই ব্রাহ্মণকুমার,
খ্যাত সারি পুত্র মৌদ্‌গলায়ণ আর।"

এই গ্রন্থরচনায় নবীন বাবুর মৌলিকতা অতি সামান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যের চিত্র অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ মূলচিত্রের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিতে পারেন। প্রব্রজ্যার অনতিপূর্ব্বে শয়নকক্ষে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া গৌতমের কামিনীকাঞ্চনে ঘৃণার উদয় হয়, আর্ণল্ডের "লাইট অব্ এসিয়া" নামক গ্রন্থে অনেকে তাহার চিত্র দেখিয়াছেন। সেই চিত্রের সহিত, নবীন বাবুর, অশ্বঘোষের ও বাল্মীকির চিত্র তুলনা করিয়া দেখিবেন।—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে অধীর যুবক
আসিলেন কক্ষান্তরে একি দৃশ্য হায়!
গভীর রজনী; চারু কক্ষ আস্তরণে
সুষুপ্তা নর্ত্তকীগণ; স্তিমিত আলোক।
কেহ বা বিবস্ত্রা, কেহ বিচ্ছিন্নকবরী,
কেশজালে সমাচ্ছন্ন বিকৃত বদন।
কাহারো বিকট ভঙ্গী, ঘূর্ণিত নয়ন
ভীতিপূর্ণ, কেহ হাসি হাসিছে বিকট,
বকিছে প্রলাপ কেহ, কেহ বড়মড়
ঘর্ষিতেছে দন্তে দন্ত, পড়িতেছে লালা।
বদন হইতে কারো, শব্দে নাসিকার
কাহারো করিছে প্রাণে ভীতির সঞ্চার।

—নবীনচন্দ্র সেন।

অভবচ্ছয়িতা হি তত্র কাচি-
দ্বিনিবেশ্য প্রচলে করে কপোলম্।
দয়িতামপি রুদ্ধগাত্রচিত্রাং
কুপিতেবাঙ্গগতাং বিহায় বীণাম্॥
বিবভৌ করলগ্নবেণুবম্যা
স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা।
ঋজুষট্‌পদপংক্তিজুষ্টপদ্মা
জলফেনপ্রহসত্তটা নদীব॥
নবপুষ্করগর্ভকোমলাভ্যাং
অপনীযোজ্জ্বলসংগতাঙ্গদাভ্যাম্।
স্বপিতি স্ম তথা পুরা ভুজাভ্যাং
পরিবভ্য প্রিয়বন্মৃদঙ্গসেব॥
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা
বসনং পীতমনুত্তমং বসানাঃ।
অবশা বত নিদ্রয়া নিপেতু-
র্গজভগ্না ইব কর্ণিকারশাখাঃ।
অবলম্ব্য গবাক্ষপার্শ্বমন্যা
স্থিতা চাপবিভুগ্নগাত্রযষ্টিঃ।
নিবাজ বিলম্বিচারুহার
চিতা তোরণপালভঞ্জিকেব॥
মণিকুণ্ডলদষ্টপত্রলেখং
মুখপদ্মং বিনতং তথাপরস্যাঃ।
শতপত্রমিবার্দ্ধচন্দ্রনাভং
স্থিতকারণ্ডবঘট্টিতং চকাশে॥
অপরা শয়িতা যথোপবিষ্টাঃ
স্তনভারাবনতমন্থমানগাত্রাঃ।
উপগুহ্য পরস্পরং বিরেজু-
র্ভুজপাশৈস্তপনীয়পরিংঘর্য্যৈঃ॥
মহতীং পরিবাদিনীঞ্চ কাচি-
দ্ধনিতামিন্দ্য সখীমিব প্রসুপ্তা।
বিজুগুর্ণ চলৎসুবর্ণসূত্রাং
বদনেন কুলকর্ণিকোজ্জ্বলেন॥
পণবং যুবতীর্ভুজাংসদেশা-
দববিস্রংসিতচারুপাশনস্তা।

সবিলাসরতান্তস্তান্তমূর্ব্বো-
র্ব্বিবরে কান্তমিবাভিনীয় শিশ্যে ॥
অপরা ন বভূনির্মীলিতাক্ষো
বিপুলাক্ষ্যোঽপি শুভ্রুবোঽপি সত্যঃ।
প্রতিসংকুচিতারবিন্দকোশাঃ
সবিতর্য্যস্তমিতে যথা নলিন্যঃ ॥
শিথিলাকুলমূর্দ্ধজা তথান্যা
ন্যুবনস্রস্তবিভূষণাং শুকান্তা।
অপরিষ্ট বিকীর্ণকণ্ঠসূত্রা
গজভগ্না প্রতিপাতিতাঙ্গনেব ॥
অপরান্তরণা হ্রিয়া বিমুক্তা
ধৃতিমত্যোঽপি বপুশ্ত গৈরুপেতাঃ।
বিনিশশ্বসুরুরণং শয়ানা
বিকৃতাক্ষিগুভুজা জজৃম্ভিরে চ ॥
ব্যপবিদ্ধবিভূষণস্রজোঽন্যা
বিস্তৃতাগ্রস্থনবাসনো বিসংজ্ঞাঃ।
অনিমীলিতশুক্লনিশ্চলাক্ষো
ন বিরেজুঃ শয়িতা গতাসুকল্পাঃ ॥
বিবৃতান্তপুটা বিবৃদ্ধগাত্রা
প্রপতদ্বস্ত্রজলা প্রকাশগুহ্যাঃ।
অপরা মদঘূর্ণিতেব শিশ্যে
ন বভাষে বিকৃতং বপুঃ পুপোষ ॥
—অশ্বঘোষ।

তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈঃ সিতকুণ্ডলৈঃ।
বিরাজত বিমানং তন্নভস্তারাগণৈরিব ॥
মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ ॥
অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।
বিশ্বস্তশুভসর্ব্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সংপ্রকাশতে।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা ॥
অন্যা কক্ষগতেনৈব মৃদুকেনাসিচেক্ষণা।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা ॥
পটহং চারুসর্ব্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী।
চিরস্য রমণং লব্ধ্বা পরিষ্বজ্যেব কামিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী ॥
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নিদ্রাশালিনী।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহ কান্তেব ভামিনী ॥
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরথৈঃ।
মৃদঙ্গং পরিবিষ্ট্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা ॥
ভুজগাশান্তরস্থেন কঙ্কণেন বিশোদরী।
পণবেন সহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা ॥
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগূঢ়েব ভামিনী ॥
কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা ॥
কলসীমপবিদ্ধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী।
বসন্তে পুষ্পসবলা মালেব পরিমার্জ্জিতা ॥
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলসোপমৌ।
উপগূহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবশমুপাগতা ॥
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণী নিদ্রাবশমুপাগতা ॥
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্তঃ কামুকানিব ॥
—বাল্মীকি।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সীতারাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সীতারামকে কেহ চিনিত না। কিন্তু ক্রমে যখন সীতারামের যশোগৌরব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তখন মুখে মুখে সীতারামের নাম দেশ বিদেশে ছুটিয়া চলিল। সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা উন্নতিসোপানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বকাহিনী কেহ লিখিয়া রাখে না; যাহার যেমন অভিরুচি, এক

একটি কারণ উদ্ভাবন করিয়া জনশ্রুতি রচনা করে। মহাবীর নেপোলিয়ান সামান্য অবস্থা হইতে কি কৌশলে জগদ্বিখ্যাত ফরাসীরাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহার রহস্যনির্ণয়ের জন্য ইতিহাসলেখকগণ কতই আড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; নেপোলিয়ান নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গোপনে গোপনে যখন উন্নতিসোপান গঠিত করিতেছিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে চিনিত না;—লোকে যখন নিশীথে নিদ্রাতুর, তিনি তখনও পাঠগৃহের ক্ষুদ্র কক্ষে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত! সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীও কতকটা সেইরূপ। প্রতিভা, সাহস, বাহুবল এবং অধ্যবসায় ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না; কিন্তু যতদিন তিনি উন্নতিশিখরে আরোহণ করেন নাই, ততদিন কেহ তাহা স্বীকার করিত না; অগত্যা সীতারামের উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, এক এক জন এক একরূপ জনশ্রুতির রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জনশ্রুতি হইলেই যে তাহা একবারে অলীক হইবে, এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু তথাপি কৌতূহলপরায়ণ জনসমাজ জনশ্রুতি প্রচার করিবার সময়ে তাহার মূলানুসন্ধানের আবশ্যকতা স্বীকার করে না। সেই জন্য জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য থাকিলেও, লোকমুখে ক্রমে তাহা এরূপ রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, অবশেষে সে মৌলিক সত্যটুকু আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হয় না। সীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে।

লিখিত ইতিহাস নাই, সুতরাং জনশ্রুতিই সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর একমাত্র উপন্যাস। সে উপন্যাস হিন্দুর রচা, কি মুসলমানের রচা, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু সে উপন্যাসে সীতারামের চরিত্রে কোনও কলঙ্ককালিমা সংযুক্ত হইবার অবসর পায় নাই। অবসর এবং অধ্যবসায় থাকিলে, এই সকল জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এখনও পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সীতারামের পূর্ব্বকাহিনীর কথঞ্চিৎ সুপ্তোদ্ধার করিতে পারেন, কেবল সেই ভরসায় জনশ্রুতিগুলি সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

এখন যেখানে মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সীতারামের বীরকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট দিয়া মধুমতী নদী প্রবাহিত। সেই মধুমতীর অপর তীরে হরিহরনগরে সীতারামের পৈতৃক তালুক ছিল। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগরেও সীতারামের কিছু জমী জমা থাকার কথা শুনা যায়। সীতারাম বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণে কৃতবিদ্য হইয়া-

ছিলেন ;—তিনি পৈতৃক তালুক পরিদর্শনের জন্য সর্ব্বদাই অশ্বারোহণে হরিহরনগর হইতে শ্যামনগর অথবা শ্যামনগর হইতে হরিহরনগরে যাতায়াত করিতেন। লোকে বলে যে, একদিন এইরূপে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া অশ্বক্ষুর মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িল ; সীতারাম অনেক উত্তেজনা করিয়াও ঘোটককে চালনা করিতে পরিলেন না। সীতারাম তখন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বাহুবলে অশ্বক্ষুর উত্তোলন করিলেন। অন্য লোকে হয় ত আবার অশ্বারোহণে গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেন ; কিন্তু সীতারাম সে দেশের পথ ঘাট বিলক্ষণ চিনিতেন, কোন স্থানে কখনও এমন করিয়া অশ্বক্ষুর প্রোথিত হয় নাই ;—সুতরাং তিনি সে স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যেখানে অশ্বক্ষুর প্রোথিত হইয়াছিল, সেই স্থান খনন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভূগর্ভে এক লৌহময় ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। কৌতূহলাবিষ্ট সীতারাম লোকবল সংগ্রহ করিয়া ত্রিশূল লক্ষ্য করিয়া যতই খনন করিতে লাগিলেন, ততই ক্রমে চূড়া, তাহার পর গম্বুজ, তাহার পর স্তম্ভরাজি, অবশেষে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি দেবমন্দির বাহির হইয়া পড়িল! হিন্দুর দেশের প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির, কতকালের মৃত্তিকাস্তর ধীরে ধীরে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, অবশেষে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—কৃষক নিঃসন্দেহে তাহার উপর দিয়া হল-চালন করিয়া বেড়াইত। সহসা সেই দেবমন্দির আবার লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইল ; দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল ; সকলে মিলিয়া প্রবল উৎসাহে মৃত্তিকারাশি আহরণ করিতে লাগিল ; সেই মৃত্তিকানিহিত দেবমন্দিরে কোন দেবমূর্ত্তি ছিল না, কেবল একটি "লক্ষ্মীনারায়ণ" বাহির হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামশিলা, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দেবতা ; যে গৃহে নিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হয়, সে গৃহ কখনও লক্ষ্মীহীন হয় না। সীতারাম পরম হিন্দু, তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন ; লোকে এই অযাচিত দেবানুকম্পা লাভ করিতে দেখিয়া সীতারামের পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে সীতারামের প্রতিভায় দেবানুকম্পাবলে লোকবল সংযুক্ত হইল। ইহাই তাঁহার উন্নতির মূল।

দেবতা যাহার সহায়, মানুষ সহজেই তাহার গোলাম হয়। দেশের মধ্যে এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে হিন্দুগণ সীতারামের পক্ষভুক্ত

হইতে লাগিলেন; অবশেষে তাঁহাদের সহায়তায় সীতারাম হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন। যশোহরের ইতিহাস-লেখক এই জনশ্রুতিকে "বিকৃত জনশ্রুতি" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট বাদানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভূগর্ভ-নিহিত দেবমন্দিরের কাহিনী সত্য হইতে পারে না; কারণ, এখন যেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে, তাহার চূড়া নাই, ত্রিশূল নাই, এবং তাহা সমতল-ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, আদৌ ভূগর্ভ-নিহিত নহে; অথচ লোকে তাহাকেই আদি-মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে! এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান মন্দির যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, গঠনপ্রণালী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি লোকের ভক্তি কিছু অচলা, তাই তাহারা আধুনিক মন্দিরকেও আদি-মন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। পাণ্ডারা সকল স্থানেই এরূপ করিয়া থাকে। কেবল ইহা হইতেই কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।

সীতারাম সম্বন্ধে দ্বিতীয় জনশ্রুতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। সেকালে দক্ষিণবঙ্গে "বার ভূঁইয়া" নামে দ্বাদশ জন করসংগ্রাহক ছিলেন; তাঁহারা কালক্রমে স্বাধীন হইয়া বাদশাহের ন্যায্যপণ্ডা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে পাঠাইয়া দেন;—সীতারাম তাঁহাদিগকে দমন করিলেন বটে, কিন্তু নিজে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব রাজকর চাহিলে বাদশাহের দোহাই দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদশাহকেও এক কপর্দ্দক রাজকর দিলেন না।

পূর্ব্বকাহিনী যাহাই হউক, যখন হইতে লোকে সীতারামের কথা শুনিতে পাইল, তখন হইতে তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সীতারাম যে দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে রাজ্য নাই, সে রাজধানীও ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সীতারামের যে সকল গৌরবচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়স্থল; সে পরিচয়ে সীতারাম বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন;—বিদেশের ইতিহাসলেখকগণ বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সীতারামের বীরকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদপুরে সীতারামের বীরকীর্ত্তির যে সকল ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান

আছে, তাহা বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের চিহ্ন। কেন না, বাঙ্গালীই তাহার মূল। মহস্মদপুরে রাজদুর্গ ছিল, দুর্গপ্রাচীরের উপর সারি সারি কামান পাতা ছিল, সিংহদ্বারে বীরবিক্রমে সেনাপতি ও সেনানায়কগণ অশ্বারোহণে সমবেত হইত,—তাহার মধ্যে সকলই বাঙ্গালীর কথা। বাঙ্গালী দুর্গ রচনা করিয়াছিল, বাঙ্গালী কামান গোলা বারুদ প্রস্তুত করিয়াছিল, বাঙ্গালী বীর-বিক্রমে স্বহস্তগঠিত দুর্গপ্রাচীরের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া স্বহস্তরচিত কামানের মুখে অগ্নি সংযোগ করিয়া মোগলের গতিরোধ করিয়াছিল! বাঙ্গালা দেশে অনেক পুণ্যস্থান আছে, কিন্তু যেখানে দাঁড়াইলে বাঙ্গালীর ললাটকলঙ্ক ধৌত হইয়া যায়, মহস্মদপুর ভিন্ন এমন পুণ্যতীর্থ আর নাই;—পুণ্যতোয়া মধুমতী-তীরে সীতারামের রাজদুর্গ যেদিন বাঙ্গালী পরিব্রাজকের নিকট অধিকতর সুপরিচিত হইবে, সে দিন সীতারামের স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

মহস্মদপুরে যে সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে সীতারামের রাজদুর্গই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই দুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা; বহু বৎসরের অযত্নে অনাদরে তাহার পূর্ব্বশোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কালে ভারত-বর্ষের সকল প্রদেশেই রাজদুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল প্রাচীন দুর্গের সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল দুর্গের গঠনকৌশল এবং আধুনিক ইংরাজদুর্গের গঠনকৌশল একরূপ নহে। আজ কাল সামরিক-বিদ্যার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া মানুষে মানুষ খুন করিবার যত সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেকালে মানবজ্ঞানের ততটা শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। কৌশল অপেক্ষা বাহুবলেরই প্রাধান্য অধিক ছিল; সুতরাং সেকালের লোকে কেবলমাত্র মৃত্তিকা সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর রচনা করিত। এই মৃন্ময়-দুর্গের বিশেষ কোন গঠনকৌশল ছিল না; কারণ, সেকালের বীরসিংহেরা কৌশল অপেক্ষা বাহুবলেরই অধিক সমাদর করিতেন। তাঁহারা বাহুবলে অসীম সাহসে মৃন্ময় দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। ভরতপুরের দুর্গ ইংরাজের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়াছে; ইংরাজসিংহ কত ক্লেশে বারংবার বিপর্য্যস্ত হইয়া ভরত-পুরের দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। সেই ভরতপুরের দুর্গও মৃন্ময় দুর্গ!

সীতারাম যে মৃন্ময় দুর্গ রচনা করেন, তাহা চতুষ্কোণ; চারি দিক প্রদক্ষিণ করিলে একক্রোশ হইতে পারে। ইহার চারি দিকে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে গড়-খাই ছিল; সে পরিখার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। উত্তর এবং পূর্ব্বদিকের পরিখা কালক্রমে জলশূন্য শুষ্কভূমিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিমদিকে এখনও অনেক জল, এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা বহুবিস্তৃত, এখনও দেখিতে ঠিক নদীর মত! এই সকল পরিখা খনন করিবার সময়ে যে স্তূপাকার মৃত্তিকা উত্তোলিত হয়, তাহা লইয়াই সীতারাম দুর্গপ্রাচীর রচনা করেন। এই দুর্গ বাগ্‌জানি মৌজায়। শত্রু আসিয়া অবরোধ করিলে পাছে জলকষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য দুর্গমধ্যে অনেকগুলি সরোবর খনিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটির জল এখনও স্বচ্ছ ও নির্ম্মল রহিয়াছে। দুর্গের তোরণদ্বার কোথায় ছিল, তাহা এখন আর ভাল করিয়া নির্ণয় করা যায় না; যশোহরের ইতিহাসলেখক ওয়েষ্টল্যাণ্ড অনুমান করেন যে, দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণেই সম্ভবতঃ দুর্গদ্বার ছিল। এরূপ অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজ দপ্তরে সীতারামের দুর্গের একখানি প্রাচীন মানচিত্রে ঐরূপ লিখিত আছে। সেই মানচিত্র দেখিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে লিথোগ্রাফ করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে আমরাও একখানি চিত্রপট প্রদান করিলাম; ইহা সীতারামের দুর্গের ভগ্নাবশেষের চিত্রপট মাত্র।

সীতারামের রাজবাটী এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এক জন ইংরাজ পরিব্রাজক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার গঠন-কৌশল কিরূপ ছিল, তাহা এখন আর নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সীতারামের রাজধানীতে অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু একালের তুলনা লইয়া বিচার করিতে গেলে তাহার কোনটিই গঠনগৌরবে উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে না। তখন গঠনসৌষ্ঠব বা বাহ্যাড়ম্বর ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে তাড়াতাড়ি রাজদুর্গ ও রাজধানী সংস্থাপন করিবার জন্য সীতারাম গঠনসৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; কেবল মোগলের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রাণপণে দুর্গপরিখা ও দুর্গপ্রাচীর রচনা করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে কোনরূপে রাজধানী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র।

সীতারাম হিন্দু, অথচ তাঁহার রাজধানীর নাম মহম্মদপুর, ইহা হইতে [illegible] করিতে পারেন যে, মহম্মদপুর নামক কোনও প্রাচীন প্রসিদ্ধ

স্থানে সীতারাম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; পুরাকীর্ত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নগরের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। এখন যেখানে মহম্মদপুর, সেকালে সে স্থান আদৌ লোকসমাজে পরিচিত ছিল না। মহম্মদ খাঁ নামক একজন মুসলমান সাধুপুরুষ সেই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন করিতেন। সীতারাম যখন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, মুসলমান সাধু তখন কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সীতারাম সাধুপীড়ন করিতে অসম্মত হইয়া সাধুর নামানুসারেই নবসংস্থাপিত রাজধানীর নামকরণ করিতে সম্মত হইলেন;—সাধু স্থানত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই হইতে তাঁহার নামানুসারে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর নামে লোকসমাজে পরিচিত হইল। ইহা যশোহর প্রদেশের জনশ্রুতি; কিন্তু এই জনশ্রুতির সঙ্গে সীতারামের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে বলিয়াই এ স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম।

কয়েকটি কারণে মহম্মদপুর নূতন রাজধানীর উপযোগী হইয়াছিল। সীতারামের বাল্যজীবনের বিহার-ক্ষেত্র বলিয়া ঐ প্রদেশ সীতারামের সুপরিচিত ছিল, নদীবহুল স্থান বলিয়া সহসা বহিঃশত্রুর পক্ষে ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না; মুসলমানপ্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন করিয়া হিন্দুরাজধানী গঠন করিতে হইলে যেরূপ স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, মহম্মদপুর সর্ব্বাংশেই তদুপযোগী ছিল বলিয়া, সীতারাম সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

উপন্যাসের উপকারিতা।

বিগত জানুয়ারী-সংখ্যক "নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে "উপন্যাসের উপকারিতা" ইতিশীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধ লইয়া একটু আলোচনা করিতে চাই। পাঠক মহাশয় প্রথমতঃ সেঞ্চুরীর লেখিকা ম্যারাওয়েল গ্রে আখ্যাধারিণী কুমারী এম্, জি. তুতিয়ে মহোদয়ার আক্ষেপোক্তি শুনুন।—

"আজকাল নবেল ও নবেল-পাঠকের যত প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছে, তত আর কোনও কালে ছিল না। পণ্ডিত মূর্খ, জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন ভদ্র অভদ্র সকলেই [illegible]

'নবেলের' জন্য পাগল। নবেলও কাহনের দরে জন্মাইতেছে। নবেলের এই আত্যন্তিক বংশবৃদ্ধি কত দিনে হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা বলা যায় না। তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, বংশবৃদ্ধির সহিত নবেলের আভ্যন্তরিক গৌরবের বৃদ্ধি হইতেছে না। এই নবেলের যুগে প্রকৃত সাহিত্যের বড় দুঃসময় উপস্থিত। পুস্তকের ভাষা ও ভাবের প্রতি লোকের আর তাদৃশ মনোযোগ নাই। কবিতার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। মাসিকপত্রে কবিতার প্রকাশ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

নবেলে জোয়ার।

ইহা সাহিত্যের পক্ষে বড় সুলক্ষণ নহে। সমালোচনার অবস্থা তথৈবচ। কাল যদি সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন দ্বিতীয় মিল্টনের আবির্ভাব হয়, তাঁহার সমালোচক হইবার যোগ্য ছয় জন লোকও মিলিবে না। সাহস করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হয়, এমন তিন জন লোকও পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ।

কবিতায় ভাঁটা।

"এ দিকে কিন্তু প্রতি বৎসরই এক জন করিয়া নূতন মিল্টন আবিষ্কৃত হইতেছেন, এবং অবিলম্বে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা সাহিত্যের অবনতির ফল। ইহাতে উপন্যাসেরও গৌরব কমিয়া আসিতেছে। সাহিত্য-সমাজে ভাল লেখক এত নাই যে, ঐ সকল পত্র পত্রিকার খোরাক যোগাইতে পারেন। যে কাগজ সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনে যত দূর সমর্থ, তাহারই তত দূর কাটতি। সাধারণ লোকে সাময়িক পত্র চায়, কিন্তু ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না। নীচ অনুসন্ধিৎসা, ব্যক্তিগত কুৎসাপাঠের পিপাসা, অশ্লীল জঘন্য হেয় বিষয়ের জন্য আগ্রহ, এই সকলে মিলিয়া সাময়িকপত্র-পত্রিকা হইতে সাহিত্য ও শিল্পকে ক্রমশঃ দূর করিয়া দিতেছে। যে সকল কাগজ কেবল শিল্প ও সাহিত্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও আর সে দিন নাই। কদর্য্য, বহুস্তম্ভময় চিত্র ও গল্পের হুজুক সকলকেই গ্রাস করিয়াছে।

সুলেখকের দুর্ভিক্ষ।

"উপাখ্যান প্রীতি মানুষের অতি স্বাভাবিক ও প্রাচীনতম প্রবৃত্তি। ভাল উপাখ্যান-পাঠে মানুষের উচ্চতর, মহত্তর প্রবৃত্তি সকল পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হয়। মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী; দেহই তাহার সর্ব্বস্ব নহে। কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি লইয়া থাকিলে তাহার চলে না। আধ্যাত্মিক আনন্দেরও প্রয়োজন। এ জগতে মানুষের জীবন কয় দিন? কিন্তু কাল অনন্ত। মানুষ অনন্ত পথের পথিক, অনন্তের ভিখারী। চক্ষুর বিষয়ীভূত এই বসুন্ধরাকে লইয়া সে শান্তিলাভ করিতে পারে না। অতীত ও বর্ত্তমানব্যাপী এই প্রত্যক্ষ মানবজাতি সংখ্যাতীত হইলেও তাহার চক্ষে সামান্য। সে প্রতিভাবশে নূতন নূতন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্পিত সুখদুঃখে অভিভূত হইতে চাহে। তাহার কল্পনাচক্ষে অরণ্যমধ্যে অপ্সরী, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরী, বনদেবী প্রভৃতি অপূর্ব্ব সুন্দরী সকল কেমন নৃত্য করিয়া বেড়ায়। তাহার মানস-কর্ণে বকুলালয়বাসিনী বিচিত্র গায়িকাগণের হৃদয়োন্মাদী সঙ্গীত কি সুন্দর ঝঙ্কার করিয়া উঠে। বিধাতার সৃষ্ট, অসংখ্যজীবরাশিপরিমণ্ডিত এই জগৎ অতি সুন্দর ও বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের কল্পিত, কবির প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত এই যে অপূর্ব্ব স্বপ্ন রাজ্য, ইহাও কি তাহারই মত সুন্দর ও বিস্ময়কর নহে?

উপাখ্যান-প্রীতি স্বাভাবিক বটে।

"কল্পনা আগে, তা'র পর প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস যখন দেখা দেয় নাই, তখন কল্পনামূলক পুরাণেরই একাধিপত্য ছিল। ইতিহাস মহাকাব্যেরই অনুবৃত্তি ইলিয়াদ ও অদিসি পাঠ করিয়া আমরা প্রাচীন গ্রীসের যে প্রাণ হৃদয়ের সহিত পরিচিত হই, আথেন্স বা স্পার্টার ইতিহাস পড়িয়া কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাই না। উপাখ্যানই সত্য, প্রত্যক্ষ তাহা [illegible] এ কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা বাস্তব, তাহাই সত্য; উপা

আগে কল্পনা, পরে প্রত্যক্ষ।

খ্যান ছায়ামাত্র। আবার সেই বাস্তব যদি অতি কলুষিত ও জঘন্য না হয়, তবে তাহা তত সত্য নহে। জোলায় আমাদের কাজ নাই। কিট্‌সের ন্যায় আমরাও বলি, 'যাহা সুন্দর, তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই সুন্দর'। বাস্তবের আধিক্য মানবাত্মার প্রভূত অনিষ্টকর।

"কবিত্বের সুনীল আকাশপটে যে অপরূপ ইন্দ্রধনু শোভিত ছিল, দার্শনিকেরা তাহাকে এখন কেবল সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলনমাত্রে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের বজ্ররশ্মির ক্রিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকুন। আমরা চিরদিন উহাকে ইন্দ্রধনুরূপেই উপভোগ করিব। বাস্তবিক, আমাদের সেই আনন্দের উৎস বাস্তবের অনেক উচ্চে অবস্থিত।

"জগতের কবি ও ঔপন্যাসিকগণ অনেক দিন ধরিয়া প্রধানতঃ বড় বড় ঘটনা, বড় বড় সুখ দুঃখ, রাজারাজড়ার মৃত্যু, জাতীয় উত্থান-পতন, ইত্যাদি বিষয় লইয়াই উপাখ্যান রচনা করিতেছিলেন। সাধারণ লোকের সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বড় বেশী দিনের নহে। ইংরাজী সাহিত্যে চসার হইতে উহার আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু চসারের প্রধান প্রধান নায়কগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সেক্ষপীয়র সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। ফিউডাল-যুগের অবসানে ডিমোক্রাসীর আরম্ভ হইতেই প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক লোকদিগের জীবনচরিত লইয়া গদ্য উপাখ্যানরচনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। রবিন্সন ক্রুসো ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। তার পর ফিল্ডিং, রিচার্ডসন, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতির হস্তে ইহা ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। "রিফরম বিল" বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি লোকের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। কিংস্লি ও জর্জ ইলিয়ট এই যুগের কবি। ইংরাজ-সমাজ বুঝিতে লাগিলেন যে, বড়মানুষ হইলেই বড়লোক হয় না। সমাজতরুর নিম্নতম প্রদেশে জন্মলাভ করিয়াও কেহ কেহ উহার সমুচ্চশাখাবিহারী বড়মানুষের বংশধরকে হৃদয়মহত্বে হারাইয়া দিতে পারেন। টেনিসন তাঁহার 'এনক আর্ডেন' নামক কাব্যে ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উপন্যাসের আরম্ভ।

জীবনের উপন্যাস।

"আধুনিক লোকের এই উগ্র নভেল পাঠলালসা নিরবচ্ছিন্ন দোষের আকর নহে। আজকালকার নভেলে মানুষের হৃদয়বৃত্তির আদর্শ-অনুশীলন না হউক, উহা সহস্র সহস্র ইংরাজের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ সংবাদপত্রের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকদিগকে কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মবক্তার সহিত পরিচিত করা, বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু নবেল তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। উহা হইতে তাহারা অনায়াসেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

"যাঁহারা কবি, মৌলিক চিন্তাশীলতার আধার, তাঁহারাই দেশে জ্ঞান বা নীতির নিয়ন্তা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের পাঠকসমাজ অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা বিশাল সাধারণ লোকশ্রেণীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের সে অন্তরায় নাই। লোকসাধারণের চরিত্রগঠনে তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

"ঔপন্যাসিক যেন সাক্ষাৎভাবে কোনও নীতিজ্ঞানপ্রচারের চেষ্টা না করেন। তাহা হইলে লোকের মনে আর সে আনন্দটুকু দিতে পারিবেন না। লোকের মন শিল্পনৈপুণ্যের ইন্দ্রজালেই বদ্ধ থাকে। তাহার ভিতর বক্তৃতা প্রবেশ করিলেই সব মাটী হইয়া যায়। তবে এমন কথা বলি না যে, জগতে যা-কিছু আছে, ঔপন্যাসিক সকলই চিত্রিত করিতে পারিবেন। কেবল বাস্তব লইয়া থাকিলে চলিবে না। বাস্তব, উপন্যাস-শিল্পের বিরোধী। *Because selection is the first principle of art.* কাব্যোপযোগী বিষয়নির্ব্বাচনই শিল্প-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান নীতি। লেখক যদি পিপিকুশল হন, তাহা হইলে দস্যু, ডাকাত, হত্যাকারী, খুনী প্রভৃতির চরিত্র চিত্রিত করিয়াও, উহাকে কবি তপস্বীর জীবনের [illegible]

উপন্যাস কিরূপ হওয়া আবশ্যক।

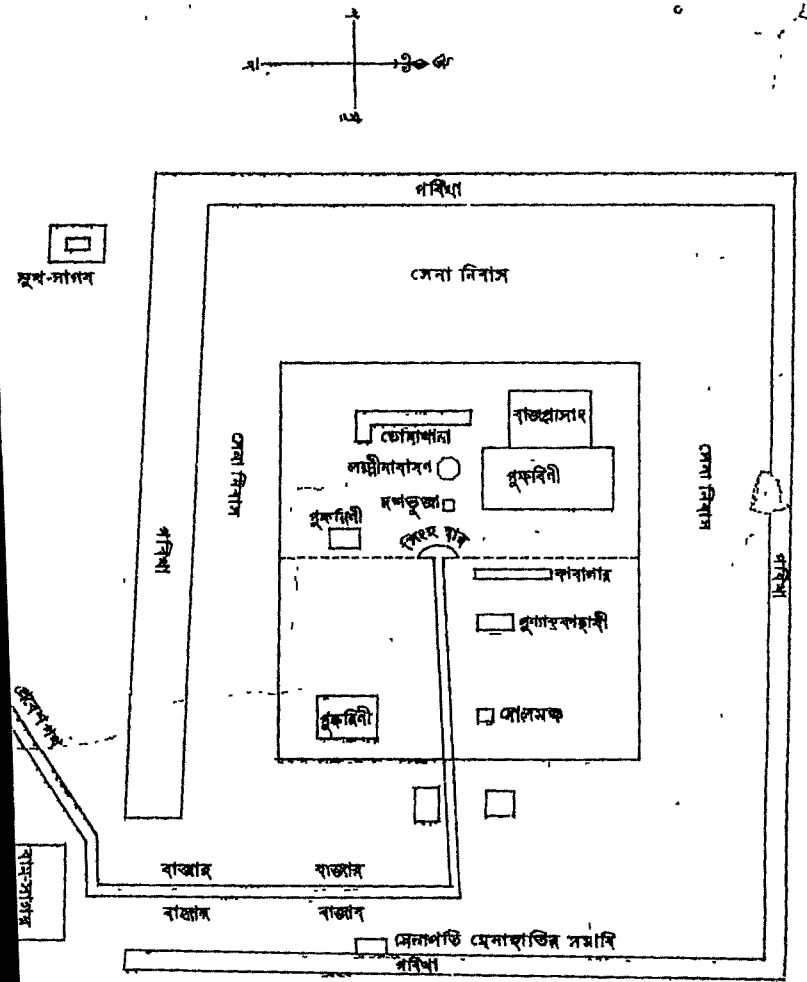
পরিখা
সুখ-সাগর
সেনা নিবাস
ভোগাগার
রাজপ্রাসাদ
লক্ষ্মীনারায়ণ
পুষ্করিণী
দশভুজা
পুষ্করিণী
সেনা নিবাস
সেনা নিবাস
পরিখা
কারাগার
পুণ্যসরোবর
পুষ্করিণী
রঙ্গমঞ্চ
বাজার
বাজার
বাজার
বাজার
সেনাপতি মেনাহাতির সমাধি
পরিখা

সীতারামের দুর্গ।

"নূতন ব্রতী ঔপন্যাসিককে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। চিন্তা কর, পর্য্যবেক্ষণ কর, শিক্ষা কর, লিখনপদ্ধতির চর্চ্চা কর, ইত্যাদি সব কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু একটা অতি প্রধান কথা কেহই বলেন নাই। তাহা এই,—আপনার মন ও কল্পনা-শক্তিকে মার্জ্জিত, পবিত্র কর; সাধুজীবন যাপন কর। কারণ, অকলঙ্ক পবিত্র হৃদয়, উচ্চ উদ্দেশ্য, মহান আদর্শ, এবং শুভ্রচিন্তা,—এ সকলে ঔপন্যাসিকের যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপ আর কাহার? তাঁহার চিন্তা ও উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সঞ্চারিত হইবে। তাঁহার হৃদয়ের ভাবগুলি জগতের শিরায় শিরায় অতি নির্জ্জনে, নীরবে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। কেবল মস্তিষ্ক লইয়া শিল্পীর কাজ নহে। বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত চরিত্রমহত্ত্ব সংযোজিত না হইলে, উহা প্রতিভা-নামের অধিকারী হয় না।"

ঔপন্যাসিক-সাধনা।

এখন উপরি-অনুবাদিত কথাগুলিকে ভিত্তি করিয়া, আমাদের এই বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে, পাঠক বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না। সেঞ্চুরীর লেখিকা মহোদয়া আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের যে দুর্দ্দশার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ-সমাজের সঙ্কীর্ণ সাহিত্যও কতকটা সেই পীড়ায় পীড়িত। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ছাড়িয়া দিলে, এক নবেল ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালাদেশে আজকাল বড় বিকায় না। বাঙ্গালীর গল্পপাঠ-পিপাসা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বটতলার বটুর দল পর্য্যন্ত কেহই তাহার প্রচুর খাদ্য যোগাইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে রেণল্ড প্রভৃতি বিদেশী লেখকের নিকট ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছে। এজন্য আমরা তাদৃশ দুঃখিত নহি। কারণ, কিছু না পড়ার অপেক্ষা নবেল পড়াও ভাল। কেবল মাথাটা বিচলিত হইয়া না উঠিলেই মঙ্গল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার গ্রন্থগুলি উচ্চ আদর্শ ও সুশিক্ষার আধার। কিন্তু সে ভাগে পড়িতে পারে কয় জন? অনেকেই কেবল কোথায় রোহিণী ঠাকুরাণী দ্বিতলগৃহের বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া নিশাকর দাসের প্রতি সাভিলাষ নয়ন-ভঙ্গী করিতেছে, তাহারই সন্ধান করেন। এ দিকে কাহার পাপে, হরিদ্রাগ্রামের গৃহনিকুঞ্জে, 'ভোমরার' সাভিমান প্রেম-গুঞ্জন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার খবর বড় কাহাকেও রাখিতে দেখি না। প্রকৃত কথা, বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকসমাজ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বঙ্কিমই হউন, আর হেম, নবীন বা রবীন্দ্রনাথই হউন, সকলকেই 'fit audience and few' লইয়া কাল কাটাইতে হইতেছে। ইহাই আমাদের আক্ষেপের কারণ।

এ দেশে।

সাধারণের রুচি।

সেঞ্চুরীর লেখিকাকে আমরা তবু একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে পারি। তিনি যে ইংরাজ-সমাজের অতিরিক্ত নবেলানুরক্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই ইংরাজই এক গিনির হিসাবে মৃত রাজকবির কবিতার প্রত্যেক পংক্তি ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কি আছে? বাঙ্গালায় এখন যাঁহারা বই পড়েন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল ইংরাজীর ধার বড় ধারেন না। তাঁহারা এখনও তাঁহাদের সেই দাশুরায় আর ঈশ্বর গুপ্ত লইয়াই পড়িয়া আছেন। দ্বিতীয় দল, ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পত্রধারী বিদ্যাবত্তার অবতার। ইঁহাদের অবস্থা কিরূপ? এক শ্রেণী মাতৃভাষার নাম শুনিলেই নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। এ শ্রেণীর তবু মার্জ্জনা আছে। কারণ, ভ্রান্তই হউক, আর অভ্রান্তই হউক, ইঁহাদের ধারণা,—বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহাদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থ এখনও লিখিত হয় নাই। আর এক শ্রেণীর সংজ্ঞা আমরা কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় নির্দ্দিষ্ট করিব;—

বিলাতের সান্ত্বনা।

আমাদের সান্ত্বনা নাই।

"One all eyes,
Philosopher! a fingering slave,
One that would peep and botanize
Upon his mother's grave!"

অথবা,—

"He has neither eyes, nor ears;
Himself his world, and his own God;
A reasoning, self-sufficing thing,
An intellectual All-in-all!"

হায়! যে ভক্তি, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি হৃদ্‌বৃত্তিনিচয়ের জন্যই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য হইয়াছে, এই কি তাহার অনুশীলন? আর ইংরাজ রাজপুরুষ! তোমরা যে এতদিন ধরিয়া কেবল Mass Education, Mass Education বলিয়া চীৎকার করিতেছ, এই বাঙ্গালাদেশবাসী অগণিত massএর কোন্ বৃত্তিটা সম্যক্ পরিমার্জ্জিত করিয়াছ, আমাদিগকে আজ বলিয়া দিতে পার?

সমালোচনা।

পত্র-রচনা।

য়ুরোপে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির পত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত হয়। আমাদিগের দেশে জীবনচরিতে পত্র সন্নিবেশিত করিবার প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। লেখকের সুচিন্তিত রচনায় ও কার্য্যে কেবল আধখানা মানুষ জানা যায়; কিন্তু বন্ধুবান্ধবের নিকট লিখিত পত্রে পুরা মানুষ সুপ্রকাশ করে। ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া বিখ্যাত লেখক জন মর্লি নাইনটিন্থ সেনচুরী পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রথম নিয়ম।

উত্তম পত্ররচনার প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, বক্তৃতা যেমন শ্রোতাদিগের জন্য, পত্র সেইরূপ বন্ধুর জন্য; সাধারণের জন্য নহে। বক্তৃতার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপন। বক্তৃতায় সৌন্দর্য্য থাকে না; কারণ, তাহাতে বক্তৃতার জীবন যে কণ্ঠস্বর, তাহার অভাব; পত্রের উদ্দেশ্য বন্ধুর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করা;—সাধারণে উহা পাঠ করিবে, এ আশঙ্কা থাকিলে, উহাতে পত্রোচিত সরলতা ও আন্তরিকতার অভাব হয়। উত্তম পত্ররচনার প্রধান আবশ্যক নিয়ম এই যে, তন্মধ্যে সাধারণের দৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নাই। পত্রলেখক স্বাধীন, অমায়িক, সরল হইবেন, কিন্তু তাহার অহিংস্থ বড় আবশ্যক। উত্তম পত্র এবং সর্দ্দালাপ, উভয়ই অতর্কিতভাবে মনোভাবের প্রকাশক হইবে। যাঁহাদিগের মধ্যে পত্র চলিতেছে, তাঁহারা যে সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন বা করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধীয় সাধারণ কথাবার্ত্তা পত্রে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে সাধারণকে টানিয়া আনিলে ইন্দ্রজাল নষ্ট হইবে।

কাউপার।

বিখ্যাত বিচারকবৃন্দের মতে, পত্রলেখকদিগের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে কাউপারের স্থান সর্ব্বোচ্চ। ইংরাজী সাহিত্যে এতদ্বিষয়ক পুস্তকাবলীর মধ্যে কাউপারের পত্রাবলিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রে লেখকের মনোভাব পরিস্ফুট। মনোভাবের পর মনোভাব যেমন আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সরলতা, পবিত্রতা, আনন্দ ও নৈরাশ্য, সকলই প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্ব্যতিরিক্ত

তাঁহার সামান্য সামান্য ঘটনাও সুন্দরভাবে বর্ণিত। একবার একজন কাউপারকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যাঁহাদিগকে পত্র লিখিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহার পত্রে চমৎকার ভাব পাইতেন। ইহাতে কিছু দিন কাউপার পত্র লেখা বন্ধ করেন। তাহার পর এই নীরবতার কৈফিয়তে কাউপার লিখিয়াছিলেন যে, ঐ গর্ব্বে তাঁহাকে মাটী করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; তিনি পোপের মত বিবক্তিকর পত্রলেখক হইয়া যাইতেন; প্রত্যেক 'বাক্য' সুলিখিত ও প্রত্যেক অংশ বিশেষভাবে লিখিত না হইলে পোপের মতে কিছুই হইল না। সেই জন্য কাউপারের মতে, পোপের পত্ররচনাপ্রণালী বড়ই বিরক্তিকর। কাজেই যত দিন এই প্রশংসার প্রভাব মন হইতে দূর না হইয়াছিল, তত দিন তিনি পত্র লেখেন নাই; তাহার পর তিনি আবার পূর্ব্বের মত মনের প্রধান চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন। বাস্তবিক, কাউপারের পত্রে তদীয় সরলতা ও আন্তরিকতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

স্কট, ল্যাম্ব ও বায়রণ।

সাহসী, আন্তরিকতাপূর্ণ, প্রতিভাবান স্কটের পত্রগুলিও তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় অকৃত্রিম, বন্ধুত্বভাবে পূর্ণ, আনন্দালোকসমুজ্জ্বল এবং কারুণ্যময়। স্কট বলিতেন যে, তিনি যাহা লিখিতেন, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবিতেন না। ইহাই প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট পত্রলেখকের উপযুক্ত কথা। পত্রলেখকদিগের মধ্যে চার্লস ল্যাম্বের স্থান অতি উচ্চ; তাঁহার পত্রে খেয়াল ও আনন্দ, কারুণ্য ভাব ও কোমল পরিহাস, এবং পরিহাসের মধ্যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আশ্চর্য্য ভাবে একত্র মিশ্রিত। এ সম্বন্ধে বায়রণের স্থান কাউপারের নিম্নেই; কেহ কেহ বায়রণকেই উচ্চতর স্থান দিতে চাহেন। বায়রণের পত্রে অনায়াসভাব, হাস্যরস, উজ্জ্বলতা, নির্ভীকতা, একত্র মিলিত। কাজেই অলস সময় কাটাইবার পক্ষে বায়রণের পত্রের মত আর কিছুই কোন ভাষাতে পাওয়া যায় না।

মিল, কার্লাইল প্রভৃতি।

মিল সকল পত্রলেখককেই উত্তর লিখিতেন। কিন্তু লোকে সেই শান্তপ্রকৃতি জ্ঞানী পুরুষকে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দিত; সেই জন্য তাঁহার পত্র গুরুতর বিষয়ের বিচার ও বিবেচনায় পরিপূর্ণ। এমার্সন কার্লাইলকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল পত্রে বিশেষত্ব বা বর্ণোজ্জ্বলতার অভাব। কার্লাইলের পত্রে তাহার অভাব নাই। তাঁহার পত্রে তদীয় আনন্দপ্রবণতা, বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃভাব পরিস্ফুট। ডিকেন্সের পত্রে সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর বর্ণনা, ও আনন্দ দেখা যায়। সেকলের সকল পত্র এমন সাহিত্য-প্রিয়তা এবং মানবজীবনসঙ্গী সাহিত্যের মহিমায় পূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিলেই তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়া সেইরূপ কিছু লিখিয়া ফেলিতে পাঠকের ইচ্ছা হয়।

যে সরলতা ও অনায়াসভাব উত্তম পত্রের প্রধান লক্ষণ, তাহা প্রধানতঃ কাউপার ও বায়রণের পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাথু আর্ণল্ড।

ইহার পর প্রবন্ধলেখক ম্যাথু আর্ণল্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ম্যাথু আর্ণল্ডের নবপ্রকাশিত দুই খণ্ড পত্রসংগ্রহে, তাঁহাকে পত্রলেখকদিগের মধ্যে কিরূপ স্থান দান করিবে, তাহা এখন স্থির করা অসম্ভব। যাঁহারা তাঁহার পত্রে নূতন উপদেশ, নূতন ভাব ও গভীর সামাজিক পর্য্যবেক্ষণে পরিপূর্ণ কোনও রচনা পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ হতাশ হইয়াছেন। আর যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকে এক জন প্রকৃত স্নেহশীল বন্ধু হারাইয়াছেন, তাঁহাদিগের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই আবার যাঁহারা তাঁহার অমর পুস্তকাবলী পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহারা সেই অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষের পত্র পড়া

করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া, অভিনেতার আত্মীয় স্বজনবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ন্যাশনাল রিভিউ পত্রে ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া নবনির্ব্বাচিত রাজকবি মিষ্টার অলিফেণ্ট অধীন, তাঁহার কবিভ্রাতার কবিতার সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার কথার সারোদ্ধার করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

অধীন বলেন যে, ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতায় ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা নৈতিক ভাবই অধিক প্রবল। আবার যখন তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিকবয়স্ক নহেন। কাজেই নিজের ব্যবহৃত যন্ত্রের উপর তাঁহার তেমন কুশলতা ছিল না; এবং সেই জন্যই তিনি সেই উচ্চ সুর তেমন করিয়া আলাপ করিতে পারেন নাই।

নানাবিধ।

হল্ কেন্।

বর্ত্তমান সময়ের বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে হল্ কেন্ এক জন। হল্ কেনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাহারও গতানুগতি না করিয়া আপনি এক পথ প্রস্তুত করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে যেরূপ প্রভূত নাটকীয় শৈলীর দৃষ্ট হয়, অন্যান্য উপন্যাসে সেরূপ দেখা যায় না। Manxman নামক পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার ভাগ্যে যেরূপ প্রভূত যশোলাভ ঘটিয়াছে, সচরাচর লেখকের ভাগ্যে সেরূপ হয় না। আমরা উইল্‌ড্রর ম্যাগাজিন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রথমে লেখকের ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তকখানি জু-সংক্রান্ত উপন্যাস হইবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া ভ্রমণকালে লেখক এই সংকল্প করেন; কিন্তু পরিণামে তাঁহার বোধ হয় যে, রসিয়ান ম্যাচম্যান। উপন্যাসলেখকদিগকে তাঁহাদিগের আপনার গণ্ডীর মধ্যে পরাভূত করা সহজ হইবে না। ইতিমধ্যে ঘটনাবপরিবর্ত্তনে তিনি মালবার্পে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে জু-সংক্রান্ত উপন্যাস ম্যাকস্ উপন্যাসে পরিণত হয়।

প্রবন্ধলেখক মিষ্টার সেরার্ড বলেন যে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবাবু একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। লেখক রেনানের খৃষ্টের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন—এই পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হয়েন। তখন খৃষ্ট। নই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রেনান অবিশ্বাসের দিক হইতে যেমন জীবনচরিত লিখিয়াছেন, বিশ্বাসের দিক হইতেও তেমনই উজ্জ্বল, ব্যক্তিগত জীবনচরিত রচিত হইতে পারে। তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন; কিন্তু ঐ পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কাজেই গত বৎসর কোন প্রকাশক উহার পাণ্ডুলিপির জন্য তাঁহাকে তিন সহস্র পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা) দিতে স্বীকার করিলেও, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। যদিও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও উপন্যাসে তিনি কোনরূপ বিষয় ব্যবহার করেন নাই, এমন অনেক বিষয় বক্ষ্যমাণ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি ঐ পুস্তক রচনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই পুস্তকে মানবোচিত বিবরের সন্নিবেশ এবং নাটকীয় সৌন্দর্য্যের অভাব নাই বটে,—তথাপি লেখক যেরূপ সঙ্কল্প ছিল, সেরূপ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাহা আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তবে তাঁহার

ইচ্ছা আছে, ঐ পুস্তক আবার লিখিবেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইংরাজী পাঠকদিগের উপকার হয়, সন্দেহ নাই; মেরান্ও হল্ কেন, উভয়েরই রচনা শিল্পসুষমমণ্ডিতা এবং শক্তিময়ী, মোহিনী এবং অসাধারণ প্রভাবময়ী।

হল্ কেন বলেন যে, গত কয় বৎসরের মধ্যে তিনি লিখিবার জন্য ডেস্ক্ ব্যবহার করেন নাই। যাহা লিখিতে হইবে, তাহা প্রথমে মস্তিষ্কে লিখিত হয়, তৎপরে মস্তকের বোঝা যখন কাগজে নামাইতে হয়, তখন যে টুকরা কাগজ হাতের কাছে থাকে, তাহাই লইয়া হাঁটুর উপর রাখিয়া লিখিলেই হইল। তাঁহার রচনা-প্রণালী এইরূপ;—প্রথমে অবশ্য মতলব আঁটিতে হয়; তাহার পর ঘটনা-সন্নিবেশ; ঘটনা-সন্নিবেশ সহজেই সম্পন্ন হয়। রচনাবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের ন্যায় পরিশ্রম করেন। যে সকল স্থানে বর্ণনা করিতে হইবে, লেখক স্বয়ং সে সকল স্থান দর্শন করেন। বর্ণিতবিষয়সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইলেই, তিনি সে সকল পাঠ করেন। ইহাতে পরিশ্রম ও আনন্দ উভয়ই আছে। তাহার পর তিনি নোট লইতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে প্রকৃত যন্ত্রণার আরম্ভ। প্রতিদিন প্রভাতে পাঁচটা হইতে প্রাতরাশ পর্য্যন্ত ঐ বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, তিনি প্রভাতে পাঁচটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া সে দিন যে অধ্যায় লিখিবেন, সেই অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত মনে মনে রচনা করেন; প্রায় সাতটার সময় সে কার্য্য শেষ হয়। সাতটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত অধ্যায়টি মনে মনে পুনর্বালোচনা করেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ক্রত কলম চালাইয়া মস্তকের বোঝা কাগজে অর্পণ করেন। অনন্তর সমস্ত পুস্তকের কথা-ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। কোনও পুস্তকের রচনাকালে, লেখক অন্য সকল চিন্তা বর্জ্জন করিয়া কেবল তাহারই কথা ভাবেন। অপরাহ্নে তিনি একমাথা চিন্তা লইয়া, হয় ভ্রমণে, নচেৎ অশ্বারোহণে, বাহির হইবেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে রক্ষনমধ্যে পদচারণ করিতে করিতে গল্প রচনা করেন। সে সময় তাঁহার অত্যন্ত আনন্দে অতিবাহিত হয়। তিনি যে প্রতিদিন লিখিবেন, এমন কিছু স্থির নাই,—মধ্যে-মধ্যে দীর্ঘ ছুটিও লইয়া থাকেন। আবার যখন লেখেন, তখন প্রতিদিন পনের শত কথার অধিক লিপিবদ্ধ করেন না।

পুনর্বালোচনা।

কোনও পত্রে যখন তাঁহার কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পাণ্ডুলিপির বড় পুনর্বালোচনা করেন না। তবে যখন উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তখন কতকটা বদলাইতে, কতকটা নূতন অংশ বসাইতে, কতকটা নূতন করিয়া লিখিতে, তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয়। Scapegoat লেখকের এক খানি মূল্যবান্ উপন্যাস। উহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার বেসাণ্ট বলিয়াছেন, "প্রায় প্রতি বৎসর প্রকাশিত পুস্তক সকলের মধ্যে একখানি অন্য সকল খানির অপেক্ষা বহুপরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়, এবং তাহাতেই সে বৎসর বিখ্যাত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বৎসরের সেই পুস্তক হল্ কেনের 'স্কেপগোট'।" সেই পুস্তকের কি হইয়াছিল শুনুন। যখন পুস্তকের চার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গেল, এবং পুস্তকখানার খুব প্রশংসা হইল, তখন লেখকের মনে হইল যে, পুস্তকখানি তাঁহার মনের মত হয় নাই। কাজেই আর দুই মাস ধরিয়া লেখক স্কেপগোট নূতন করিয়া লিখিলেন। লোকে বলে, এই সংশোধিত স্কেপগোটের কোনও উন্নতি হয় নাই; কিন্তু লেখকের সংস্কার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ডুমা।

বিগত নভেম্বর মাসে আলেক্জাণ্ডার ডুমার মৃত্যুতে ফরাসী সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। স্থাবর সম্পত্তিতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দ

করিবার অধিকার আইনসঙ্গত বটে; কিন্তু সাহিত্যের ক্রমাধ সাধারণতঃ 'জুটবন্দি' বন্দোবস্তই প্রচলিত; কচিৎ মৌরসি বন্দোবস্ত দেখা যায়। কিন্তু ডুমার বিষয় স্বতন্ত্র। তাঁহার সাহিত্য-'ক্রম' পিতার পর পুত্রেই বর্ত্তাইয়াছিল; এমন কি, পিতার বৃদ্ধাবস্থাতেই পুত্র সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও ইংরাজী সহযোগীর অনুসরণ করিয়া আমরা ডুমার সম্বন্ধীয় কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ইংরাজ কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন;—

"দোষরাশি তৃণসম ভাসে-ত-উপরে;
যাহারা মুকুতা তরে সন্ধান করিয়া ফেরে,
তাদের ডুবিতে হ'বে গভীর সাগরে।"

দোষ প্রথমেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দোষ সকলেরই থাকে, ডুমারও ছিল। ডুমা যখন ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন, তখন ডুমার সমসাময়িক কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি তদীয় রচনার দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ডুমা পাঠককে যে জগতে উপনীত করিতেন, তাহার অস্তিত্বই নাই। সে জগৎ এক বিচিত্র জগৎ। তাঁহার মতে, ডুমার লেখনীপ্রসূত মোহিনী-বর্ণনায়-বর্ণিত-সাধারণ নিয়মের-ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, পুরুষে-সন্তানি এবং রমণীতে-পবিত্রতার আদর্শ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, এবং স্বয়ং ডুমাও অসতর্কভাবে সেই আদর্শেরই পূজা করিতেন।

দোষ।

ডুমার অধিকাংশ পুস্তকই বড় সত্বর রচিত হইত। তিনি বলিতেন যে, কোনও নাটক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাহার আদ্যোপান্ত ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিতেন। গঠা সম্বন্ধে তাঁহার মত বড় স্থির ছিল। বড় কাগজখানিকে চার সমান ভাগে বিভক্ত করা হইত। ঐরূপ কুড়িখানি কাগজে প্রত্যেক অঙ্ক শেষ হইত; কেবল শেষ অঙ্ক সম্বন্ধে বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র; সতের খানা কাগজেই শেষ অঙ্ক শেষ হইত। নির্দ্ধারিতসংখ্যক কাগজ লেখা হইলেই তিনি বুঝিতেন যে, অঙ্কটা বেশ বড় হইয়াছে; তখন তিনি সে অঙ্ক শেষ করিতেন।

রচনা।

পিতা পুত্রের প্রভেদ সম্বন্ধে ডুমা একবার একজন ইংরাজ সমালোচককে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পিতার রঙ্গলীলাপ্রিয়তা পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল; কিন্তু দুই জনের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পিতা কবিতা ও সৌন্দর্য্যের কাব্য যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই তিনি "রাইজ্যাণ্টিষ্ট"। আর তিনি এ কালের লোক, তাই তিনি "রিয়ালিষ্ট"। পিতা স্বপ্নরাজ্য হইতে বর্ণনার বিষয় সংগ্রহ করিতেন; পুত্র চতুষ্পার্শ্বস্থ মানবমণ্ডলীর মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিতেন। পিতা মুদিত চক্ষু লইয়া কার্য্য করিতেন; পুত্র জগতের জটিল জালের মধ্যে নয়ন নিমীলিত না রাখিয়া কাজ করিতেন না। পিতা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন, পুত্র জগতের একেবারে মধ্যে থাকিতেন। পিতা চিত্র অঙ্কিত করিতেন; পুত্র ফটোগ্রাফ তুলিতেন। তাঁর চিত্রিত চরিত্রের আদর্শ জগতে পাওয়া যায় না, পুত্রের চিত্রিত চরিত্রের আদর্শ নিত্য সহজপ্রাপ্য।

পিতা ও পুত্র।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ডুমার মত বড় ভয়ানক। তিনি বলিতেন যে, কোনও রমণী যদি কোনও পুরুষকে পছন্দ করে, তবে সে তাহাকে বিবাহ করে; নতুবা সে তাহাকে বিবাহ করে না। বাস্—বিশেষত্ব শেষ হইয়া গেল। তিনি পুত্রপৌত্রাদিবেষ্টিতা অনেক রমণী। মহিলাকে শৈশবাবধি জানেন,—বিবাহ ব্যাপারটা কি, তাহাও তিনি শব বুঝেন। পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হইলেই রমণীগণ পুরুষকে ঘৃণা করিতে

আরম্ভ করিবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন রমণী পুরুষের উপর নির্ভর করিবে। বিবাহপ্রথার মত আর কোনও প্রহসন আছে কি? রমণীগণের মতে ইহা ত স্বাধীনতা-প্রদাতা। বিবাহ হইতেই তাহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমতী' যোগ হয়; আর বিবাহের পর তাহারা পিতামাতার নিকট হইতে যাইতে পারে। পিতামাতাকে তাহারা ভালবাসে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলে তাহাদিগের আনন্দ দেখে কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, মেয়ীর অস্তিত্ব না থাকিলে বৃষ্টধর্ম্ম আরও শীঘ্র জয়লাভ করিত, মেয়ীই সে ধর্ম্ম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ডুমার ঈশ্বর ও তাঁহার মধ্যে মেয়ী থাকিতে পাইবেন না। পুরুষ অপেক্ষা রমণীর নীচত্ব অনুভব করিয়া টেনিসনের 'লকস্‌লিহলের' হতাশপ্রেমিক নায়ক বলিয়াছেন:—

"Woman is the lesser man, and all thy passions match'd with mine
Are as moonlight unto sunlight, and as water unto wine."

কিন্তু ডুমার মত বড় ভয়ানক। যে নবনারীর আবির্ভাবে এখন ইংরাজি সাহিত্য কলুষিত, সেই নরনারীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে যদি ইংলণ্ডে বিবাহপ্রথার লোপ না হয়, তবে কেবল দীর্ঘ-কেশশালী পুরুষগণ হ্রস্বকেশশালিনী রমণীগণকে বিবাহ করিবে; আর রমণীগণ ফুটবল খেলিয়া, দ্বিচক্রযান চালাইয়া কাল কাটাইবে, এবং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীত্ব ও কদর্য্য জীবনসন্তানের জন্মের অনাবশ্যকতা ও অন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সেই নরনারীর আদর্শ, মূর্ত্তিমতী করুণার কল্পনা কোমলপ্রাণা কামিনীর আদর্শ বিকৃত করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেও, ডুমার এই ভয়ানক মত। রমণীদিগের সম্বন্ধে ডুমার বিধান প্রায় ড্রেকোর বিধানের মতই কঠোর। জানুয়ারী মাসের 'ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ' পত্রে শ্রীযুতা গ্যান্ডিভেলুডি, ডুমা ও তাঁহার নাটক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে, শেষকালে রচিত গ্রন্থসমূহে ডুমা পুরুষদিগকে বড় কঠোর উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশের সার এই দাঁড়ায়,—"যদি তোমার পত্নী তোমাকে প্রবঞ্চিত করে, তবে তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিবে; যদি তোমার এমন বোধ হয় যে, তোমার পত্নী পাপে এমন আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা যে, তাহার অনুতপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে তাহাকেও হত্যা কর; আর যদি নরহত্যে হস্ত কলুষিত করিবার প্রবৃত্তি তোমার না হয়, তবে তাহাকে সন্তানহীনা, গৃহহীনা করিয়া দূর করিয়া দাও। তাহার প্রাণের আবরণ ধূলিসাৎ করিয়া তাহাকে গৃহহীন স্থানে বিশাল ভবের মাঝে বিদায় করিয়া দাও—তাহার ফিরিবার পথ রাখিবার প্রয়োজন নাই।" "যে পতিতা রমণী উদ্ধারের প্রার্থিনী, তুমি তাহাকে সাহায্য করিতে পার; কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, যে দুর্ব্বল, যথেচ্ছাচারিণী, বিবেকহীনা, অনিষ্টকারিণী রমণীকে তুমি তোমার পত্নী করিয়াছিলে, তাহার কলঙ্ককাহিনী প্রকাশ করিয়া দিও।" "তাহার পাপ, তাহার দুর্ব্বলতা জগতে প্রকাশিত করা আবশ্যক। পুরুষ যখন আপনার প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় পরাঙ্মুখ হয়, যখন সে রমণীর উপর শাসন শিথিল করে, তখন সে রমণীর হস্তে ক্রীড়নকমাত্র হইয়া দাঁড়ায়; হয় আত্মহত্যা করে, নয় ঘৃণাজনক সম্মানহীনতায় মগ্ন হইতে থাকে। সে তাহার দুর্দ্দশার জন্য তখন আর সহানুভূতিও পায় না।" অর্থাৎ তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না। রমণীসম্বন্ধে ব্যবস্থা! বিৎ ডুমার এই কঠোর ব্যবস্থা। কি ভয়ানক!

ডুমার জীবনের সর্ব্ব সময়ে রচিত গ্রন্থেই রমণীজাতির প্রতি অবিশ্বাসভাব দেখা যায়। ইহার কারণ কি? ডুমা তখনকার নূতন লেখক, পরে সুপ্রসিদ্ধ সোপাঁকে বড় ভাল

বাসিতেন। তাঁহাদিগের উত্তরের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যুবক বন্ধুকে তাঁহার গৃহে "আহারস্বাধীনতা" প্রদান করিবার সময় ডুমা মোপাঁসাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সদ্য চলনসই, লোক জন অন্য স্থানের লোকের অপেক্ষা অধিক বোকা নহে; আর তাঁহার গৃহে নাপীর নারগস নাই। এই অসাধারণ অবিশ্বাসের কারণ বুঝিতে হইলে ডুমার অতীত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। যৌবনে একবার নির্ম্মমভাবে প্রবঞ্চিত হইবার পর, ডুমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও প্রেমজালে জড়িত হইবেন না। ভুবনে প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকিলেও এবং কে কোথা ধরা পড়ে তাহা কেহ না জানিলেও ডুমার গর্ব্ব টুটে নাই; য়ুরোপের বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী কলানিপুণা মোহিনীগণ আর কখনও ডুমাকে বন্ধ বা বন্দী করিতে পারেন নাই। তবুও ডুমা বলিয়াছিলেন যে, রমণীরা অন্য পুরুষ অপেক্ষা অধম এবং মন্দকারিণী; যেন সেই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রমণীরা চিরজীবন তাঁহার তোষামোদ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায়ের প্রতি ডুমার প্রবল ঘৃণা ছিল। মৃত ব্যক্তির বিশেষ বিধান না থাকিলে, ফরাসী ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় ব্যাপটাইসড্ খৃষ্টানমাত্রকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতে সমাধিস্থ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার রক্ষণশীল বন্ধুসম্প্রদায়ক বিষয় ও তাঁহার পুরোহিত সম্প্রদায়। ঘৃণিত পরিবর্ত্তনশীল সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিয়া, ডুমা যে অন্ত্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিব্যাপারের জন্য তিনি এই বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাতে পুরোহিত, সৈনিক এবং বক্তৃতা, এই তিন জিনিস থাকিতে পাইবে না। কাজেই ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কেবল কতকগুলি বড় লোক তাঁহার সমাধিসময়ে উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতের কোনও কার্য্য, বক্তার বাক্য, বা সৈনিকের সজ্জা, সেই সমাধিব্যাপারের গম্ভীরতা নষ্ট করে নাই। অনেক গোঁড়া ক্যাথলিকের বন্ধু ডুমার এই বিশেষ বিধানের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে।—কোনও ধর্ম্মযাজকের বিবক্তিকর বন্ধুত্বেই ইহার উৎপত্তি। কোনও ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের এক যুবকের সহিত ডুমার এক কন্যার বিবাহের সময়, সেই ধর্ম্মযাজকের পুত্র ডুমার পুস্তকে প্রকাশিত নৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে ক্যাথলিকদিগের মতামত প্রকাশ করেন। পুত্র ডুমা তখন পিতার ন্যায় পুরোহিতসম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় কেবল ভাল গলের অন্ত ব্যস্ত হইতেন না, পরন্তু তিনি কথায় যুবকগণের নীতিশিক্ষক বলিয়া গর্ব্বই করিতেন। কাজেই পুরোহিতের হাড়জ্বালান কথাগুলা ডুমার বড় লাগিয়াছিল। পুরোহিত মহাশয়ের কথাগুলাও বোধ হয় কিছু কটোর হইয়াছিল, কারণ নিগুণ আদায় তিনগুণ ঝালের কথা সুবিদিত। ইহাতে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারিত। শেষক্রোধে পুরোহিত যখন বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তখন সংক্ষেপে ডুমা কেবল বলিলেন যে, সে কথা কেহই স্বীকার করিবে না; এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। জীবনে এবং মরণে পুরোহিতসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিবার সংকল্প, এই সময় হইতেই তাঁহার মনে ছিল।

পুরোহিতবিদ্বেষী সমালোচকবিশেষের মতামতে ডুমার অপরিসীম যশ ক্ষুণ্ণ হইবে না। সূর্য্যাস্তের সময় যেমন গিরিশরীরস্থ কণ্টকময় গুল্মাদি সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়, পর্ব্বতের তুষারমুকুটমণ্ডিত সমুন্নতশির অভ্রভেদী গিরিবিশ্বিজ্বালে সুসজ্জিত দেখায়, তেমনই কালে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী নগণ্যলোচকগণ বিস্মৃতির ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেও, ডুমার নাম অপরিমেয় যশঃপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শেষ কথা।

দর্শন।

ফেব্রুয়ারি-সংখ্যক কণ্টেম্পোরারি রিভিউ পত্রে দার্শনিকপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সর ব্যবসায়িক প্রণালীর অনুশীলনপ্রসঙ্গে ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি ও পরিণতির আলোচনা করিয়াছেন।

স্থাপত্যের পূর্ব্বে ভাস্কর্য্য।

অনেকের ধারণা আছে যে, ভাস্কর্য্যের পূর্ব্বে স্থাপত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, আর স্থপতিরচিত মন্দিরাদির অলঙ্কারার্থ ভাস্কর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। স্পেন্সরের মতে মৃৎ বা দারুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি কালতঃ স্থাপত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি।

অসভ্যাবস্থায় মানুষ মৃত ও জীবিতের ভেদ বুঝিতে সক্ষম হয় না। আজ যে জীবিত থাকিয়া তাহার সহিত আলাপ আহার করিয়াছে, সে যে মৃত্যুর কবালস্পর্শে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল, অসভ্যের ধারণায় এতটা কুলায় না। সে ভাবে, মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া কোথায় অদৃশ্য আছে; একটা জড় আধার পাইলেই তাহাতে আবার অধিষ্ঠিত হইবে। এই ভাব হইতেই মূর্ত্তির গঠন আরম্ভ হয়। মানসকল্পিত বা স্মৃতিস্থিত মৃতের মূর্ত্তি কাষ্ঠে বা মৃত্তিকায় গঠিয়া অসভ্য ভাবে যে, প্রেত তাহাতে অহরহ বা অবসরমত অধিষ্ঠিত হয়। অতএব সে সেই মূর্ত্তিকে পরিচ্ছদে ভূষিত ও আহার্য্যে সেবা করিতে যায়। এইরূপ কয় শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মৃত রাজাদিগের মূর্ত্তি মহার্ঘবেশে সজ্জিত করিয়া দৈনন্দিন ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা অভ্যর্থিত করা হইত।

প্রেতের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি প্রাচীনকালে যাজকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। অতএব দেখা যায়, মৃতের মূর্ত্তিগঠন (যাহা হইতে ভাস্কর্য্যের সূত্রপাত) যাজক দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

যাজক হইতে ভাস্কর।

উল্লিখিত তত্ত্বের প্রমাণ-অঙ্গ স্পেন্সর প্রধানতঃ বহুতর প্রাচীন ও আধুনিক জাতির বিবরণ ও ইতিবৃত্ত সংগৃহীত করিয়াছেন। আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট নিগ্রোজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, মৃতের গোরের উপর তাহার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। কুক বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাণ্ডবিচ দ্বীপবাসীরা প্রত্যেক শক্তিশালী প্রেতের উদ্দেশে এক একটি মূর্ত্তি গঠিত করে। এই প্রেতগণ মৃত রাজা বা রাজগুরুই আর কেহ নহে। মেওরি জাতি মুরিণ জাতি প্রভৃতির বিবরণপাঠে জানা যায় যে, ঐ সকল মূর্ত্তির নির্ম্মাতা ভাস্কর প্রায়ই যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত। কুলনক এবং মোগলদিগের যে বৃত্তান্ত পেলাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও জানা যায় যে, যাজকেরাই ভাস্কর ও চিত্রকর উভয়বিধ কার্য্যই সম্পাদন করে।

প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে এই কথাই সপ্রমাণ হয়। মিসরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, উপাস্য প্রেত বা দেবতার মূর্ত্তি যাজকদিগের উপদেশ ও তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্থলে যাজক নিজেই বা তাহা গঠিত করিতেন। গ্রীকদিগের বৃত্তান্ত লিখিয়া হুবার্টস বলিয়াছেন যে, আদিতে ভাস্কর্য্য যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত লোক দ্বারাই রচিত হইত। রোমকদিগের ইতিহাস দ্বারা এই কথাই সপ্রমাণ হয়।

অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, এক হইতে বহুর উৎপত্তি, ইহাই বিবর্ত্তনের নিয়ম। পূর্ব্বে এক সম্প্রদায় বা ব্যক্তিতে বহু-ব্যবসায় একীভূত ছিল; ক্রমশঃ সে সকল পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। লিওনারদো দা ভিন্‌চি বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়েই পারদর্শী ছিলেন। কবি, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর মাইকেল আন্‌জিলো একা এ সকল নামেরই অধিকারী। ধিয়োক্রিতস্ বাজন, লিখন,

চিত্রণ ও স্বর্ণকারকর্ম্মে নিপুণ ছিলেন। এসিরিক ডেডিড লিখিয়াছেন যে, মধ্য যুগে স্বর্ণকার্য্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও কবিতারচনায়; একই যাজকাচার্য্যদিগকে সুনিপুণ দেখা যায়। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিশেষ কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। স্পেন্সরের মতে ভাস্কর্য্য এখনও যাজকের সম্পূর্ণ হাত ছাড়াইয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে নাই। গির্জ্জায় যে প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা মৃত আত্মীয়ের প্রেত-উপাসনার রূপান্তরমাত্র। ধনীর প্রাসাদে যে পূর্ব্বপুরুষদিগের মূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হয়, তাহাও এই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাও বক্তব্য যে, ক্রমশঃ ভাস্কর স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া ইতিহাস, উপাখ্যান, রূপক বা বাস্তব ঘটনার ছায়া লইয়া, তাহাই প্রস্তর বা ধাতুতে রচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ।—"বিদ্যুৎ-দর্শনী" একটি সুরঞ্জিত প্রবন্ধচিত্র। "প্রবাহ-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদমালার মূল অনুসন্ধান ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছেন। প্রবন্ধটি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই উপাদেয় হইয়াছে। "সিরাজদ্দৌলা" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখকের গবেষণা প্রশংসনীয়। সিরাজদ্দৌলার বিস্তৃত বিবরণ এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয় নাই; লেখক সে অভাবের মোচন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "নীলগিরির টোডা জাতি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি সুখপাঠ্য রচনা। "বাঙ্গলার রঙ্গভূমি" প্রবন্ধটি আলোচনার উপযুক্ত;—থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রবন্ধটিতে দৃষ্টিপাত করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বাঁহারা থিয়েটারের দর্শক, সুতরাং পৃষ্ঠপোষক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের শিক্ষার বিষয়ও যথেষ্ট আছে;—কিন্তু তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম মূক উপেক্ষার নিকট সকল আবেদন উপদেশ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের সাধারণ জনের শুনিবার ও শুনিয়া ভাবিবার, এবং তদনুসারে নূতন পথে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি বা সম্ভাবনা থাকিলে, দেশের অনেক আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত এবং অনেক আবশ্যক সংস্কার সুনির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্ভাবনারও অতীত। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "প্রজাসুহৃৎ সভা" প্রবন্ধটিতে, এবারকার কংগ্রেসে পঠিত মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতাটির সংক্ষিপ্ত এবং কৃপণ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে;—ইহাকে সমালোচনা না বলিয়া "মুরুব্বির মন্তব্য" বলিলেই বোধ হয় সঙ্গত হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ ক্ষেত্রে অনেকের মতের অনৈক্য হইবে। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন, "তাঁহার সেই উক্তিগুলি সত্যও নহে, সুবুদ্ধি ও সুরুচির পরিচায়কও নহে।"—তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধেও অনেকে এ কথা বলিতে পারেন।

নব্যভারত। পৌষ ও মাঘ।—"স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী" প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার" মধ্যে শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "প্রেমের আদর্শ" একটি সুন্দর সমুজ্জ্বল কবিতা। এবারকার "নব্যভারতের অগ্রভাগ"—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের "নৃসিংহাবতার বঙ্কিমচন্দ্র,"—বক্তব্যমাত্র প্রবন্ধটির দ্বারা "নব্যভারত" কলুষিত হইয়াছে;—গালি না দিলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা যায় না,—এই যাঁহাদের সংস্কার, তাঁহারা সাধারণের কৃপার পাত্র। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এখন নিন্দা প্রশংসার অতীত দেশে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হায়,—

"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥"

ভারতবর্ষ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও কলিকাতার মেডিকেল সোসাইটির মেম্বর, ডাক্তারি ও কবিরাজী শাস্ত্রের রহস্যবিদ্,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৩৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের অকৃত্রিম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধাতুঘটিত সমস্ত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতু দ্রব্যাদি ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা, সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। প্রাতে সমাগত রোগীদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত দেখিয়া বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করা যায়। মফঃস্বলের রোগিগণের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে সহজ মুষ্টিযোগ সহ বিনা মূল্যে ব্যবস্থা পাঠান হয়।

পুষ্পতিক্ত বটিকা।

ইহা সেবনে পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বর, পালা ও কম্পজ্বর, প্লীহা এবং যকৃতঘটিত জ্বর দৌকালীন, নজ্জাগত, মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষম জ্বর এবং মুখ নেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সমস্ত জ্বর আরোগ্য না হয়, তৎসমুদায়ের একমাত্র মহৌষধ। ইহা কেবল কয়েকটী দেশীয় বনজ উদ্ভিজ্জ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এক কৌটা ৩০টী বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আনা। এক কালে ১২ কৌটা বটিকার মূল্য ১০৲ টাকা।

কবিরাজী শিক্ষা। মূল্য মাশুল সমেত ১৸০ টাকা।

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

নং ৩৬, ফৌজদারি বালাখানা—কলিকাতা।

বিষহরি।

ডাঃ শশীভূষণ বিশ্বাসের পারার ঘা, দূষিত ঘা, ধবল ও কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ একমাত্র নিরাপদ আশুফলপ্রদ ঔষধ কেবল দেশী গাছড়া হইতে প্রস্তুত। অনুরোধ করিতেছি, যে সে ঔষধ সেবন করিয়া নিজের ও বংশের সর্ব্বনাশ করিবেন না। যদি পারা বা অন্য বিষাক্ত ঔষধ খাইয়া থাকেন, তবে বিষহরি সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করুন। যাঁহাদিগের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই যকৃত অন্ত্র রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাঁহারা যদি নিয়ম পূর্ব্বক বিষহরি গর্ভাবস্থায় সেবন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের সন্তান অকালে বিনষ্ট হইবে না। বিষহরি অনুকরণ হওয়ায় ভারতবর্ষস্থিত সমস্ত এজেন্সি বন্ধ করিয়া নিজ বাটীতে বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। সেবনের টিং ১৲ লেপনের ঔষধ ১৲ কুষ্ঠ ও ধবলের লেপন ৪৲ প্যাঃ ও ডাঃ স্বতন্ত্র। মেনেজার জে, কে, বসু—৮নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন।

আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি, "কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।" আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে অবিলম্বে আপনার স্ত্রীর জন্য এক বোতল ক্রয় করুন। তিনি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আ আপনি যদি বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত না হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের আফিসে আসিয়া কুন্তলীনের নমুনা দেখিয়া যাইবেন। মনোনীত না হইলে ক্রয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। ইহাই "আমাদের নিবেদন।"

এইচ. বসু।

ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার;

৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩০২ ; চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশিচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবীরেশ্বর-গোস্বামী, শ্রীজলধর সেন, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্., শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ., শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ. ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বেগম সমরু	৭৭০	৫। সীতারাম (সচিত্র)	৮০১
২। প্রতিশোধ (উপন্যাস)	৭৭৭	৬। সহযোগী সাহিত্য	৮২৮—৮৩১
৩। ভট্টনারায়ণের বংশাবলী ...	৭৮৫	৭। প্রতিবাদ	৮৩১
৪। পার্লিলিং যাত্রা	৭৯২	৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ...	৮৩২

কলিকাতা ;

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/১ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ চারি আনা।

শর্ম্মা কোম্পানীর জ্বরাদির অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য প্রতিকৌটা ॥০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

(একত্রে ১০ কৌটা পর্য্যন্ত ।০ মাশুলে যায়।)

১০০০০০ এক লক্ষ বড়ি বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই আজ "চৌদ্দবড়ির" অত্যাশ্চর্য্য গুণে চমৎকৃত। এ দেশময় "চৌদ্দবড়ির" সুযশঃ। পুরাতন জ্বরের যে এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে, রোগ যত দিনের পুরাতন হউক না—ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ২।৪ দিনেই প্রকাশ পায়। প্লীহা, যকৃত প্রভৃতির পীড়ায় যেখানে কোন ঔষধে সুফল দেয় নাই, সেখানেও ইহার রোগনাশক ক্ষমতা খুব অল্প সময়ে প্রকাশ পাইবে। যাঁহারা ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণজ্বরে কষ্ট পাইতেছেন, নানারূপ চিকিৎসায় যাঁহারা সুফল পান নাই, তাঁহারা এই ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করুন,—ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

প্রশংসাপত্র।—প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমি আপনার প্রকাশিত চৌদ্দবড়ি লইয়া গিয়া আমার এক প্রতিবেশীকে দিয়াছিলাম তিনি ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় প্রতি দিন জ্বর হইত; এই বড়ি ব্যবহার করিবার পর হইতে তিনি আজ প্রায় ৫ মাস ভাল আছেন।"

বিনামূল্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "জীবন-রক্ষক" পুস্তক বিতরিত হইতেছে। ১০ মূল্যের টিকিট পাঠাইলে পাঠাইয়া থাকি।

শর্ম্মা কোম্পানী।

১২ নং সেকরাপাড়া লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।

৫ নং হুমারটুলি, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে পুরাতন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত-জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি (বমন), অপস্মার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শোথ, উদরী, অম্লপিত্ত, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, স্ত্রীলোকের বিবিধ রোগ ও বালরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ কৌষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, দ্রাবক, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মফস্বলের অধিবাসিগণ রোগের অবস্থা আমুপূর্ব্বিক জানাইলে, তাদৃশ পেবল ডাকে ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন। পত্র লিখিয়া যথাসময়ে কেহ তাহার উত্তর না পাইলে, সে পত্র পাওয়া যায় নাই, কিংবা ঠিকানা বুঝা যায় নাই, এইরূপ বুঝিতাম। এক নামীয় ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ব্যবহৃত হয়, এজন্য পত্র লিখিতে হইলে কোন্ রোগের জন্য ঔষধ আবশ্যক, সেই রোগের নাম লিখিবেন।

রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র।

I have much pleasure in placing on record my opinion of my friend Kaviraj Bijaya Ratna Sen. I have known him for some time and can very confidently say that he is deserving of every respect and consideration for his learning and professional talents. He is a thorough gentleman in every respect.

ম্যারেজ ও ফ্যামিলি রিলিফ ফণ্ড।

ঠিকানা গোঃ অঃ বাঘবাজার; কলিকাতা।

নূতন ধরণে ও নূতন প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের নিকট নিঃ অল্পব্যয়ে লোকে উপযোগী করিয়া উপরোক্ত দুইটী ফণ্ড স্থাপন করা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী পুরুষ যাহাতে মেম্বর হইতে পারিবেন। অপর কোন ফণ্ডে মেম্বর হইবার পূর্ব্বে আমাদের ফণ্ডের নিয়মাবলী একবার পড়িয়া দেখিবেন। বাবিষ্টার, হাকিম, জমীদার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ডিরেক্টর হইয়াছেন। এক পয়সার টিকিট সহ আবেদন করিলে যে কোন ফণ্ডের নিয়মাবলী ও প্রস্পেক্টস্ পাইতে পারিবেন; কেহ এজেণ্ট হইলে কমিসন্ পাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বোস, বি, এ, সেক্রেটারি।

প্রেম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাশুল ⁄০ এক আনা।

"উহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। উহাতে উচ্চ পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে। উহাতে অনেক স্থলে হৃদয়োন্মাদক কথা আছে।" শ্রীমাখনলাল রায়।

প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহের নিকট ২ নং প্যারীমোহন মুখের লেন। (মোহাবাগান, সিমলা পোঃ, কলিকাতা;—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

মেডিকেল কলেজ হইতে ইংরেজিতে পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত।

৭৫।১ নং বিডন ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

চারিটী মহৌষধ।

যাঁহারা বহু দিনাবধি নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, ডাক্তারী কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া হার মানিয়াছেন, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশার জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এবং জীবনে হতাশ ও বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন একবার মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টী তাচ্ছীল্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

রাধক-বিজয়।

ডাক্তারের বিশ্বাস রাধক রোগ জীবনের সঙ্গী, কোনও ক্রমেই আরোগ্য হয় না; কিন্তু আমার এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অবশ্যই তিরোহিত হইবে। বিষম বেদনা ও যন্ত্রণা এবং হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার রাধক-রোগী এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য তিন পুরিয়া ১৲, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

জরায়ু-কল্যাণ।

জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা ও বেদনা, নাড়ীর বিকৃতভা, আভ্যন্তরিক প্রদাহ ইত্যাদি অসুস্থতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক এবং অপরিসীম যন্ত্রণাপ্রদ। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে জরায়ু ও নাড়ী ঘটিত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ও পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ২ ঔন্স শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রদর-চিন্তামণি।

এই পরম উপকারী ঔষধ সেবনে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং দাহ, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট সকল প্রকার প্রদর-রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১৷০, প্যাকিং ৷৵০, আনা ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ক্ষত-নিসূদন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে দ্বোষ, পঁচিড়া, ফোড়া, ঘাউর, ঘুব-রে, নালী ঘা, নারাঙ্গী, পশ্চিমে ধসা, সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা এবং জন্তুর দংশনজাত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে। ঘা যত দিনের পুরাতন ও যত চা হউক না কেন এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে উপকার হইবে বং কিছু দিনের মধ্যে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। মূল্য এক ঔন্স শিশি ১৲ টাকা, াকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ডাক্তার বি এসেন্ জির অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার

একশিরার অব্যর্থ মহৌষধ।

নং ৮৫ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একশিরা রোগ যেরূপেরই বা যত দিনেরই হউক, নিশ্চয় এই ঔষধ প্রয়োগে এককালীন আরোগ্য হইবে। ইহা বর্ত্তমান কালের এক অতি আশ্চর্য্য আবিষ্কার এবং এই পীড়ার পক্ষে অব্যর্থ মহৌষধ। যাঁহারা বহুদিন হইতে এই রোগে কষ্ট পাইতেছেন, এবং যাঁহারা নানারূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনেক বহুদিনের রোগী এই ঔষধ ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধে কোনরূপ দুষ্য দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রশংসাপত্র।

১। আমি আপনার ঔষধ দুই বোতল মাত্র ব্যবহার করিয়া এককালীন আরোগ্য লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের একশিরা রোগ আছে, তাঁহাদিগকে আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে স্বচ্ছন্দে অনুরোধ করিতে পারি।

এস, পি, দাস, নং ৮ এসপ্ল্যানেড রো, কলিকাতা।

২। পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ উবল্, জি সাহেব লিখিয়াছেন:—আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার একশিরা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৩। আপনার একশিরার ঔষধে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ও আমার বন্ধুদিগকে ইহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছি। সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। জে, পি, সিংহ বি-এ, বি-এল, মোজাফরপুর।

আর ইউরিনা।

বহুমূত্র রোগের একমাত্র অশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। বহু দিবসের পুরাতন রোগও ইহা সেবনে স্বল্প সময়ে আরোগ্য হয়। ঔষধের উপকারিতায় সন্দিহান হইলে, ভাগলপুরের ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার জেমস্ রবিনসন সাহেবকে পত্র লিখিয়া জানুন, তিনি ঔষধের গুণে আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়াছেন। মূল্য ১ এক কৌটা ৫৲ টাকা, ৩ কৌটা ১৩৷৷০ টাকা।

অর্শ-নিসূদন বটিকা।

বিনা অস্ত্রে সকল প্রকার অর্শ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ১ এক দিনমাত্র সেবনে রক্ত পড়া ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ছোট কৌটা ১৷৷০ টাকা, বড় কৌটা ৩ টাকা। কাশ্মীর রাজ্যের অম্বু সহরের জজ শ্রীযুক্ত সাদাতুল্লা এ সাহেব উচ্চ দরের প্রশংসা করিয়াছেন।

২৷০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে অন্যান্য ঔষধের ক্যাটালগ পাঠান যায়।

গুপ্ত এণ্ড সন্স।

৩১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

৯১নং অপারসারকিউলার রোড, কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সি কালেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, (এডিনবার্গ) এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এম, বি, মহোদয়ের সাহায্যে আমাদের এই অল্পায়াসে ঔষধের কারখানায় প্রায় তিন শত রকম ঔষধ প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের কারখানায় যাবদীয় ঔষধ আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত হয়। মফঃস্বলের নিকট পত্র লিখিলে প্রাইস্‌লিষ্ট পাঠান যায়।

সিরাপ অফ্ হাইপোফসফাইট অফ লাইম।

কাশি, কাশী, ক্ষয়কাশ, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুস রোগের অমোঘ ঔষধ। এই সিরাপ খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ইহার বং সুন্দর গোলাপী।

প্রতি বোতল ১৲ টাকা; ডজন ৯১৲ টাকা।

কলেরা ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের জন্য।

ক্লেরোডাইন অর্দ্ধ আউন্স শিশি ।৵০ আনা; ডজন ৩৸০, ঔষধের সহিত প্রয়োগবিধি দেওয়া যায়।

ডাক্তার রবিনি ন্যাফর; অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲; ডজন ৩ টাকা।

একোয়া টাইফোটিস।

বা যমানী জল।

অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, হৃতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ ঔষধ। সেবনে পেট কাঁপা, বুকজ্বালা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ তৎক্ষণাৎ দূর হয়; ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও সুনিদ্রা হয়। ২৪ আউন্স বোতল ।৵০ ডজন ৩৸০।

মফঃস্বলবাসীদিগের সুবিধার জন্য আমরা যমানীজলসার প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার সহিত সাত গুণ জল মিশাইলে যমানীজল প্রস্তুত হয়।

৩ আউন্স শিশি ।৷০ ডজন ৫।০।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

এক্সট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কম্পাউণ্ড (গুলঞ্চ প্রভৃতি তরলসার) পালাজ্বর, বৈকালীন জ্বর প্রভৃতি সকলপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে কুইনাইন বা সিনকোনা নাই।

৬ আউন্স শিশি ১৲ টাকা ডজন ১১৲ টাকা।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ম্যানেজার।

রন্ধনবিষয়ক নূতন পুস্তক।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।

নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

নূতন উপন্যাস।

কৃতজ্ঞতা।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

মূল্য বার আনা মাত্র।

কলিকাতার সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শিখা

নূতন প্রকাশিত গীতিকাব্য।

"অশ্রুকণার" কবি

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত।

খুব উৎকৃষ্ট ছাপা, চনৎকার পুরু কাগজ, ভাল বাঁধান। বিলাতী বহির মত আকার প্রকার। প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত। গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখার দ্রব্য।

ঢাকার শাঁখার দ্রব্যের বিষয় কে না জানে? এই দেশীয় শিল্পের অবনতির সময় ঢাকার কারিগরেরা কেবল নিজের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছে। অতি বড় সম্ভ্রান্ত মহিলার ব্যবহারোপযোগী করিয়া আমরা এই সমস্ত দ্রব্য নির্ম্মাণ করাইতেছি। দ্রব্যগুলি দুষ্প্রাপ্য নিভ ভব হীরার জিনিষ বলিয়া ভ্রম হয়, সমস্তই নিখুঁৎ। হাঙ্গরমুখো প্লেন, ডায়মন আশাশোটা বা হোলপাক বালা জোড়া ৷৵৩, মাছ বা নপবালা জোড়া ১৲, ঝলতরঙ্গ চুড়ি (৬ গাছায় সেট ৩ মেল ১৲৸৹, ৷৵৹, প্লেন বা কিরকিরে কঙ্কণ জোড়া ৷৹, ঝপিবার নাল (২৫ নানা) ১৲ টাকা, সর্প প্যাটার্ণ বা পাঞ্জা আংটী ১টি ৸৹। পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন, ঢাকার দরের সঙ্গে আমাদের দরের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

একমাত্র আমদানিকারক

দে এণ্ড কোং—৫২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সপ্তম বর্ষের বিজ্ঞাপন।

বৈশাখ হইতে "সাহিত্যের" সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইবে।

"গ্রাহকগণ, বৈশাখ মাসের মধ্যে সপ্তম বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইবেন।

সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ মাসের শেষ দিবসে প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য কার্য্যালয়।
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন;
কলিকাতা।

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি
কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা অতি সত্বর স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিয়া বাধিত করিবেন।

আশা করি, এজন্য আর স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে হইবে না।

সাহিত্য কার্য্যালয়।
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন।
কলিকাতা।

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি
কার্য্যাধ্যক্ষ।

পাথরের চশমা।

মেটাল ফ্রেম মূল্য ৵৹, ষ্টিল ৬৲, রূপার ৮৲, সোনার ২৫৲। গ্রাহকের কত বয়স, কতদিন চশমা ব্যবহার করিতেছেন, ও দিবালোকে ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে পারেন কি না লিখিলে উপযুক্ত চশমা নির্ব্বাচন করিয়া ভিঃ পিঃতে পাঠান যায়। চক্ষে না লাগিলে বদল করিয়া দিব, মূল্য-তালিকা বিনামূল্যে দিব।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং।

২০ নং লাল বাজার; কলিকাতা।

গীতিকা।

পলাশির যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন কৃত।

* * * এই পুস্তকে অনেকগুলি অতি উচ্চ ভা

এবং তাহা যে প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচায়ক, তাহা আমরা মু

করিতে পারি। * * *

* * * উচ্ছ্বাসের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা ত বেশ তৃ

করিয়াছি। অনেকগুলি কবিতাই ত বড় সুন্দর হইয়াছে। নবীন কবির

আমাদিগকে প্রশংসাই করিতে হইতেছে। * * * *

কবির উচ্ছ্বাস আমাদিগকে পুলকিত করিয়াছে। উচ্ছ্বাসের ছাপা, কাগজ

ও বাঁধা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তকে এমন বাহার ও বাহাদুরী

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * দৈনিক।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রশংসার সহিত যে কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন

এবং বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে সাধারণের

নিকট আদরণীয় হইবে, বলা বাহুল্য। উচ্ছ্বাসে কবিত্ব আছে। * * *

বামাবোধিনী।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মাসিক পত্রিকা **রত্নাকর** অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০।

বার্ষিক জীবন বীমা হাজার টাকা প্রদত্ত হয়।

জীবন-বীমা লইলে ২৲ টাকা।

রহস্য-তন্ত্র, জ্যোতিষ ও পুরাণাদি সম্বলিত এমন ষড়-শাস্ত্র-পূর্ণ পত্রিকা এ

পর্য্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঠে প্রাণ মন চরিতার্থ হয়। এ কার্য্যালয়

এক খণ্ড, ১২ মাসে ১২ খণ্ড বহির্গত হইবে। আগামী আষাঢ় মাস হইতে

বহির্গত হইবে। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা

১৲ টাকা মূল্যের বৃহৎ চিকিৎসা-কৌমুদী পুস্তক উপহার পাইবেন। এক্ষণে

মূল্য চাহি না! পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। বৈশাখ মাসে

উপহার ও পত্রিকা ডাকে পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণ করিব। প্রকাশক কবিরাজ

এস, বি, পাল, ৯৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র মহৌষধ।

...সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা ম্যালে-
...পীহাদি রোগ বিনাশের এমন উৎকৃষ্ট মহৌষধ আজিও এ
...ই হয় নাই। আজ বাঙ্গালার বাজারে অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের
...ঘরে বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। কি ইংরেজ, কি ফরাসী, কি জর্ম্মা-
...ণ, কি পঞ্জাববাসী—সকলেই বিজয়া বটিকার ভক্ত। বিশেষতঃ ইংরেজ-
...বিজয়া বটিকা পরম প্রিয় বস্তু! বহু ইংরেজ-পুরুষ এবং ইংরেজ-মহিলা
...বিজয়া বটিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া আছেন। এমন লোক-হিতকর ঔষধ সংসারে
...আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

...বিজয়া বটিকার এক মাহাত্ম্য গুণ এই যে, ইহা সকল ঋতুতেও সেবনীয়।
...সুতরাং, যাহার অভ্যাসের ঈষৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে, যাঁহার চক্ষু জ্বালা, হাত পা জ্বালা
...করিতেছে, যাহার কোষ্ঠে বাধা হইয়াছে বা সময় কাটিতেছে না; যাঁহার
...ক্ষুধা হয় না, যাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, যাহার কাঁসি সর্দ্দি হইয়াছে,—এই-
...রূপ বিজয়া বটিকা সেবন আরম্ভ করিলে, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর ভুগিতে হইবে
...না। বিজয়া বটিকাদি শক্তি প্রদানই ইহার বিশেষত্ব।

...অধিকন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যিনি স্বর-প্লীহা-যকৃৎ রোগে
...ভুগিতেছেন, ডাক্তার-কবিরাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ২৪ ঘণ্টাই যাঁহার মাত্র ছয় জন আছে,—
...ডাক্তার—কবিরাজ যাঁহাকে জবাব দিয়াছেন,—এমন রোগীও বিজয়া বটিকা
...খাইয়া আরোগ্য হইতেছেন,—ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া, রোগীর
...আত্মীয়গণ মুগ্ধ হইতেছেন। বৃদ্ধগণ, বালকগণ, যুবকগণ, স্ত্রীলোক,
...অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, বাত-পুরাতন রোগে কাতর ব্যক্তিগণ, সকলেই এই ঔষধ
...সেবনে ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

বিজয়া বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	৸৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৮	১৷৵০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৸০	।০	৵০

নিম্নের নম্বর—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪	৪৷০	।০	৵০

বিজয়া বটিকা প্রাপ্তি-স্থান।

আমিয়ান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি-স্থান বেড়ুগ্রাম, পোষ্ট সাবিরুর, জেলা বর্দ্ধমান স্বর্ণবিকারী শ্রীযুক্ত জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য; অথবা—
৯নং হ্যারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা—ভারতে একমাত্র এজেন্সি—
...র, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বেগম সমরু।

শেষ।

সমরুর সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল তদীয় পত্নী বেগমের জীবনের ঘটনাগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য। সমরুর সহিত বেগমের সম্মিলন উপযুক্তই হইয়াছিল। উভয়ের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। বরঞ্চ বেগম খোদ সমরু অপেক্ষা অধিকপরিমাণে পরোক্ষদর্শিনী ছিলেন। সমরু যে সেনাদল চালন করিয়া জীবনে অসন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছিলেম, বেগম অনেকটা তাহার বিপরীতপথাবলম্বিনী হইয়া সুযশ ও সুনাম সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

বেগম কে, এ-সম্বন্ধে বড় মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি জনৈক হীনাবস্থাপন্ন মোগল রাজবংশধরের কন্যা। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি একজন অতুলরূপশালিনী নর্ত্তকী; কাশ্মীর তাঁহার জন্মস্থান;—সমরু সেই রূপ চরিতার্থ করিবার জন্য এই ঘৃণিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হন। অন্য ঘটনা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, বেগম যে সমরুর পরিণীতা পত্নী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেগম স্ত্রীলোক হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে পুরুষের দৃঢ়তা ও কার্য্যক্ষমতা ছিল। সেই ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার সময়ে, নিমকহীন সেনাদল লইয়া এক জন স্ত্রীলোক কি প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সমরু দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। পুত্রটি পিতার পরিত্যক্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষতাকার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করিলে, বেগম, সপত্নীপুত্রের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। সমরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার দলের সেনানায়কেরা বেগমকেই কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বেগম অগত্যা তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন।

বাদসাহ তখন আমীর ওমরাহদের বিদ্রোহে মহা ব্যতিব্যস্ত। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি বেগমকে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন। বেগম

নামক এক জন ফার্ম্মানের হস্তে সেনাদলের নায়কত্ব প্রদান করিয়া, হের সহায়তা করিতে লাগিলেন। *

বেগম সমরুর হৃদয়ে, দৃঢ়তা বলিয়া, একটি নূতন শক্তি নিহিত ছিল। এই তার বলেই তিনি সৈন্যদল শাসনাধীন রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে সক্ষম হন। একটি ঘটনার দ্বারাই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বাদসাহের সহায়তা করিবার জন্য বেগম তাঁহার সৈন্যদল লইয়া মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, তাঁহার আগরার বাটী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই গৃহে তাঁহার যাবদীয় সঞ্চিত অর্থ আবদ্ধ ছিল। পরে তাহারা প্রকাশ পাইল, বেগমের দুই ক্রীতদাসী, নষ্টচরিত্রা হইয়া, তাহাদের উপপতিদের পরামর্শে, সমস্ত গুপ্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবার মানসে এই প্রকারে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। বেগম ক্রীতদাসীদের মথুরায় ধরিয়া আনাইলেন, নিজেই বিচার করিতে বসিলেন। বিচারে দাসীদের দোষ প্রমাণিত হইল। দণ্ড হইল, প্রচণ্ড কশাঘাত। ক্রমাগত কশাঘাতে রমণীদ্বয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, বেগম সম্মুখস্থ দুইটি খনিত গর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিবার হুকুম দিলেন। হুকুম কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল। তাঁহার সেনাদল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারা এক দৃঢ়চিত্তা শক্তিশালিনী রমণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ঘটনার আর কিছু হউক বা না হউক, এই নিষ্ঠুরতার গৌরবে ভরবশতঃ বেগমের সেনাদল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ক্ষমতাধীন হইল। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত হইল; তাহারা নিয়মাধীন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

গাড়ীর মৃত্যুর পর বাডার, ইভান্স ও হুদেশী নামক তিন জন ইউরোপীয় যথাক্রমে বেগমের সেনানায়ক হইয়াছিলেন। অবশেষে ঐ-তেসো নামক সম্ভ্রান্তবংশজাত জনৈক শিক্ষিত ফরাসীর† হস্তে সেনাচালনের ভার ন্যস্ত হয়।

* বাদসাহের সহায়তা করিয়া, বিদ্রোহী নজফ খাঁ ও গোলাম কাদিরকে দমন করিবার জন্য ও কয়েক বার মহারাষ্ট্রীয়দের সময় বাদসাহের জীবনরক্ষা করিবার জন্য, দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বেগমকেও প্রকাশ্য দরবারে "কন্যা" সম্বোধন করিয়া খেলাত ও উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। কোনও সমসাময়িক লেখক লিখিয়াছেন,—"The Shah himself in full *Durbar* honoured her with a magnificent *khillat* and called her "*his most beloved daughter*" in addition to her various other titles. (Fraser's Mily Memoirs. P. 286. Vol. I.).

† সাহ আলম-চরিত-লেখক কর্ণেলিন সাহেব ইহাকে "আরমান" বলিয়া গিয়াছেন।

লি-ভেসোর অধীনে ছয়টি রেজিমেণ্ট সংগঠিত হইল। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা সবই নূতন। ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ, এই তিন শ্রেণীরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। বেগম তখন সার্দ্ধানায় বসবাস করিতেছিলেন। সেনাগণের কিয়দংশ সার্দ্ধানায় রহিল। অবশিষ্ট দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের সহায়তাকল্পে লি-ভেসোর কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত হইল।

ঠিক এই সময়ে আর একটি নূতন ঘটনা ঘটিল। জর্জ টমাস নামক একজন ইংরাজ জাহাজের কাপ্তেনী করিতেন। তিনি জাহাজ ছাড়িয়া বেগমের সেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। জর্জ টমাস, যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও সামরিক প্রতিভা একত্রিত হইয়া, বেগমের সৈন্যদলের মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চারিত করিল। জর্জ টমাস অতি-শীঘ্রই বেগমের সু-নজরে পড়িলেন।

দিল্লীতে বাদসাহ শাহ-আলমের মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত নজফ্-আলি খাঁ এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া নজফ্ খাঁ বাদসাকে একবারে নিহত করিবার চেষ্টা করেন। জর্জ টমাস বেগমের উপদেশে, সহসা সৈন্যদল লইয়া, বাদসাহকে সম্পূর্ণবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলেন। বাদসাহ ও বেগম উভয়েই টমাসের বীরত্বে যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন। বাদসাহ এই সময় হইতে তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বেগমকে "কন্যা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

জর্জ টমাসের ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া লি-ভেসো বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা হওয়াতে গোপনে তিনি বেগমকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বেগম সমরু, কোন অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রেগরি নামক একজন রোমান-ক্যাথলিক পাদরীর দ্বারা অতিগোপনে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ঘটনাক্রমে এই বিবাহের পর হইতে জর্জ টমাস বেগমের দল ছাড়িলেন। তাঁহার সৈনিকপ্রতিভা আবার নূতন দল সংগঠন করিল। তিনি শিখ প্রদেশসমূহে বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, পেরণ প্রভৃতি ফরাসী সৈনিকদিগের প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে তাঁহার পতন না হইলে, হয় ত রণজিৎ সিংহের পরিবর্ত্তে টমাসের শাসনই পঞ্চনদে প্রতিষ্ঠালাভ করিত। লি-ভেসো সদ্বংশজাত হইলেও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। বেগমকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গৌরব নষ্ট

হইয়াছে, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি অতি সামান্য বিষয়েও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বেগমের সেনাদলে দু চারি জন ইউরোপীয় সেনানায়ক ছিল। ইহাদের আচার ব্যবহার, চাল চলন, ভদ্রপ্রকৃতির সীমার বাহিরে ছিল। ইহাদের প্রকৃত চরিত্র যাহাই হউক না কেন, এই সকল লোক লইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে, এই ভাবিয়া বেগম সময়ে সময়ে একত্র আহারাদি করিয়া, তাহাদের সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। লি-ভেসো এ প্রথাটা আগেই বন্ধ করিয়া দিলেন। নামাবিধ সুরসাল খাদ্যভারে পীড়িত খানার টেবিলের পার্শ্বে উপবেশনের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া, রসনার অপরিতৃপ্তির জন্য যতটা না হউক, এই ঘটনার পূর্ব্ব-সম্মানহানির আশঙ্কায়, তাঁহার অধীনস্থ ইউরোপীয়েরা অবাধ্য হইয়া উঠিল। লি-গো নামক এক ফরাসী সেনাপতি, সেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অবাধ্যতার বীজ বপন করিলেন। ইহাদিগকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও বেগম যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সেনাদলের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে হইল। লি-ভেসো এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ণেল মাক্-গোয়েন, ইংরাজের তরফের সেনাধ্যক্ষ। তিনি সেনাদল লইয়া তখন কোনও কার্য্যব্যপদেশে অনুপসহরে অবস্থান করিতেছিলেন। লি-ভেসো নিজে ইংরাজি জানিতেন না। অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে ইংরাজি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তদবলম্বনেই ম্যাক্-গোয়েন (Mc. Gowen) সাহেবকে ইংরাজাধিকারে আশ্রয় লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। বেগমের সেনাদল দিল্লীর বাদসাহের সহিত সংশ্লিষ্ট; পাছে তাঁহাকে কোনও দোষের ভাগী হইতে হয়, বা বাদসাহ ইংরাজদের উপর বিরক্ত হন, এই ভাবিয়া কর্ণেল সাহেব লি-ভেসোকে ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিলেন।

সিন্ধিয়া এই সময়ে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপর একটা সাংঘাতিক আঘাত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণর স্যর জন শোর সমস্ত বিষয়ে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মেজর পামার নামক এক ইংরাজ সেনানীকে প্রেরণ করেন। লি-ভেসো অনুপসহরের ব্যাপারে ব্যর্থমনোরথ হইয়া খোদ গবর্ণর সাহেবের কাছে এ সম্বন্ধে পত্রাদি চালাইতেছিলেন। এমন সময়ে (১৭৯৫ খৃঃ) মেজর পামার সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বেগমের তখন ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সময়। সিন্ধিয়া দেখিলেন, বেগম সৈন্যদলের পরিচালনে

অনর্থ হইয়া তাহাদের উৎপাতের ভয়ে ইংরাজাধিকারে পলাইতেছেন। এ প্রকার স্থলে উপস্থিত সুযোগ পাইয়া তিনি আরও বিপরীত দিকে বাঁকিয়া বসিলেন। সিন্ধিয়া পামার সাহেবকে বলিলেন, "বেগম যদি সমগ্র সেনাদল ও নগদ বার লক্ষ টাকা দেন, তবে আমি তাহাদিগকে নিজদলভুক্ত করিয়া যাই; অন্যথা আমিই তাঁহার ইংরাজাধিকারগমনের পথে অন্তরায় উপস্থিত করিব।"

মেজর পামার সমরু বেগমকে সমস্ত কথা জানাইলেন। বেগম শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও ভগ্নমনোরথ হইলেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হইলেও বেগম সহজপ্রকৃতির ছিলেন না। সিন্ধিয়াকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাকে টাকা দেওয়া দূরে থাক্, আপনি এই সৈন্যদলগঠনের অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অন্যান্য খরচার জন্য চার লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?"

মেজর পামার মাঝে পড়িয়া শেষ একটা রফা করিয়া দিলেন। কথা স্থির হইল, "সিন্ধিয়া বেগমের পুত্রকে যাবজ্জীবন মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি দিবেন; সমস্ত সেনাদল সিন্ধিয়ার নিজের অধীনে থাকিবে; বেগম ও লি-ভেসো গোপনে ইংরাজাধিকারে পলাইবেন।"

এ দিকে হিতে বিপরীত ঘটিল। বেগমের সেনানায়কেরা ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল যখন শুনিল, তাহাদের পূর্ব্বকর্ত্রী সিন্ধিয়ার নিকট তাহাদের বিক্রয় করিয়া গোপনে পলাইবার চেষ্টায় আছেন, তখন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া বেগমপুত্রকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া লইল। লি-ভেসোর কড় ব্যবহার ইউরোপীয় অফিসারেরা তখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই সুযোগে বেগমের নিজহস্তগঠিত সেনাদলই তাঁহাদিগকে প্রথমধ্যে অবরোধ করিবার মন্ত্রণা আঁটিয়া অগ্রসর হইল।

গভীর রাত্রি; চারি দিক অন্ধকার। লি-ভেসো ও বেগম, সার্দ্ধানা ত্যাগ করিয়া গোপনে ফরাক্কাবাদের দিকে চলিলেন। বেগম পালকীতে উঠিলেন। তাঁহার হাতে একখানি শাণিত ছুরিকা। বেগম মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। উন্মত্ত বিদ্রোহী সৈন্যেরা প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার যথোচিত লাঞ্ছনা করিতে পারে, এ কথাও তিনি জানিতেন। যদি কিছু ঘটে, তাহা হইলে এই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অনেক উপকার করিবে। লি-ভেসোও এই ঘটনায় বেগমের সাহস ও আত্মসম্মানজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তিনি নিজেও একখানি তরবারি ও দুইটি পিস্তল লইয়া অশ্বারোহণ করিয়া পালকীর পাশে পাশে চলিলেন।

তাঁহারা এইরূপে মোটে দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়াছেন, এমন সময়ে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকমালা দেখা দিল, সেই নিশীথ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহা কোলাহল উঠিল। বেগমের অধীনস্থ ইউরোপীয় সেনানায়কগণ ত্বরিতপদে আসিয়া পলায়িত প্রভুদম্পতিকে ঘেরাও করিল। বেগমের পালকীর দ্বার খোলা, সেনারা তাহার উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত; এমন সময়ে লি-ভেসো দেখিলেন, বেগমের বক্ষঃস্থ শ্বেত পরিধেয়বস্ত্র লোহিত রাগরঞ্জিত হইয়াছে। লি-ভেসোর মাথার ঠিক ছিল না; ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বেগম সম্ভ্রমরক্ষার্থ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি পিস্তলের মুখ সহসা নিজের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীষণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া, সেই বিপুল দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল।

বিদ্রোহীরা লি-ভেসোর পরিণাম দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, কিছু অধিক আনন্দ উপভোগ করিত। যাহা হউক, তথাপি তাঁহার মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া চলিল। ভাগ্যক্রমে বেগমের আঘাত তত সাংঘাতিক হয় নাই; ছুরিকা কেবলমাত্র মাংসভেদ করিয়া অস্থিতে ঠেকিয়াছিল; সুতরাং তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ চেতনালোপ হয় নাই। বাহকেরা পালকী ফিরাইয়া আবার রাজধানীর চলিল।

এইবার বেগমের লাঞ্ছনার একশেষ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে একটি কামানের সম্মুখে রাখিয়া পাহারাবন্দী করিল। আহার বন্ধ, সাত দিন অনাহারে থাকিয়া, নানাবিধ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, বেগম জীবন-রক্ষার আশায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। সময়ে সময়ে সামান্য মুষ্টিমেয় আহার্য্য দ্রব্যের জন্য, ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য, তাঁহাকে এই সময়ে পরিচারিকাগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইত।

এই সময়ে জর্জ টমাস আবার দেখা দিলেন। লি-ভেসোর মৃতদেহের উপর যত দূর অমর্য্যাদা ও কাপুরুষবৎ লাঞ্ছনা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মৃতদেহের ৫।৭ দিন ধরিয়া সমাধিই হয় নাই; দেহ পচিয়া উঠিয়াছিল। টমাস লি-ভেসোর দেহের সদ্গতি করাইলেন।*

* লি-ভেসোর মৃতদেহের উপর যে যথেষ্ট কাপুরুষোচিত অত্যাচার হইয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে ইনি মৃত সেনানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, টমাস্ বীর শত্রুর প্রতি উদারতা দেখাইয়া রাজের আত্মসম্মানপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি নিজে এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

অধীনস্থ সেনারা, লি-ভেসোর সহিত বেগমের বিবাহের কথা জানিত না। জানিলে তাহারা আরও উত্তেজিত হইত। সমরুর উপর তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। সমরুর বিধবা অপরের পাণিগ্রহণ করিবে, ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিরুদ্ধ। * সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরিশেষে মৃতদেহ সমাধিস্থ হইল।

এখন এই সেনাদলের অধিনায়ক কে হইবে, এই বিষয়ে বিচার চলিল। সার্দ্ধানাহ ষ্টেটটি খরচপত্রনির্ব্বাহের জন্য দিল্লীশ্বর বেগমকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বেগমকে হত্যা করিলে, বা অনাহারে অত্যাচারে তাঁহার জীবন-বিয়োগ হইলে, পাছে বাদসাহ এই সম্পত্তি কাড়িয়া লন, এই প্রকার ভয় দেখাইয়া, জর্জ টমাস বিদ্রোহী সেনাদলকে শান্ত করিয়া, বেগমকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেলিয়র নামক এক ফরাসী, তাঁহার অধীনে সেনাদলের অধ্যক্ষতা স্বীকার করিলেন।

এবার সেলিয়রের আমলে, বেগমের পূর্ব্ব প্রতাপ আবার জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সেনাদল ১৭৯৭ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারি পল্টন হইতে ছয় পল্টনে পরিণত হইল। সেলিয়র এই সমস্ত সৈন্য সিক্রিয়ার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। ইহারা আসাই যুদ্ধেও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

এই সময়ে বেগম নিজে কামান ঢালিবার কারখানা তৈয়ার করেন। নূতন তোপখানার সহিত গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়। সেনারা নিয়মিত বেতন ও পেন্সন পর্য্যন্ত পাইতে থাকে। এই সমস্ত খরচপত্রে বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ব্যয়ই তাঁহার সার্দ্ধানার ষ্টেট হইতে নির্ব্বাহিত হইত।

বেগমের সপত্নীপুত্র, জাফর ইয়ার খাঁ কন্যার সহিত কর্ণেল ডাইসের বিবাহ দেয়। বেগম, জাফর ইয়ার, তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রীদিগের ভরণপোষণ জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে বেগম, ইংরাজ গবর্মেণ্টের রক্ষাধীনে আত্মসমর্পণ

"The villains who—the preceding day, had styled themselves his slaves, now committed every act of insult and indignity on his corpse."

* পাদরি Gregory ছাড়া, ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর Sir John Shore ও Major Palmer, এই বিবাহসম্বন্ধে অনেক ঘটনা অবগত ছিলেন। লি-ভেসো, ইঁহাদের যে পত্রাদি লেখেন, তাহাতে বিবাহসম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

করেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন।*

স্ত্রীলোক হইলে কি হয়, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পুরুষোচিত সাহস, অদ্ভুত অধ্যবসায়, তাঁহাকে সাধারণের চক্ষে অতি উচ্চসীমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে কঠোরতার সহিত রমণীর কোমল প্রবৃত্তিরও যথেষ্ট সমাবেশ ছিল। প্রথমাবস্থায় বেগম, নিতান্ত স্বার্থপর ও দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন। তাহা কেবল পদমর্য্যাদারক্ষার জন্য। রমণীর দয়াপ্রবৃত্তিরও তাঁহাতে অভাব ছিল না। সার্দ্ধানা, মীরট প্রভৃতি স্থানে গির্জ্জানির্ম্মাণের জন্য, খ্রীষ্টান বালকদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। একবার দুর্দ্দশাপন্ন অধমর্ণদিগের উদ্ধার করিতে তিনি কয়েক সহস্র টাকা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়া, বেগম ইংরাজি চাল চলন ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে বা হস্তীতে চড়িয়া কখন কখন সাধারণ্যে বাহির হইতেন। গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন। অনেক দরিদ্র, অনাথ, নিঃসহায় ব্যক্তি, অনেক অন্ধ, পঙ্গু, পথভ্রষ্ট, বেগমের প্রচুর দয়ার জন্য আজীবন তাঁহার মঙ্গলকামনা করিত।

ভারতের তদানীন্তন লাটসাহেব বেগম সমরুকে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

---

* বেগম প্রথম প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধে যদিও সিন্ধিয়ার সহায়তা করিয়াছিলেন, পরে বিশেষ বুঝিয়া সুঝিয়া ইংরাজের দিকে ঢলিয়া পড়েন। মারহাট্টা যুদ্ধে ইংরাজের ক্ষমতা ও বাহুবলের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী যে ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। দিল্লীর যুদ্ধের পর বেগম নিজের সেনাবল ইংরাজের কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য, তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত লর্ড লেককে (Lord Lake) পত্র লিখিয়াছিলেন। তার পর লর্ড লেক যখন যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীতে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তখন বেগম নিজে পাল্কী করিয়া গিয়া সেনাপতির সহিত দেখা করেন। এই সময়ে একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল,—সেটির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেগম দলবল লইয়া যখন শিবিরের অভ্যর্থনাগৃহে (Reception-room) উপস্থিত হইলেন, লর্ড লেক তাঁহার সহানুভূতিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লেক সাহেব যুদ্ধজয়োৎফুল্ল হইয়া একটু অতিরিক্ত মদিরা পান করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রকাশ্য জনতার সম্মুখে বেগমকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। বেগমের সহচরবর্গ এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইলে, প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম সহসা বলিয়া উঠেন, "তোমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না। তোমরা ত জান, আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। ইনি আমাদের পাদরীশ্রেণীভুক্ত। পাদরীরা এই প্রকারে তাঁহাদের অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন।" (Fraser's Memoir, Page 293.)

To Her Highness the Begum Sumroo—

My esteemed friend,

I cannot leave India without expressing the sincere esteem for your Highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands have excited in my mind sentiments of warmest admiration and I may trust that you may be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, the sure source of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England and my prayers and best wishes attend you, and all others who like you exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain
With much consideration
Your sincere friend
Sd. M. W. Bentinck.
Calcutta, March 17th, 1835.

এই পত্রই বেগম সমরুর চিত্রে তীব্র জ্যোতি ঢালিয়া দিয়াছে। ইংরাজ ইতিহাসকারেরা কি জন্য জানি না—বেগমকে ইতিহাসে স্থান দান করেন নাই;—কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেগমের উত্তরাধিকারীরা আজও সার্দ্ধানায় বর্ত্তমান।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথ যেমন অলক্ষ্যে আসিয়াছিল, তেমন অলক্ষ্যে ফিরিতে পারিল না। উপরগস্তিরা নিশিদিন ছদ্মবেশে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; ডাকাইতির প্রধান সম্বল যে দ্রুতযান রন্‌পা, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। বিশ্বনাথ আসিবার সময় বাঁকা পথে আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় অপেক্ষাকৃত সোজা পথে গেল। আর কেহ হয় ত এটি করিত না, কিন্তু বিপদজালে বেষ্টিত হইলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্য সাহস এবং পৌরুষ তাহাকে ত্যাগ করে নাই। নিজের গন্তব্য স্থান যখন দুই ক্রোশমাত্র ব্যবধান, নিশা প্রায় শেষ হইয়া

আসিয়াছে, তখন বিশ্বনাথের বিদ্যুৎগতি বৃক্ষমূলে আসীন এক জন উপরগস্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবিলম্বে সে তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহা হইলেও চর এই ঘটনায় বুঝিয়া লইল, বিশ্বনাথের অজ্ঞাত বাসগৃহ দূরবর্ত্তী নহে। এইরূপে বিশ্বনাথ নিজের শেষ দিন কতকটা স্বেচ্ছায় সংক্ষেপ করিয়া আনিল।

বিশ্বনাথকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার মিলিবে, উপরগস্তিটা সুতরাং কাহারও কাছে কিছু ভাঙ্গিল না। পর দিন সোজা পথে অগ্রসর হইয়া সে কুলিয়ার মাঠের চারি দিকে ঘুরিল। দেখিল, প্রকাণ্ড মাঠ, আশে পাশে ধান্যক্ষেত্র আছে বটে, কিন্তু মাঝের অনেকখানি স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মে পরিপূর্ণ। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে দুই দিন বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিল, অন্য দিকে দুই চারি ক্রোশের ভিতর লুকাইয়া থাকিবার মত বন জঙ্গল কিছু নাই। অতএব তাহার নিশ্চিত ধারণা হইল, অন্ততঃ বিশ্বনাথ বা তাহার দলের কেহ সে রাত্রে কুলিয়ার মাঠে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই সূত্র ধরিয়া চর নানা বেশে এবং নানা প্রয়োজনের ছলনায় দিনের পর দিন কুলিয়ার মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণ্টকবনে একাকী প্রবেশ করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে সাহস হইতেছিল না, অথচ গোল করিলে পুরস্কারের অর্দ্ধে ভাগ বসিবে। এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া লোকটা কুলিয়া গ্রামের দু একটা দুষ্টগোছের রাখালকে কিছু পয়সা কবুল করিল। তখন বনফুলের সময়, মাঝ বনের ভিতর হইতে যদি কিছু ফুল তাহারা আনিতে পারে। রাখালেরা একবাক্যে সে ভূতের জায়গায় যাইতে অস্বীকার করিল। একজন বলিল, না জানিয়া ইহার ভিতর সে এক দিন বনের ধারে দুপুর বেলায় গাই চরাইতে গিয়াছিল। কোথা হইতে একরাশ চিল আসিয়া তাহার পিঠে পড়িল। আর সে বনের মাথার উপর স্পষ্ট ধূম রেখাও দেখিতে পাইয়াছিল।

উপরগস্তি অতঃপর সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিল। নিজে যাহা দেখিয়াছিল, এবং যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, ব্লাকুয়ার সাহেবের প্রশ্নমতে তাহা বিবৃত করিল। কৃতনিশ্চয় না হইলেও, সাহেবেরা সদলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সহসা এক দিন অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য কর্ত্তনরত কৃষকদিগকে বিস্মিত করিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্লাকুয়ার ও কেডি সঙ্গে শীকারে চলিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইলিয়ট্ সাহেব মীরা এবং সরলাকে বিস্মৃত হন নাই। ভগবানকে বন্দী করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে ফিরিবার সময়, বারম্বার তাহাদের কথা তাঁহার মনে হইতেছিল। তেমন সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদের রক্ষক এবং অভিভাবক এই ভগবান মদক—এ লোকটা কি তবে সত্য সত্যই দস্যুদলে সংসৃষ্ট? বিশেষতঃ তাহার সহচরটি ব্রাহ্মণ, উপবীতধারী ক্ষীণজীবী ভিক্ষুকবেশী,—এ লোকটাও তবে বিশ্বনাথের দলভুক্ত? ঘোর সন্দেহে ইলিয়ট সাহেবের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি ফেডিকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছিলেন। ফেডি হেলিবার পাত্র নহেন। তাঁহার সেই একই উত্তর—বিশ্বনাথের আড্ডায় ইহাদিগকেই তিনি গান করিতে শুনিয়াছিলেন!

ভগবান এবং বিনোদ হাজতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইলিয়ট্ সাহেবের ব্যবস্থায় তাঁহারা অন্যান্য ডাকাইত আসামীদের দল হইতে পৃথক রহিলেন, এবং তাহাদের মত হস্তপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন না। দিগ্‌নগর অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা ভগবানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন শুনিয়াও, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। অতএব মীরা যে রাত্রে সরলাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছিল, সেই রাত্রে, প্রায় একই সময়ে, ইলিয়ট্ অকস্মাৎ হাজতগৃহ পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন।

সাহেব ভগবানের কাছে গেলেন। বিনোদ প্রহরীদিগকে সহসা সসম্ভ্রমে কারাগারের দ্বার অর্গলমুক্ত করিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। ভগবান ঝুলিহস্তে হরিনাম করিতেছিল, বাহিরের কিছুতে তাহার মন ছিল না; সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল না; জমাদার সরকরাজি দেখাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিল, সাহেবের কাছে ধমক খাইয়া হটিয়া গেল। প্রহরীরা কেহ সেখানে থাকিতে পাইল না।

সাহেব বিনোদের কাছে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি যদি সব সত্য বল, তোমার পক্ষে ভাল হইতে পারে।" বিনোদ করযোড়ে উত্তর করিলেন যে, ডাকাতির ভাল মন্দ কিছুই তিনি জানেন না,—এবং তখন সেই পারঘাটায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি হোড়ঙ্গের বনপ্রান্তে গ্রেফতারি পর্য্যন্ত, প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা অকপটে বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া বলিয়া গেলেন। ঈশ্বর সাক্ষী শপথ করিয়া, দুই হস্তে উপবীত জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিনোদবিহারী ইলিয়ট সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্মুখে আপনার ভাল মন্দ

কাহিনী শেষ করিলেন। তাহাতে সাহেব অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ দেখিতে ছিলেন না। জপ সাঙ্গ করিয়া ভগবানও এই সময়ে সাহেবকে সেলাম করিল।

সাহেবের প্রশ্নমতে ভগবান নিজের অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু বিশ্বনাথের অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কথা একটিও বলিল না। ইলিয়ট জেরা করিলে বলিল,—"গলা কেটে দিলেও সাহেব, আসা হতে তা হবে না। যার নুন খেয়েছি, আমরণ তার গুণই গাব।" বিশ্বনাথের উপস্থিত বাসস্থানের কথা সুধাইলে ভগবান বলিল,—"সত্য সত্য তার কিছুই জানি নে। ইচ্ছা করলে জান্‌তে পারতাম, কিন্তু মিছে বল্‌তে হবে এই ভয়ে ইচ্ছে করেই জানিনে। জান্‌লেও বল্‌তাম না সাহেব।"

ভগবান বিনোদকে সম্পূর্ণ নির্দোষী জানাইয়া প্রার্থনা করিল, তদ্দণ্ডে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্। সাহেবের দয়া উদ্রিক্ত করিবার আশায় এই প্রথম ভগবান তাহাকে সরলার স্বামী বলিয়া পরিচিত করিল। ইলিয়ট্ হাজতগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু সে-রাত্রে তাঁর ভাল নিদ্রা হইল না; অতি প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * *

এ দিকে শেষ নিশায় বিশ্বনাথকে বিদায় দিয়া মীরা এবং সরলা স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু সেই চারি দণ্ড চারি যুগ বলিয়া তাহাদের মনে হইতেছিল। স্বামীকে বাঁচাইবার ভরসায় সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও, পীতাম্বরের আপত্তির কথা হৃদয়ে তাহার কেমন একটা খট্‌কার সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামীর প্রাণরক্ষা নিশ্চিত না হউক, চিঠি দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডাকিয়া আনিলে, হিতে বিপরীত ঘটা অনেকটা নিশ্চিত। কেন সে আপনার স্বার্থের জন্য মীরাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দিবে? যে পিতৃতুল্য বিক্রমসিংহ হতভাগিনীকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়াই অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, জানিয়া শুনিয়া সরলা কি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে দিবে? না, পীতাম্বরের চিঠি লইয়া গিয়া কাজ নাই। মীরা বা পীতাম্বরের ইহাতে আর আদৌ লিপ্ত থাকারই দরকার নাই। বদন এবং আয়ি বুড়ি সম্প্রতি সরলাকে দেখিতে আসিয়াছিল। সরলা চিত্ত স্থির করিল যে, তাহাদের দুজনকে সঙ্গে করিয়া দুঃখিনীর বেশে সে মাজিষ্টর-সাহেব কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিবে। প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, চিরজীবনের তরে স্বামীকে একবার প্রণাম করিয়া আসিবে! একবার

করযোড়ে তাঁহাকে বলিয়া আসিবে, প্রত্যাখ্যান-নিশিতে বালিকার সে প্রগল্‌ভতা তিনি মার্জ্জনা করুন। মীরা বলিয়াছিল, "সতীলক্ষ্মীর তিনি অপমান করেছিলেন, বিধাতার মনে কি আছে, কে জানে?" শুনিয়া অবধি সে কথা সরলার প্রাণে বাজিতেছিল। চিরদুঃখিনী সরলা ভাবিতেছিল, স্বামীর হাত ধরিয়া বলিয়া আসিবে যে, সে কখনও তাঁর মন্দ কামনা করে নাই।

* * *

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইলিয়ট সাহেব স্বরূপগঞ্জে আসিলেন। বিশ্বনাথের সে আড্ডাগৃহ জনমানবশূন্য, কয় দিনের ভিতর পড়ো বাড়ীর মত দেখাইতেছিল। বিষণ্ণমনে সাহেব গ্রামাভিমুখে চলিলেন। পীতাম্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুরোধে নদীর দিকে যাইতেছিল। মাজিষ্ট্রেটকে চিনিত, দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় প্রমাদ গণিল। সাহেব ভদ্রলোক দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতে পারেন, যে দুইটি ভদ্রলোকের মেয়ে এবার এখানে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁরা এখানে এখন আছেন কি না?"

পীতাম্বর সাহেবকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিল। সেখানে মীরা এবং সরলার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইল, আমরা তাহা সবিস্তারে বলিব না। ইলিয়ট ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের কাছে বিশ্বনাথের প্রসঙ্গ করিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন—এবার তাহার দিক্ দিয়াও গেলেন না। ভগবান এবং বিনোদের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—মীরা এবং সরলার বাক্যে সন্দেহমাত্র রহিল না। সরলা প্রাণের দায়ে এবার লজ্জা ত্যাগ করিল। এবারে আর দিদির উপর নির্ভর করিল না;—কেন না, মীরাকে তাহার বিপদে সংস্পর্শশূন্য রাখাই বালিকার অভিপ্রেত।

মীরা আপনা হইতে বিনোদের কথা তুলিল। না তুলিলে সরলা স্বামীর জন্য কিছু বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। যুক্তকরে সরলা কেবল নতমুখে অশ্রুমোচন করিতেছিল। সাধ্বীর সেই নির্ব্বাক প্রার্থনায় নিষ্ঠুর স্বামীর প্রত্যাখ্যানবার্ত্তা ইলিয়টের হৃদয় মথিত করিতেছিল। সেই কথা শুনিয়াই গত রাত্রে তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সাহেব রুমালে চক্ষু মুছিলেন। উভয়কে অভিবাদন করিয়া অভয় দিয়া গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নদীয়া জেলায় সুবিস্তৃত মাঠের অভাব নাই, এবং বন জঙ্গলও যথেষ্ট। বিশ্বনাথ পুরাতন আড্ডাগুলি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে যে বাসগৃহ ইদানীং

নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মেঘা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহচরের মতে তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। দস্যুদলের অনেকে পূজার সময় সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছিল; দলপতির দুর্দ্দিনে, তাহার অজ্ঞাতবাসের অবসরে, সকলেই যে অর্থলোভ সম্বরণ করিবে, কে বলিতে পারে? অন্যান্য স্থানের চেয়ে কুলিয়ার মাঠের আকর্ষণ এই যে, ইহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জঙ্গল অধিকাংশ স্থলে কণ্টকবৃক্ষখচিত, শত্রু আসিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে, অথবা সহসা আক্রমণ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। এই বনের মধ্যস্থানে মাটীর নীচে বাসস্থান উঠাইয়া বিশ্বনাথ নীলকুঠী লুঠের পর হইতে লুক্কায়িত ছিল। সঙ্গী সবে পাঁচ ছয় জন মাত্র। ছায়ার মত তাহারা দলপতির সঙ্গে মিলিয়াছিল। মেঘা ইহার ভিতর একজন। আত্মরক্ষায় বিশ্বনাথের চিরদিনই ঔদাসীন্য—মেঘার কথাই সে একটু শুনিত। সে দিন স্বরূপগঞ্জে যাওয়ার আগে মেঘার সঙ্গে তাহার খুব বচসা হইয়াছিল।

চর সাহেবদিগকে এই কুলিয়ার মাঠের অদূরে আনিয়া উপস্থিত করিল। দূরবীণযোগে দূর হইতে বন লক্ষ্য করিতে করিতে ব্লাকুয়ার ইলিয়টকে বলিলেন, "শীকারের খবর বুঝি মিছা হয়!" তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সামুয়েল ফেডি চরটাকে "শূয়ারকি বাচ্ছা" প্রভৃতি মধুর নামে অভিহিত করিলেন। চর একাকী পুরস্কার ভোগ করিবার দুরাশা করিয়া দলের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিল, অতএব সাহেবের এই গালির পর তাহাদের তরফ হইতে একচোট বিদ্রূপবাণও সহ্য করিল। তখন সে "মরিয়া" হইয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্লাকুয়ার ইতিপূর্ব্বেই বাঁকা পথে মাঠের চারি দিকে সিপাহী রওনা করিয়াছিলেন। চর বনের ভিতর গেল দেখিয়া, তিনি উপরগন্তিদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। সেলারদের সঙ্গে সশস্ত্র হইয়া সাহেব তিন জন ধান্যক্ষেত্রে লুক্কায়িত হইলেন। অনুসন্ধানের কিছুই আর বাকী রহিল না।

ও দিকে চর অতি সন্তর্পণে ঝোপের অন্তরালে অন্তরালে গুড়ি মারিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অলক্ষ্যে অগ্রসর হইল। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে, গুপর্ণবৃক্ষচ্ছায়ার নীচে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বিশ্বনাথ তখন সদলে আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া অণুমাত্র দেরি না করিয়া সে ঋষিবৎ সাবধানে ফিরিয়া আসিল।

শুইয়া বসিয়া নিঃশব্দে যাতায়াত করিতে চরটার অনেক সময় লাগিয়া-

ছিল। ততক্ষণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সিপাহী এবং উপবর্গস্তিরা বনের চারি দিক ঘিরিয়া ফেলিল। সাহেবেরাও অসহিষ্ণু হইয়া প্রান্তক্ষেত্রের অন্তরাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব চর ফিরিয়া সংবাদ দিবামাত্র বেগে তাঁহারা সেই কণ্টকবনে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনাথের অস্ত্রশস্ত্র মাটীর নীচে ক্ষুদ্র অস্ত্রাগারে রক্ষিত ছিল—আহারের স্থানে খানকতক লাঠি ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেবল মুসলমান মেঘা পার্শ্বে তরবারি রাখিয়া অদূরে একাকী ভোজনে বসিতেছিল। বিপদ বুঝিতে পারিয়া সে বিশ্বনাথকে আপন অসি সমর্পণ করিতে গেল। বলিল, "বিশু, শেষ দিন একবার তরওয়াল ধর্। তোর মুখ চেয়ে ছয় জন আমরা এখনও ছয় শ'।" দলপতি তাহা গ্রহণ করিল না। স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আর বাঁচার চেষ্টা বৃথা! মা কালী অপ্রসন্ন না হলে আজ ইঁদুরের মত কলে পড়তাম না। স্বপ্নে ক'দিন তাঁর ভ্রূকুটিই দেখ্‌চি! তোদের যা ইচ্ছে হয় কর, আমি বাঁচবার জন্য একটি আঙুলও আর তুলব না।" মেঘা গর্জ্জিয়া উঠিল। "চিরদিন তোকে মাথার মণি ভেবেচি, আজ আর কি বল্‌ব বল্। নিজের দোষে মরলি। নিজে লাঠি তরওয়াল না ধরিস্, আমার একবার হুকুম দে বিশু!" বিশ্বনাথ সমাগত সাহেবদের ভিতর কেডি সাহেবকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল,—মেঘার কথার উত্তর দিল না। হতাশ্বাস হইয়া মেঘা বলিল, "তবে তুই ধরা দিবি দে, আমি কিন্তু কাফেরের হাতে মরব না।" তখন মেঘা দৃঢ়হস্তে চিরজীবনের সঙ্গী সেই তীক্ষ্ণধার অসিফলক আমূল আপনার বুকে বসাইয়া দিল।

মেঘাকে কেডি সাহেবের খুব মনে ছিল; স্বহস্তে তাহার মাথাটা শরীরচ্যুত করিতে পারিলে, তবে তাঁর রাগ যাইত। বেগে তিনি তাহার বিমুক্তপ্রাণ ভূপতিত দেহের দিকে ছুটিয়া গেলেন। বিশ্বনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "হাঁ, ঐ মরা মানুষকে যা কতক লাথি মারতে না পারলে তুমি ঠিক হতে পারচ না! মনে পড়ে ফিরিঙ্গি, ওই সেই তরওয়াল খানা? মনে পড়ে সেই কসম, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের যে ঈশ্বর, তিনি সাক্ষী, তুমি আমাদের কোন মন্দ করবে না? ছি, ছি, সাহেব, ইংরেজ জেতের তুমি মুখ হাসালে?" সামুয়েল কেডি এই শ্লেষবাক্যে মাটী হইয়া গেলেন, নতমুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—আর অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া ইলিয়ট ও ব্লাকুয়ার বিস্মিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। দেখিয়া নির্ভীক বিশ্বনাথ উচ্চহাস্য করিল। দৃঢ় উচ্চ হাস্য,—ঘৃণা বিদ্রূপ একত্র মিশিয়া তাহার প্রত্যেক তরঙ্গে প্রহৃত

হইতেছিল। বিশ্বনাথ কহিল, "বুঝেছি, নিজের বীরত্বের কথা তোমাদের বল্‌তে ফেডি সাহেবের সাহসে কুলোয় নি। শপথ করে আমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে আজ আমাদেরই ধরিয়ে দিতে এসেছেন! কেমন ফেডি সাহেব, মিথ্যা বল্‌চি কি?"

ফেডি চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "কি ছার এ প্রাণ ফিরিঙ্গি, বিশে পরশু মর্‌তো, না হয় কাল মরবে! বিশে ডাকাত কিন্তু ডাকাতি করে কখন নিজের পেট পুরোয় নি, কখন তোমার মত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নি!"

তখন বিশ্বনাথ ইলিবট সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। বলিল, "আমার আয়ু শেষ হয়েচে। যে কোন শাস্তির জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।"

পরিশিষ্ট।

তার পর ইংরেজের বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার সহচরদের ফাঁসি হইয়াছিল। ঠগ্‌বগের খালের মাঠে যে বট গাছে ইহা সম্পাদিত হয়, আজও তাহা শ্রান্ত পথিকদের সুশীতল ছায়া দান করিতেছে। ইণ্টার সাহেব বলেন, দস্যুদের মৃতদেহ লোহার পিঞ্জরে পুরিয়া এই গাছে লটকাইয়া দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য,—দেখিয়া কুকর্ম্মীদের চৈতন্য হইবে। জনশ্রুতি বলিতেছে, "বিশ্বনাথ ফাঁসির আগে বলে, 'গোয়ালাকে কেউ কখন বিশ্বাস করো না ভাই!' তার মা সাহেবের কাছে ছেলের মৃত্যুর পর হাড়গুলি চাহিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। সাহেবেরা বাক্সবন্দী করিয়া সেগুলি স্থানান্তরিত করেন। মা নাকি বলিয়াছিল যে, হাড় পাইলে বিশুকে সে আবার বাঁচাইতে পারিবে।"*

ইলিয়ট সাহেবের কৃপায় বিনোদবিহারী বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। প্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া, শেষজীবন তিনি সুখ শান্তিতে যাপন করেন। সরলার মধুর চরিত্রগুণে তাঁহার তেমন অশান্তির সংসারও অতঃপর সুখের হইয়াছিল। মীরাকে সরলা জীবনে কখন ভুলে নাই। গঙ্গা-স্নানোপলক্ষে প্রতি বৎসর সরলা তাহার কাছে মাস খানেক কাটাইত।

শ্রীশশিচন্দ্র মজুমদার।

সম্পূর্ণ।

* বালক; ৫১৩ পৃষ্ঠা, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা, ১২৯২।

ভট্টনারায়ণের বংশাবলী।

"বেণীসংহার" নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণের নাম কে না জানেন? কি কাব্যকলায়, কি রচনাপারিপাট্যে, কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি বিবিধ রসের অবতারণায়, সকল বিষয়েই এই নাটকখানি সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। ইহা বাঙ্গালীরও গৌরব; কারণ, প্রবাদ এই যে, নাটককার বঙ্গাধিপতির আশ্রিত ছিলেন, এবং নাটকখানি বঙ্গদেশেই রচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নাটককার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা নাটকখানির কোনও সমালোচনা করিব না; কারণ, ইহার সমালোচনা অনেক হইয়াছে। অথচ নাটককারের আবির্ভাব-কাল বা তাঁহার বংশাবলী নিরূপণ করিতে কাহারও আগ্রহ দেখি নাই। যাঁহারা প্রয়াস করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল ভ্রমসঙ্কুল হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সকল হইবে, আমাদের এরূপ অভিমান নাই। তবে, আলোচনাই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায়, সেই জন্য আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এরূপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তাহার কারণ, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এসময়কার প্রামাণিক কোনও ইতিহাস নাই। সুতরাং জনপ্রবাদ, তাম্রশাসন বা সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থে উল্লেখাদি, এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথের ক্ষীণ আলোক;—সুতরাং পদে পদে পদস্খলন হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, গৌড়ের প্রথম নৃপতি আদিশূর পুত্রার্থে পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না থাকায়, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইয়াছিল। ইহারা নিপুণ পণ্ডিত, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে কুশল, এবং পরম কুলীন ছিলেন। রাজা ইহাঁদের বাসার্থ ব্রহ্মত্র ভূমি দিয়া বঙ্গদেশেই বাস করান। সেই অবধি ইহাদের বাঙ্গালায় বাস, এবং বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণের ইহাঁরাই আদিপুরুষ। ইহাঁদের সঙ্গে যে ভৃত্যগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কুলীন কায়স্থের আদিপুরুষ। এই পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ।

এখন, ইহা প্রবাদমাত্র। ইহা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কুলাচার্য্যগণের বচনমাত্র প্রমাণ। দুঃখের বিষয়, সকল সময়ে কুলাচার্য্যগণের বচন আবার সত্যের অবিরোধী নহে। সুতরাং সর্ব্বত্র কুলাচার্য্যের বচন প্রমাণ নহে। এই আদিশূরের আবির্ভাবকাল লইয়াও প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদের মধ্যে অনেক বিবাদ দেখিতে পাই। সে মতসমুদ্রের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত প্রামাণিক এবং খুব সম্ভব সত্য, এরূপ আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত আদিশূরের রাজত্বকালের সময় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমরা এ বিষয়ের বিচার করিব।

সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রসঙ্গক্রমে এ কথার আলোচনা করিয়াছি। হলায়ুধের জীবনীসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জানিতে পারি, হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের বংশধর। হলায়ুধ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছি। * পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, যে হলায়ুধ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। পণ্ডিত মুকুন্দরাম বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বেণীসংহারের সংস্করণে হলায়ুধকে ষোড়শ পুরুষ করিয়াছেন। আই, সি, বসু কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঠাকুরবংশীয় তালিকাতেও এইরূপ করা হইয়াছে। এই তালিকা আমরা দেখি নাই। তবে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যে সকল কারণে উহা ভ্রমাত্মক স্থির করিয়াছি, তাহা রিবিউ পত্রে সবিস্তারে বিবৃত আছে বলিয়া, এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। সম্প্রতি হলায়ুধের গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাস্পদ স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পাদিত একখানি "কবিরহস্য" প্রাপ্ত হই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর, এ পুস্তক নয়নগোচর হইয়াছিল; নচেৎ হলায়ুধের জীবনীর আলোচনাকালে এ পুস্তকের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতাম। কবিরহস্যের ভূমিকায় সম্পাদক এক বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকার অদ্ভুত বিবরণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল, তাহা স্বয়ং সম্পাদকই বলিতে পারেন। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের কোনি প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ এরূপ ভ্রমাত্মক বংশতালিকা আমরা অধিক দেখি নাই। আমাদের সংগৃহীত বংশতালিকা

* Calcutta Review; July, 1895.

হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং আমাদের মতস্থাপন করিতে হইলে উহার আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের বংশতালিকা প্রথমে প্রদত্ত হইল।

১।	ভট্টরামেশ্বর—	৯৪১ খৃঃ
২।	ভট্টনারায়ণ	৯৬১ "
৩।	ভট্টরামকৃষ্ণ	৯৮১ "
৪।	ভট্টকমলাকর	১০০১ "
৫।	মহেশ্বর	১০২১ "
৬।	ধনঞ্জয়	১০৪১ "
৭।	হলায়ুধ	১০৬১ "

এই বংশতালিকা ইহাঁদের স্বরচিত গ্রন্থশেষে নিবিষ্ট বংশাবলীপরিচয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে ৯৮৬ খৃঃ সম্পাদিত হয়। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জে গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আর বেণী-সংহারের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিবার সময় তাঁহার অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অন্যায় নহে। এ কারণে আমরা তাঁহার জন্মকাল ৯৬১ খৃঃ স্থির করিয়াছি। তাহার পর বাল্যবিবাহের সমাজে গড়ে ২০ বৎসর পরে প্রত্যেক পুরুষের জন্মকাল স্থির করা অসঙ্গত নহে।

এখন নিম্নে স্যার গৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রদত্ত তালিকা আলোচিত হইতেছে। তিনি একটি ধারাবাহিক তালিকা না দিয়া আরও গোল বাধাইয়াছেন। তিনি হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ বলিয়াছেন। তজ্জন্য কোনও প্রমাণপ্রয়োগ বা অনুক্রমিক কোন তালিকা প্রদান অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন। তবে, তাঁহার ভূমিকা হইতে নিম্নলিখিত প্রকার অসম্পূর্ণ তালিকা গঠিত হইতে পারে:—

১। ভট্টনারায়ণ।
(মধ্যের পুরুষের কোন উল্লেখ নাই)
|
ধরণীধর—বনমালী
|
(কোন উল্লেখ নাই)
|
ধনঞ্জয় (নিঘণ্টু প্রণেতা)
|
গণপতি—হলায়ুধ—ঈশান।

উপরের প্রদত্ত তালিকার কেবল হলায়ুধ পর্য্যন্ত আপাততঃ আলোচিত হইবে। স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের তালিকা সম্বন্ধে পাঠকেরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন; কারণ সেই গুলিতেই তাঁহার ভ্রম সম্যক লক্ষিত হইবে। সে বিষয়গুলি এই;—

১। তিনি হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (অথচ হলায়ুধের পিতামহের নামোল্লেখ ব্যতীত মধ্যেকার পুরুষগুলির নামোল্লেখ মাত্র করেন নাই।)

২। তিনি হলায়ুধকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (অথচ আদিশূরের বা ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবসময়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই)

৩। তিনি বনমালীকে ধরণীধরের ভ্রাতা এবং "দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণরহস্য" নামক গ্রন্থের রচয়িতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিগর্ত্তাধিপতি জয়চন্দ্রের (জয়স্তচন্দ্র?) অনুরোধে লিখিত হয়।

৪। তিনি ধনঞ্জয়কে ধরণীধরের পৌত্র, নিঘণ্টু গ্রন্থকর্ত্তা এবং বল্লাল সেনের ধর্ম্মাধিকার স্থির করিয়াছেন।

আমরা দেখাইব, তাঁহার উক্ত মতের অধিকাংশই ভ্রমাত্মক।

প্রথমে, আমাদের সময়নির্দ্ধারণের প্রণালী বিবৃত করি। ১ম—যাঁহাদের জীবনী আলোচিত হইবে, যদি তাঁহাদের বা তাঁহাদের বংশধরগণের লিখিত কোন বংশবিবরণ থাকে, আমরা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিব না। ২য়—যদি কোন রাজার আজ্ঞায় তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সভাপণ্ডিত বা কবির লিখিত রাজার বা রাজার সমসাময়িক লোকদিগের ইতিহাস বা সময় নির্দ্ধারিত পাই, উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। এই জন্যই তাম্রশাসন বা প্রস্তরফলকে লিখিত কথা ইতিহাসের প্রমাণ। ৩য়—সমসাময়িক লেখকের উক্তি সময়নির্দ্ধারণে আমাদের তৃতীয় প্রমাণ। এমন হইতে পারে যে, এক বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মত পরস্পর-বিরোধী। এরূপ স্থলে যিনি সমসাময়িক, তাঁহার লেখা মত সত্য হইবার সম্ভাবনা; পরবর্ত্তী গ্রন্থকের তত নহে; এজন্য সমসাময়িক লেখকের প্রমাণ অগ্রে গ্রহণ করিব। ৪র্থ—জনপ্রবাদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, যখন দেখিব, পরবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রন্থকে একই প্রবাদের উল্লেখ করিতেছেন, তখন সে প্রবাদের অবিরোধী

অংশ অন্য কোন প্রমাণাভাবে গ্রহণ করিব। এখন, এই আলোচনাপ্রণালীর দ্বারা স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের তালিকার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

১। ভট্টনারায়ণ হইতে হলায়ুধ যে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ হইতে পারেন না, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুপূর্ব্বে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন; আমরাও ভিন্ন কারণে রিবিউ পত্রিকায় এই মতের সমর্থন করিয়াছি। স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের নিজের সিদ্ধান্তে ইহার ভ্রম পরে প্রমাণিত হইবে।

২। স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় মত প্রথম মতের বিরোধী। প্রথম মতে হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষ। অথচ দ্বিতীয় মতে তিনি হলায়ুধকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক স্থির করিয়াছেন। এখন, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের সময়, বহু বিচারের পর, মিত্র মহোদয় ৯৮৬ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। আর, হলায়ুধ তাঁহার "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থের উপক্রমণিকায় আপনাকে লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এতদধিক প্রমাণ আর নাই। এখন মিত্র মহাশয় অনেক গবেষণার পর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১১০৬) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল অনুমান করেন। যখন তাঁহার নির্দ্ধারিত আদিশূরের সময় যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন তন্নির্দ্ধারিত লক্ষ্মণসেনের সময় গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। ইহাতে হলায়ুধ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক, হলায়ুধের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তাঁহার ও আমাদের মতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

কিন্তু ইহাতে অন্য এক আপত্তি আসিতেছে। হলায়ুধকে তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ স্থির করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের ইহা বোধ হয় নিজের মত নহে—তিনি পণ্ডিত মুকুন্দরাম বিদ্যাবাগীশের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বহুপূর্ব্বে সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের নিজের কথায়ও ইহা খণ্ডিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি আদিশূরকে "আসীৎ পুরাস্মিন্ গৌড়দেশে" বলিয়াছেন। এই "পুরা" কালের মধ্যে মান্ধাতার রাজ্যলাভ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যু পর্য্যন্ত অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে। সুতরাং এরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিলে ইহা প্রত্নতত্ত্বের বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। নচেৎ এই "পুরাকাল" অর্থাৎ ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবকাল (কারণ তিনি আদিশূরের সমসাময়িক) যদি দশম শতাব্দীর শেষভাগে স্থির

হয়, এবং শৌরীন্দ্রবাবুর কথামত যদি হলায়ুধ একাদশ শতাব্দীর লোকই হন, তবে এই কলিযুগের পাপে স্বল্পায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও এক শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ পুরুষের আবির্ভাবকাল কেহই স্থির করিতে পারেন না।

৩। শৌরীন্দ্রবাবু ধরণীধরকে "বৈয়াকরণসর্ব্বস্বের" গ্রন্থকার ও মনুসংহিতার "অতীবসুবোধিনী" টীকার রচয়িতা স্থির করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই "অতীবসুবোধিনী" টীকা সম্বন্ধে আমাদের কোনও বোধ নাই। মনুসংহিতার যতগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকারের নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে ধরণীধরের কুত্রাপি উল্লেখ দেখি নাই। অমিরা রাজেন্দ্রলাল, উইবার (Weber), মিউওর (Müir), মোক্ষমূলর, কোলব্রুক ও উইলসন্,—এতগুলি মহামহোপাধ্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকে ধরণীধরের নামের উল্লেখ কোথাও পাইলাম না;—বিশেষতঃ, অধ্যাপক উইবারের History of Indian Literature বা মিউর সাহেবের Sanskrit Text গ্রন্থেও ইহাঁর নাম নাই। সম্প্রতি আমাদের আফ্রেক্ট সাহেবের অমূল্য তালিকা দেখিবার সুবিধা নাই, নচেৎ ইহাতেও অন্বেষণ করিয়া দেখিতাম। সুতরাং কবিবহস্যের সংস্কৃত ভূমিকায় শৌরীন্দ্রবাবু ধরণীধরকে বিদ্যাধারী আখ্যা দিয়া, যাঁহাকে ঠাকুর মহাবংশ "উদধির" উজ্জ্বল রত্ন স্থির করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সুপ্রাপ্য হইলেও, তিনি যে ধনঞ্জয়ের পিতামহ, এরূপ প্রমাণিত হইতেছে না।

ধরণীধরের ভ্রাতা "আকলিত বিজ্ঞান শালী" বনমালীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বক্তব্য। তবে, ইহাঁর সময় নির্দ্দেশ করিবার শৌরীন্দ্রবাবু একটি উপায় রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহাঁর রচিত "দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণরহস্য" ত্রিগর্ত্তাধিপতি জয়চন্দ্রের (জয়ন্তচন্দ্র) আদেশে রচিত হয়। জয়চন্দ্রের কথা-বিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর তাঁহার "প্রবন্ধকোষে" উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি, পণ্ডিতবর বুলারের (Buhler) মতে, কাষ্টকুট ক্ষত্রিয় নৃপতি, ও ইহাঁর অপর নাম জয়ন্তচন্দ্র। মৃত মহাত্মা রামদাস সেন "শ্রীহর্ষ" প্রবন্ধে ইহাঁর আবির্ভাবকাল ১১৬৮ খৃঃ হইতে ১১৯৪ মধ্যে স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ইনি কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু শৌরীন্দ্রবাবুর কথিত জয়চন্দ্র ত্রিগর্ত্তাধিপতি। ত্রিগর্ত্ত কান্যকুব্জ নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জয়চন্দ্র শৌরীন্দ্রবাবুর জয়চন্দ্র নহেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জয়চন্দ্রই ইতিহাসে বিখ্যাত ও পরম বিদ্যোৎসাহী। অনেক বিদ্বদ্বৃন্দ ইহাঁর আশ্রিত ছিলেন। নৈষধকাব্যকার বিখ্যাত কবি

শ্রীহর্ষ ইহাঁর সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, রাজশেখর এরূপ বলিয়াছেন। এতৎপক্ষে বাধা এই যে, সময়ের হিসাব ধরিতে গেলে ধনঞ্জয়ের পিতামহ (আমাদের কমলাকর বা শৌরীন্দ্রবাবুর বনমালী, যিনিই হউন) দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, কিন্তু জয়চন্দ্র একাদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং বনমালীকে জয়চন্দ্রের সভাসদ বা ধনঞ্জয়ের পিতামহ বলিতে গেলে, বলবত্তর প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন।

৪। তাঁহার চতুর্থ মত এই (ক) ধনঞ্জয় হলায়ুধের পিতা, (খ) তিনি বল্লাল সেনের ধর্ম্মাধিকার ছিলেন, (গ) তিনি "নিঘণ্টু" কার। এখন, ধনঞ্জয় তিনটি দেখিতেছি। এক ধনিকাপরনামা ধনঞ্জয় "দশরূপনিবন্ধের" রচয়িতা;—তিনি মুঞ্জভোজরাজের সমসাময়িক। কোলব্রুক সাহেব উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনানুসারে ইহাঁকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের (১০৪২) লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর একজন বিখ্যাত বৈদিক পরিভাষা "নিঘণ্টু"র প্রণেতা। তৃতীয় ব্যক্তি, হলায়ুধের পিতা।

ধনঞ্জয় যে হলায়ুধের পিতা, হলায়ুধের নিজের কথাই তাহার প্রমাণ। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের" প্রারম্ভে নিজের বংশের কথায় তিনি "লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ" এ কথা লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ধনঞ্জয়-নামা কোন জন তাঁহার পিতা ছিলেন, এ কথা সত্য। তবে শৌরীন্দ্রবাবু তাঁহাকে বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার ও "নিঘণ্টু"র প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতা যে বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার বা "নিঘণ্টু"-প্রণেতা, হলায়ুধ এ কথা কুত্রাপি বলেন নাই। এখন কথা হইতেছে, যে লোক নিজের পিতার নিষ্ঠার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, যিনি নিজের রাজকর্ম্মের কথা এবং স্বীয় ভ্রাতাদের গ্রন্থের কথা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, তাঁহার পিতা যে বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার এবং "নিঘণ্টু"-নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা, তাহা লিখিতে কি আপত্তি হইতে পারে? হলায়ুধ পিতা ধনঞ্জয় যে "নিঘণ্টু"-কার ও বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকার নহেন, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহার উত্তরে এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত নহে যে, হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের কথা উল্লেখ করেন নাই কেন? এ কথার উত্তর এই যে, পিতার পরিচয় প্রদত্ত হইল বলিয়া কি ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পরিচয়ও অবশ্য প্রদত্ত হইবে? ভট্টনারায়ণ যে হলায়ুধের পূর্ব্বপুরুষ, তাহার প্রমাণ হলায়ুধের গ্রন্থে না থাকিলেও, পরবর্ত্তী লেখকের সাক্ষ্য প্রমাণ। আমাদের সত্যনির্দ্ধারণপ্রণালীতে এ প্রমাণও গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে

ভট্টনারায়ণ হইতে হলায়ুধ পর্য্যন্ত যে কয় পুরুষের তালিকা শৌরীন্দ্রবাবু দিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিলাম। ইহার পরের তালিকার সহিত আমাদের 'রিবিউ'র প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই।

—শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

দার্জ্জিলিং যাত্রা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে রবিবার রাত্রি ১১টার সময়ে যদি কেহ উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ের পার্ব্বতীপুর জংশনে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, ধুতি-জামা-পরিহিত একটি লোক একটা কার্পেটের ব্যাগ হাতে লইয়া সেই ষ্টেশনের বহিঃপ্রাঙ্গনে একটু দাঁড়াইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু এমনই স্থানাভাব যে, এক পার্শ্বে দাড়াইয়া যে দু' দণ্ড অপেক্ষা করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই;—পশ্চিমযাত্রী হিন্দুস্থানী ভায়াদের ধাক্কার চোটে স্থির থাকিবার যো নাই; ষ্টেশনটি আবার অতি ক্ষুদ্র; আরোহীদিগের দাঁড়াইবার জন্য একটি ছোট টিনের ছাদওয়ালা আবরণ আছে, তাহার মধ্যে যাত্রা শুনিবার মত গায়ে গায়ে বসিলে খুব বেশী হয় ত দুই শত লোকের স্থান হইতে পারে; কিন্তু যে সকল যাত্রী আগে হইতে ষ্টেশনে আসিয়া জমা হয়, তাহারা, পরে যে সকল যাত্রী আসিবে, তাহাদের স্থানাভাবের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হয় না;—স্ব স্ব গাঁটরী মাথায় দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়ে, আর যাহারা পরে আসে, তাহারা তাহাদিগকে একটু উঠিয়া বসিতে বা সরিয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুই দশটা চড়া কথা শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়। আসাম অঞ্চলের গাড়ী হইতে চারি পাঁচ শত লোক প্রতিদিন এই পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে নামে, এবং তাহাদিগকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত

* এ প্রবন্ধে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা গেল না।

আর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ত্রিগর্ত্তকে Julunder Doab বলিয়াছেন। ত্রিগর্ত্ত ঠিক গজন্ধর নহে। জেনারল কনিংহামের মতে ত্রিগর্ত্ত, চম্বার দক্ষিণ কাঙ্গরা ও জালন্ধরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। (Vide Arch. Survey Report and prof. Kilhorn in the Indian Antiquary." of Jany. 1888.) ত্রিগর্ত্ত শব্দের ব্যাখ্যায় শব্দকল্পদ্রুমে আছে:—"বিশেষঃ লাহোরাখ্যদেশৈকভাগঃ জালন্ধরঃ (হেমচন্দ্র)। পাঠক দেখিবেন, ইহাতে স্থান ক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।—লেখক।

এখানে পড়িয়া কর্ম্মভোগ করিতে হয়। দার্জিলিং-যাত্রী আমার প্রত্যাগত লোককে ত প্রায় সমস্ত রাত্রিই প্রকৃতির নিরাবরণ নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে কাটাইতে হয়। পশ্চিম হইতে মনিহারীঘাট দিয়া যাঁহারা দার্জিলিং যান, তাঁহাদেরও সেই দশা।

এই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি আমার ছোট কার্পেটের ব্যাগটি হাতে করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, কৃষ্ণপক্ষের অপূর্ণ চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে অনেক দূর উঠিয়াছিল; তাহাতে সুদূরবর্ত্তী ছায়ানণ্ডিত কাননশ্রেণী, শ্যামল মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ, ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং চক্রঘর্ষিত লৌহপথের উপর ম্লান চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত রশ্মিজাল পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল। চারি দিক নিস্তব্ধ; যাত্রীরা কেহ শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, কেহ বসিয়া ঢুলিতেছে, কেহ বা স্থানাভাবে আমারই মত এদিকে ওদিকে পাদচারি করিয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিতেছে, এবং যখন ঘুরিতে ঘুরিতে ষ্টেশনের মধ্যে আসিতেছে, তখনই টেলিগ্রাফ আফিসের 'খট্ খট্' 'খটাখট্' শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; দুই একটা কেরোসিনের আলো যেন নিদ্রিত ষ্টেশনের উপর পাহারা দিতেছে ও পাথুরিয়া কয়লার একটা উগ্রগন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে; মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এক একটা বাতাসের হিল্লোল বৃক্ষপত্রগুলিকে আন্দোলিত করিয়া যাইতেছে, আর দুই চারিটা শুষ্ক পত্র শর শর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আজ রাত্রে আর নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত অভ্যর্থনা করিতে পারিব না, তাহা জানি; কিন্তু কতক্ষণ এমন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইব? ঘুরিতে ঘুরিতে বিরক্তি বোধ হওয়াতে কোথায় একটু বসিয়া বিশ্রাম করি, এই কথা ভাবিতেছি,—এমন সময় দেখিলাম, ষ্টেশনের একটি বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া ষ্টেশনের একটা কামরায় প্রবেশ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে মুরুব্বি ধরিলাম, তিনি টিকিট-পরীক্ষক, বুকিং-ক্লার্ক বা সেই শ্রেণীর আর কিছু হইবেন। আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বাঙ্গালা কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মধ্যশ্রেণীর আরোহীদিগের বিশ্রামের জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে কি?' তিনি আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া তাঁহার অভ্যস্ত 'রেলোয়ে-ব্যাকরণ'-সঙ্গত ইংরাজিতে বলিলেন, yes, why remains not? বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন। আমি কিঞ্চিৎ আশান্বিত চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা বারান্দার দিকে

চলিলাম। গিয়া দেখি, অন্ধকারে একখান বেঞ্চির উপর মাত্র আট জন লোক অতি কষ্টে বসিয়া আছেন। সে উপবেশন বিড়ম্বনা; আমার এ ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা অনেক কষ্টকর; তবে, বসিতে পাইয়াছি, শুধু এই টুকু সান্ত্বনাতে বোধ হয় তাঁহাদের সে কষ্ট অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল; সেখানে ত তিলমাত্র স্থান নাই; সেখানে আর নিরর্থক চেষ্টা করিয়া কি হইবে ভাবিয়া বারান্দার দিকে চলিলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটির লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একদল লোক নানারকম ভঙ্গীতে বসিয়া আছে;—বারান্দায় উঠিবার পর্য্যন্ত যো নাই, কাহাকেও ঠেলিয়া উপরে উঠিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বাবুটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া "Can't help Babu" বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে অন্য দিকে সরিয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি রেলের বাবু হইয়াও আমার জন্য যতটুকু আয়াস স্বীকার করিলেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ত্রুটী করিলাম না; বুঝিলাম, আজকার রাত্রি Stand up হইয়াই কাটাইতে হইবে। এখন সমস্যা,—ব্যাগটি কোথায় রাখি?

অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক এক পাশে একটা ষ্টীলট্রাঙ্কের উপর বসিয়া আছেন; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিলাম, তিনি পাটনা হইতে আসিতেছেন, জলপাইগুড়ি যাইবেন, পাটনা কালেজে তিনি পড়েন; তাঁহারই জিম্মায় আমার ব্যাগটি রাখিয়া আমি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক স্থানে দেখি, একজন টিকিট-সংগ্রাহক একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছেন,—"তুমকো মোকামা যানে হোগা"। স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"নেহি যায়েঙ্গে"। উক্ত টিকিট-কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এ স্ত্রীলোকটির through ticket মোকামা পর্য্যন্ত, কিন্তু যাইতে চাহে না, দারজিলিং যাইতে চাহিতেছে;—এই বলিয়া তাহার টিকিটখানা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটির বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, হিন্দুস্থানী;—আসি দেখিলাম, সে একজন পুরুষের কাছে গিয়া বসিল, তাহার সঙ্গে ফুসফুস করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। জানা গেল, তাহার হাতে একটাও পয়সা নাই, সে আসামে চা-বাগানে গিয়াছিল, এগ্রিমেণ্ট শেষ হওয়ায় চা-বাগানের কর্ত্তারা তাহাকে দেশ পর্য্যন্ত টিকিট ও খোরাকীর পয়সা দিয়াছেন; সে যাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, সেই পুরুষটির সঙ্গে দারজিলিং যাইবে। সে লোকটির সঙ্গে আরও

দুটি স্ত্রীলোক দেখিলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম, এ কোন কুলীসংগ্রাহক দলের আড়কাটী। ব্যোমকেশ প্রকাশ হইল যে, সে দার্জিলিংএর কোন চা-বাগানের সর্দ্দার। এ স্ত্রীলোকটিকে সে কেন লইয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করায়, সেই পুরুষটি উত্তর করিল, সে কেন তাহাকে লইয়া যাইবে?—স্ত্রীলোকটিকে এই আড়কাটীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, পুরুষটিকে অনেক করিয়া বলিলাম, কিন্তু তাহার এই ব্যবসা, তাহাকে অনুরোধ করা নিষ্ফল, চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না। সুতরাং আমি সেই টিকিট-কলেক্টরের নিকটে গিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি ভদ্রলোক, সকল অবস্থা বুঝিয়া দুই জন পাহারাওয়ালার নিকট স্ত্রীলোকটিকে জিম্মা করিয়া দিলেন, এবং সেই আড়কাটীটাকে শিলিগুড়িগামী একখানি লোকাল ট্রেনে (তখন সেই প্ল্যাটফর্ম্মে ছিল) তুলিয়া দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে যখন দার্জিলিংএর গাড়ীতে উঠি, তখন সেই আড়কাটী ও তাহার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুটির একটিকে দেখিলাম। যাহা হউক, সেই স্ত্রীলোকটি রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল।

দার্জিলিংএ পৌঁছিয়া তাহার পর দিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছি, মেলট্রেন আসিতেছে। ষ্টেশনে দেখি, সেই সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিলাম, সে বুঝি কোন কাজে আসিয়াছে, কিন্তু তখনই হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হইল,—হয় ত আজ সেই স্ত্রীলোকটি আসিবে, তাহার সঙ্গের দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটিকে হয় ত সেই জন্য রাখিয়া আসিয়াছে; যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক; সেই হতভাগিনী তাহার সঙ্গের দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিল, এবং কোন-দিক দিয়া যে লোকারণ্যে মিশিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইলাম না।

পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে অনেক কীর্ত্তি দেখিলাম, তাহা লিখিতে গেলে ফুরায় না; টিকিট লইবার ভয়ানক গোল, তদ্ভোধিক বেবন্দোবস্ত। একটি বাবু চশমা নাকে লাগাইয়া টিকিটঘরে ঘুমাইতেছেন, শেষরাত্রে গাড়ী আসিবে, গাড়ী আসে আসে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিকট নিদ্রা আর ভাঙ্গে না। এত গোলমালে, এমন একটা কর্ত্তব্য মাথায় লইয়াও মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারে!—বুঝিলাম, এই প্রাত্যহিক কার্য্যে এই সমস্ত গোলমাল, এই রক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাত্রীরা যত ব্যাকুলভাবে জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতেছে, তাঁহা

নিদ্রা ততই গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। অনেক যাত্রীরই through ticket আছে বটে, কিন্তু অনেকেই এখানে টিকিট লইবে, আমাকেও টিকিট করিতে হইবে। একজন যাত্রী তাঁহাকে কয়েক বার জোরে জোরে ডাকিতেই তিনি "কোন্ হ্যায়, ক্যা মাঙতা ?" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হুঙ্কার শুনিয়া যে তাঁহাকে ডাকিয়াছিল, সে নিস্তব্ধ হইল; কিন্তু আমার আর স্বস্থ হইল না, আমি বলিলাম, "মাঙতা আর কি, মাঙতা টিকিট, আপনি এমন কি কল্পতরু যে, এই রাত্রিশেষে লোকে আপনারি কাছে অন্য দৌলত মাঙ্গতে আসিবে ? এখন একবার উঠে টিকিট ক'খানা দিলেই আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হই।"—কিন্তু আমাদের এই রকম আপ্যায়িত করাটা তিনি সম্পূর্ণ বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। তখন আমি উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং আমার পূর্ব্বপরিচিত টিকিট-কালেক্টরকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের টিকিট-বাবুর নিদ্রাভঙ্গের ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না, এ-দিকে গাড়ী আসিয়া পড়িল, আমরা যাহাতে টিকিট পাই, তাহার একটা উপায় করুন।" তিনি অবিলম্বে আমাকে সঙ্গে লইয়া আফিসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আমাকে একখানা রিটার্ণ টিকিট দিলেন। শেষে দেখি, সেখানি দার্জিলিংএর নয়, শিলিগুড়ির রিটর্ণ টিকেট। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় টিকিটক্লার্ক বলিলেন, "আপনি ফের সেখান হতে টিকিট ক'রে নেবেন।"—আমি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে সে টিকিট পাওয়ার বাধা কি ?" লোকটা অভদ্রভাবে উত্তর করিল যে, আমার সুবিধা অসুবিধায় জন্য রেল কোম্পানীর নিয়ম পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; নিয়ম! এ কি রকম নিয়ম ? আমি টিকিট লইলাম না; বলিলাম, আমি কখন শিলিগুড়ির টিকিট লইব না, যাব দার্জিলিং, মধ্যের একটা ষ্টেশনের টিকিট কেন লইব ? সে তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজীতে সাহেবিয়ানা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, আমাকেও অগত্যা দুই চারিটা ইংরাজী বাৎ ঝাড়িতে হইল। আমার উচ্চকণ্ঠ ষ্টেশনমাষ্টারের কর্ণগোচর হইল, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমার রৌদ্ররসসিক্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি "ক্যা মাঙতা" হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব তাঁহার সেই কর্ম্মচারীর উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং আমাকে আমার প্রার্থনা অনুসারে দার্জিলিংএর টিকিট কেন দেওয়া হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কোন সঙ্গত উত্তর পাইলেন না; তখন তিনি

আমাকে দারজিলিংএর রিটর্ণ টিকিট দিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। লোকটা কিছু অপ্রস্তুত হইল; বলিল, দারজিলিংএর টিকিট দিলে সেই শিলিগুড়ীর টিকিটখানা আর বিক্রয় হইবে না, সেখানার দাম তাহাকেই নিজের পকেট হইতে দিতে হইবে। শুনিয়া আমি নিরস্ত হইলাম, ভাবিলাম, তাহার ক্ষতি করা অপেক্ষা শিলিগুড়ীতে আমার একটু অসুবিধা ভোগ করা ভাল। এই ভাবিয়া শিলিগুড়ীর টিকিটখানা লইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। তখন দেখি, লোকটা কিঞ্চিৎ তদ্রতা করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়াছে। আমিও তাহাকে দুই একটা মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিলাম।

শিলিগুড়ী পঁহুছিয়া গাড়ী বদল করিতে হয়। এখান হইতে দারজিলিংএ যে গাড়ী যায়, সেগুলি ছোট ছোট, ট্রামকারের মত গাড়ী; তাহাতে ভাল করিয়া বসিবারই সুবিধা নাই, বাক্স পেটারা রাখা ত দূরের কথা। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সুখনা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমভূমি, সেখান হইতেই উপরে উঠিতে হয়; শুনিয়াছিলাম, দারজিলিং রেল ইন্‌জিনিয়ারিং কৌশলের চরম আদর্শ, দেখিয়াও তাহাই বোধ হইল। ছোট একখানা এন্‌জিন বীরদর্পে গাড়ী গুলি লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে, ঠিক যেন একটি পিপিড়ার সারি। গাড়ী হইতে মাথার উপরে একটা রেল দেখা যাইতেছে সেইখানে যাইতে হইবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাইবার যো নাই, পনের মিনিট ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। রাস্তায় সর্ব্বসমেত পাঁচটা লুপ আছে।

সমভূমির সাধারণ গাড়ীর ন্যায় এই পার্ব্বত্য গাড়ীগুলি সুরক্ষিত ও কাষ্ঠ বরণবেষ্টিত নহে। তবে বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরদা খাটান আছে, এই পরদা গুলি অনেকটা ট্রামকারের পরদার মত।

আমরা ক্রমে স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। সমতলভূমি ক্রমে ছোট এবং তাহার অঙ্কশায়ী বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। নীচে সবুজ ক্ষেত্র, সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের অন্তরালগুপ্ত নির্ঝর প্রবাহ, শ্যামল শৈবাল এবং অসংখ্য কারণের বন, এ সকলের ঊর্দ্ধদেশে আমাদের গাড়ী পাহাড়ের বুকের উপর দিয়া লৌহপথ বাহিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা বিস্ময়পূর্ণনেত্রে খমণ্ডলচারী বেলুন-বিহারীর ন্যায় নিম্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, বৃহৎ বৃক্ষের অগ্রভাগ এবং ক্ষুদ্র চা-গাছের ডগা, অথবা ক্ষুদ্রতম তৃণ গুল্ম, সমস্ত সমোচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছে।

অনেক ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম; তিনদরিয়া ষ্টেশন দারজিলিং রেলোয়ের কারখানা। তিনদরিয়া হইতে নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়;—অতি সুন্দর দৃশ্য, দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এবং এই অবর্ণনীয় অসামান্য সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না,—শুধু আত্মীয় স্বজনকে চোখ ভরিয়া দেখাইতে সাধ যায়। মনে হয়, আমরা একা এ সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী নহি। যতই নূতন নূতন ষ্টেশন ছাড়াইতে লাগিলাম, ততই নব নব দৃশ্য, অভিনব শোভা, বিচিত্র আকারের গাছ, লতা পাতা, বাড়ী, পথ, এবং বাগান। যেন পৃথিবী ছাড়াইয়া স্বর্গের তোরণদ্বারে প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে সুকৌশলচিত্রিত নব নব দৃশ্যপট উন্মুক্ত দেখিতেছি, একখানির পর অন্যখানি, চক্ষু ফিরাইতে হইতেছে না, আপনি সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইতেছে না, বরং আগ্রহ আরও বাড়িতেছে; জানি না, এইরূপে দিবস শেষ করিয়া দিবাবসানে কখন সেই সুখ, ঐশ্বর্য্য এবং গরিমার লীলানিকেতন দারজিলিংএর অভ্যন্তরে আমাকে ও আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটিকে বহন করিয়া ট্রেন আসিয়া থামিবে!

কর্শিয়ং ষ্টেশনটী খুব জাঁকাল। পাহাড়ের উপর নানা আকারের অনেক বাড়ী, অধিকাংশই সাহেবদের বাড়ী; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বাড়ীগুলিকে দেখিয়া একটা কিছুর সঙ্গে উপমা দিবার ইচ্ছা হয়; মনে হয়, এ যেন কৈলাসপুরী; পরক্ষণেই মনে হয়, না, ইহা তেমন শান্তিপূর্ণ, তেমন পবিত্র নিষ্কলঙ্ক, ছায়াচ্ছন্ন, মাতা পার্ব্বতীর স্নেহরসার্দ্র নহে। ইহা যেন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অলকা, অজস্রধারে বিলাসিতা শুভ্র কাচপাত্রে লোহিত মদ্যের মত কানায় কানায় উছলিয়া উঠিতেছে; এবং বোধ হইতেছে, বড় বড় হোটেল হইতে পলাণ্ডুখচিত মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন, শুভ্রবস্ত্রপরিবৃত টেবিলের সুগন্ধি-কুসুম-সমাচ্ছন্ন পুষ্পাধারের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক মিশ্র সুরভিতে পার্ব্বত্য নগরটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দোকানগুলিতে নানারকমের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে ট্রেন বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অর্দ্ধ মাইল পরেই ক্ল্যারেণ্ডন্ হোটেল ষ্টেশন। ইহা ঠিক ষ্টেশন নহে, গাড়ী থামে বলিয়াই ষ্টেশন বলিলাম। এখানে আসিয়া গাড়ী থামিলে, দলে দলে সাহেববিবি গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষুধার্ত্ত পঙ্গপালের ন্যায় অন্ধ আবেগে হোটেলে প্রবেশ করেন; ইহাদের আহার শেষ না হইলে ট্রেনের সাধ্য কি তাঁহাদের অসম্মান করিয়া চলিয়া যায়? সুতরাং এখানে আসিয়া ট্রেন একঘণ্টা থামে। কর্শিয়ং ষ্টেশনে

নামিয়া আহারাদি করিয়া, তাহার পর হাঁটিয়া আসিয়া ক্লারেণ্ডন হোটেলে মেল ট্রেন ধরিতে পারা যায়।

সাহেবেরা এখানে আসিয়া বেশ আহারাদি করিয়া থাকেন; আমরা শাস্ত্র ও দেশাচার-শাসিত বাঙ্গালী, আমাদের অদৃষ্টে শক্ত পুরি আর শুষ্ক আলুভাজা; দাড়িওয়ালা বাবুর্চির ইস্তরচিত সোণসাই খানা এবং নিমিছ পক্ষিমাংস ছাড়িয়া এই বাসি লুচি এবং কাঠখোলার ভাজা দগ্ধপ্রায় আলুর টুকরা খাইলে মোক্ষলাভ হয় কি না, জানি না; কিন্তু উদরাময় হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনাহারেই দিনপাত করা শ্রেয়স্কর মনে করিলাম। ক্লারেণ্ডন হোটেলের কাছে সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। কর্শিয়ং অঞ্চলে অনেক সাহেব লোক আজ কাল বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা চলিতেছি, গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশই উপরে উঠিতেছে। বেশ রৌদ্র আছে; কিন্তু বেলা যতই কমিতেছে, শীত ততই বাড়িতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেশে ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল, গায়ে ফুরফুরে পাতলা চাদর রাখা ভার, আর ইহারই মধ্যে শীতে হৃৎকম্প উপস্থিত! গায়ের উপর সমস্ত শীতবস্ত্রগুলি আঁটিয়াও মনে হইতেছে, আরও কিছু হইলে সুবিধা হইত। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই বেশী ঠাণ্ডা,—এই সহজ প্রাকৃতিক সত্যটা পদার্থবিজ্ঞানের পৃষ্ঠাতেই পড়া ছিল, আজ হাতে কলমে তাহার পরীক্ষা হইল। চারি দিক স্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ নাই, শুধু ক্ষুদ্র এঞ্জিন-খানা গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে, কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে; দূরে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহার পর অভ্রভেদী অসংখ্য শৃঙ্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শিরোদেশে বৃক্ষলতা-শৈবালশূন্য শুভ্র জমাট বরফস্তূপ, তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে;—দেখিয়া শুধু অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু সেই দূরদূরান্তরস্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গের বিরাট মহিমা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যদি অদূরবর্ত্তী রেলপথের উপর স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলেও মনে অল্প বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না, সেই সঙ্গে মনে ভয়েরও উদ্রেক হয়। এত উপর দিয়া মানুষে পাথর কাটিয়া তাহার উপর রেল বসাইয়া গিয়াছে, ইহা কি অল্প অধ্যবসায়? পর্ব্বতের দুরতিগম্য প্রদেশে কঠিন পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, নরহস্তের অঙ্কিত এই সকল কীর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য বলিয়া মনে হয়। পার্শ্বস্থ গভীর খদের কিম্বা নিম্নতলবর্ত্তী অধিত্যকার এত নিকট দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে যে, সহসাই আশঙ্কা হয়,—এখনই হয় ত গাড়ীসমেত ঐ গভীর

খদের মধ্যে গিয়া পড়িব, নীচে সেই মহান্ধকারময় গুহায় একবার পড়িলে চিরজীবনের মত সখ মিটিয়া যাইবে, হাড় ক'খানারও কেহ খোঁজ পাইবে না।

ঘুম ষ্টেশন পর্য্যন্ত উঠিয়া গাড়ী আবার নীচে নামিতে লাগিল। শীঘ্রই আমরা দারজিলিংএ আসিয়া হাজির হইলাম। তখন আর বেশী বেলা নাই, চারি দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এ সময় এমন নিবিড় কুয়াসা সমতল প্রদেশে —অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশের কোথাও দেখা যায় না। আমার যে বন্ধুটি ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন কথা ছিল, তিনি আসেন নাই। কত জনকে কতজন অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন; হাস্য, করকম্পন, নমস্কার, গল্প, চারি দিকে কতরকমের প্রীতিসম্ভাষণ চলিতেছে, তাহার মধ্যে আমি একাকী, আমার পরিচিত কেহই নাই। মনে বড় কষ্ট বোধ হইল। এমন একা ত অনেককাল হইতেই পাহাড়ে বেড়াইয়াছি, তখন একা বলিয়া কোন চিন্তা ছিল না, আজ এমন হইল কেন?—কেন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না; বুঝি সে সময় কোন পরিচিত ব্যক্তির, কোন বান্ধবের প্রীতি অভ্যর্থনার আশা ছিল না; যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পাইলেই কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। কিন্তু এবার আমার আশাভঙ্গেই বুঝি এই দুঃখ; অতএব আশা জিনিসটাই খারাপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনে একটু অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কুয়াসাও কাটে না, পথও দেখা যায় না; অবশেষে তাহারই মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পোষ্ট আফিসের নিকট বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, তাঁহারা আমার পত্র পান নাই। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, মনের মধ্য হইতে একটা মস্ত ভার দূর হইয়া গেল; বুঝিলাম, আর যাহাই হউক, আমার বন্ধুটির ইহাতে কোন অপরাধ নাই। আমাকে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বন্ধুটি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শুধু আনন্দে চলে না, আমার এদিকে পরিপূর্ণ অনাহার; সেই অপরাহ্নেও স্নান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, Bath-roomএ প্রবেশ করিয়া গরম জলে বেশ ভাল করিয়া স্নান করিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া দেখি, তখনও ঘণ্টাখানেক বেলা আছে; তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনিদ্রা, অনাহার ও গাড়ীতে দারুণ কষ্টের পর, স্নানাহারশেষে কোথায় রট টানিতে টানিতে খোসগল্প করিব, অথবা লেপ টানিয়া নিদ্রাদেবীর রিচর্য্যা করিব, না বেড়াইতে বাহির হইলাম দেখিয়া—বন্ধু বলিলেন,

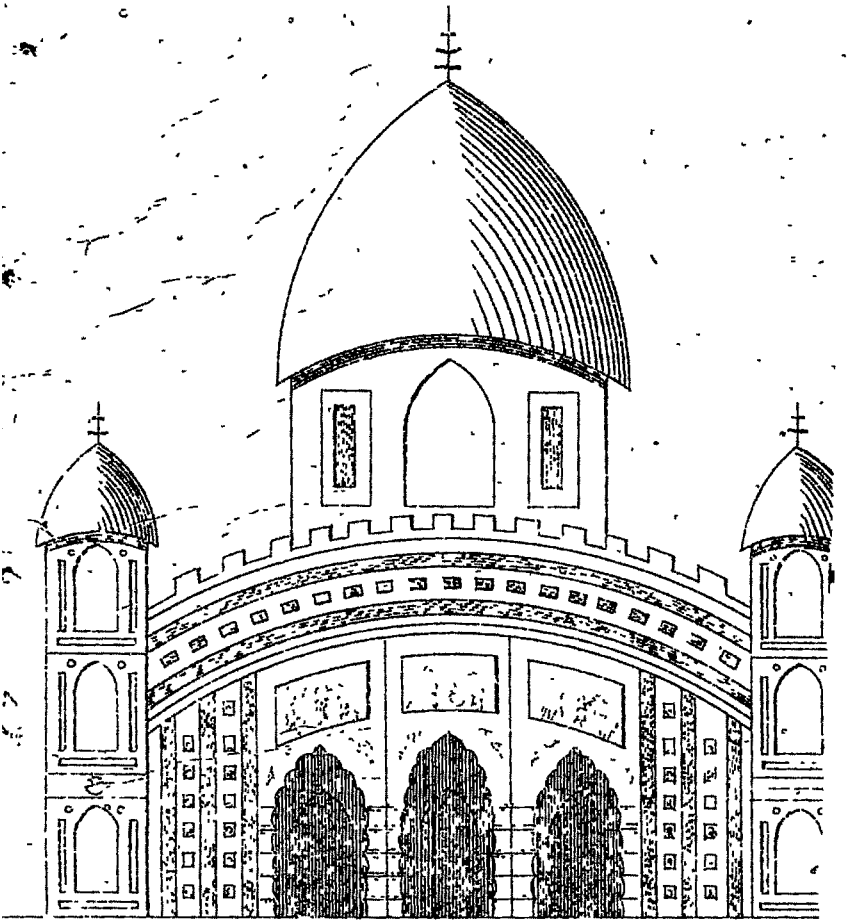

সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমন্দির।

বর্ত্তমান আছে। তাহার অধিকাংশই গিরিদুর্গ। সমতল শস্যক্ষেত্রের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা সেরূপ সহজ নহে। তথাপি সমতলক্ষেত্রেও কয়েকটি দুর্গচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার কোন দুর্গেই সিংহদ্বারের সম্মুখে একপ বিস্তৃত জলাশয় খনিত হয় নাই। ইহাই সীতারামের দুর্গরচনার মৌলিকত্ব।

রামসাগরের নানারূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সীতারাম যেখানে রামসাগর খনন করেন, সেখানে এক সময় একটি দরিদ্রা বিধবার পর্ণকুটীর ছিল। বিধবার একটিমাত্র পুত্র। বৃদ্ধা এক দিন "সীতা সীতা" বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিতেছিলেন; সীতা নিকটে ছিল না, কিন্তু রাজা সীতারাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা কি প্রয়োজনে সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সীতারামের কৌতূহল হইল। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্র সীতারামকে স্মরণ করিতেছিলেন, রাজা সীতারামকে স্মরণ করেন নাই। সীতারাম সে কথা শুনিবার পাত্র নহেন; তিনি বৃদ্ধার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। চিরদুঃখিনী বিধবা আর কেমন করিয়া রাজাধিরাজ সীতারামকে অভ্যর্থনা করিবেন? তাঁহার কুটীরেই বা কি আছে যে, তাহা লইয়া রাজহস্তে উপঢৌকন দিবেন? তিনি দৈন্য জানাইয়া বিনীতভাবে সীতারামের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন; সীতারাম তাঁহাকে তদ্রূপ সকাতর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি নিতান্তই কিঞ্চিৎ উপহার দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আঙ্গিনার পাশে যে লাউগাছটি লতাইয়া উঠিয়াছে, সেইটি পাইলেই সীতারাম চরিতার্থ হইবেন। বৃদ্ধা বলিলেন—তথাস্তু। সীতারাম তখন অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধার কি এমন কোন গুপ্ত বাসনা নাই, যাহা রাজানুকম্পায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? বৃদ্ধার একটি ক্ষুদ্র বাসনা ছিল;—জলকষ্টে তাঁহাকে বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত। তিনি তখন একটি কূপ খনন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কূপখননের জন্য লাউগাছের মূলদেশ খনিত হইল। সীতারাম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রচুর অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে! তখন আর কূপ খনন করা হইল না,—সীতারাম সেই অর্থে একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকাখননের আদেশ করিলেন। নিকটে সেনাপতি মেনা হাতি দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দীঘি কত বড় হইবে? সীতারাম বলিলেন, তোমার আকর্ণ সন্ধানে তীর যত দূর ছুটিয়া যাইবে, তত দূর পর্য্যন্ত খনন করিয়া দিও। মেনা হাতি আকর্ণ-

সন্ধানে তীর ছাড়িয়া দিলেন;—সে তীর বহুযোজন দূরে কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরভূমি অতিক্রম করিয়া ভূমিতল স্পর্শ করিল। সীতারাম অর্ধ রাজ্য হরণ করিলেন না;—যত দূর পারিলেন, খনন করিয়া দিলেন। লোকে তাঁহার এই অলৌকিক কীর্ত্তি চিরজীবী করিবার জন্য দীঘির নাম "রামসাগর" রাখিয়া দিল।*

মহম্মদপুরের রাজধানীতে যে আরও অনেকগুলি দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোধ হয় তাহার একটির ইতিহাস হইতে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র "চিত্তবিশ্রাম" নামক রমণীয় উদ্যানবাটীর কল্পনা গঠন করিয়াছিলেন। সে জলাশয়ের নাম "সুখসাগর,"—তাহা দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে, অল্পদূরেই খনিত হইয়াছিল। সুখসাগরের আয়তন খুব বড় নহে, একেবারে নিতান্ত ছোটও নহে। মধ্যস্থানে একটি দ্বীপের ন্যায় মৃত্তিকাস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে;—গৌরবের দিনে সেই দ্বীপের উপর সীতারাম একটি সুশীতলসুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে দুর্গমধ্যে বাস করিবার অসুবিধা হইলে, সীতারাম কখন কখন চিত্তবিনোদের জন্য সেই হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিতেন। তাহার এখন আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই!

দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আর একটি দীঘি বর্ত্তমান আছে। তাহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অনেক;—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নলদীঘ নামের মহাশয়ের পাচক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সেই জলাশয়ে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সেই কথা দেশরাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, নড়ালের বাবুরাও স্বর্ণমুদ্রার লোভে অনেক অর্থব্যয় করিয়া জলশোষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।† তাঁহাদের ভাগ্যে পণ্ডশ্রমই সার

---

* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন। এই জনশ্রুতি সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সীতারাম যে আরও অনেক জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। সেকালের হিন্দু রাজার প্রজাসাধারণের অন্নজলে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সাধ্যানুসারে অন্নজল সুলভ করিয়া দিতেন।

† The Naral Baboos, who for some time had possesion of the temple lands (debuttur) at Muhamadpore, made diligent search in the rank, t find any stray treasure which might be in it. They tried to pump out th water, but there dwells a genius in the tank who frustrated their impiot efforts. Every night the water rose as much as it had gone down by t[illegible] during the day, and they had to give up.—J. Westland.

হইল। কিন্তু শুনা যায় যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবার একজন এক ঘটি টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। লোকের বিশ্বাস যে, সেখানে এখনও সাত রাজার ধন অজ্ঞাতে বঙ্গ মহামতির কঠিন শাসনে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। পাঠক! ঐতিহাসিক অনুরাগে না হউক, আর্থিক অনুরাগে মহম্মদপুর পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা হইতেছে কি?

সীতারাম যেরূপ ভাবে মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে বাহুবলে রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল যে, আজ হউক, কাল হউক, মুসলমান একদিন না একদিন তাঁহার রাজদুর্গ ধ্বংস করিবার জন্য সাগ্রহে বাহুবিস্তার করিবে। সেই জন্য তিনি কেবল দুর্গপ্রাচীর সুদৃঢ় করিয়া এবং প্রাচীরমূলে পরিখা খনন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; মুসলমানেরা পুরী অবরোধ করিলে যাহাতে হিন্দুর সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন কিছুতেই কুক্ষিগত করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্য দুর্গমধ্যে এই দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার গুপ্ত কোষাগার। সঞ্চিত অর্থ এই জলাশয়ে নিমজ্জিত হইত; আবশ্যক হইলে, সন্ধাননিপুণ সীতারাম তাহা উত্তোলন করিতে পারিতেন। এখন আর কেহ সে সন্ধান জানে না, সেই জন্য সীতারামের গুপ্ত কোষাগার চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জলাশয় খনন করা সেকালে বড়ই পুণ্য কার্য্য বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিল। তাহার জন্য পুণ্যশীল জলদাতা রাজসরকার হইতে উপাধি পাইতেন না, কিন্তু হিন্দুর দেশে হিন্দুর সমাজে হিন্দু নরনারীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ অনেক প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবে, কাহার ব্যয়ে এই সকল জলাশয় খনিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন জলাশয়ের সঙ্গেই কোন না কোন মহাত্মার পুণ্যনাম সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগের পুরাতন সমাধিমন্দিরগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গভর্মেণ্ট মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাহাতে অবশ্যই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি সঞ্জীবিত রাখিবার সদুপায় হইতেছে। কিন্তু সে গুলি কেবল ইষ্টকস্তূপ,—তাহাতে লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করে, বিস্ময় উৎপাদন করে, কচিৎ বা কাহারও কল্পনাপ্রবণ ঊর্ব্বর মস্তিষ্কে অতীতের স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র আকাশকুসুম চয়ন করিবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়! কিন্তু তাহাতে পরবংশীয় দীনদরিদ্র প্রতিবেশীদিগের প্রাত্যহিক

দুঃখদুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে না! আর হিন্দুর সেই সকল জলাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি,—এই সকল হিন্দুহৃদয়ের লোকহিতৈষণার সমাধি-মন্দিরগুলি, হিন্দুজীবনের পরহিতব্রতের এই সকল জীবন্ত নিদর্শনগুলি, কাল ক্রমে শৈবালে শাদ্বলে পঙ্কে, দূষিত সলিলে অব্যবহার্য্য হইয়া কত লোকের কীর্ত্তিলোপ করিতেছে! সদাশয় গভর্মেণ্ট যদি এই সকল সমাধিচিহ্ন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে হয় ত আবর্জ্জনা যাইয়া তাহা এদেশের উপকার সাধন করিত।

ইংরাজেরা তাঁহাদের নগণ্য গতজীব সহযোগীদিগের সমাধিমন্দিরের জরাজীর্ণ প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া এবং পুরাতন জলাশয়গুলির বিস্তৃতী সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি গ্রন্থরচনা করেন, তাহা হইলে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সজীব থাকিতে পারে। আমরা সীতারামের ইতিহাস পাই নাই; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ-স্থানীয় প্রাচীন দেবমন্দির এবং পুরাতন দীর্ঘিকাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহারও কোনরূপ বিবরণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি না!

সীতারাম সে সকল জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কেবল সাধারণভাবে তাঁহার পুণ্যপিপাসা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নহে; সেকালে সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার সকলেই সেরূপ সৎকীর্ত্তিসংস্থাপন করিতেন;—তাহাতে কাহারও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকটিত হইত না। কিন্তু সীতারামের জলাশয়গুলি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র, বুদ্ধিকৌশল এবং দূরদর্শিতা বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে "রামসাগরের" উল্লেখ করিয়া তাঁহার সংগ্রামকৌশলের পরিচয় দিয়াছি. দুর্গপরিখার বর্ণনা করিয়া তাঁহার রচনা-কৌশলের আভাস দিয়াছি, এবং "সুখসাগরের" পরিচয় দিয়া তাঁহার বিলাস-বাসনার প্রকৃতিনির্ণয় করিয়াছি। অন্যান্য জলাশয়গুলিতেও এইরূপ একটি না একটি পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

এদেশে অনেকেই জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খনন-প্রণালীর দোষে কিছু দিন পরে সে সকল জলাশয় দুষ্টজলে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে ইহার অনেকরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন মাটির দোষ, কেহ বলেন জলাশয়-তীরে বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিবার দোষ, এবং অনেকের

* The Bengal Obituary.

ধারণা এইরূপ যে, এই উভয়দোষবর্জ্জিত হইলেই হয় ত জলাশয়গুলি একবারে দোষসম্পর্কশূন্য হইত! কিন্তু প্রধান দোষ এই যে, খনিতমৃত্তিকা কেমন করিয়া কোথায় স্থাপন করিলে সরোবরের অনিষ্ট না হয়, সে দিকে কেহ সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সরোবর খনিত হইয়াছে; ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত সুনিশ্চিত সোপানাবলী সুগঠিত হইয়াছে; তীরে তীরে রুচিভেদে তাল তমাল বা নারিকেল বৃক্ষ, কখন বা কুসুম-বহুল অশোক চম্পক বকুল পলাশ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। কিন্তু খনিত মৃত্তিকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিত; তাহার যথাযথ বিন্যাসের জন্য কেহ আর অর্থব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

সীতারামের দুই একটি জলাশয় দেখিলে মনে হয় যে, তিনি এই চিরপ্রচলিত কুরীতির অপকারিতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; এবং যথাসাধ্য সংশোধন করিবার জন্য একটি সরোবরে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার নাম "কৃষ্ণসাগর"; বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র দেব ঠাকুরের নামানুসারে পরিচিত। এই "কৃষ্ণসাগর" রামসাগরের ন্যায় বৃহদায়তন নহে; কিন্তু ইহার জল এখনও বড়ই উপাদেয়।* সীতারাম "কৃষ্ণসাগর" খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার অবসর দেন নাই; তাহা সরোবরতীর হইতে প্রতিদিকে প্রায় এক বিঘা দূরে আনিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া যে পঙ্কিল সলিলস্রোত প্রত্যেক সরোবরকেই বর্ষাকালে আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা আর "কৃষ্ণসাগরের" সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে! ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব "কৃষ্ণসাগরের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, আধুনিক সময়েও সরোবর-খননকালে সেই প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

স্থানে স্থানে তড়াগাদি খনন করা ভিন্ন সীতারাম এক নদী হইতে আর এক নদীতে গমনাগমন ও নৌকা-চলাচলের সুবিধার জন্য সুদীর্ঘ খাল খনন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কিরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

---

* This probably results from a peculiarity of construction, which might be with advantage copied in making tanks in the present day.—J. Westland.

নবম অধ্যায়।

আমরা আজকাল অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল! দেশে যে অন্ন বস্ত্র নাই, তাহা নহে; নানা কারণে দেশের অন্ন বস্ত্রে আমাদিগের অভাবপূরণ হয় না। বহুবিধ ঘটনাপরম্পরায় দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা লজ্জারক্ষার জন্য ম্যানচেষ্টারের তাঁতিদিগের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া লইতেছি, লৌহদ্রব্যের জন্য সেফিল্ডের কর্ম্মকারগোষ্ঠীর হাফরের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছি;—জীবনধারণের জন্য, কায়িক মানসিক সাংসারিক সকল প্রকার দৈনিক অভাব মোচনের জন্য বিদেশের লোকের কাছে কর-যোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। সেকালে এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না। বাঙ্গালী তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত করিয়া লইত। হাতে অর্থ থাকিলে লোকে ঘরে বসিয়া সকল দ্রব্যই সহজে ন্যূনাধিক মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সীতারামের সে সুবিধা ঘটিল না।

তিনি মুসলমানশক্তি উপেক্ষা করিয়া মহম্মদপুরে রাজধানী সংস্থাপন করায় রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; সুতরাং অন্যান্য গ্রাম নগর হইতে আবশ্যকমত দ্রব্যজাত আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে তেমন সহজ ছিল না। অথচ তাঁহার সকল দ্রব্যেরই নিতান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতারক্ষার জন্য দুর্গপ্রাচীর গঠিত হইল, নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনাদল গঠিত হইল, কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র সেরূপ সহজে সংগৃহীত হইল না। কামান বন্দুক গুলি গোলা ও বারুদের সৃষ্টি হইয়া অবধি সমরশিক্ষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাই, আর ধর্ম্মযুদ্ধ নাই, আর ধনুঃশর,—সংমোহন, একাঘ্নী, পাশুপতের দিন নাই। এখন যুদ্ধ করিতে হইলে তদুপযোগিনী শিক্ষা চাই; যুদ্ধ শিখাইতে হইলে তদুপযোগী গুলি গোলা বারুদ কামান ও বন্দুক চাই। সুতরাং সীতারামের চারিদিকেই অভাব। তিনি নবাবের অধিকৃত রাজ্য হইতে এই সকল দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে লোকে শীঘ্রই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিত; নবাবও তাহার গতিরোধ করিবার অবসর পাইতেন। সীতারাম সে পথ অবলম্বন করিলেন না।

তিনি নানা স্থান হইতে বিবিধশিল্পবিশারদ কার্য্যকুশল শ্রমজীবীদিগকে পরম সমাদরে নূতন রাজধানীতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহাদিগের জন্য রাজধানীতে দুর্গমধ্যে এবং দুর্গের বাহিরে স্থান নির্দ্দেশ

করিয়া দিলেন। নবাব ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; কেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁহার অভিসন্ধির অনুসন্ধান পাইল না। অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুরে বাজার বসিয়া গেল। সে বাজারে সকল দ্রব্যই মিলিত; মিলিত বলিলে ঠিক্ বলা হইল না;—সকল দ্রব্যই প্রস্তুত হইত। তাহাতে বহু লোকের অন্নসংস্থানের সুবিধা হইল। লোকে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিল। তখন মহম্মদপুরে বসিয়া সেই সকল কারিগরেরা কেহ বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ চারুশিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল; কেহ বা যুদ্ধোপযোগী বিবিধ প্রকার যন্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধ্যে সীতারামের বাজার আর সামান্য বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর সুবৃহৎ শিল্পাগার হইয়া উঠিল।

সীতারামের এই শিল্পাগারে যে সকল তৈজসপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে;—ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। সীতারামের শ্রমসহিষ্ণু কর্ম্মকারগণ যেরূপ নিপুণ হস্তে সুদৃঢ় কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মোগল তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কি কৌশলে সীতারাম সহসা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য যাহারা কিছুমাত্র জানিবার অবসর প্রায় নাই, তাহারা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকচক্ষুর নিকট সীতারামের কার্য্যকলাপ বিচিত্র ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

সেকালের বাঙ্গালী কর্ম্মকারেরা যে সত্য সত্যই কামান গড়িতে জানিত, তাহা কাহারও রচা-কথা নহে; সেরূপ দুই একটি কামান এখনও বর্ত্তমান আছে; অবশিষ্টগুলি অযত্নে অনাদরে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূষণা অঞ্চলেও এই সকল পুরাতন কামান দেখা যাইত; কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ কালেক্টর তাহার কোনটি লইয়া রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোনটি গলাইয়া কয়েদীদিগের বেড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, কোনটি বা তিন টাকা মূল্যে নিলাম করিয়া দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের বিলুপ্ত-গৌরব প্রাচীন রাজধানীর নিকটে এখন পর্য্যন্তও কাদামাটীর সুহস্ত-গঠিত একটি পুরাতন কামান বর্ত্তমান আছে। কালে তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি তরুশাখা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে মাটি হইতে শূন্যদেশে উঠাইয়া ফেলিয়াছে;—দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই কামানের

* J. Westland.

নাম "জাহানকোষ";—ওজনে ২১২ মণ; ২৮ সের বারুদ না হইলে তাহার কোদর পূর্ণ হইত না। এই কামানের উপর যে কলকব্লিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কার্য্যপরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাধীনে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দনের দ্বারা, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঢাকা নগরে এই বৃহদাকার কামানটি গঠিত হয়। * ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকার মোগল রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মহম্মদপুরের সীতারামের রাজধানীও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঢাকাই কর্ম্মকারদিগের কেহ কেহ মহম্মদপুরে আসিয়া সীতারামের অস্ত্রাগার পূর্ণ করিবার সহায়তা করিয়াছিল। সে সকল অস্ত্র শস্ত্র কালসহকারে বিলুপ্ত না হইলে বাঙ্গালীর গঠনপ্রতিভার পরিচয় বিলুপ্ত হইত না; কিন্তু সে সকল অস্ত্র শস্ত্র যে যুদ্ধকালে শত্রুপীড়নে কত দূর সক্ষম হইয়াছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে তাহার পরিচয় একবারে বিলুপ্ত হয় নাই! মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ীতে এখনও এই সকল পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র কতক কতক যত্নে রক্ষিত হইতেছে। সেলেখানায় মধ্যে কোন প্রতিভাশালী শিল্পকার প্রবেশ করিলে, সে সকল অস্ত্রশস্ত্রের গঠনকৌশল দেখিয়া অবশ্যই অপরিসীম কৌতূহল অনুভব করিবেন!

সীতারামের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি সাহসী স্বাধীন-চেতা স্বাবলম্বনপরায়ণ প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তাহার অভাবপূরণের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; যত্ন চেষ্টা করিয়া স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতেন। ঘটনাসূত্রে তাঁহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহুবল ভিন্ন আর কোন সম্বল ছিল না; মোগলের দেশে বাস করিয়া মোগলশক্তিকে পরাজিত করিতে হইলে অবশ্য মোগলের নিকট সহায়তালাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়াও তাঁহাকে স্বাবলম্বনপরায়ণ হইতে হইয়াছিল। তিনি এরূপ ভাবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা

* The gun Jahan Kasha was constructed at Jahangirnagar, otherwise called Dacca, during the Darogaship of Sher Mahammud, and when Har ballav Das was mashrif (Inspector) and Janarjan chief blacksmith, in the month of Jumadi-us-sani, in the year of 11 the reign corresponding to 1047 (October 1637). Weight 212 maunds, the measure 36 dams ul shamari, charge of powder 28 seers.—H. Beeridge. C. S.

না করিলে, মহম্মদপুরের রাজধানী ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারিত না। উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র পাইলে, উপযুক্ত সুশিক্ষিত সেনাদল পাইলে, উপযুক্ত অর্থ-ভাণ্ডার লাভ করিতে পারিলে, দেশের লোকের শুভাশীর্ব্বাদ এবং সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারিলে, অনেকের পক্ষেই বীরত্বের পরিচয় প্রদান করা সহজ হয়। স্বাধীন নরপতিদিগের পক্ষে এ সকলই সুলভ; তাঁহারা সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া জনসাধারণের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করেন, বহুসঞ্চিত রাজকোষে অগণ্যমাণ্য ধনরত্ন প্রাপ্ত হন, রণপণ্ডিত সেনাপতিপরিচালিত সুশিক্ষিত সেনাদল আসিয়া করযোড়ে অভিবাদন করে, সুতরাং তাঁহাদের বীরকীর্ত্তির জন্য তাঁহারা যশস্বী হইলেও, সেরূপ বীরকীর্ত্তিতে কোনরূপ বিশেষত্ব সূচিত হয় না। কিন্তু যাঁহার এ সকল সুবিধা নাই, যাঁহাকে জঙ্গল কাটিয়া রাজধানী বসাইতে হয়, শস্যক্ষেত্র সমুন্নত করিয়া দুর্গপ্রাচীর গঠন করিতে হয়, কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী দরিদ্র নিরক্ষরদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেনাদল গঠন করিতে হয়, অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজ্যপালন, সেনাপরিপোষণ এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র গঠন করিয়া লইতে হয়, তিনি যদি প্রতিকূলশক্তিসংঘর্ষে পতিত হইয়া অল্পদিনের জন্যও স্বাধীনভাবে জয়পতাকা বহন করিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহার জন্য ইতিহাস অবশ্যই স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া থাকে। সীতারাম বাঙ্গালী, সীতারাম নিঃসম্বল দরিদ্র কায়স্থ, সীতারাম পরাধীন বঙ্গদেশের পরাধীন ক্ষুদ্র প্রজা; কিন্তু ইতিহাস তাঁহার জন্য স্বর্ণসিংহাসন গঠন করিয়া দিয়াছে! ইহাতেই সীতারামের গৌরব; ইহাতেই বাঙ্গালীর গৌরব; এবং এই জন্যই সীতারামের ইতিহাস বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সম্মানলাভের অধিকারী। বাঙ্গালী কি সীতারামকে সে সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? বাঙ্গালী যেরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া উৎসাহের সহিত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাঙ্গালী কি সে উৎসাহের অংশমাত্রও এই সকল ঐতিহাসিক রত্নোদ্ধারের জন্য নিয়োগ করিতে গৌরববোধ করিবেন না?

দশম অধ্যায়।

সীতারামের রাজধানী বহুবিস্তৃত জনাকীর্ণ মহানগর হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান মহম্মদপুর সবডিভিসনের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ১৫ মাইল দূরে এই প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না; তাঁহার সুরক্ষিত রাজধানী অজলোকের কর-

ভগ্নগত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মহম্মদপুরেই যশোহরের জেলা সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে সীতারামের পুণ্যকীর্ত্তিগুলি ধূলিপরিণত হইত না; সীতারাম এবং মহম্মদপুরের নাম লোকের নিকট পূর্ব্ববৎ সুপরিচিত থাকিত। কিন্তু ইংরাজবণিক ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চারি দিকে যে ভীষণ কালের চিতা জ্বলিয়া উঠে, তাহার অগ্নিকণা মহম্মদপুরেও পতিত হইয়াছিল; ১২৪৩ সালের সমকালে এমন মহামারীর আবির্ভাব হইল যে, সেই সময় হইতে মহম্মদপুর জঙ্গল হইয়া গেল; লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল; যাহারা ইংরাজের আদেশে মহম্মদপুরের ভিতর দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করিতেছিল, সেই সকল কয়েদীদিগের মধ্যে শত শত লোক কালকবলে পতিত হইল। সুতরাং তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দির বৎসর হইল, মেজর রেণেল যে সুবিখ্যাত মানচিত্র † সংকলন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান নগর বলিয়া মহম্মদপুরের নাম বৃহদক্ষরে লিখিত আছে; সে সময়েও ভূষণা চাকলার সদর কাছারী মহম্মদপুরেই সংস্থাপিত ছিল।

শিল্পের জন্য, বাণিজ্যের জন্য, সীতারামের আন্তরিক অনুরাগের জন্য, মহম্মদপুরের বাজার অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, ক্ষুদ্রায়তন দুর্গের মধ্যে তাহার স্থান সংকুলন হইয়া উঠিল না। সীতারাম সেই জন্য শিল্পীদিগকে দুর্গের বাহিরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত এই বাজার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সীতারামের সময়ে তাঁহার নিতান্ত অনুগত লোক ভিন্ন আর কেহ দুর্গাভ্যন্তরে দোকান খুলিতে পারিত না। ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, কেবল সেই জন্যই তিনি বিদেশাগত শিল্পকরিদিগকে দুর্গমূল হইতে দূরস্থানে শিল্পাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই সকল বিপণিশ্রেণী কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও তাহার সীমা-চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

মোগল শাসনকর্ত্তার অগোচরে অলক্ষিতভাবে তাড়াতাড়ি নগর পত্তন

---

* Westlands's Jessore. † Major Rennel's map.

করায়, মহম্মদপুরে স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার প্রত্যেক ইষ্টকস্তূপের সঙ্গে সীতারামের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে বলিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। রাজধানীর অন্যান্য বাড়ীঘরের সবিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সীতারামের কল্যাণে যে সকল দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এই সকল দেবমন্দিরের অধিকাংশই গঠনকৌশলে বিশেষ গৌরবলাভ করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু গঠনকৌশল বা বাহ্য শোভার বাহুল্য না থাকিলেও, প্রত্যেক দেবমন্দিরেই সীতারামের এক একখানি প্রস্তরফলক নিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে সে সকল ফলকলিপির অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছে। কে কোন্ সময়ে তাহা অপহরণ করিল, সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, হয় ত এখনও ভগ্নাবশেষ ইষ্টক-রাশির মধ্যে সে সকল ফলকলিপি অনাদরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে! ওয়েষ্টল্যাণ্ড যখন মহম্মদপুর পরিদর্শন করেন, তখন অধিকাংশ ফলকলিপিই বর্ত্তমান ছিল না; তিনি দেবপূজকদিগের মুখে তাহার যে বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিদর্শনের পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট সে সকল ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * সেই গ্রন্থলিখিত পাঠের সহিত ওয়েষ্টল্যাণ্ডের লিখিত পাঠের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তদবলম্বনে মন্দিরগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল মন্দিরের মধ্যে "দশভুজালয়" নামক মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই মন্দির সীতারামের গুপ্তকোষাগার-স্থানীয় দুর্গমধ্যস্থ সরোবরতীরে সংস্থাপিত। মন্দিরটি নিতান্তই ক্ষুদ্র; দেখিতে 'বাঙ্গলা' ঘরের মত; একটি মাত্র কক্ষ, এবং কক্ষের সম্মুখে ক্ষুদ্রায়তন বারান্দা। বারান্দার সম্মুখস্থ পুরাতন মিলানগুলিও কালক্রমে পড়িয়া গিয়াছে। সেকালে 'বাঙ্গলা' ঘরের অনুকরণে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রথা ছিল। নাটোরের রাজবাটীতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রাণী ভবানীর নির্ম্মিত এই শ্রেণীর অনেক-গুলি দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। "দশভুজালয়ে" এখন আর কোন ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই। সেকালে ইহাতে যে প্রস্তরফলক নিহিত ছিল, তাহাতে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যাইত,—

* Bengal Monuments.

"মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ং।
অকারি শ্রীসীতারামরায়েন মন্দিরম্॥"

হস্তাক্ষর বাঙ্গলা, কিন্তু অনেকটা প্রাকৃত ধরণের, বিশেষ সুগঠিত সুপাঠ্য অক্ষর-সম্বন্ধ নহে। এই ফলকলিপির পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রী সীতারাম রায় কর্ত্তৃক মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।" মহী অর্থে পৃথিবী—একার্থবাচক; ভুজ দ্বি-অর্থ-জ্ঞাপক, রস ষট্-সংখ্যা-দ্যোতক, ক্ষৌণী পৃথিবীরই প্রতিশব্দ, সুতরাং তাহাও একার্থবাচক। সংখ্যাগণনায় ১২৬১ হয়। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ;"—সুতরাং ১৬২১ শকে এই মন্দির নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। ১৬২১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন দিল্লী মুসলমানের রাজধানী; আরঙ্গজীবের প্রবল প্রতাপ চারি দিকে দেদীপ্যমান; হিন্দু-দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়ানিচয় ধরাতলে বিলুণ্ঠিত; কাশীধাম সীমা-চিহ্নপরিশূন্য বিচ্ছিন্ন ভগ্নস্তূপ; তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্তম্ভের উপর সমুন্নত মুসলমান-মসজেদে "আল্লাহো আকবর" রব সদর্পে প্রতিধ্বনিত!

যে-লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের সৌভাগ্য-সূচনার মূল কারণ বলিয়া লোক-সমাজে চিরবিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্যও একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত। এই মন্দির অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতল গৃহ; গঠন-গৌরববিবর্জ্জিত ইষ্টকস্তূপ-মাত্র।* ইহার অবস্থা এখনও কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৎ সংরক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণের নামে এখনও দেবসেবা চলিতেছে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, আসল লক্ষ্মীনারায়ণ আর মহম্মদপুরে নাই। মহম্মদপুর যে লক্ষ্মীহীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়া গিয়াছেন যে, "আসল লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা নড়ালের বাবুরা চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও বিক্ষারিত হইয়া উঠিয়াছে!"

লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরেও একখানি ফলকলিপি নিহিত ছিল, তাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত ছিল যে;—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরম্॥"

ইহার পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "সীতারাম রায় কর্ত্তৃক পিতৃপুণ্য-সংস্থানার্থ লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থিতির জন্য তর্কাক্ষিরসভূশকে মন্দির নির্ম্মিত

* Westland's Jessore.

হইয়াছিল।" তর্ক শব্দ দর্শনজ্ঞাপক, দর্শনগুলি সংখ্যায় ছয়টি; অঙ্কি দ্বি-সংখ্যা-প্রতিপাদক; রস শব্দ ষট্ সংখ্যাবাচক; ভূ শব্দে পৃথিবী, একার্থ-বোধক; সুতরাং অর্থ যোজনা করিলে জানা যায় যে, এই মন্দির ১৬২৬ শকে নির্ম্মিত হয়। ১৬২৬ শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে মুসলমান রাজধানী উঠিয়া আসিতেছে।

সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের কল্যাণে যাত্রা মহোৎসবাদিতে সবিশেষ সমারোহ হইত। তন্মধ্যে দোলযাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষেই লক্ষ্মীনারায়ণের বিভবচ্ছটা সমধিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তেমন বৃহদায়তন নহে; সুতরাং তাহাতে দোলযাত্রার সমারোহ সুসম্পন্ন হইত না। তজ্জন্য সীতারাম সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনসম্মুখে পৃথক একটি দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে কোন ফলকলিপি ছিল না। দোলমঞ্চটি সমুন্নত, অপেক্ষাকৃত সুগঠিত এবং সুসজ্জিত;—তাহা এখনও প্রায় সেইরূপ অবস্থাতেই আছে। নবাবী আমলে দোলযাত্রার বড়ই আড়ম্বর ছিল। মুসলমান সরকারে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দোলযাত্রা উপলক্ষে এক পক্ষ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজদরবার বন্ধ থাকিত। এই প্রথা নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় পর্য্যন্তও যে সমভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা সিরাজদ্দৌলার লিখিত একখানি পত্রে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। * দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পরিখার সমসূত্রে একটি সুবিস্তৃত দীর্ঘায়তন রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া সীতারাম-রায় শ্রীঈশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর দিয়া সুন্দর সুচিত্রিত রথারোহণে বিগ্রহদেব মৃদঙ্গকরতালসমন্বিত সংকীর্ত্তন-সমারোহে হেলিতে দুলিতে মথুরাগমনের পূর্ব্বস্মৃতির সৌভাগ্যগর্ব্ব উপভোগ করিতেন;—ভক্তভৃঙ্গকণ্ঠোচ্ছ্বাসপরিপূরিত হরিধ্বনি কোলাহল করিয়া জয় ঘোষণা করিত।

দুর্গস্থিত এই সকল দেবমন্দির ব্যতীত দুর্গসংলগ্ন কানাইনগর গ্রামে সীতারামের আর একটি দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। এই মন্দিরটি এখন চতুষ্পার্শ্বস্থ বিটপিরাজির মধ্যে নীরবে বিগত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনীর স্মৃতি-চিহ্ন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ; সর্ব্বত্রই খিলান; ছাদের উপর মন্দিরচূড়া; তাহা প্রায় মন্দিরের সমান উচ্চ; দুই পার্শ্বে ঈষদ্বক্র দুইটি চূড়া। সম্মুখভাগে নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-

* Letter from Nawab Shiraj Dowla to Admiral Watson.

গঠিত, এবং তিনটি দ্বার-সংযুক্ত। এই মন্দিরে সীতারাম প্রাণপণে বাহুল্যের বিস্তার কারিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক দ্বারের উপর এক একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, তাহাতে বিচিত্র-চিত্রনিপুণ স্থপতিবিদ্যাকুশল কারিগরগণ সীতারামের গৌরববোষণার জন্য আঁকিয়া রাখিয়াছেন;—দুই দিক হইতে দুইটি পরাক্রান্ত সিংহ মধ্যস্থ রাজমুকুট সগৌরবে ধরিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া দ্বার, দ্বার-পথ অতিক্রম করিলেই বারান্দা; তাহার পর মন্দিরমধ্যস্থ কক্ষ; সেখানে রত্নচতুর্দ্দোলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ বিরাজ করিতেন। সীতারামে নাই, কিন্তু কাননইনগরে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে কৃষ্ণজী বিগ্রহ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

এই মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত কবিতায় যে কলকলিপি নিহিত আছে, তাহা সহজে পাঠ করা যায় না। তাহার পাঠোদ্ধার কবিয়া গবর্মেণ্ট এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড-বাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কবিতাটি স্থানাভাববশতঃ চরণে চরণে বিভাগ করিয়া লেখা হয় নাই; কোন স্থানে বিরাম গতির কোনরূপ চিহ্নও ব্যবহৃত হয় নাই; সুতরাং বিদেশী লোকের পক্ষে তাহার পাঠোদ্ধার করা শ্রমসাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরফলকে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে:—

বাণিধন্দাঙ্কচন্দ্রে
পরিগণিত শকে কৃষ্ণভোষা
ভিলাষী শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবো
ভব কুলকমলে ভানকোভানুতুল্য
অজস্রং সৌধযুক্ত রুচিরতর
চি হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং শ্রীসীতা
রামরায়ো যদুপতি নগরে
ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

পরিষ্কার করিয়া লিখিলে কবিতাটি এইরূপ দাঁড়ায়;—

"বাণধন্দাঙ্কচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে ভানকোভানুতুল্য
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিরতরুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ॥"

পাঠোদ্ধার করিলে জানা যায় যে, "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে যিনি ভানুতুল্য দীপ্তিপ্রদান করিয়া পিতৃবংশপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ভক্তিমান শ্রীসীতারাম রায় বহুবিধসৌধযুক্ত এবং সুন্দর হইতেও সুন্দর

কানাইনগর গ্রামে বাণদ্বন্দ্বাঙ্কচন্দ্রপরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী হইয়া এই বিচিত্র কৃষ্ণগেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "বাণ শব্দ ভগবান মকরকেতনের তূণীরগর্ভস্থ পঞ্চবাণ সূচনা করে; দ্বন্দ্ব শব্দের সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব হইবে না; অঙ্ক বলিতে বড়ঙ্কই বিঘোষিত হইয়া থাকে, চন্দ্র শব্দ পাঠশালার বালকদিগের চিরাভ্যস্ত একার্থবোধক সুপরিচিত সংখ্যা। সুতরাং ১৬২৫ শকে সীতারাম রায় এই মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৬২৫ শক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী। তখন বাঙ্গলাদেশে মোগলের গৃহকলহ উপস্থিত; সম্রাটপৌত্র আজিমুশ্শান অপরা ক্রীতদাস মুর্শিদ কুলী খাঁ,—আরঙ্গজীবের বিচারে কাহার জয় হইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয্যে উদগ্রীব হইয়াছিলেন।

এই মন্দির ফলকে সীতারাম আত্মবংশের উল্লেখ করিয়া আপনাকে "শ্রীমদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভবকুবলয়কমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা সীতারামের আত্মগুরিতার পরিচয় নহে; লোকে তাঁহাকে তৎকালে কিরূপ গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করিত, তাহারই পরিচায়ক। ভাষা কথায় লোকে যাঁহাদিগকে "বিশ্বাস" উপাধি ধরিয়া ডাকিত, সেই বিশ্বাসবংশকমলের পক্ষে সীতারাম যে ভানুতুল্য উদ্ভাসক শক্তিরূপে সেকালে লোকসমাজে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একাদশ অধ্যায়।

দিন দিন সীতারামের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সেই বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া শীঘ্রই মোগলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। মোগল সে সময়ের বাদশাহ, মোগল সে সময়ের নবাব, মোগল সে সময়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সুতরাং সীতারাম মোগলের নিকট রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিচিত হইলেন। মোগল তাঁহার প্রবল প্রতাপ চূর্ণ করিবার জন্য যথারীতি আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সীতারামের রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে মধুমতী নদী; তাহার পূর্ব্ব তীরেই ভূষণার বিস্তৃত জনপদ। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশ ১৩ চাকলায় বিভক্ত করেন; ভূষণা তাহার মধ্যে একটি প্রধান চাকলা বলিয়া পরিচিত ছিল। এই চাকলার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভূষণায় একজন মুসলমান ফৌজদার থাকিবার রীতি ছিল। তাঁহার সঙ্গেই সীতারামের সর্ব্বপ্রথম কলহ উপস্থিত হইল।

সেকালের মুসলমান নবাব রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেন না, রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; সুতরাং সীতারাম মোগলকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলে, তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চেষ্টা করিত না। সীতারাম কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি নবাবের আদেশ প্রতিপালন করিতে বা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে সীতারামের কলহ উপস্থিত হইল।

ভূষণার মুসলমান ফৌজদার অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন; অবশেষে বাহুবল প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন সীতারামের সুশিক্ষিত সিপাহিদিগের সঙ্গে ফৌজদারের ফৌজদিগের শক্তিপরীক্ষার আয়োজন হইল। মধুমতীর জলস্রোত রুধিরবর্জ্জিত হইল, হিন্দু ও মুসলমানের শবদেহ কাতারে কাতারে ভাসিয়া চলিল, অবশেষে ফৌজদারের পরাজয় এবং সীতারামের জয় হইয়া সমগ্র ভূষণা অঞ্চল সীতারামের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

রাজা সীতারাম এই বিস্তীর্ণ জনপদে স্বাধীনভাবে আত্মশক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদপুরের ন্যায় আরও অনেক স্থানে দীঘি পুষ্করিণী এবং রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার পাংসা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে এবং মাগুরার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ, হরিহরনগর এবং সূর্য্যকুণ্ডে এই সকল রাজপ্রাসাদাদির কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে যে, সীতারাম নিরন্তর রাজধানীতে আলস্যে কালযাপন না করিয়া, সময়ে সময়ে এই সকল প্রাসাদে বাস করিয়া স্বচক্ষে রাজ্যকার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা সহজ নহে। তথাপি এই সকল ভগ্নকীর্ত্তি দেখিয়া জনশ্রুতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। সেকালের মুসলমান নবাব বা হিন্দু জমিদারগণ প্রায়ই রাজধানীর সযত্নরচিত রাজপ্রাসাদের শীতলকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইতেন না। লোকে তাঁহাদের নাম শুনিত, কিন্তু সচরাচর চর্ম্মচক্ষে দর্শনলাভ করিতে পাইত না। ইহাতে রাজা প্রজার মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে পারিত না। কিন্তু সীতারাম ইহার ব্যতিক্রম করিয়া সরলভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যে মোগল সহসা তাঁহার প্রবল শক্তিকে প্রতিহত করিবার অবসর পাইল না। সীতারামের স্বাধী-

রাজকারাগার ছিল, বিচারালয় ছিল এবং সদর মফঃস্বলে রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য স্থানে স্থানে কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছিল;—সুতরাং তিনি যেমন বাহুবলে মোগলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া স্বরাজ্যে রাজা নাম সদর্থযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকে সহজেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন রাজশক্তি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। রাজবিধি যদি প্রজাসাধারণের কল্যাণকর হয়, তবে লোকে রাজবিধির প্রতি এবং রাজশক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে, এবং রাজার ব্যক্তিগত স্বভাব যেরূপ হউক না কেন, তাঁহার নিকট রাজভক্তি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। সেকালে রাজশক্তির এরূপ অবস্থা ছিল না। রাজা কেবল স্বভাবগুণে বা ক্ষমতাবলে লোকের ভয়ভক্তি উপহার পাইতেন। সুতরাং রাজার স্বভাব ভাল না হইলে, তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

সেকালের রাজদরবারে মৌখিক রাজভক্তির বাড়াবাড়ি থাকিলেও, অনেক স্থলে আন্তরিক রাজভক্তির বড়ই অভাব দৃষ্টিগোচর হইত। সীতারামের রাজ্যে কিন্তু আন্তরিক রাজভক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রণার সহায়, যাঁহারা তাঁহার বাহুবলের সহায়, যাঁহারা তাঁহার স্বাধীনতালাভের উৎসাহদাতা, তাঁহারা সকলেই এরূপ আন্তরিক স্নেহে তাঁহার সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিতেন যে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তাঁহারা সীতারামের জয়পতাকা রক্ষা করিতে কাতর হইতেন না। এই সকল লোকের ইতিহাস, ইহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ, ইহাদিগের নাম ধাম সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—যাঁহাদের এখনও নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ, গবরদালান, এবং মেনাহাতির নামই সর্ব্বপ্রধান। মেনাহাতির প্রকৃত নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইনি সীতারামের প্রধান সেনাপতি এবং দক্ষিণ বাহু বলিয়া এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত। দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠদেহে মেনাহাতি অমানুষিক বল ধারণ করিতেন; লোকে সেই জন্য তাঁহাকে মেনাহাতি বলিয়া ডাকিত। ইনি সমস্ত দিন দুর্গমধ্যে সেনাচালনা ও রণশিক্ষা দিয়া রজনীযোগে সীতারামের সিংহদ্বারে শয়ন করিয়া থাকিতেন, সেকালের লোকে অলৌকিক শক্তিতে এত দূর বিশ্বাস করিত যে, সকলেই বলিত, মেনাহাতি এক প্রকার অমর, তাহার মৃত্যুবাণ কেহ জানে না, এবং ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুসন্ধান

না বলিয়া দিলে কেহ কখনও মেনাহাতিকে নিহত করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাসে মেনাহাতির সেনাদল সর্ব্বদাই গর্ব্বোন্নতশিরে সর্ব্বত্র আস্ফালন করিয়া বেড়াইত। অকৃত্রিম অনুরাগে, অলৌকিক বাহুবলে, অপরিসীম সাহসে এবং অবিমিশ্র প্রভুভক্তিতে এই বাঙ্গালী বীরপুরুষ স্বদেশে আত্মগৌরবস্মৃতি চিরস্মরণীয় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালী কেবল নাম-মাত্রই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। মহম্মদপুরে তাঁহার যে সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান আছে, কোন বাঙ্গালী কোন দিন তাহাতে জয়মাল্য জড়াইয়া দেয় নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

ভূষণা অঞ্চলে সীতারামের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইবার পর, নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁ আর তাঁহাকে সহসা পরাজিত করিবার অবসর পাইলেন না। রেনেল-কৃত প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় যে, সেকালের ভূষণা চাকলার উত্তরে এবং পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল প্রবাহ, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে রাজসাহী ও কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধ জনপদ। পশ্চিম ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া সীতারামকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু মধুমতী নদীর পশ্চিমতীরে দুর্গরচনা করিয়া সীতারাম আপন রাজ্য বিশেষরূপে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সীতারামের নাম দিল্লীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সেকালে মোগল অমাত্যগণ দিল্লীর দরবার হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে জায়গীর বা রাজ-পদ দিবার জন্য সহজেই সনন্দ প্রদান করিতে পারিতেন। আবুতোরাপ নামক এক জন মোগল সেনাপতি এই সময়ে দিল্লীতে বাস করিতেন। তিনি বাহুবলে সীতারামকে পরাজিত করিতে সম্মত হওয়ায়, বাদশাহের দরবার হইতে তাঁহাকে ভূষণার-ফৌজদার নিযুক্ত করা হইল। তোরাপ দিল্লীর দরবারে সবি-শেষ প্রতিপন্ন ছিলেন, আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং আবু তোরাপ সহজেই সনন্দ হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি সসৈন্যে মুর্সিদাবাদের রাজধানীতে শুভাগমন করিয়া যথারীতি নবাব-দরবারে ফৌজদারী সনন্দ দাখিল করিয়া দিলেন, এবং ভূষণা দখল করিবার জন্য নবাবের নিকট সেনাসাহায্য পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নবাব মুর্সিদকুলী খাঁ তখন পূর্ণিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ-দমনে ব্যতিব্যস্ত; তিনি আবু তোরাপকে সৈন্যবল প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তোরাপ বাহু-

রিয়া উঠিব, এবং বারম্বার জিজ্ঞাসা করিব—এ সব কেন? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতারক্ষার জন্য এত নিষ্ফল প্রয়াস কেন?

স্বাধীনতাই যে মহত্ত্বের একমাত্র সোপান, এবং মহাপুরুষেরা যে কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসে সীতারাম সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সেকালের বাঙ্গালী যদি সীতারামের সাধু দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে পারিত, তবে মোগলের গ্রাসবিগলিত সোনার রাজ্য বিদেশের বণিক সমিতি বিনা পণে কুড়াইয়া লইবার অবসর পাইত না!

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে মুর্সিদ কুলী খাঁ সত্য সত্যই বিচলিত হইলেন। তিনি সীতারামের প্রবল প্রতাপে ভীত হইলেন না; তাঁহার মনে হইল যে, বাদসাহ তাঁহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া এখনই হয় ত আর কাহাকেও বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব করিয়া পাঠাইবেন। সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে সাহস করিলেন না। বক্স আলী খাঁ নামক একজন বিশ্বস্ত মুসলমানকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন, এবং যথারীতি দিল্লীর দরবারে সমাচার প্রেরণ করিলেন।

এক জন ফৌজদারের শূন্যপদে আর এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করা খুব সহজ কথা। ইঙ্গিতমাত্রে অমাত্যবর্গ সনন্দ প্রস্তুত করিয়া আনিল; অবলীলাক্রমে তাহাতে নবাবের মোহর দস্তখত অঙ্কিত হইয়া গেল। কিন্তু সীতারামকে পরাজিত করিবার উপায় কি,—সে কথা ইঙ্গিতমাত্রে মীমাংসিত হইবার বিষয় নহে।

নাটোর রাজবংশের স্বনামখ্যাত রায় রাইয়ান রঘুনন্দন এই সময়ে নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বের অবধি ছিল না। রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রামজীবনের প্রবল প্রতাপ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব অনন্যোপায় হইয়া রামজীবন এবং রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন। সীতারামের রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিমে রামজীবনের বিস্তৃত জনপদ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সীতারামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা খুব সহজ। রঘুনন্দন প্রতিভাবলে সকলের নিকটই সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই প্রতিভা এখন সীতারামের সর্ব্বনাশসাধনকল্পে নিযুক্ত হইল। নম্রপাকুশল রঘুনন্দন

স্থির করিলেন যে, চারিদিক হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা রহিত করিতে হইবে, এবং জমিদারী ফৌজ ও সুবাদারী সিপাই সম্মিলিত করিয়া রাজ্য অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে সীতারামকে বশীভূত করিতে হইবে। যেমন পরামর্শ হইল, জমিদারদিগের উপর সেইরূপ আদেশলিপি প্রচারিত হইল।

কেহই এই রাজাদেশ অবহেলা করিতে সাহস পাইল না; সুতরাং পদ্মা, গৌরী, মধুমতী, জলঙ্গী প্রভৃতি নদীস্রোতের সঙ্গে যে সকল পণ্যদ্রব্য সীতারামের রাজ্যে বাহিত হইত, তাহার সমাগম সহসা রহিত হইয়া গেল। চরমুখে এই সকল গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া সীতারাম বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিরীহস্বভাব ভালমানুষকেও দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলে; সীতারামেরও তাহাই হইল। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, বাণিজ্যদ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রী আমদানী হইতেছে না, তখন আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতে হইল। যুদ্ধকালে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করা দোষাবহ নহে। কিন্তু ইতিহাসলেখক সকল সময়ে সে কথা স্মরণ করিতে চাহেন না। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম নৌকাপথে দেশ লুট করিয়া বেড়াইতেন; তিনি শুধু বিদ্রোহী নহেন, পরাক্রান্ত উৎপীড়নকারী দস্যু!*

যাঁহারা দিগ্বিজয়ী সেকন্দার বাদশাহ এবং দস্যুদলপতির উপকথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাদশাহ এবং দস্যুর মধ্যে বাদশাহই প্রকৃত দস্যু। সীতারাম দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু উদরান্নের জন্য, বাসনাবাহুল্যের জন্য, অথবা কেবল শত্রুপক্ষকে অপদস্থ ও হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতিমাত্রই সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

সীতারামের অত্যাচারে সুবাদারী সিপাহীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; যেনাহাতির প্রবলপরাক্রমে জলস্থল কম্পিত হইতে লাগিল; গ্রামে নগরে, লোকালয়ে, নিবিড় বনে, নদীসৈকতে, সর্ব্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে সকল কলহে সীতারামকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিল না।

নাটোর রাজবংশে দয়ারাম রায় নামে একজন বিচক্ষণ প্রভুভক্ত গাহসী ও

* Sitaram kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Fouzder —Stewart.

তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে [illegible] রায়ও সেইরূপ সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। দয়ারাম নাটোর রাজসরকারের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যখন সীতারামকে পরাজিত করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন দুই দিক হইতে দুই দল সেনা প্রেরিত হইল। সুবাদারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ এবং জমিদারী ফৌজের অধিনায়ক দয়ারাম রায়, যুগপৎ ভূষণা আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস চিরদিনই একরূপ। বাঙ্গালী চিরদিন বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী যদি স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও বদ্ধপরিকর হইত, সপ্তদশ অশ্বারোহীর অধিনায়ক স্থূলোদর খর্ব্বদেহ কর্কটাকার ব্যক্তিরা খিলিজি নবদ্বীপে শুভাগমন করিবার অবসর পাইতেন না। বাঙ্গালী যদি একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, আজ যাহারা রাজা, হয় ত তাঁহারা চিরদিনই বণিক্‌ব্যাপার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ধারাবাহিক ইতিহাস চিরদিনই এক রূপ, চিরদিনই বাঙ্গালীর মন্ত্রণাকৌশলে সুবর্ণ অযথাবিন্যস্ত রত্নিবৎ বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সীতারামেরও তাহাই হইল।

দয়ারামের কৌশলে মেনাহাতি নিহত হইলেন। মেনাহাতির মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে কেহ সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে সাহস পাইত না; সুতরাং দয়ারাম সম্মুখযুদ্ধের আয়োজন করিলেন না। গুপ্তচরের সাহায্যে মাত্র কয়েক জন সৈন্য সহ [illegible] করিয়া, সযত্ন ও সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। [illegible] মেনাহাতি মহম্মদপুরে [illegible] রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন। মেনাহাতি প্রতিপ্রত্যূষে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইতেন; সাহসী মেনাহাতি সঙ্গে অনুচরমাত্র লইতেন না। সেই গুপ্তসংবাদ পাইয়া দয়ারামের অনুচরবর্গ একদিন প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া মেনাহাতিকে অন্যায় কৌশলে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছিল। মেনাহাতির জীবন ও মৃত্যু সকলে অলৌকিক কিম্বদন্তীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লোকে বলে, মেনাহাতি ভূলুণ্ঠিত হইয়াও মরিলেন না; ক্রমে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি প্রাণবায়ু বাহির হইল না। অবশেষে তিনি আর অনর্থক যন্ত্রণা সহন করা অনাবশ্যক বলিয়া, আপন মৃত্যুসন্ধান বলিয়া দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

মেনাহাতি নিহত হইল, কিন্তু মহম্মদপুর হস্তগত হইল না। গুপ্তচরগণ রংপোষ উদ্দীপ্ত করিয়া গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িল; সীতারাম এই সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যথোচিত সমারোহে মেনাহাতির কবন্ধদেহের সৎকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জমিদারী কৌজের অধিনায়ক মেনাহাতির ছিন্নমুণ্ড লইয়া নবাবদরবারে উপনীত হইলেন। সে বীরমস্তক যেন ভীমের মস্তক। নবাব তাহা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, হায়! হায়! এমন মহাবীরকে হত্যা করা হইল কেন? ইহাকে লশকরীর কারারুদ্ধ না করিয়া গুপ্তভাবে নিহত করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। * তিনি সসম্ভ্রমে সীতারামের নিকট সে বীরমুণ্ড উপহার পাঠাইয়া দিলেন। † মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সেই বীরমুণ্ড সমাহিত হইয়াছে; সীতারাম তাহার উপর যে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মেনাহাতিই সীতারামের দক্ষিণবাহু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেনাহাতি নিহত হইলে সীতারামের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। চারি দিক হইতে নবাবের ফৌজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কালক্রমে সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, রজা আলী খাঁ সীতারামকে ও তাঁহার পরিবারস্থ সমুদায় নরনারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে চালান দিয়াছিলেন; নবাব সীতারামের স্ত্রীপুত্রদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া সীতারামকে শূলদণ্ডে নিহত করেন, এবং সগৌরবে দিল্লীতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করেন। †

---

* It is narrated that his head was sent to the Nawab at Moorshedabad and that the Nawab, seeing the huge head, said,—"A man like that you should have brought alive and not killed." He directed the head to be taken back to Muhammedpore, and it was there buried, and a great tomb raised over it. The spot marked by the brick foundation of the tomb is still shewn close to the north east corner of the present bazar.—J. Westland.

† These proceedings were entered in the public records; and the Governor wrote a particular representation of all the circumstances to the Emperor, placing his own conduct in the most favourable point of view.—Stewart.

মুসলমানদিগের এই কাহিনী ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রাজসাহী প্রদেশে আজিও সীতারামের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; এ দেশের লোকেও মুসলমানদিগের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। নলডাঙ্গার রাজসরকার হইতে সীতারামের ভ্রাতুষ্পুত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃত্তিলাভ করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ বা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করার বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দিল্লীর দরবারে বাহবা পাইবার জন্য নবাব বাহাদুর দেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসলেখকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সীতারাম মূলদণ্ডে নিহত হইলে অবশ্যই তাহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান থাকিত।

ভূষণারাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিজয়োন্মত্ত জমিদারী ফৌজ মহম্মদপুর লুটিয়া লইল। দয়ারাম রায় এই অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নবাব দরবার হইতে "রায় রায়ান" উপাধি লাভ করিলেন। সীতারামের সুবিস্তৃত রাজ্য মহারাজা রামজীবনের রাজসাহী-রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ দিল্লীর দরবারে যেরূপ ভাবে বিজয় ঘোষণা করুন না কেন, মহারাজা রামজীবনের সম্বন্ধে কিন্তু ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কেবল ইহাই লিখিত আছে যে, অন্য লোকে ভূষণা চাকলার জন্য যে পরিমাণ রাজকর দিতে চাহিল, রামজীবন তদপেক্ষা অধিক রাজকর দিতে অঙ্গীকার করায়, চাকলা তাঁহারই জমিদারীভুক্ত করা হইল।

ভূষণা রাজসাহী রাজ্যে ভুক্ত হইয়া গেল। দয়ারাম তাড়াতাড়ি আপন বাটী দিঘাপতিয়াতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, ভূষণা লুটের মূল্যবান সম্পত্তিগুলি বুঝি দিঘাপতিয়ায় চলিয়া গেল। নাটোর রাজবংশের কুমার কালিকাপ্রসাদ গোপনে সন্ধান লইবার জন্য দিঘাপতিয়ায় উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে সংশয় দূর হইয়া গেল। সাহসী সুচতুর দয়ারাম পরমভক্ত বৈষ্ণব। তিনি সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহদমন করিয়াছিলেন, কিন্তু লুটের দ্রব্যের কপর্দ্দকও স্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই। যে ভাবে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তকার্য্য

* The Rajas of Rajshahi.

অবশ্যই সমাগত হইবে; সুতরাং তিনি অন্য কোন দ্রব্যে লোভ না করিয়া স্বয়ং সীতারামের প্রিয়তম বিগ্রহ কৃষ্ণজীকে সসম্ভ্রমে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নিজ পাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে আজিও দয়ারামের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যথোচিত সমারোহে কৃষ্ণজীর পূজা হইতেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার আরকচিহ্ন আর কিছুই বর্ত্তমান নাই, কেবল কৃষ্ণজীর পাদপদ্মে ক্ষোদিত কাছে—দয়ারাম বাহাদুর।

সীতারামের কি হইল? রাজ্য গেল, রাজধানী গেল, হিন্দু স্বাধীনতার আকাশকুসুম শুকাইয়া গেল, তথাপি জীবন গেল না। তাঁহাকে খুলদণ্ডে নিহত করিবার আয়োজন হইল। সীতারাম তাহার আভাস পাইয়া বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া মুর্শিদাবাদ-কারাগারে জীবনলীলা বিসর্জ্জন করিলেন।* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই কাহিনীকেই সত্য কাহিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসাহীর লোকের ধারণা অন্যরূপ। নাটোর রাজবাটীতে এখনও একটি জরাজীর্ণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুরাতন কক্ষ আছে; লোকে বলে, সেখানেই সীতারাম বন্দিদশায় প্রাণবিসর্জ্জন করেন। † নবাব যাঁহার প্রবল প্রতাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মোগল-সেনাপতি আবু তোরাপ যাঁহার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ধরিবার জন্য এত কৌশল এত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, সেই সীতারাম বন্দী হইবামাত্র নবাব যে তাঁহার আর কোন তত্ত্ব না লইয়া নাটোর রাজ-কারাগারে বাস করিবার অবসর দিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নাটোর রাজবাটীতে জনরব বড়ই প্রবল;—এখনও নাকি পুরাতন ভৃত্যবর্গ অন্ধকার নিশীথসময়ে সেই জরাজীর্ণ কারাকক্ষে সীতারামের প্রেতাত্মার বিকট চীৎকার শুনিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় যে, স্বয়ং দয়ারাম যখন সীতারামকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণজী বিগ্রহ কুক্ষিগত করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ গমন করিবার সময়ে সীতারামকে কয়েক দিনের জন্য নাটোর-রাজকারাগারে অবরুদ্ধ রাখিয়া অবশেষে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রামজীবন এবং রঘুনন্দনের অধ্যবসায়ে সীতারামের রাজধানী শ্মশান হইয়াছিল। সে শ্মশানভূমি সম্মার্জ্জন করিয়া আবার তাহার উপর আর একজন বিচিত্র রাজধানী গঠন করিয়া সযত্নরচিত দেবমন্দিরে সুসজ্জিত করিয়া মহোৎসবে মহম্মদপুরের রাজপথ শঙ্খঘণ্টারবে প্রতিশব্দিত করিয়া তুলিয়া-

* J. Westland. † রঘুভারতম্।

ছিলেন। সে সকল দেবমন্দির আবার ধীরে ধীরে বনজঙ্গলে লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে। যিনি সীতারামের শ্মশানপুরীকে আবার সুরক্ষিত সুসজ্জিত করিয়া দেবীপূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। রাণী ভবানীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের বীরকীর্ত্তি ক্রমেই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। মহম্মদপুর এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সে মহম্মদপুর আর নাই; তাহা এখন আবার শ্মশান!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

সমাপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

শিক্ষা।

মার্কিণ ছাত্রী।

আধুনিক সভ্যতার স্রোতে আমেরিকা সর্ব্ব বিষয়েই পৃথিবীর অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে; ইহার পরিচয় পাঠক নিত্যই পাইতেছেন। আমেরিকার 'নব অভ্যুদয়' হইলেও ইহারই মধ্যে সেখানে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রচার হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। বালিকা ও যুবতীর দল আপনাপন শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ দিন দিন নব নব উপায়ের আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতেছেন। আমেরিকার পরিবের ঘরের মেয়েরাও কেমন করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হন, আজ আমরা মার্চ্চ মাসের নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী হইতে তাহার একটা বিবরণ দিতেছি। মার্কিণ মেয়েদের বিদ্যানুরাগের বাহাদুরী আছে। কিন্তু উন্নতি-পরাঙ্মুখ অবশ্য বাঙ্গালী আমরা,—আমাদের চক্ষে তাঁহাদের এরূপ স্বাতন্ত্র্য কতকটা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর খৃঙ্খলশ্রীগণকে আমরা মার্কিণ মহিলার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতে পারি না। তবে মার্কিণ ছাত্রীর বিদ্যানুরাগ অনুকরণীয় বটে। তাহাও অতি সাবধানে কাটিয়া ছাঁটিয়া। আমরা স্ত্রীজাতির কলেজীয় উচ্চ শিক্ষার বড় প্রয়োজন দেখি না। আধুনিক উন্নতিপ্রয়াসী মহোদয়গণ যদি বাঞ্ছনীয় বোধ করেন, তাহা হইলে বেথুন কলেজে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

মার্কিণ সমাজের বিদ্যানুরাগ।

সেখুনীয় লেখিকা শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যাকন স্বয়ং এক দরিদ্রা ছাত্রী ছিলেন। তিনি যাহা লিপিয়াছেন, তাহা তাঁহার ছাত্রীজীবনেরই অভিজ্ঞতার ফল।

আমেরিকার শিক্ষিতশ্রেণীর কৃষকগণ, কন্যাদিগকে যথাকালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য, অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন আরম্ভ করে। বালিকাকে এক খণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে সকাল বেলা এবং ফিরিয়া আসিয়া আবার বৈকালে, সে ঐ ভূমিতে গাছ পুঁতে, জল ঢালে, এবং আগাছা উপড়ায়। উহাতে উৎপন্ন শাক সবজি, ফলমূল প্রভৃতি বিক্রয়

কৃষক সমাজে।

...ছাত্রীদিগের ক্রমোন্নতি প্রতি ত্রৈমাসে পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ...ছাত্রীদিগের কার্য্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ...বিদ্যালয়ের 'শিক্ষা সমাপ্ত' হয়। কখনও বা পরিদর্শকগণ 'কনভোকেশন' প্রদান করেন। সে দিবস ...বিদ্যালয় বেশ সুসজ্জিত হয়। ...ভৃতি ...বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বালিকাদিগের বিদ্যার পরীক্ষা লইয়া থাকেন। ...পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে; ইহাদের উপর আমাদের ...ভার ন্যস্ত থাকে। ইহারা কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে। সেই দ্বিতীয়শ্রেণীর কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

...ইহাদের সব সময় ...ছাত্রী থাকে না। কাহারও ছাত্রী থাকে আবার পরীক্ষা দিতে হইতেছে। পাশ ইত্যাদির ব্যাপার। আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোর্ডিং বিদ্যালয়ে নব ...ছাত্রীদিগের চালচলনের পরিবর্ত্তে করিয়া ছাত্রীদিগকেই সব কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে তাহারা শিক্ষাকার্য্যে বেশ দক্ষতা পাইয়া থাকে। মেয়েদের পরিচালনে এই প্রথা বিশেষ ফলপ্রদ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থালী।

...ছাত্রীদিগকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘরের জিনিষ পত্র ধোয়া মোছা, ...ঘরের